সেমিনার স্মারক-গ্রন্থ

২০০৮

সেমিনার বিভাগ
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

সেমিনার স্মারক-গ্রন্থ

২০০৮

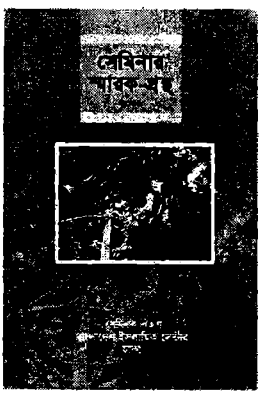

সম্পাদনায়

মোশাররফ হোসেন খান

সৌজন্যে

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

সেমিনার বিভাগ

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

ঢাকা

www.bjilibrary.com

সেমিনার স্মারক-গ্রন্থ
২০০৮

সম্পাদনায়
মোশাররফ হোসেন খান
সেমিনার বিভাগ
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
প্রধান কার্যালয় : ২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড (৪র্থ তলা)
ঢাকা-১২০৫, ফোন : ৮৬২৭০৮৬, ফ্যাক্স : ৯৬৬০৬৪৭
E-mail : info@bicdhaka.com, www.bicdhaka.com
বিক্রয় বিভাগ : কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস (২য় তলা)
ঢাকা-১০০০, ফোন : ৮৬২৭০৮৭, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
প্রকাশকাল
নভেম্বর, ২০০৮
গ্রন্থস্বত্ব
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
প্রচ্ছদ
গোলাম মাওলা
মুদ্রণ
আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার
ঢাকা-১২১৭
বিনিময়
একশত পঞ্চাশ টাকা

www.bjilibrary.com

সূ চী ক্র ম

সে মি না র প্র ব ন্ধ

ইন্ডিয়া ডকট্রিন : একটি পর্যালোচনা
মুহাম্মদ নূরুল আমিন ॥ ৫
সুদের অভিশাপ : পরিত্রাণের উপায়
অধ্যাপক শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান ॥ ৩০
বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক এবং আমাদের অস্তিত্বের সংগ্রাম
আজিজুল হক বান্না ॥ ৪৪
বাংলাদেশের প্রতি ভারতের আচরণ
ড. মাহফুজ পারভেজ ॥ ৬৭
ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ কৌশল
অধ্যাপক শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান ॥ ১০৭
অর্থনৈতিক ভারসাম্য সৃষ্টিতে যাকাতের ভূমিকা
ড. আ.ক.ম. আবদুল কাদের ॥ ১২৪
একটি মুসলিম দেশের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন কৌশল
মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম ॥ ১৩৪
নারীর উত্তরাধিকার ও অর্থনৈতিক মুক্তি
খোন্দকার রোকনুজ্জামান ॥ ১৬৫
ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিক
শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির ॥ ১৮৮
ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ
যুবাইর মুহাম্মাদ এহসানুল হক ॥ ২১৫

প রি শি ষ্ট

সেমিনার-প্রতিবেদন
মোশাররফ হোসেন খান ॥ ২৪১

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

ইন্ডিয়া ডকট্রিন ঃ একটি পর্যালোচনা

মুহাম্মদ নূরুল আমিন

■

ভারত আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী দেশ। প্রায় ৭০০ বছর মুসলিম শাসনের পর ১৯০ বছর বৃটিশ শাসনাধীনে থেকে অনেক আন্দোলন রক্তপাতের মুখে ১৯৪৭ সালের অগাস্ট মাসে উপমহাদেশ স্বাধীন হয় এবং ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে তৎকালীন পাকিস্তান ও ভারতীয় ইউনিয়নের জন্ম হয়। এর ২৪ বছর পর ১৯৭১ সালে নয় মাস মেয়াদী একটি সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল স্বাধীন বাংলাদেশ হিসেবে আত্ম প্রকাশ করে। বাংলাদেশ প্রায় তিন দিকেই ভারত দ্বারা বেষ্টিত; দক্ষিণ দিকে তার বঙ্গোপসাগর। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে ভারত সক্রিয়ভাবে বাংলাদেশকে সহায়তা করেছে। প্রায় এক কোটি লোককে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় দিয়েছে। ভারতীয় সৈন্যরা বাংলাদেশের স্বাধীনতার অনুকূলে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে এবং ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসে পাকিস্তানী বাহিনী তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে গঠিত যৌথ বাহিনীর কম্যান্ড তখন তাদের হাতে ছিল। ভারতের সাহায্য না পেলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সহজ হতো না।

ভারতের আয়তন ৩২,৮৭,৫৯০ বর্গ কিলোমিটার এবং জনসংখ্যা ১১২ কোটি। এই দেশটির আয়তন বাংলাদেশের তুলনায় প্রায় সোয়া বাইশ গুণ এবং পাকিস্তানের তুলনায় প্রায় তিন গুণ বড়।

www.bjilibrary.com

ভারতকে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম সামরিক শক্তি হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। এশিয়ায় চীনের পরেই তার স্থান। পাক ভারত বাংলাদেশ উপমহাদেশে সৈন্য সংখ্যা ও অস্ত্র ভান্ডারের দিক দিয়ে ভারত প্রথম। ভারতের নিয়মিত সৈন্য সংখ্যা ১৪,১৪,০০০। তার ১২ লক্ষ সৈন্যের একটি রিজার্ভ বাহিনী আছে। পক্ষান্তরে তার নিকটতম প্রতিবেশী ও প্রতিদ্বন্দ্বি পাকিস্তানের নিয়মিত সৈন্য সংখ্যা ৬,২০,০০০ এবং রিজার্ভ সৈন্যের সংখ্যা ৬,০০,০০০। ভারতের হাতে ৫,০০০ ট্যাংক এবং ৭৮৫টি যুদ্ধ বিমান আছে, পাকিস্তানের আছে ৩৭৪০টি ট্যাংক এবং ৫৩০টি যুদ্ধ বিমান।

ভারতের জনসংখ্যা ১১২ কোটি, পাকিস্তানের ১৬ কোটি এবং বাংলাদেশের ১৪ কোটি। ভারত মুখ্যত কৃষি প্রধান দেশ, জিডিপিতে শিল্পের অবদান মাত্র ১৮.৬% (২০০৫)। ভারতের ১০% লোক মোট জাতীয় সম্পদের ৩৩ শতাংশ ভোগ করে। মোট জনসংখ্যার ২৭.৫ শতাংশ দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাস করে, ৪৬ শতাংশ শিশু অপুষ্টিতে ভোগে। কাগজে কলমে ধর্ম নিরপেক্ষ বলা হলেও ভারত উগ্র হিন্দুবাদী একটি দেশ, দৃষ্টিভঙ্গি সাম্প্রদায়িক, বর্ণভেদ প্রথা প্রকট। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার দৃষ্টিকোণ থেকে দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের স্থান শীর্ষে। আশির দশকের শিখ রায়ট, নব্বই এর দশকের বাবরী মসজিদ উৎখাত, বোম্বের রায়ট এবং ২০০৪ সালের গুজরাট রায়ট সাম্প্রদায়িক ভারতের সংখ্যালঘু নির্যাতনের মর্মান্তিক স্বাক্ষর বহন করে। নারী নির্যাতনের দিক থেকেও দেশটির অবস্থান শীর্ষে। জি-নিউজ এর তথ্যানুযায়ী নারী পাচার এবং পতিতাবৃত্তি ভারতের জাতীয় আয়ের একটা উল্লেখযোগ্য উৎস। শুধু ভারত নয় পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের অসহায় নারীরা পাচারের শিকার হয়ে এই দেশটির পতিতালয়সমূহে স্থান পায় এবং পরবর্তীকালে মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন দেশে পাচার হয়। দশ বছরের কম বয়সী নেপালী মেয়েরা অপহরণের শিকার হয়ে এই দেশে পতিতা বৃত্তি গ্রহণে বাধ্য হয়। India e-news-এর ভাষ্য অনুযায়ী নারী পাচার বাবদ ভারতে বার্ষিক ৮ মিলিয়ন ডলারের লেনদেন হয়। অবশ্য বেসরকারী হিসাব অনুযায়ী এর পরিমাণ কম পক্ষে ৪৮ মিলিয়ন ডলার। প্রতি বছর ১০ বছরের কম বয়সী ১০ হাজার নেপালী মেয়ে এবং ২০ থেকে ২৫ হাজার বাংলাদেশী নারী পাচারের শিকার হয়ে ভারতে আসে। এশিয়ান লিগাল রিসোর্চ সেন্টারের দাবী অনুযায়ী ভারত নারী নির্যাতনের অন্যতম প্রধান স্থান। নারী শিশুরা হত্যার শিকার হয়, যৌতুকের কারণে লক্ষ লক্ষ নারী প্রাণ হারায়। সতিদাহ প্রথা এখনো দেশটিতে প্রচলিত আছে এবং এই কারণে ভারতই বিশ্বে একমাত্র দেশ যেখানে জনসংখ্যা কাঠামোতে নারীদের তুলনায় পুরুষের সংখ্যা বেশি। দেশটিতে নারীরা অবহেলা ও বৈষম্যের শিকার হলেও শিল্প সংস্কৃতি এবং বিপণন বাণিজ্যে পণ্য হিসেবে নারীদের ব্যবহার অবাধ, স্যাটিলাইট টিভি ও সিডি ব্যবসায় পর্ণো-ছবি এই দেশটির সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের প্রধান বাহন হয়ে পড়েছে। শতাধিক স্যাটিলাইট চ্যানেলে রাত দিন ২৪ ঘন্টা বিভিন্ন ভাষায় যৌন আবেদনমূলক বিভিন্ন কর্মসূচী প্রচারিত হয়।

www.bjilibrary.com

শিল্প অর্থনীতির দৃঢ় ভিত্তির উপর এখনো দাঁড়াতে না পারলেও ভারত বেশ কিছু পণ্যের রফতানী কারক দেশ। তার অর্থনীতি সম্প্রসারণশীল। চাল, ডাল, চিনি, পিঁয়াজ, রসুন ও মসল্লা জাতীয় পণ্য, কৃষি যন্ত্রপাতি বিশেষ করে পাওয়ার টিলার, ট্রাক্টর, সেচ পাম্প, সীড ড্রিল, থ্রেসার, হারভেষ্টার এবং হালকা ও ভারী যানবাহন রফতানীতে এই দেশটি উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে। প্রতিবেশী দেশ গুলোতে বিশেষ করে বাংলাদেশ, নেপাল ও ভূটানে ভারতের রফতানী বাণিজ্য নিঃশর্ত নয়। অনেক সময় আমদানী কারক দেশকে শিক্ষা দেয়ার জন্যও ভারত হঠাৎ করে পণ্য রফতানী বন্ধ করে দেয়। পাকিস্তান ভারতীয় পণ্যের উপর নির্ভরশীল নয়। পাকিস্তান ছাড়া অন্যান্য প্রতিবেশী দেশের প্রতি ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি বড় ভাই সুলভ। পারমাণবিক শক্তির দেশ হিসেবে ভারত পাকিস্তানকে সমীহ করে। ভারত আণবিক বোমার বিস্ফোরণ কিংবা পরীক্ষামূলক ক্ষেপনাস্ত্র নিক্ষেপ করলে পাকিস্তানও তার জবাব দেয়। তবে প্রতিবেশী কোনও দেশ সামরিক শক্তি অথবা অর্থনৈতিক সামর্থের দিক থেকে ভারতকে অতিক্রম করুক ভারত তা চায় না।

এই প্রবন্ধে ইন্ডিয়া ডকট্রিন বলতে ভারতের সম্প্রসারণ ও আধিপত্যবাদী দৃষ্টি ভঙ্গি, প্রতিবেশীদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ এবং প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকে যেমন বুঝানো হয়েছে তেমনি তার নিজের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে অতিরিক্ত প্রত্যয় বা নিঃসংশয়তার প্রেক্ষাপটে হীনমন্যতা লুকানোর উদ্দেশ্যে অপরের প্রতি তাচ্ছিল্যসূচক আচরণকেও (Superiority Complex) বুঝানো হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ায় অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠার স্বপ্নও এর অনুর্ভুক্ত রয়েছে।

নিজের জাতীয় স্বার্থের সাথে সংগতি রেখে ভারত তার আঞ্চলিক রাজনীতি ও কূটনীতির পলিসি নির্ধারণ করবে তা স্বাভাবিক। কিন্তু তাদের এই নীতি পলিসির কারণে ভারতের সাথে তার ক্ষুদ্র প্রতিবেশী দেশসমূহের মধ্যে অব্যাহতভাবে অবিশ্বাস সংশয় ও উত্তেজনা সৃষ্টির ফলে এই অঞ্চলের নিরাপত্তা এবং ফলপ্রসূ সহযোগিতার উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। ফলে ইন্ডিয়া ডকট্রিন প্রতিবেশী দেশসমূহের জন্য আধিপত্যবাদের প্রতিভূ হয়ে দেখা দিয়েছে।

ইন্ডিয়া ডকট্রিন যে কয়টি দার্শনিক ভিত্তির উপর গড়ে উঠেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নরূপ :

১. অর্থ ও ক্ষমতার বিশ্ব রাজনীতিতে ইউরোপের অবস্থান এখন ক্ষয়িষ্ণু; এশিয়া হচ্ছে তার ভবিষ্যত এবং এশিয়ার ভবিষ্যত হচ্ছে ভারত। এই অবস্থায় ২০৫০ সালের মধ্যে দুনিয়ার যে চারটি দেশ বিশ্বের শীর্ষ অর্থনৈতিক শক্তিতে রূপান্তরিত হবে অথবা তাদের বিদ্যমান অবস্থান অক্ষুণ্ন রাখবে তারা হচ্ছে চীন, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও ভারত। এই সময়ের মধ্যে ভারতীয় অর্থনীতির আকার জাপানী অর্থনীতির তুলনায় চারগুণ বড় হবে। ভারত বিশ্বের শীর্ষ স্থানীয় চারটি সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তির অন্যতম হিসেবে আত্ম প্রকাশ করবে। Dominic Wilson Roopa Purushothama তাদের লিখিত

www.bjilibrary.com

"Dreaming with BRICS : The Path to 2050" শীর্ষক পুস্তকে ২০৪১ সালে বিশ্বের ৮টি দেশের মোট জাতীয় উৎপাদন কি হবে সে সম্পর্কে একটি আভাস দিয়েছেন। এই আভাস অনুযায়ী এ সময়ে চীনের জিডিপি হবে ২৮.৩ ট্রিলিয়ন ডলার, জাপানের ৬ ট্রিলিয়ন, রাশিয়ার ৪.৬ ট্রিলিয়ন, ব্রাজিলের ৩.৯ ট্রিলিয়ন, যুক্তরাজ্যের ৩.৩ ট্রিলিয়ন এবং জার্মানীর ৩.২ ট্রিলিয়ন ডলার। তাদের হিসাব অনুযায়ী ২০৫০ সালে চীনের জিডিপি উন্নীত হবে ৪৪.৫৩ ট্রিলিয়ন ডলারে, যুক্তরাষ্ট্রের ৩৫ ট্রিলিয়ন, ভারতের ২৭.৮ ট্রিলিয়ন, জাপানের ৬.৬৭ ট্রিলিয়ন, ব্রাজিলের ৬ ট্রিলিয়ন এবং রাশিয়ার ৫.৮৭ ট্রিলিয়ন ডলারে।

বিশ্ব ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা আনার জন্য ভারতের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত সম্পর্কের উন্নয়ন অপরিহার্য্য। সম্প্রতি সম্পাদিত ভারত-মার্কিন সামরিক চুক্তি এই দু'টি দেশ বিশেষ করে ভারতকে এশিয়া অঞ্চলে তার প্রভাব বলয় সম্প্রসারণের সুযোগ এনে দিয়েছে। বলা বাহুল্য অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিশ্বের মোট শিল্প উৎপাদনে ভারতীয় উপমহাদেশের হিস্সা ছিল ২৪.৫%, বৌদ্ধ অধ্যুসিত চীনের ৩২.৮%, প্রোটেস্ট্যান্ট ও ক্যাথলিক পশ্চিম ইউরোপের ১৮.২%, অর্থোডক্স রুশ সাম্রাজ্যের ৫% এবং জাপানের ৩.৮%। বিশ্ব ইতিহাসের তিন হাজার বছর পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, শিল্প পণ্য ও কাঁচামাল উৎপাদনে ভারত এবং চীন যৌথভাবে দুনিয়াকে নেতৃত্ব দিয়ে এসেছে। ভারত বাসীর ধারণা ২১০০ সালের মধ্যে বিশ্বের মোট জিএনপি এবং আন্তর্জাতিক বাজারের অর্ধেক থেকেও বেশি হবে ভারত, চীন এবং জাপানের মিলিত অবদান। এই অঞ্চলে যেহেতু চীনই হবে বৃহত্তর অর্থনীতি এবং স্বাভাবিকভাবে সামরিক শক্তিধর দেশ, সেহেতু তাকে ঠেকাতে হলে ভারত-মার্কিন মৈত্রীকে আরো সংহত করা প্রয়োজন এবং ভারতকে এজন্য নিজের অবস্থান দৃঢ় করতে হবে। গোল্ডম্যান সাচ এর ভাষায়-

"The United States-India strategic ties are crucial for the stable balance of power in Asia. Only India can contain China. Only India is a exemplar post-nation imperative for America that Senate and Congress ratify civilian nuclear deal with India."

২. মরক্কো থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের সামরিক সামর্থ থাকলেও ভারত কখনো সম্প্রসারণবাদী ভূমিকা পালন করেনি। তারা এখন উপলব্ধি করছে যে ভারতের এই ব্যর্থতার কারণেই আফ্রিকা ও আরব ভূমিতে অতীতে ভারতীয় কোনও কলোনী গড়ে উঠেনি। শুধু তাই নয়, সাতশ' বছর ধরে তাকে মুসলিমদের শাসনাধীন থাকতে হয়েছে। ভারতীয়দের বিশ্বাস অনুযায়ী ১৫০০ সালের আগে ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও বোর্নিও হিন্দু রাজাদের অধীনে শাসিত হতো। দক্ষিণ ভিয়েৎনাম, লাওস, ক্যাম্বোডিয়া, মায়ানমার, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, বোর্নিও ঐতিহাসিকভাবে হিন্দু সভ্যতার অংশ ছিল; শুধু উত্তর ভিয়েৎনাম চীনা সভ্যতার সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল।

www.bjilibrary.com

সংখ্যালঘু পৌত্তলিক চীনারা মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া এবং ফিলিপাইনের অর্থনীতিকে যেহেতু নিয়ন্ত্রণ করছে, সেহেতু কৌশলগত কারণে ভারত এ দেশগুলোর চীনভুক্তিকে বিরোধিতা করবে না। কাস্পিয়ান তীরের মধ্য এশিয়ান প্রজাতন্ত্রসমূহ বিশেষ করে তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান, কিরগিজিস্তান এবং তুর্কমেনিস্তান ঐতিহাসিকভাবে আর্য হিন্দু সভ্যতার অংশ ছিল। ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট বাবরের আদি নিবাস ছিল উজবেকিস্তানের রাজধানী সমরকন্দে। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে আফগানিস্তান ও নর্দান এলায়েন্সের উজবেক ও তাজিকজনগণ পাকিস্তান ও ইরানের তুলনায় ভারতকে বেশি প্রাধান্য দেয়। আঠার, উনিশ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত পারস্য উপসাগর ভারতেরই একটি হ্রদ ছিল। দীর্ঘকাল ভারতীয় রূপী সওদী আরব, কুয়েত, ওমান, সংযুক্ত আরব আমীরাত, ইরান ও ইয়েমেনসহ উপসাগরীয় আরব দেশগুলোর সরকারী রিজার্ভ মুদ্রা ছিল। কাস্পিয়ান এলাকা, তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান, কাজাকস্তান ও আজারবাইজানে বিপুল তেল ও গ্যাস মওজুদের আবিষ্কার ভারতকে মধ্য এশিয়া এবং আরব দেশসমূহের তেল কূটনীতির বড় অংশীদার হবার সুযোগ এনে দিয়েছে। ১৯৪৭ সালের পূর্বে ভারত ইরানী তেলের ১০০% এবং ইরাকী তেলের ৪৮% নিয়ন্ত্রণ করতো এবং আরব উপসাগর ছিল একটি ভারতীয় হ্রদ। ভারত এই অঙ্গনে তার আধিপত্যকে সংহত করার জন্য নিয়মিত গান বোট ডিপ্লোম্যাসিতে অংশ গ্রহণ করতো। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইরান ও আরব উপসাগরীয় অঞ্চলে ভারতের যে অর্থনৈতিক, সামরিক ও রাজনৈতিক প্রভাব ছিল একবিংশ শতাব্দীতে ভারত তা ফেরৎ পেতে চায়। আফ্রিকা, মধ্য এশিয়া ও আরব দেশসমূহের চলমান সভ্যতার সংঘর্ষে ভারত সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে চায়।

৩. পশ্চিম ইউরোপের ক্ষমতা হ্রাস এবং বিশ্বের শক্তি বলয় থেকে তার অন্তর্ধান ভারতের জন্য উৎসাহব্যঞ্জক। ভারত মনে করে যে ক্ষমতার রঙ্গমঞ্চে একটি শক্তির আগমন ও আরেকটির নির্গমন একটি স্বাভাবিক ব্যাপার; ইউরোপ দীর্ঘকাল ক্ষমতার স্বাদ ভোগ করেছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সৌজন্যে এখনো তা করছে। তাদের এখন সরে যাবার সময় এসেছে। ভারতকে এই স্থান দখল করতে হবে। রুপা পুরুষোত্তম ও ডোমিনিক উইলসনের ভাষায়-

"The decline of western Europe is permanent and Spanish leadership of brown Andean and Central America is nearing its end. The demographic decline of white Catholic Populations has sealed the faith of Spain, Portugal, Italy, Germany and France. The decline of white European Population coupled with the vast increase in non-white Hispanic Catholic population of Central America and Andean America resulted in the return of ancient Civilizations Incas Mayas and Aztecs."

www.bjilibrary.com

ভারতীয়দের বিশ্বাস অনুযায়ী তাদের প্রাচীন পৌত্তলিক সভ্যতা পুনঃ প্রতিষ্ঠার দিন অত্যন্ত নিকটবর্তী।

৪. ২০১০ সাল নাগাদ বিশ্বে যে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে তা অনেকটা ঊনবিংশ শতাব্দীর উপনিবেশবাদী বিশ্ব ব্যবস্থার অনুরূপ হবে, তবে নতুন উপনিবেশিক অবস্থায় যা তফাৎ হবে তা হচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্র, ভারত এবং চীনই নতুন ব্যবস্থার নিয়ামক হিসেবে কাজ করবে। প্রেসিডেন্ট বুশকে তারা এই অবস্থা সৃষ্টির পথিকৃত বলে মনে করে। ডোমিনিক উইলসন বিষয়টিকে এভাবেই দেখেছেন-

"President Bush rewrote international law on the concept of occupying powers. right of preemptive attack by his invasion of Iraq in 2003. International law is whatever great powers agree by means of treaty. International law is whatever President Bush determines should be part of international law and if other great powers or the United Nations implicitly or explicitly accept it. The international law is neither revealed by God through a Prophet nor descends from the heaven. The international law is whatever great powers agree international law should be. Similarly the enactment of colonial international law by means of an international treaty by great powers shall establish a legitimate colonial international system that would allow great powers periodic right of preemptive attacks on oil producing countries to establish secular Petro colonial empires in the 21st century."

এখানে ভারতীয় উপলব্ধি হচ্ছে, দুনিয়ার শক্তিধর দেশগুলো তাদের জাতীয় জ্বালানী নিরাপত্তার জন্য তেল উপনিবেশ সৃষ্টিতে বদ্ধপরিকর। সকল বিশ্ব শক্তিই তেলের হাম্মাম খানায় বিবস্ত্র। সামরিক দিক থেকে দুর্বল স্বল্প জনসংখ্যার তেল উৎপাদনকারী দেশগুলো যদি স্বাধীনতা হারায় তা হবে তেল নির্ভর শিল্পোন্নত দেশগুলোর দৃষ্টিতে অনেকটা Collateral damage এর ন্যায়। ১৮৮৫ সালে আফ্রিকাকে বিভক্ত করার জন্য বিশ্ব শক্তিগুলো যে রকম একটি মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল ঠিক তেমনি তেল গ্যাসের আমদানি চাহিদার ভিত্তিতে তেল উৎপাদনকারী ওপেক দেশগুলোকে নিজস্ব প্রভাব বলয়ের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেয়ার জন্য বিশ্ব শক্তিগুলোর অনুরূপ চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া উচিত। বিশ্বের তেল ও গ্যাস মওজুত ভাগাভাগি করাকে একবিংশ শতাব্দীতে অনৈতিক বলা যাবে না। পেট্রোকলোনিয়েলিজম প্রকৃত পক্ষে একটি নৈতিক অধিকার।

www.bjilibrary.com

৫. ভারত বিশ্বাস করে যে মায়ানমার, ইরান ও ইরাকের তেল সম্পদকে ভারতের নাগালের বাইরে রাখার জন্য ১৯৩৫ ও ১৯৪৭ সালের তেল ষড়যন্ত্র ভারতকে বিভক্ত করেছিল। একই ষড়যন্ত্রের অধীনে ১৯৭১ সালে তেলসমৃদ্ধ আরব আমীরাত, বাহরাইন, কাতার প্রভৃতি দেশ স্বাধীন হয় এবং তেল কোম্পানীসমূহের কার্টেল হিসেবে ওপেকের জন্ম হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পেছনেও কাস্পিয়ান উপকূল ও সাইবেরিয়ার তেল সম্পদ লুণ্ঠনের ব্লুপ্রিন্ট ছিল। এই ব্লুপ্রিন্টই আজারবাইজান, উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান এবং কাজাকস্তানকে স্বাধীন করেছে। এই শতাব্দীর শুরুতেই আফগানিস্তান ও ইরাক দখল নতুন তেল উপনিবেশ সৃষ্টির সূচনা করেছে এবং ইরান দখল এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। এ প্রেক্ষিতে দেশটির ধারণা, যুক্তরাষ্ট্র যদি তার পক্ষে থাকে তাহলে চীনকে ঠেকিয়ে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মহাশক্তি হিসেবে তার উত্থান ত্বরান্বিত হবে এবং এক্ষেত্রে তেল ও গ্যাস উপনিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে যদি নিকট বা দূরের প্রতিবেশী কোনও দেশকে দখল করতে হয় তা হলেও সে তা করতে দ্বিধা করবে না। কলকি গৌর তার Global Clash & Races পুস্তকে এই ধারণাই পোষণ করেছেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের মৈত্রীর আলোকে সম্ভাব্য অভিযানকে ক্রুসেড বলে মনে করেন। তার ভাষায়-

"The 1989 demise of communism and 1991 demise of Soviet Union is a turning point in history, and heralds the victory of republican neo-conservation and Protestant reformed Christianity as new agency of history, to export democratic utopia and religious tolerance worldwide to wage wars on extremism, fundamentalism and intolerance to fruitfully leverage the might of the Protestant superpower of the world to create a tolerant inclusive 3rd millenium. United States as well as India is the new agency of history and democracy and neo-conservatism is the reigning ideology of the third millenium."

৬. ফিলিস্তিনের ভূমিতে ইসরাইলের প্রতিষ্ঠা এবং রাষ্ট্র ও গৃহহীন ইহুদীদের সেখানে পুনর্বাসনকে ভারত শুরু থেকেই স্বাগত জানিয়েছে এবং ইহুদী পুনর্জাগরণকে তারা নিজেদের অনুপ্রেরণার উৎস বলে মনে করে। প্রায় দু'হাজার বছরেরও বেশি সময় পর ১৯৪৮ সালে ইসরাইলে ইহুদীদের প্রত্যাবর্তন ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া থেকে মুসলিমদেরকে বহিষ্কার করে হিন্দু ও বৌদ্ধদের পুনর্বাসনের সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে। কেননা এ দু'টি দেশ চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত হিন্দু ও বৌদ্ধ অধ্যুসিত ছিল।

কলকি গৌর এ কথারই প্রতিধ্বনি করেছেন। তিনি বলেছেন-"The Indian Scriptures talk that spiritual enlightenment could come about in the twinkling of an eye. Similarly the chemistry, between

www.bjilibrary.com

Protestant President Bush and Sikh Prime Minister Manmohan Singh overnight removed sixty years of animosities, biases, fears and apprehensions between the governments and Civilizations of the United States and India. President Bush's visit to India in 2006 was truely a turning point in world history and a turning point to the history of world civilizations. Hindu India emerged in 2006 as the preponderant military power from Morocco to Indonesia. Geopolitics forecasts that throughout 21st century no catholic or Islamic or Jewish country would be able to overtake top three powers of the world namely Protestant United States, China and Hindu India. China will disintegrate if the USA and India are united under a common goal and interest."

আগ্রাসী তৎপরতা ও ভারত

ভারত এবং ইসরাইলের মৈত্রী বন্ধন আন্তর্জাতিক রাজনীতির অঙ্গনে নতুন কোনও বিষয় নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্বের পাশাপাশি ইসরাইলের সাথে তার বন্ধুত্ব পরাশক্তি হিসেবে তার আবির্ভাবকে সহজ ও নিশ্চিত করতে পারে বলে অনেকের ধারণা। ঠান্ডা লড়াই উত্তর বিশ্বে কমুনিজমের পতনের পর ইসলামই হচ্ছে একক খৃস্টান পরাশক্তির প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বি। ভারত এবং ইসরাইল উভয়েই ইসলামকে বৈরী শক্তি বলে মনে করে। ইসলামের মুকাবিলায় তারা উভয়েই ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদে বিশ্বাসী এবং নিজেদের ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারে বদ্ধ পরিকর। এ প্রেক্ষিতে কূটনৈতিক অঙ্গনে উভয় দেশ তাদের নিজস্ব গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বের দেশগুলোর ঐক্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি, আভ্যন্তরীন স্থিতিশীলতা নষ্ট, উন্নয়ন তৎপরতায় বাধার সৃষ্টি এবং কৌশলগত নিরাপত্তার জন্য গৃহীত যাবতীয় পরিকল্পনা ভন্ডুল করার সুদূরপ্রসারী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। মোসাদ-র' এর আনুষ্ঠানিক-অনানুষ্ঠানিক সহযোগিতা এখন গোপন কোন বিষয়ই নয়।

উপমহাদেশের দেশগুলোর পুনরেকত্রিকরণ এবং যুক্ত বাংলার ধারণা সাম্প্রতিক বছর সমূহে ভারতীয় পত্র পত্রিকা এবং রাজনৈতিক সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিদ্রোহ ও সশস্ত্র সন্ত্রাসী তৎপরতা এবং এক শ্রেণীর সাংবাদিক বুদ্ধিজীবিদের কিনে নিয়ে বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষ, হানাহানি সৃষ্টির প্রয়াসকে তার ঐক্যকে নষ্ট করে দেশটিকে দখল করার কৌশল বলে দেশপ্রেমিক মহল মনে করেন। শুধু বাংলাদেশ কেন প্রতিবেশীদের প্রতি ভারতের এই দৃষ্টিভঙ্গি সর্বজনিন।

www.bjilibrary.com

প্রতিবেশীদের সাথে সম্পর্ক

বস্তুতঃ ক্ষুদ্র প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে ভারতের সম্পর্ক কখনো বন্ধুসুলভ ছিল না। পাকিস্তান, নেপাল, ভূটান, মালদ্বীপ, শ্রীলংকা প্রভৃতি দেশের সাথে তার আচরণ আগ্রাসন মূলক ও বৈরী। জন্মলগ্ন থেকে পাকিস্তানের অস্তিত্ব তার কাছে অসহ্য, শ্রীলংকার স্বাধীন সত্তা ও অগ্রগতি অবাঞ্ছিত এবং মালদ্বীপ, নেপাল ও ভূটানের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে আধিপত্যবাদী চিন্তাধারার বহিঃপ্রকাশ। মওদুদ আহমদ তার South Asia: Crisis of Development, the case of Bangladesh শীর্ষক পুস্তকে যথার্থই বলেছেন-

"From its independence in 1947 India's policy towards its neighbours was guided mostly by negative considerations. They were never willing to accept Pakistan as a sovereign state as they thought neither the creation nor the existence of Pakistan had any rational basis..... Immediately after independence India first consolidated its territorial position, It militarily took over the princely states of Junagar and Hyderabad, conquered the Portuguese enclave of Goa ad turned Sikkim into a protectorate. By signing a treaty with Bhutan, it removed the latter's foreign policy options, trade and business freedom; and a similar treaty with Nepal removed Nepal's entire economic leverage. After occupying the Muslim majority state of Kashmir India had to fight a war with Pakistan as early as 1948. So the wound of partition was by no means healed in 1948 due to Indian aggression. Secondly India followed a principle of bilateralism in its policy towards its neighbours, which in effect discouraged any initiative to resolve regional issues collectively by soliciting cooperation of a third country. India's persistent refusal to involve Nepal, not to mention China, in the augmentation and sharing of the Ganges water is a clear example. India has followed the same principle even within the framework of SAARC."

প্রতিবেশী দেশসমূহে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আসুক ভারত কখনো তা চায়নি। ১৯৭১ সালে ভারত বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্য করেছে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য যত নয় তার বেশি ছিল জন্ম শত্রু পাকিস্তানকে বিভক্ত ও দুর্বল করার জন্য। তার ধারণা ছিল পাকিস্তান ভেঙ্গে বাংলাদেশ হয়ে গেলে নতুন

www.bjilibrary.com

দেশটি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, কূটনৈতিক, সাংস্কৃতিক সকল দিক থেকে তার প্রতি অনুগত ও দাসানুদাস হয়ে থাকবে।

প্রতিবেশী দেশসমূহের বিদ্রোহী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী গ্রুপ গুলোকে উস্কিয়ে দেয়া, অস্ত্র ও রসদ সরবরাহের অভিযোগ ভারতের বিরুদ্ধে এক চেটিয়া। প্রতিবেশীদের সাধারণ ধারণা হচ্ছে, এই দেশটিকে বিশ্বাস করা যায় না, তারা তাদের স্বাধীনতাকে স্বীকার করে না। তার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অব্যাহত সম্প্রসারণ এবং সামরিক অস্ত্র সজ্জা দক্ষিণ এশিয়ার সামগ্রিক নিরাপত্তার প্রতি হুমকি স্বরূপ। এই হুমকি যে অবাস্তব নয় তার প্রমাণ পাওয়া যায় ২০০৪ সালের ২৭শে অগাস্ট ভারতের প্রভাবশালী পত্রিকা The Hindu তে প্রকাশিত সি রাজমোহন নামে ভারতের প্রভাবশালী একজন বিশ্লেষকের লেখায়। Ending the regional drift শীর্ষক বিশ্লেষণ ধর্মী এই নিবন্ধে মিঃ সি রাজমোহন লিখেছেন-

"Non-intervention in the internal affairs of the neighbouring countries is indeed a sensible proposition. Yet given the deepening crises in the region and the long-term consequence of state failure India might have no option but to develop a pro-active policy to encourage internal political change within the subcontinent. That is part of the burden of being a responsible power in the international system India will have to develop both the instrument of pursuasion as well as define the limits to its use of force in the region."

বলাবাহুল্য রাজমোহনের এই নিবন্ধের লক্ষ্য বস্তু হচ্ছে তিনটি ছোট প্রতিবেশী দেশ, বাংলাদেশ, নেপাল ও মালদ্বীপ। তার মতে এই তিনটি দেশই ভারতের নিরাপত্তার জন্য সংকট, তিনটি দেশই অকার্যকর রাষ্ট্রের সংজ্ঞার চাহিদা পূরণ করেছে। ভারত সব সময় তার ক্ষুদ্র প্রতিবেশী দেশগুলোর প্রতি তার নীতি কি হবে সে সম্পর্কে দোদুল্যমান অবস্থায় ছিল। তার মতে এখন আর দোদুল্যমান অবস্থায় থাকা যাবে না। এখন এসব দেশে সামরিক অভিযান চালিয়ে ভারতের স্বার্থের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে হবে।

নেপালের মাওবাদীদের কাঠমুন্ডু অবরোধের কথা স্মরণ করুন। ভারতের সামরিক শক্তির হুমকিতে তারা এই অবরোধ তুলে না নিলেও ধমক বেশ কিছু কাজ করেছে বলে রাজমোহনের ধারণা। প্রয়োজনে ভারত যে এই পাহাড়ী রাষ্ট্রটি থেকে মাওবাদীদের হটানোর জন্য সেনা বাহিনী নিয়োগ করতে পারে সেটা তারা পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছে। রাজমোহনের ভাষায়-

www.bjilibrary.com

"Clearly the blockade shook the Indian government into signalling that it would not allow the collapse of the state structures in Nepal. If Maoists were testing India's resolve in preventing the emergence of a radical dispensation in Kathmundu, the answer from new Delhi has been both. Strong and unambiguous New Delhi should combine its will to intervene militarily in Nepal with a whole range of other policy instruments."

মাওবাদীরা কাঠমুন্ডু অবরোধ করে তাদের যে শক্তি ও সমর্থন প্রদর্শন করেছিল তাতে ভারত ভীত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এর জবাবে ভারত যখন সামরিক অভিযান চালিয়ে নেপালের জনগণের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রাকে নস্যাৎ করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছে তখন রাজমোহনের ন্যায় বুদ্ধিজীবীরা তাকে সমর্থন করেছেন। নেপাল একটি স্বাধীন দেশ। গণতান্ত্রিক আন্দোলন তার আভ্যন্তরীণ বিষয় এবং এব্যাপারে অন্য কোন দেশের হস্তক্ষেপ সম্পূর্ণভাবে অনভিপ্রেত। কিন্তু এই কাজটি তারা অনবরত করে আসছে। নেপালীরা মনে করে যে ভারত তাদেরকে সেবাদাস বানাতে চায়। এজন্য দীর্ঘকাল ধরে তার বিরুদ্ধে লড়াই করছে। এখন রাজমোহনের ন্যায় ভারতীয় বুদ্ধিজীবীও নেপালকে জানিয়ে দিলেন যে যদি বাঁচতেই চাও তা হলে ভারতের সেবা দাস হয়েই বেঁচে থাকতে হবে।

ইতোপূর্বে র'কে দিয়ে ভারত নেপালে নানা রকম অন্তর্ঘাত মূলক কর্মকান্ড চালিয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। আবার মাওবাদীদের ব্যানারে আন্দোলনরত গণতান্ত্রিক কর্মীদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়েও যখন তাদের অগ্রযাত্রা রুদ্ধ করা যায় নি তখন ভারত বলছে, আমরা সামরিক অভিযান চালিয়ে হলেও নেপালে আমাদের স্বার্থের অনুকূল রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করবো। ইরাকে নেপালী জিম্মিদের হত্যা এবং তাকে কেন্দ্র করে নেপালে হিন্দু-মুসলিম রায়ট ও সেনাবাহিনী নামিয়ে কারফিউ জারী প্রভৃতি ঘটনাকে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা ভারতীয় আধিপত্যবাদের অংশ বলে মনে করেন।

নেপালের আভ্যন্তরীন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ ছাড়াও তার বিরুদ্ধে বাণিজ্য অবরোধ আরোপ, বন্দর ব্যবহারে বাধা, বাংলাদেশসহ প্রতিবেশী দেশের সাথে আমদানী রফতানী পণ্য চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি প্রভৃতি এই দেশটির স্বাভাবিক বিকাশকে স্তব্ধ করে রেখেছে।

অনুরূপভাবে মালদ্বীপের ন্যায় ছোট একটি দেশের স্বাধীন ও সার্বভৌম অস্তিত্বকেও ভারত স্বীকার করতে চায় না। মালদ্বীপ কি করবে না করবে তাও ভারতকে জিজ্ঞাসা করতে হবে। ১৯৮৮ সালে খোঁড়া অজুহাতে মালদ্বীপে সৈন্য প্রেরণ, ঐ দেশটির সন্নিহিত উপকূল ও পানি সীমানায় ভারতীয় কর্তৃত্ব এবং সামরিক মহড়া ও পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষার ভীতি এই দেশটির স্বাধীনতাকে ক্ষুন্ন করছে।

www.bjilibrary.com

ভারতীয় ইন্ধন ও অনুপ্রেরণায় সৃষ্ট তামিল সমস্যা শ্রীলংকার ন্যায় সম্ভাবনাময় একটি দেশকে ধ্বংসের মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়েছে। ভারতীয় বংশোদ্ভুত তামিল ও সিংহলীদের জাতিগত সংঘাত ভারতীয় প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র বলে এখন স্থায়ী গৃহযুদ্ধের রূপ নিয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করেন যে তামিলরা যদি ভারতের অস্ত্র এবং উস্কানী না পেতো তাহলে শ্রীলংকার জাতিগত সমস্যাটি অংকুরেই বিনষ্ট হয়ে যেতো এবং শ্রীলংকা দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়ন মডেলে পরিণত হতো। কিন্তু যেহেতু ভারত চায়না যে তার কোনও প্রতিবেশী দেশ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে এগিয়ে যাক সেহেতু তারা দেশটিকে অস্থিতিশীল করে সরকারের মনোযোগকে উন্নয়ন ভাবনার পরিবর্তে নতুন-পুরাতন সংকট মুকাবিলায় ব্যস্ত রাখতে চায়। এতে দেশটিকে ভারতীয় পণ্যের বাজারে পরিণত করা ছাড়াও অস্ত্র ও চোরাচালান বাণিজ্যে অঢেল মুনাফা লুটা যায়। এটা তাদের আধিপত্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদেরই অংশ বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। অবশ্য, সিকিম দখল করে ভারত তার আধিপত্য ও সম্প্রসারণ চরিত্রকে আগেই উন্মোচিত করে দিয়েছে।

শুরুতেই বলা হয়েছে যে উপমহাদেশে ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে পাকিস্তানই হচ্ছে অপেক্ষাকৃত বড়। এই দেশটির জন্মলগ্ন থেকেই ভারত তার কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা চালিয়ে এসেছে। দেশ বিভাগের সময় তার প্রাপ্য অর্থ, সম্পদ এবং রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম থেকে তাকে বঞ্চিত করেছে। ১৯৪৮ সালে স্বাধীনতার পরপরই এমন এক সময় যখন দেশটির প্রতিষ্ঠাতা নেতা কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মৃত্যু বরণ করেন তখন ভারত পাকিস্তানে যোগ দেয়া দেশীয় রাজ্য কাশ্মীর দখলের জন্য পাকিস্তানে সামরিক হামলা চালায়। কাশ্মীর ইস্যুতে শুধু মাত্র ভারতের কারণে দেশ দু'টি একাধিক যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। এই দেশটি সীমান্ত গান্ধীকে (আবদুল গাফফার খান) অর্থায়ন করে দীর্ঘকাল পর্যন্ত পাকিস্তানের অন্যতম প্রদেশ উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে অস্থিতিশীল অবস্থার সৃষ্টি করে রেখেছিল। জাতি সংঘের হস্তক্ষেপে আইয়ুব-নেহরু চুক্তির আওতায় সিন্ধু নদীর পানির সমস্যার সমাধান করতে বাধ্য হলেও এখনো পর্যন্ত সে দেশের পাঁচটি বৃহৎ নদীর পানির ন্যায্য অংশ থেকে পাকিস্তানকে বঞ্চিত করার চেষ্টা করে আসছে। লাইন অব কন্ট্রোল লংঘন, কারগীল ইস্যুসহ সীমান্ত বিরোধ এবং আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ ও স্থিতিশীলতা নষ্টের পারস্পরিক অভিযোগ ছয় দশক ধরে দেশ দু'টির সম্পর্ক উন্নয়নের পথে বাধা হয়ে আসছে। ভারতের অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে পরমাণু শক্তির অধিকারী হবার পর সে তার প্রতিবেশীকে সন্ত্রস্ত করার জন্য প্রায়ই বোমার বিস্ফোরণ ঘটায় এবং মিসাইল টেষ্ট করে। এর জবাবে পাকিস্তানের তরফ থেকেও যখন অনুরূপ কিংবা তার চেয়েও শক্তিশালী বোমা ও মিসাইল টেষ্ট করা হয় তখন সে পিছু হটে। অনুমান করা হয় যে যদি পাকিস্তানের হাতে আণবিক বোমা না থাকতো তা হলে বহু আগেই ভারত দেশটি কবজা করে নিতো। পাকিস্তানের সামরিক শক্তি ও আণবিক বোমার মালিকানা ভারতের জন্য অসহ্য হয়ে পড়ে। তাকে সন্ত্রাসী রাষ্ট্র ঘোষণার জন্য ভারত আন্তর্জাতিক বিশ্বে

www.bjilibrary.com

ব্যাপক লবি তৎপরতা চালায় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বাধ্য করার চেষ্টা করে। পাশাপাশি প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশারফের দুর্বল অবস্থানের সুযোগ নিয়ে বন্ধু সেজে শান্তি চুক্তি সম্পাদন ও তার অভ্যন্তরে বিভেদ সৃষ্টি এবং অন্তর্ঘাত মূলক কাজ কর্মও শুরু হয়ে যায় বলে সে দেশের বিরোধী দলগুলো অভিযোগ করেছে।

সোভিয়েত রাশিয়ার পতনের পূর্ব পর্যন্ত ভারত রাশিয়ার আস্থাভাজন বন্ধু ছিল এবং তার কাছ থেকেই তার সামরিক শক্তি বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করতো। পরে তার কিবলা পরিবর্তন হয় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ মিত্র হবার জন্য এই দেশটি মরিয়া হয়ে উঠে। শিগগিরই মার্কিনীদের পুরাতন মিত্র পাকিস্তানকে পেছনে ঠেলে দিয়ে ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান মিত্রে পরিণত হয়। এই দেশটি এখন মার্কিন পৃষ্ঠপোষকতায় সামরিক শক্তি বৃদ্ধির পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে।

এখানে উল্লেখ্য যে ১৯৯২ সালে সর্ব প্রথম ভারত-মার্কিন কৌশলগত সহযোগিতার সূচনা ঘটে এবং US Army Executive Steering Committee-র অধীনে দুই দেশ যৌথ নৌ-মহড়ায় অংশগ্রহণ করে। ১৯৯৩ সালে মার্কিন কংগ্রেস ভারতের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক সহযোগিতায় সম্মতি প্রদান করে। ১৯৯৫ সালে দু'দেশ সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। এই চুক্তির অধীনে যৌথ মহড়া এবং অস্ত্র কেনার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত ছিল। চুক্তিটি স্বাক্ষরের পর ভারত পারমাণবিক শক্তিধর দেশ হিসেবে আত্ম প্রকাশের জন্য মরিয়া হয়ে উঠে এবং ১৯৯৮ সালে সর্ব প্রথম দক্ষিণ এশিয়ায় পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্ফোরণ ঘটায়। ২০০০ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন দু'দেশের মধ্যে Vision Document শীর্ষক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এতে বলা হয়েছে-

"...Vision Document declared a resolve to create a closer and qualitatively new relationship between the US and India on the basis of common interest in and complementary responsibility for ensuring regional and international security. This document declared that India and the US were partners in providing strategic stability in Asia and Beyond (India- US Relations : Vision for the 21st century www.indiaembassy.org/inews/200 -inews/september-2000.

২০০২ সালের এপ্রিল মাসে ভারত-মার্কিন অস্ত্র চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির অধীনে যুক্তরাষ্ট্র ভারতের কাছে দূর পাল্লার মর্টার আর্টিলারী ও রকেট লাঞ্চারসহ ১৪৬ মিলিয়ন ডলার মূল্যের রাডার সামগ্রী বিক্রয়ে সম্মত হয়। এর পরের বছর ২০০৩ সালের মে মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের কাছে ১২০০ কোটি ডলার মূল্যের ইসরাইলী ফালকন এয়ারবোর্ন আর্লি ওয়ার্নিং সিষ্টেম বিক্রি অনুমোদন করে। বলাবাহুল্য ২০০২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বুশ প্রশাসন কর্তৃক প্রকাশিত জাতীয় নিরাপত্তা কৌশল পত্রে

www.bjilibrary.com

(National Security Strategy Paper) ভারত-মার্কিন সম্পর্কের দার্শনিক ভিত্তি প্রতিফলিত হয়। এতে বলা হয়, "The United States has taken transformation in its bilateral relationship with India based on the conviction that US interests require a strong relationship with India. We have a common interest in the free flow of commerce including through the vital sea lanes of the Indian Ocean. Finally we share an interest in fighting terrorism and in creating strategically stable Asia." ভারতের পারমাণবিক ও মিসাইল কর্মসূচী সম্পর্কে পূর্ববর্তী উদ্বেগ নাকচ করে দিয়ে নিরাপত্তা কৌশল পত্রে আরো বলা হয়, "While in the past these concerns may have dominated our thinking about India, today we start with a view of India as a growing world power with which we have common strategic interest."

যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ ও কারিগরি সহযোগিতায় ভারতের সামরিক সজ্জায় দক্ষিণ এশিয়ার শক্তির ভারসাম্যে সংকট দেখা দেয়ায় ২০০৫ সালে পাকিস্তানও ৫০০ কি.মি. দূরত্বের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করার ক্ষমতা সম্পন্ন মিসাইলের সাফল্যজনক পরীক্ষা চালায়। ফলে প্রতিবেশী দেশগুলোসহ দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে পারমাণবিক ভীতির সঞ্চার হয়েছে। ভারত-মার্কিন সামরিক চুক্তির আগে ধারণা করা হতো যে ভারত দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের একটি সামরিক শক্তি হিসেবে উন্নীত হয়ে হয়ত সন্তুষ্ট থাকবে। কিন্তু সামরিক চুক্তি-উত্তর সময়ে অস্ত্র ক্রয়ের সুবিধা পেয়ে মার্কিন মৈত্রীর উষ্ণ সান্নিধ্যে আসার পর এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে এই দেশটি এখন আঞ্চলিক শক্তি নয় বিশ্ব শক্তি হিসেবে আত্ম প্রকাশে উঠে পড়ে লেগেছে। এতে সংকট শুধু দক্ষিণ এশিয়ায় সীমাবদ্ধ থাকছে না, তা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া তথা চীন জাপান, কোরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হচ্ছে। আবার সমাজতন্ত্রের পতনের পর ইসলাম ঠেকানোর পুঁজিবাদী পরিকল্পনার সাথে ভারতের আঁতাত চীনের উত্থান রোধের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করায় এই মহাদেশের ক্ষুদ্র রাষ্ট্র গুলোর নিরাপত্তা সমস্যাও ঘনীভূত হচ্ছে।

একটি প্রতিবেশী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ভারতের সাথে সর্বদা সুসম্পর্ক কামনা করে এসেছে। দেশটি আমাদের স্বাধীনতা অর্জনে সক্রিয় সহযোগিতা করেছে, আমরা তা ভুলিনি। ভারতীয় সৈন্যরা যদি আমাদের পক্ষে যুদ্ধ না করতো তা হলে পাকিস্তানীদের হাত থেকে এই দেশকে বিচ্ছিন্ন করে স্বাধীন করা অত্যন্ত কঠিন হতো। তবে এই কৃতজ্ঞতা সত্ত্বেও স্বাধীনতার পরপর আমরা যা দেখেছি তাতে হতাশ না হয়ে পারিনি। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানী সৈন্যদের রেখে যাওয়া প্রায় ৪০ হাজার কোটি টাকার অস্ত্র শস্ত্রসহ পাটকল চিনিকল ও বস্ত্র কলের অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি, রেলওয়ে বগি যানবাহন প্রভৃতি যখন ভারতীয় সৈন্যদের পাহারায় ভারতে পাচার হয়ে গেল এবং

www.bjilibrary.com

ভারতীয় পণ্যে যখন বাংলাদেশের বাজার সয়লাব হয়ে পড়লো তখন এদেশের মানুষ উপলব্ধি করতে শুরু করলো যে আমাদের প্রতি ভারতের সমর্থন ও সহযোগিতা নিঃস্বার্থ এবং নিঃশর্ত ছিল না; স্বাধীনতা যুদ্ধের পেছনে তারা যা ব্যয় করেছে সুদে আসলে তা আদায় করাই তাদের লক্ষ্য। ভারত-বাংলাদেশ ২৫ বছর মেয়াদী মৈত্রী চুক্তি তারই অভিব্যক্তি ছিল। স্বাধীনতা লগ্নে এবং স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে ভারতীয় লুট পাটের প্রতিবাদ করতে গিয়ে মেজর জলিলের ন্যায় মুক্তিযুদ্ধের একজন সেক্টর কমান্ডার গ্রেফতারও হয়েছিলেন এবং মাওলানা ভাসানীর ন্যায় বর্ষিয়ান রাজনীতিককে অনেক নিগ্রহ ভোগ করতে হয়েছে। অধ্যাপক মাহফুজ পারভেজের ভাষায় "১৬ ডিসেম্বর রেসকোর্স ময়দানে আত্ম সমর্পনের কয়েক ঘন্টার মধ্যেই ঢাকাসহ সারা দেশে ভারতীয় বাহিনী নজির বিহীন লুটতরাজ শুরু করে। তারা অস্ত্র, গোলাবারুদ, যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, এমন কি বাড়ী ঘরের আসবাবপত্র পর্যন্ত ট্রাকে ভর্তি করে সীমান্তের ওপারে পাঠিয়ে দিতে থাকে।" এই সময় আন্তর্জাতিক ও জাতীয় সংবাদ মাধ্যম সমূহেও ভারতীয় লুট পাটের সচিত্র বিবরণী প্রকাশিত হতে থাকে। চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্র বন্দর এবং চাঁদপুর ও নারায়ণগঞ্জ নদী বন্দরে ভারতীয় বাহিনী লুট পাটের তান্ডব চালায় এবং তাতে বহু দেশী বিদেশী জাহাজের মালামাল ও বন্দরের মূল্যবান যন্ত্রপাতি লুটপাট হয়। অধ্যাপক মাহফুজ আরো বলেছেন, "আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করার সংগে সংগে ১৯৭২ সালের ১লা জানুয়ারী ভারত তিনটি সিদ্ধান্ত চুক্তি পাশ করিয়ে নেয় যা অর্থনৈতিকভাবে বাংলাদেশকে পঙ্গু করে ভারতীয় স্বার্থ হাসিলের জন্য যথেষ্ট ছিল। এই সিদ্ধান্তগুলো ছিল : (ক) পাকিস্তান আমলে ভারতে পাট ও পাটজাত পণ্য রফতানীর উপর যে নিষেধাজ্ঞা ছিল তা প্রত্যাহার, (খ) ভারতীয় মুদ্রার বিপরীতে বাংলাদেশী টাকার অবমূল্যায়ন এবং (গ) ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালের আগের সকল রফতানী চুক্তি বাতিল করে দেয়া। এই চুক্তি কার্যকর হবার ফলে ভারত পাট ও পাটজাত পণ্যের একক ক্রেতায় পরিণত হয় এবং কম দামে বৈধ ও অবৈধ (চোরাচালানী) পন্থায় তৎকালীন বাংলাদেশের একমাত্র অর্থ উপার্জন খাত পাট ভারতের কব্জায় চলে যায়।" ভারতের এই কূট চালে পড়ে এভাবে আমাদের পাট শিল্প ধ্বংস হয়। ড. কামাল সিদ্দিকী তার "Political Economy of Indo-Bangladesh Relations : 1971-75" শীর্ষক তার অভিসন্দর্ভে একথাই বলেছেন, তিনি বলেছেন, "For several decades India was able neither to export raw jute nor to produce enough jute to feed its own industries. The position changed dramatically after the birth of Bangladesh. In 1973 India exported one million bales of raw jute and by 1974 not only were its existing mills running at full capacity but it had also started to set up more jute mills."

বস্তুতঃ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর নতুন এই স্বাধীন দেশটার প্রতি ভারতের আচরণ, লুটপাট, অর্থনৈতিক সম্প্রসারণবাদ এবং আধিপত্যবাদের নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

www.bjilibrary.com

ফলে স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতের সাহায্যকে মানুষ সহজেই ভুলে যায় এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে ভারতবিরোধী চেতনা দানা বেঁধে উঠতে থাকে। এ প্রেক্ষিতে ভারতীয় মহলের নতুন বোধোদয় হয়। তাদের কেউ কেউ বলতে শুরু করেন যে প্রয়াত নেহেরু একটি পাকিস্তান করেছেন, তার কন্যা ভারতের মুকাবিলায় দুটি পাকিস্তান করে দিয়েছেন। এদের আর আগ বাড়তে দেয়া যায় না। ভারতীয়দের এই প্রতিশ্রুতি তারা রক্ষা করে চলেছে। এই রাষ্ট্রটিকে পঙ্গু ও অকার্যকর করার জন্য তারা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অন্তর্ঘাত ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করে এই দেশটির অর্থনীতিকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। সরকারকে অকার্যকর প্রমাণ করার জন্য এদেশেরই কিছু বুদ্ধিজীবী, মিডিয়া কর্মী এবং রাজনৈতিক নেতা কর্মীকে কিনে নিয়ে নন ইস্যুকে ইস্যু বানিয়ে জাতীয় ঐক্যে ফাটল ধরানোর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। বাংলাদেশকে মৌলবাদী ও তালেবান রাষ্ট্র প্রমাণের জন্য পত্র-পত্রিকায়, রেডিও-টেলিভিশনে ব্যাপক প্রচারণা চালানো হচ্ছে। এই সেদিনও ভারতের কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী প্রণব মুখার্জী পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী বাসুদেব বসু ও ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার বাংলাদেশে ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ঘাটি আছে বলে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, মুখ্যমন্ত্রীদের দু'জনই ভূটানের ন্যায় বাংলাদেশে সেনাবাহিনী পাঠিয়ে তল্লাশী চালানোর জন্য ভারত সরকারের নিকট দাবী জানিয়েছেন। ভারত সরকারের একজন পদস্থ কর্মকর্তা ও র'এর ঊর্ধতন নির্বাহী বিভূতি ভূষণ নন্দী দি Statesman পত্রিকায় লিখেছেন, "রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিকসহ সর্বপ্রকার অস্ত্র প্রয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশের এই তৎপরতা স্তব্ধ করার জন্য ভারতকে কার্যকর ও সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় ভূখণ্ডকে ইসলামপন্থীদের কবল থেকে বাঁচানো যাবে না।" র' কর্মকর্তার এই বক্তব্যটি তাৎপর্যপূর্ণ।

ভারতীয় পত্র পত্রিকাগুলো বাংলাদেশ বিরোধী প্রচারণায় শীর্ষ স্থান দখল করে আছে। The Hindu পত্রিকায় এমভি কামাথ নামক ভারতের একজন প্রবীণ রাজনৈতিক বিশ্লেষক তার এক নিবন্ধে বাংলাদেশের অস্তিত্বই মুছে ফেলার ইঙ্গিত দিয়েছেন। ২০০৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি লিখেছেন, "Let it be said in simple and plain language : Bangladesh has no business to exist. Its creation in 1947 was as historic a mistake as Lord Curzon's Partition of Bengal was in 1905. Curzon's Plan to divide Bengal was annulled because, in the end Bengal's sense of unity prevailed. Bangladesh if it wants to survive must return to India and India in turn must help it to do so, The answer to the problem of illegal immigration of Bangladesh is into India lies in one word: Federation. No matter how loudly the current rulers of Bangladesh may deny it, Bangladesh can never be

www.bjilibrary.com

self-sufficient. It has a cultural identity of its own that it shares with West Bengal. It could never be part of Pakistan and its creation should have been foreseen. So should its ultimate unity with India, no matter what resistance Begum Zia may offer or the Jamat-e-Islami, what needs to be worked out is the nature of Bangladesh's reconciliation with India."

মিঃ কামাথের এই বক্তব্য ও আশাবাদ বাংলাদেশের অস্তিত্বের জন্য একটা বিরাট হুমকি। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ প্রকাশ্যে বলতে না পারলেও অন্যান্য ভারতীয়দের মতো তারাও বিশ্বাস করে যে বাংলাদেশের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বেমানান, টিকে থাকতে হলে তাকে ভারতের অংগভুক্ত হয়েই টিকে থাকতে হবে। বাংলাদেশের ভারতভুক্তির পথে তারা বিএনপি, জামায়াতকে প্রতিবন্ধক বলে মনে করে। ভারতভুক্তির এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই ভারত প্রকাশ্যে এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত তাদের সুবিধাভোগী এজেন্টদের দিয়ে দেশে বিদেশে এই দেশটিকে "তালেবান রাষ্ট্র" "অকার্যকর রাষ্ট্র" এবং "জংগী ঘাটি" প্রমাণ করার জন্য সামগ্রিক প্রচেষ্টা চালিয়েছে। এখানে ব্যর্থ হয়ে তারা এখন শ্রীলংকার ন্যায় বাংলাদেশকেও গৃহযুদ্ধের মুখে ঠেলে দেয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাপঞ্জী পর্যালোচনা করলে এটা পরিষ্কারভাবে ধরা পড়ে যে ভারত বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষার অতন্ত্র প্রহরী হিসেবে যে দু'টি দলকে তাদের লক্ষ্য অর্জনের পথে প্রতিবন্ধকতা বলে মনে করে সে দুটি দল তথা বিএনপি এবং জামায়াতে ইসলামীকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য এখন মরিয়া হয়ে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। বিএনপি বিভক্ত হয়েছে। জামায়াতকে সন্ত্রাস দুর্নীতি কোন অভিযোগেই যখন ঘায়েল করা যাচ্ছে না এবং ভারতের পছন্দের দলটির শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত হয়ে কারাগারে যাওয়ায় দলটি দুর্বল হয়ে পড়লো তখন ছত্রিশ বছরের পুরাতন একটি বিষয়কে সামনে এনে দেশব্যাপী নৈরাজ্য সৃষ্টির অপচেষ্টা শুরু হয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করেন যে এটা হচ্ছে র'এর ইন্ধনে- ভারতীয় মিত্র মহাজোট-এর মাধ্যমে দেশে একটি গৃহ যুদ্ধের পরিবেশ সৃষ্টি করে ভারতীয় স্বার্থ উদ্ধারের পথ প্রশস্ত করার একটি অশুভ উদ্যোগ।

ভারত ফারাক্কা বাঁধ চালু করে শুকনা মওসুমে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলকে 'মরুভূমিতে পরিণত করেছে এবং সারা দেশে নদীর নাব্যতা সংকটের সৃষ্টি করেছে। বর্ষা মওসুমে ফারাক্কার পানি ছেড়ে দিয়ে তারা আমাদেরকে ডুবিয়ে মারে। নদী সংযোগ প্রকল্পের মাধ্যমে তারা বাংলাদেশের গোটা অর্থনীতিকেই পঙ্গু করে দিতে চায়।

জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশকে তার উৎপাদিত পণ্যের বাজারে পরিণত করার জন্য ভারত তার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। ভারত-বাংলাদেশ বৈধ বাণিজ্যে আমাদের বার্ষিক প্রতিকূল ঘাটতি প্রায় ৬০ হাজার কোটি টাকা। এ ছাড়া চোরা চালান আমাদের অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দিচ্ছে।

www.bjilibrary.com

স্বাধীন বঙ্গভূমি আন্দোলন এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরের ১৬টি জিলাকে নিয়ে হিন্দু বাংলা গঠনের অশুভ পরিকল্পনা ভারতেরই সৃষ্টি।

ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক সীমান্ত এলাকায় বাংলাদেশী নাগরিকদের হত্যা, অপহরণ ও তাদের সহায়তায় জবরদস্তি জমির ফসল কাটা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। এ ছাড়াও তারা দীর্ঘদিন ধরে পুশ ইনের নামে ভারতীয় নাগরিকদের বাংলাদেশী ভূখণ্ডে ঠেলে দিয়ে দু'দেশের মধ্যে তিক্ততার সম্পর্ক সৃষ্টি করে আসছে। বাংলাদেশে ইসলামের উত্থান ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের গাত্রদাহের অন্যতম প্রধান কারণ। এই উত্থানকে ঠেকানোর জন্য তারা এখন মরিয়া হয়ে উঠেছে। কুরআনের বিকৃত অর্থ করে মানুষের মনকে বিষিয়ে তোলার জন্য একটি উদ্যোগও তারা গ্রহণ করেছে।

সরাসরি ইসলামের বিরোধিতা করে লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়ে বিপথগামী কিছু আলিম নামধারীদের জঙ্গী বানিয়ে তারা এখন ভেতর থেকে ইসলাম ও মুসলিমদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করার চেষ্টা করছে। তারা কুরআন শরীফের ১০০টি আয়াতকে চিহ্নিত করে প্রচার করে বেড়াচ্ছে যে বিনা কারণে বিধর্মীদের হত্যা করা এবং সন্ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে ক্ষমতা দখল মুসলিমদের জিহাদী দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে অতীতে মুসলিমরা কোটি কোটি লোককে হত্যা করেছে এবং বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশে তাই করছে।

ভারতীয় শিবসেনা কর্তৃক বিলিকৃত একটি পুস্তিকায় প্রদত্ত একটি উদাহরণ এখানে উল্লেখ করছি। এখানে বলা হয়েছে, "When Kassim, the horrible invader who invaded Sind in 711 AD got sick of killing 30000 Hindu men, women and children sent message of his glorious accomplishment, his king in Mecca, reminded him the sura 46.4 and asked him to butcher the rest."

ইতিহাস এবং তথ্য বিকৃতির একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত! প্রথমত: ১৭ বছরের তরুণ মুহাম্মাদ বিন কাসিম সিন্ধু অভিযানে গিয়েছিলেন হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নির্দেশে এবং তার রাজধানী মক্কায় ছিল না, ছিলো দামেস্কে। কাজেই তার বিজয় বার্তা মক্কায় পাঠানো কিংবা মক্কা থেকে তাকে নির্দেশনা দেয়ার প্রশ্নই উঠেনা। দ্বিতীয়ত: কুরআন মাজিদের যে সূরা ও আয়াতের এখানে উল্লেখ করা হয়েছে তা হচ্ছে সূরা মুহাম্মাদের ৪নং আয়াত। এই আয়াতের নির্দেশনার ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ এবং সাথে সাথে যুদ্ধ বন্দীদের সকলকে হত্যা করার (butcher the rest) হুকুম পরস্পর বিরোধী। বলা বাহুল্য সূরা মুহাম্মাদের ৪নং আয়াতে যুদ্ধ সংক্রান্ত প্রাথমিক নিয়ম কানুন বর্ণনা করা হয়েছে। এই আয়াতটি যুদ্ধের নির্দেশ আসার পরে এবং কার্যত: যুদ্ধ শুরু হবার পূর্বে নাযিল হয়েছিল এবং এর উপলক্ষ ছিলো বদরের যুদ্ধ। এতে বলা হয়েছে, "অতএব কাফিরদের সাথে যখন তোমাদের সম্মুখ যুদ্ধ হবে তখন প্রথম কাজই হচ্ছে (যুদ্ধরত শত্রুদের) গলাসমূহ কর্তন করা। এমন কি তোমরা যখন তাদের ভালোভাবে চূর্ণ বিচূর্ণ করে ফেলবে তখন বন্দী শত্রুদের শক্ত করে বেঁধে ফেলবে। অত:পর

www.bjilibrary.com

তোমাদের এখতিয়ার রয়েছে হয় তাদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করে ছেড়ে দেয়ার অথবা মুক্তিপণের বিনিময়ে আযাদ করে দেয়ার চুক্তি সম্পাদন করার, যতক্ষণ না তারা অস্ত্র সংবরণ করে" এই আয়াতে কোথাও যুদ্ধবন্দীদের হত্যা করার নির্দেশ নেই। ইসলামের যুদ্ধনীতি অনুযায়ী শুধুমাত্র যুদ্ধকালেই শত্রু হত্যা বৈধ, কিন্তু যুদ্ধের পর যুদ্ধবন্দীদের হত্যা করা বৈধ নয়।

তৃতীয়তঃ মুহাম্মাদ বিন কাশিম সিন্ধু অভিযান চালিয়েছেন জলদস্যুদের দমন করার জন্য, রাজা দাহিরের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় যে জলদস্যুরা বেশ কয়েক দশক ধরেই মুসলিম বণিকদের জাহাজ ও মালামাল লুণ্ঠন করছিল এবং সর্বশেষ সিংহলের রাজার উপঢৌকন ও সে দেশে ব্যবসারত কতিপয় আরব ব্যবসায়ীর মৃত্যুর পর তাদের পরিবার-পরিজন ও সহায়সম্পদ বহনকারী জাহাজের পর হামলার প্রেক্ষিতে রাজা দাহির কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণে অস্বীকৃতির কারণে এই অভিযান ত্বরান্বিত হয়। রাজা দাহির অত্যাচারী শাসকই শুধু ছিলেন না তিনি ব্যভিচারীও ছিলেন। তার অত্যাচারে অতিষ্ঠ সিন্ধুবাসীরা মুহাম্মাদ বিন কাসিমকে যুদ্ধে সহায়তা করেছিলেন এবং চার হাজার জাঠ সৈন্য সপক্ষ ত্যাগ করে মুসলিম বাহিনীর সাথে দাহিরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন এবং অতি সহজেই তিনি বিজয় অর্জন করেছিলেন। ৩০ হাজার লোক হত্যার যে অপবাদ তাকে দেয়া হচ্ছে তা ইতিহাস সমর্থিত নয়। মুসলিমরা যেখানেই গিয়েছেন নির্যাতিত সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের স্বাগত জানিয়েছে। ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মাদ বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক মাত্র ১৭ জন অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে বাংলা বিজয়কে এজন্যই ইতিহাসের বিস্ময় বলা হয়। তারা যদি খুনী অত্যাচারীই হতেন তাহলে এত সহজে মানুষ তাদের গ্রহণ করতো না। আর আখিরাতে বিশ্বাসী ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের তো বিচারের নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া এবং যুদ্ধাবস্থা ছাড়া অন্যকোনো অবস্থাতেই মানুষ হত্যার প্রশ্নই উঠে না। এ হত্যা তাদের জন্য মহাপাপ সমগ্র মানব জাতিকে হত্যার শামিল। মুসলিমরা যদি হত্যার রাজনীতি করতেন তাহলে ভারতবর্ষে তাদের সাতশত বছরের শাসনে কোনো অমুসলিম বেঁচে থাকতে পারতো না।

ভারত থেকে প্রকাশিত ও বিনা মূল্যে বিতরণকৃত শ্রীরাম জন্মভূমির উপর লেখা এবং মুসলিম শাসকদের বর্বরতার বিবরণী সম্বলিত পুস্তিকাগুলো পড়লে দেখা যায়, কিভাবে দুনিয়ার বিশেষ করে ভারত এবং বাংলাদেশের মুসলিমদের বিরুদ্ধে হিন্দু ধর্মাবলম্বীসহ সাধারণ মানুষকে ক্ষেপিয়ে তোলার জন্য পবিত্র কুরআনের আয়াতের কদর্থ করে তারা দেশে দেশে বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে এবং আমাদের দেশের একটি রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দও এই কাজকে নিজেদের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে। পাঠকদের অবগতির জন্য আমি এখানে সামান্য নমুনা তুলে ধরছি। এই ধরনের একটি পুস্তিকায় সূরা আল বাকারার ১৯৩নং আয়াতের উল্লেখ করে তার একটি তরজমা দেয়া হয়েছে। এই আয়াতটি হচ্ছে "ওয়া কাতেলু হুম হাত্তা লা তাকুনা ফিতনাতুন অ-ইয়া কুনাদ দ্বীনো লিল্লাহে ফা ইনিন তাহাও ফালা উদওয়ানা ইল্লা আলায যোলেমীন।" বিশ্ব হিন্দু পরিষদ

www.bjilibrary.com

এই আয়াতের তরজমা করেছে, “Fight against them until idolatry is no more and Allah's religion reigns supreme” অথচ এর প্রকৃত তরজমা হবে, “And fight them on until there is no more persecution and the religion becomes Allah's but if they cease let there be no hostility except to those who practise oppression.” অর্থাৎ আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই কর যে পর্যন্ত না ফিতনার অবসান হয় এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়। অত:পর যদি তারা নিবৃত হয়ে যায় তাহলে কারুর প্রতি কোনো জবরদস্তি নেই। শুধু তারা ছাড়া যারা নিপীড়ন অব্যাহত রাখবে। পবিত্র কুরআনে ফিতনা উৎখাতের কথা বলা হয়েছে যার অর্থ হচ্ছে অত্যাচার, অবিচার, জুলুম, নির্যাতন, নিপীড়ন প্রভৃতি। হিন্দুরা মূর্তি পূজা করে এবং মূর্তি তাদের জন্য প্রিয়। পরধর্মে সহনশীলতার অংশ হিসেবে কুরআন মাজিদে মূর্তিকে গালি দিতে পর্যন্ত নিষেধ করা হয়েছে। যদিও ইসলাম মূর্তি পূজার বিরোধী। ইসলাম এও বিশ্বাস করে যে জবরদস্তি করে কারো ধর্ম বিশ্বাস পরিবর্তন করা যায় না। এ অবস্থায় ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে জনমতকে বিষিয়ে তোলার জন্য বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ফিতনা শব্দটির তরজমা করেছে idolatry তথা মূর্তি পূজা এবং ফিতনার অবসানকে মূর্তি পূজার উচ্ছেদ। একইভাবে তারা সূরা আল আনফালের ৩৯নং আয়াতের কদর্থ করে প্রচার করে বেড়াচ্ছে যে ধার্মিক মুসলিম মানেই হচ্ছে সন্ত্রাসী। আমাদের দেশের মুসলিম নামধারী এক ধরনের রাজনীতিক ইসলামী শক্তির বিরুদ্ধে এটাকে একটি মোক্ষম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছেন।

২০০৫ সালের ১৭ অগাস্ট বাংলাদেশে ৬৩টি জিলায় পরিকল্পিত বোমা হামলার তদন্ত পর্যায়ে এর সাথে জামায়াতুল মুজাহেদীন নামক একটি সংস্থার সম্পৃক্ততার প্রমাণ ইসলাম বিরোধী শক্তি, দল ও গণমাধ্যমের প্রচার প্রপাগান্ডাকে আরো শক্তিশালী করেছে। এতে অনেকের চিন্তা-চেতনায় বিভ্রান্তি ও ধুম্রজালের সৃষ্টি হচ্ছে।

এখানে দ্ব্যার্থহীনভাবে একটা কথা পরিষ্কারভাবে বলে দেয়া দরকার যে ইসলাম হচ্ছে মানুষের জন্য আল্লাহ মনোনীত একটি জীবন বিধান যার উৎস কুরআন এবং সুন্নাহ, প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের কোনো মিডিয়া নয়। এই ইসলামে মানুষ হত্যার লাইসেন্স কখনো ছিলো না, এখনো নেই। বস্তুত: মানুষের কল্যাণই হচ্ছে ইসলামের লক্ষ্য। মানুষ হত্যা করে, তার ধন সম্পদ, মান মর্যাদা ধ্বংস করে তার কল্যাণ সাধন করা যায় না। এজন্য ইসলামে খুন, রাহাজানী, দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি, ব্যভিচারসহ অপরাধমূলক সকল প্রকার কর্মকান্ড নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইসলামের ফৌজদারী আইনে এসব অপরাধের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে, আখিরাতের শাস্তি তো আলাদা। আল্লাহর নবী (সা) বিদায় হজের ভাষণে প্রত্যেক মানুষের জান মাল ইজ্জত মুসলিমদের জন্য হারাম করে দিয়েছেন। আল্লাহ এবং তাঁর নবী (সা) যা হারাম করেছেন কোনো মুসলিম নামধারী তা হালাল করতে পারেন না। যারা করেন তারা বিভ্রান্ত, মুনাফিক, পবিত্র কুরআনে

www.bjilibrary.com

এসব কপটাচারীদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে। এর মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা তাদের সমাজের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে। সংস্কারের ছদ্মাবরণে সন্দেহজনক আদর্শ-প্রচার করে তারা ফিতনা ফাসাদ ঘটায়। সূরা আল বাকারার ১১-১২নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, "যখন তাদের বলা হয় যে দুনিয়ার বুকে দাঙ্গা হাঙ্গামার সৃষ্টি করো না, তখন তারা বলে আমরা তো ভাল কাজই করে যাচ্ছি, মনে রেখো তারাই হাঙ্গামা সৃষ্টিকারী, কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করে না।" আমাদের দেশে বোমাবাজীসহ যারা হাঙ্গামা সৃষ্টির সাথে জড়িত তারা ইসলাম নয়, ইসলাম বৈরী শক্তির ক্রীড়নক।

প্রতিকারের উপায়

বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য একটি স্বাধীন দেশের সব কিছু করার অধিকার রয়েছে তবে শর্ত হচ্ছে এই যে তার কাজগুলো নীতি নৈতিকতার দিক থেকে বৈধ হতে হবে এবং এই অধিকার প্রয়োগ করতে গিয়ে অন্য কোন স্বাধীন দেশ বা তার জনগণের অধিকারকে ক্ষুণ্ন করা যাবে না। ভারতের আধিপত্যবাদী কর্মকান্ড একটি দেশ হিসেবে বাংলাদেশের এবং মুসলিম উম্মাহর সদস্য হিসেবে আমাদের অস্তিত্বকে বিপন্ন করতে চায়। এর মুকাবিলা করা আমাদের জাতীয় দায়িত্ব।

India Doctrine এর যে কর্ম কৌশল তার সার্থক মুকাবিলায় নিম্নোক্ত পন্থা অনুসরণ করা অপরিহার্য্য ঃ

১. জনবল অর্থবল ও সামরিক শক্তি সব দৃষ্টিকোন থেকেই বাংলাদেশের তুলনায় ভারতের অবস্থান শীর্ষে। বৈশ্বিক অঙ্গনেও ৪৫০ কোটি অমুসলিমের তুলনায় ১৫০ কোটি মুসলিমের শক্তি সামর্থ উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। এ প্রেক্ষিতে ইসলামে প্রত্যাবর্তন এবং তার পূর্ণাঙ্গ অনুসরণই কেবল আমাদের স্বাধীনতার রক্ষা কবচ হতে পারে। যে কোন দেশ বা জাতি একটি ভিশন বা মিশন নিয়ে বেঁচে থাকে। এই Vision বা Mission হিসেবে আমরা যদি ইসলামকে গ্রহণ করতে না পারি তা হলে দেশ ও জাতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা যাবে না। যে অঞ্চল নিয়ে বাংলাদেশ গঠিত ১৯৪৭ সালে কেবলমাত্র ইসলামের জন্যই এই অঞ্চলটি ভারত থেকে আলাদা হয়ে পাকিস্তানের অংশে পরিণত হয়েছিল এবং পাকিস্তানের অংশ হবার বদৌলতেই ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ হয়েছিল। ১৯৪৭ সালে ইসলামী চেতনা Climax এ পৌঁছেছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে এই চেতনা ধরে রাখা যায়নি, Anticlimax শুরু হয়ে যায়। আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে যদি আমরা নতুন জেনারেশানকে আদর্শ দিতে ব্যর্থ হই তাহলে সম্প্রসারণবাদের হাতে আমাদের পরাজয় অনিবার্য, সমন্বয়ী পলিসি দ্বারা বাংলাদেশের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা কঠিন ব্যাপার।

২. ইসলামের পরিপূর্ণ অনুসরণ ও অনুশীলনের পাশাপাশি জ্ঞান বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে না পারলে জাতি হিসেবে যেমন টিকে থাকা যায় না তেমনি সম্প্রসারণবাদেরও মুকাবিলা করা যায় না। Income Poverty Knowledge Poverty-র'ই ফসল।

www.bjilibrary.com

বাংলাদেশের বাসিন্দা এবং সর্বোপরি মুসলিম হিসেবে এই উভয় দারিদ্র্য থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। মুসলিমদের জন্য এখন এটা ফরয হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ প্রসঙ্গে ড. মাহাথিরের একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য।

২০০৩ সালে কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত ওআইসি শীর্ষ সম্মেলনে মুসলিমদের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধান মন্ত্রী ড. মাহাথির মোহাম্মদ বলেছেন, "Some believe that poverty is Islamic, sufferings and being oppressed are Islamic. Some preach that the world is not for us, ours are the joys of heaven in the after life. All we have to do is to perform certain rituals, wear certain garments and put up certain appearance." মাহাথিরের এই মন্তব্যটি সারা দুনিয়ার মুসলিমদের বেলায় প্রযোজ্য। দারিদ্র্য ও দুর্ভোগ যেন তাদের ললাট লিখনে পরিণত হয়েছে। এক শ্রেণীর আলিম ও পীর সাহেবদের বেশির ভাগ এই শিক্ষাই দেন যে এই দুনিয়া আমাদের জন্য নয়, আখিরাতের সুখ শান্তি আমাদের প্রাপ্য। বিশেষ পোশাক পরে দাড়ি রেখে আনুষ্ঠানিক কিছু ইবাদাত করলেই এই জান্নাত প্রাপ্তি নিশ্চিত হয়ে যায়, এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পারমাণবিক বোমার মুকাবিলা করা যাবে না। অর্থ বল না থাকলে বাহু বল বা জনবল কাজে লাগে না। শিক্ষা-দীক্ষা জ্ঞান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে অবহেলা করে কখনো কোনোও জাতি মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না।

ওআইসির অধীনস্ত Statistical Economic and Social Research and Training Center for Islamic Countries (SESRTCIC) কর্তৃক প্রকাশিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত তথ্যে মুসলিম দেশগুলোর এক করুণ চিত্র ফুটে উঠে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে কোনও দেশের অগ্রগতি বিবেচনার জন্য মান সম্পন্ন বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি জার্নালে সে দেশের বিজ্ঞানী প্রকৌশলীসহ বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের প্রণীত গবেষণা মূলক প্রবন্ধ নিবন্ধ প্রকাশের হারকে অন্যতম প্রধান Indicator হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। UNESCO'র Human Resources & R&D expenditures সংক্রান্ত তথ্য, Institute for scientific Information's Citation Index (SCI), Science Citation Index Expanded (SCI Expended), Social Science Citation Index (SSCI) এবং Arts & Humanities Citation Index (A & HCI) প্রভৃতি সূত্র থেকে সংগৃহিত তথ্যেও দেখা যায় যে ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত এই দশ বছরে ওআইসিভুক্ত দেশগুলোর সর্বমোট বিজ্ঞান ও কারিগরি প্রকাশনার সংখ্যা হচ্ছে ২,৭৫,৯৯৯টি। এই দশ বছরে ওআইসির প্রতি মিলিয়ন লোকের বিপরীতে এই সংখ্যা ২০০.৯টি। গত ১০ বছরে প্রকাশিত প্রকাশনার মধ্যে সোমালিয়া কর্তৃক প্রকাশিত প্রকাশনার সংখ্যা সর্বনিম্ন (১৬) এবং তুরস্কের সর্বোচ্চ (৮৭,৬২৯), মিশরের ২৭২৩৭,

www.bjilibrary.com

ইরানের ২১৫৯৬, সৌদি আরবের ১৬৮৩০, পাকিস্তানের ৭৮৪৪, ইন্দোনেশিয়ার ৫০৮৭ বাংলাদেশের ৪৬৮৬ ইত্যাদি। পক্ষান্তরে এই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের এমআইটি ও ষ্ট্যানফোর্ড বিশ্ব বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক প্রকাশনার সংখ্যা হচ্ছে ৯৯৬৪৩টি। আবার আঞ্চলিক ভিত্তিতে ওআইসিকে বিবেচনা করলে ওআইসি এশিয়া প্রথম (১৪৭৪৯৪) ওআইসি আরব দেশসমূহ দ্বিতীয় (১০৫,২১৮) এবং ওআইসি আফ্রিকা তৃতীয় (২৩২৮৭) স্থান দখল করে। এর সাথে অমুসলিম দেশ হাঙ্গেরীর তুলনা করলে ব্যবধানটি পরিষ্কার হয়ে উঠে। বর্ণিত সময়ে এককভাবে হাঙ্গেরী কর্তৃক প্রকাশিত নিবন্ধের সংখ্যা ৪৮৮৩২টি। যদি প্রতি মিলিয়ন জনসংখ্যার বিপরীতে এই হিসাবটি বিশ্লেষণ করা হয় তা হলে দেখা যায় যে দেশ হিসেবে কুয়েত (২৩৭৯ টি নিবন্ধ) প্রথম, লেবানন (২০৩৩.১) দ্বিতীয়, তুরস্ক (১২৩৯.৩) তৃতীয় এবং আফিগানিস্তান (২.৫) চতুর্থ অবস্থানে আসে। এই নির্দেশিকা অনুযায়ী ওআইসি আরব দেশগুলোর গড় প্রকাশনা ৩৪৫.১টি, ওআইসি এশিয়ার ১৯৫.৫টি এবং ওআইসি আফ্রিকার ৮১.৪টি নিবন্ধ। এর বিপরীতে দেখা যায় যে একক দেশ হিসেবে অমুসলিম ফিনল্যান্ড একই সময়ে প্রকাশ করেছে প্রতি মিলিয়ন লোকের বিপরীতে ১৬৫৫৯.৮টি এবং আয়ারল্যান্ড ১৪৯২.৮টি বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি নিবন্ধ।

এখন বর্ণিত প্রকাশনা ও নিবন্ধসমূহের মানের প্রশ্নে আসা যাক। এই মান যাচাই-এর জন্য যে মানদন্ডটি ব্যবহার করা হয় তা হচ্ছে, সংশ্লিষ্ট প্রকাশনা বা নিবন্ধটি অন্যান্য বিজ্ঞানী বা প্রযুক্তি বিশারদরা তাদের গবেষণা কর্মে কতবার উদ্বৃত করেছেন তার উপর। h-index হচ্ছে এর সূচক। এই সূচক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে ১৯৯৫ সাল থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত এই দশ বছরে প্রকাশিত নিবন্ধের মানে লেবানন পায় ৯৪ নম্বর। তুরস্ক ৯২, সৌদি আরব ৬২, মিশর ৬০, জর্দান ৫৯, ইরান ৫৩, ইন্দোনেশিয়া ৫২, মালয়েশিয়া ৫১, বাংলাদেশ ৪৫, পাকিস্তান ৪৪, আফগানিস্তান ৮, জিবুতি ৫ এবং কমোরোস ৩। অন্যদিকে এই সূচকে ফিনল্যান্ডের স্কোর হচ্ছে ২০৬, আয়ারল্যান্ডের ১৬৮, হাঙ্গেরীর ১৩৭, গ্রীসের ১২৭, যুক্তরাষ্ট্রের ষ্ট্যানফোর্ড বিশ্ব বিদ্যালয়ের ২৯৫ এবং এমআইটির ২৭৬।

অন্যদিকে ২০০৫ সালের পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে ঐ বছর ওআইসির সদস্যভুক্ত সকল দেশ মিলে মোট ৪৫,৪২৫টি বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি নিবন্ধ প্রকাশ করেছে অথচ নিউইয়র্ক নগরীর একক প্রকাশনা হচ্ছে ৫২৫৬০টি। আবার এক্ষেত্রে ওআইসি এশিয়া, ওআইসি আরব ও ওআইসি আফ্রিকান দেশসমূহের প্রকাশনার সংখ্যা হচ্ছে যথাক্রমে ২৮৮৯২, ১৩৪৪৪ ও ৩০৮৯। পক্ষান্তরে একই বছর শুধু হার্ভার্ড বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রকাশনার সংখ্যাই হচ্ছে ১৫৪৫৫টি। এছাড়াও ওআইসি দেশগুলোর সাথে নির্বাচিত কয়েকটি উন্নয়নশীল দেশের তুলনা করলে দেখা যায় যে

www.bjilibrary.com

চীন (৮০২৪২), ভারত (২৯০৪৭) রাশিয়া (২৮০৭৩) ব্রাজিল (২০৬৬৯) পোল্যান্ড (১৭০১১) এবং ইসরাইল (১৬৪৭০) এক মাত্র তুরস্ক ছাড়া প্রত্যেকটি ওআইসি দেশ থেকে বেশি নিবন্ধ প্রকাশ করেছে।

শিক্ষা-দীক্ষা জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মুসলিম দেশগুলোর যদি অগ্রগতি না হয় এবং বিশেষ করে তারা যদি অন্যদের তুলনায় এগিয়ে যেতে না পারে তা হলে শুধু আবেগ দিয়ে প্রতিপক্ষের মুকাবিলা করা যাবে না।

৩. ভারত চায় না বলে ভারতের সাথে আমাদের দ্বিপাক্ষিক সমস্যাবলীর সমাধান হচ্ছে না। ভারত চায় না বলেই সার্ককে আঞ্চলিক উন্নয়নের একটি কার্যকর সংস্থায় রূপান্তরিত করা যাচ্ছে না। ভারত চায় না বলেই তার সাথে আমাদের বাণিজ্য বৈষম্য কমানো যাচ্ছে না। এগুলো হচ্ছে রূঢ় বাস্তবতা। এই বাস্তবতাকে সামনে রেখেই আমাদের আগাতে হবে। দ্বিপাক্ষিক সংলাপের সকল সুযোগ সুবিধাকে কাজে লাগাতে হবে এবং তা যদি ব্যর্থ হয় তাহলে বাস্তব ও যৌক্তিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সাহায্য গ্রহণ করতে হবে। এজন্য প্রয়োজন তার সৃষ্ট সমস্যাগুলো Highlight করা, আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সাথে বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বের সাথে আমাদের সম্পর্ককে আরো নিবিড় করা। তার আগ্রাসী তৎপরতা মুকাবিলার জন্য আমাদের স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা থাকাও অপরিহার্য। সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি না থাকলে দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠা অর্জন করা যায় না। এই শক্তি অর্জনের জন্য আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে এবং দীর্ঘ মেয়াদী সমাধান হিসেবে মুসলিম বিশ্বের জাতি রাষ্ট্রগুলোকে যদি ইসলামী রাষ্ট্রে রূপান্তর করা যায় তাহলে আধিপত্যবাদ পালানোর পথ খুঁজে পাবে না। বাংলাদেশসহ মুসলিম বিশ্বের জনসংখ্যা বিপুল। এই জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে রূপান্তরিত করে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দেয়া প্রয়োজন।

৪. বাংলাদেশসহ মুসলিম দেশগুলোর অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে মুসলিম নামধারী এক শ্রেণীর নেতা নেত্রী জাতীয় স্বার্থকে জলাঞ্জলী দিয়ে ভারতীয় স্বার্থের তাবেদারীতে লিপ্ত রয়েছে এবং দেশে বিভেদ সৃষ্টিতে লিপ্ত রয়েছে। সংলাপের মাধ্যমে এই মহলটির বোধোদয়ের চেষ্টার পাশাপাশি জাতির সামনে তাদের মুখোশ উন্মোচনেরও চেষ্টা করতে হবে।

৫. ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রচার মাধ্যমের অপপ্রচার রোধের জন্য পরিকল্পিতভাবে লেখক, সাংবাদিক, কলামিষ্ট প্রভৃতি পেশায় পারদর্শী লোক তৈরির ব্যবস্থা গ্রহণ এবং তাদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে হবে। প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া নিরপেক্ষ ও ইসলামী করণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এর পর আসে আলিম উলামাসহ ইসলামপন্থীদের ঐক্যের প্রশ্ন। আল্লাহর কোনও নবী বাধা

www.bjilibrary.com

বিপত্তি থেকে রেহাই পাননি, আমাদের সামনেও বাধা বিপত্তি অবশ্যই আসবে এবং তা মুকাবিলার জন্য স্বল্প মেয়াদী নয়, দীর্ঘ মেয়াদী পন্থাই আমাদের অনুসরণ করতে হবে। আমরা যদি কুরআন-সুন্নাহর অনুসরণ করি, বিজয় অবশ্যই আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে। ■

তথ্যপঞ্জি ঃ

1. Shouri, Arun, A Secular Agenda, ASA, 1993.
3. Shouri, Arun, Indian Controversies ASA, 1993.
3. Isa khan The India Doctrine, Bangladesh Research Forum, Dhaka.
4. Malkani, K.R. The Politics of Ayodhya and Hindu Muslim Relations Har Anand Publications, New Delhi.
5. Nabaratna S. Rajaram. the Politics of History : Aryan Invasion Theory and the Supervision of Scholarship, Voice of India, New Delhi, 1995.
6. Some Frequently Asked Questions on Sree Ram- Janmabhumi of Ayodhya, Uttar Pradesh, India Sree Ram Janmabhumi Nyasa, New Delhi.
7. Kalki Gour : Global Clash of Races
8. Dominic Wilson of Rupa Purushothama : Dreaming with Prices : The Path to 2050.
9. Goldman Sach : Global Economic Paper no 99, October 2003.
10. মাহফুজ পারভেজ : ভারতীয় আধিপত্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদ ঃ বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের বিপদ ও করণীয়, বিআইসি সেমিনার পেপার, ২০০৬।
11. মোঃ নূরুল আমিন : মৌলবাদ জঙ্গীবাদ ও ইসলাম, ২০০৫।
12. G.W. Chowdhury : Pakistan's Relations with India, Islamabad, Pakistan.

লেখক-পরিচিতি : মুহাম্মদ নূরুল আমিন– বিশিষ্ট সাংবাদিক, কলামিস্ট এবং সহকারী সম্পাদক, দৈনিক সংগ্রাম।

লেখা-পরিচিতি : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত ১০ই জানুয়ারী, ২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সেমিনারে প্রবন্ধটি উপস্থাপিত হয়।

www.bjilibrary.com

সুদের অভিশাপ : পরিত্রাণের উপায়

শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান

■

ভূমিকা

সমাজ শোষণের যতগুলো উপায় এ পর্যন্ত উদ্ভাসিত হয়েছে, ধনীকে আরও ধনী এবং গরীবকে আরও গরীব করার যত কৌশল প্রয়োগ হয়েছে সুদ তাদের মধ্যে সেরা। কৌশল, পদ্ধতি, ফলাফল, অর্থনীতির চূড়ান্ত অনিষ্ট সাধন– সকল বিচারেই সুদের কাছাকাছি কোন সমাজবিধ্বংসী হাতিয়ার নেই। সেই প্লেটো-এরিস্টটলের যুগ হতেই সুদ অপ্রতিহত গতিতে সমাজে বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী, সুদকে কঠোর ভাষায় নিন্দা করা হয়েছে, সুদখোরদের সামাজিক শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, সুদ বর্জনেরও আহ্বান জানানো হয়েছে যুগে যুগে। কোন অবতীর্ণ গ্রন্থেই সুদের লেনদেনকে সমর্থন করা হয়নি, বৈধতা দেওয়া হয়নি।

ইতিহাসের কাল পরিক্রমায় দেখা যায়, অন্যের দুর্ভাগ্য হতে অর্থ উপার্জনের জন্যে সুদখোরদের নিন্দা করা হয়েছে। প্লুটার্ক বিশ্বাস করতেন– বিদেশী আক্রমণকারীদের চাইতে সুদখোররা অধিকতর নির্যাতনকারী। মধ্যযুগের গীর্জা অপরিসীম লোভ ও কৃপণতার জন্যে সুদখোরদের দেহপসারিণীদের সমতুল্য গণ্য করেছে। ইতালীর অমর কবি দান্তে সুদখোরদেরকে নরকের অগ্নিবৃষ্টিময় সপ্তম বৃত্তে নিক্ষেপ করেছেন। সুদখোররা তাদেরপ প্রবাদতুল্য অর্থগৃধ্নুতা, নিষ্ঠুরতা ও লোলুপতার জন্যে

www.bjilibrary.com

সেক্সপীয়ার, মলিয়ের প্রমুখ বিশ্বখ্যাত সাহিত্যিকদের রচনায় বিদ্রূপের খোরাক হয়ে রয়েছে। সুদরখোররা কদাচিৎ সামাজিক মর্যাদা লাভ করেছে। ঋণ প্রদানের একচেটিয়া ব্যবসা, ক্ষুদ্র ও স্বল্প মেয়াদী ঋণের জন্যে চড়া হারে সুদ আদায় এবং ঋণের ফাঁদে জড়িয়ে ঋণগ্রহীতার সর্বস্ব খুইয়ে বসার কারণেই সুদখোরদের বিরুদ্ধে এই সর্বজনীন নিন্দা উৎসারিত হয়েছে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানবজাতির জন্যে প্রেরিত তার সর্বশেষ গ্রন্থে সুদকে হারাম ঘোষণা করেছেন দ্ব্যর্থহীন ভাষায়। মানবতার শ্রেষ্ঠ বন্ধু ও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিটিও তাঁর বিদায় হজ্জের ভাষণে সুদকে চিরতরে নিষিদ্ধ ও রহিত ঘোষণা করেছিলেন। সে ঘোষণায় ফলও হয়েছিল। আব্বাসীয় ও উমাইয়া যুগের শেষ দিন পর্যন্তও ইসলামী হুকুমাতের কোথাও সুদ বিদ্যমান ছিল না।

পরবর্তীতে মুসলিমদের ভোগবিলাস ও আত্মবিস্মৃতির সুযোগে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তাদের পরাভূত করে ধ্বংস করে দেয় তাদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড। ব্যবসা-বাণিজ্য ও উৎপাদনের উপায়-উপকরণের উপর আধিপত্য বিস্তার করে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ। বিপরীতে মুসলিম দেশ ও সমাজ প্রতিরোধ তো গড়তে পারেইনি বরং ধীরে ধীরে পিছিয়ে পড়ে যোজন যোজন পথ। এই সময়েই ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের পথ ধরে নতুন আঙ্গিকে সুদ পুনরায় ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে সমাজের সর্বস্তরে। ব্যাংকিং পদ্ধতির বিকাশ ঘটে শিল্প বিপ্লবের হাত ধরেই। ব্যাংকিং পদ্ধতির মাধ্যমেই সমাজে সুদের সর্বনাশা শোষণ ও ধ্বংস আরও ব্যাপকতা লাভ করে। একদিকে পুঁজি আবর্তিত হতে থাকে শুধু ধনীদের মধ্যেই যা আল-কুরআনে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অন্যদিকে সুদের কারণে আরও নতুন নতুন অর্থনৈতিক নির্যাতন ও শোষণ বিস্তৃতি লাভ করে সমাজের তৃণমূল পর্যায়ে যার হাত থেকে পরিত্রাণ লাভ সহজসাধ্য নয়।

সুদের কুফল ঃ

সুদের কুফল বহুবিধ। সেসব সম্বন্ধে আলোচনা করতে হলে প্রয়োজন পৃথক প্রবন্ধের। এখানে শুধু কুফলগুলোর শিরোনাম উল্লেখ করা হলো ঃ

১. সুদ সমাজ শোষণের সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম।
২. সুদের কারণে দরিদ্র আর দরিদ্র এবং ধনী আরও ধনী হয়।
৩. সুদের শোষণ সার্বিক, ব্যাপক ও দীর্ঘস্থায়ী প্রকৃতির।
৪. সুদ গ্রহীতারা প্রায়শঃই স্বার্থপর, কৃপণ ও চরম ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়।
৫. সুদের নিশ্চিত উপার্জন সুদখোরকে শ্রমবিমুখ ও অলস করে।
৬. সুদের ফলে একচেটিয়া কারবারের প্রসার ঘটে।
৭. সুদের কারণে মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যেই বৃহৎ পুঁজি আবর্তিত হয়।
৮. সুদ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ।
৯. সুদের দীর্ঘমেয়াদী কুফলস্বরূপ অর্থনীতিতে মন্দার সৃষ্টি হয়।

www.bjilibrary.com

১০. সুদ পূর্ণ কর্মসংস্থানেরও মারাত্মক প্রতিবন্ধক।

১১. সুদের জন্যেই দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত হয়।

১২. সুদ স্বল্পলাভজনক সামাজিক প্রয়োজনীয় খাতে বিনিয়োগকে নিরুৎসাহিত করে।

১৩. সুদের কারণেই ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্প লাভজনক হতে পারে না।

১৪. সুদ সাধারণ জনগণের বিত্ত স্বল্প সংখ্যক পুঁজিপতির হাতে পুঞ্জীভূত করে।

১৫. সুদ সৃজনশীল উদ্যোগের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

১৬. সুদ ক্ষুদ্র বিনিয়োগকে নিরুৎসাহিত করে।

১৭. সুদ মজুরী বৃদ্ধির অন্যতম প্রতিবন্ধক।

১৮. সুদ ধনবণ্টনে অসমতা সৃষ্টির অন্যতম কারণ।

১৯. সুদ মুদ্রাস্ফীতিতে প্রত্যক্ষ ইন্ধন যোগায়।

২০. সুদের কারণেই ধনী ও দরিদ্র দেশের সম্পর্ক শোষক-শোষিতের পর্যায়ে উপনীত হয়।

এসব ছাড়াও সুদের নৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক কুফল রয়েছে। সেগুলো আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। তাই সে সবের উল্লেখ হতে বিরত থাকা গেল।

পরিত্রাণের উপায়

সুদের এই সর্বগ্রাসী সয়লাব, এর ভয়াবহ বিধ্বংসী কুফলসমূহ হতে উদ্ধার লাভের উপায় কি? পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, ইসলামী খিলাফাতের দীর্ঘ নয়শত বছরে মুসলিম বিশ্বে কোথাও সুদ বিদ্যমান ছিল না। কিন্তু মুসলিমদের পতন দশা শুরু হলে যখন পাশ্চাত্যের ধনবাদী আগ্রাসী শক্তিসমূহ একে একে মুসলিম দেশসমূহ গ্রাস করতে শুরু করে তখন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও সৃষ্টি হয় চরম নাজুক অবস্থা। ব্যবসা-বাণিজ্য ভূ-সম্পত্তি সবই চলে যায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের দখলে। এই সময়েই প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সুদের বিস্তার শুরু হয়। দীর্ঘদিন পরে যখন এসব দেশ পুনরায় রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করে ততদিনে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুদ গভীরভাবে শিকড় গেড়ে বসেছে। সুদ উচ্ছেদের জন্যে তাৎক্ষণিকভাবে কোন প্রচেষ্টাও চলেনি। অর্থবহ কোন জোরদার কর্মসূচীও গৃহীত হয়নি। সুদ উচ্ছেদের জন্যে মাত্র বিগত শতাব্দীর শেষভাগে ইসলামী পদ্ধতির ফাইন্যান্সিয়াল প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। কিন্তু এরপরও বাংলাদেশের মতো বহু মুসলিম দেশে সুদ অর্থনৈতিক-সামাজিক-প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ডে সদাপট বিরাজমান। কিভাবে একে সমাজদেহ হতে উচ্ছেদ করা যায়, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হতে কিভাবে চিরতরে দূর করা যায়, এক কথায় সুদ বর্জনের কৌশল কি হতে পারে সে সম্বন্ধেই এখানে কিছু কর্মসূচী আলোচিত হলো।

www.bjilibrary.com

সামাজিক কর্মসূচী

১. গণসচেতনতা সৃষ্টি ঃ সুদ বর্জনের তথা সমাজ হতে সুদ উচ্ছেদের জন্যে গণসচেতনতা সৃষ্টির বিকল্প নেই। এ দেশের জনগণের প্রায় ৮৫% লোক মুসলিম। তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা) জন্যে জীবন দিতেও কুণ্ঠিত নয়। কিন্তু যথার্থ ইসলামী জ্ঞানের অভাবে সুদ যে ইসলামে সর্বৈব হারাম সে সম্বন্ধে অনেকেই জ্ঞাত নয়। কেউ কেউ বলেন, ঐ নির্দেশ চৌদ্দশত বছর আগে ঠিক ছিল, এখন নয়। নাউযুবিল্লাহ। তাদের যুক্তি, ব্যাংকের সুদ ও ব্যক্তির দাবীকৃত সুদ একই পর্যায়ের বিবেচিত হতে পারে না। কারণ রাসূলের (সা) যুগে ব্যাংক ব্যবস্থার উদ্ভবই হয়নি। আবার একদল বলেন, আরবী রিবা এবং ইংরেজী Interest একই অর্থ বহন করে না। অথচ আভিধানিক ও ব্যবহারিক বিচারে রিবার যে অর্থ ইংরেজী Interest এর ব্যবহারিক অর্থ একই দাঁড়ায়। আল-কুরআনে আল্লাহ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন– "ব্যবসাকে হালাল করা হলো আর সুদকে করা হলো হারাম" (সূরা আল বাকারা ঃ ২৭৫ আয়াত)। দেশের সাধারণ জনগণের বিপুল অংশ প্রকৃতপক্ষে আল-কুরআনের এই নির্দেশ সম্বন্ধে অবগত নয়। এ জন্যেই তাদের কাছে এই আসমানী নির্দেশ যথাযথ গুরুত্বের সাথে তুলে ধরা অতীব প্রয়োজন।

সুদের ক্ষতিকর দিক সম্বন্ধে প্রথমেই যে বিষয়টি পরিষ্কারভাবে জনসমক্ষে তুলে ধরা দরকার তা হলো সুদের আয় যেমন হারাম, সুদের সঙ্গে যে কোন ধরনের সংশ্লিষ্টতাও তেমনি হারাম এবং হারাম সূত্রে উপার্জন ইসলামে নিষিদ্ধ। রাসূল (সা) বলেন–

"তোমাদের মধ্যে যারা সুদ খায়, সুদ দেয়, সুদের হিসাব লেখে এবং সুদের সাক্ষ্য দেয় সকলেই সমান গুনাহগার।" (সহীহ মুসলিম, জামে আত্ তিরমিযী, মুসনাদে আহমাদ)

সহীহ হাদীস অনুসারে আল্লাহর কাছে দু'আ কবুল হওয়ার জন্যে যে শর্তগুলো রয়েছে তার অন্যতম হলো হালাল রিযকের উপর বহাল থাকা (সহীহ মুসলিম)। সুতরাং, একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে যদি আমাদের উপার্জনই হালাল না হয় তাহলে আল্লাহর দরবারে যতই ফরিয়াদ করি না কেন তা কবুল হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নেই।

সে ক্ষেত্রে আমাদের সকল ইবাদাত বন্দেগীই বরবাদ হয়ে যাবে। এর চূড়ান্ত পরিণতি হলো আখিরাতে আল্লাহর আযাব হতে রেহাই না পাওয়া। আল্লাহর রাসূল (সা) আরেক হাদীসে বলেছেন– হালাল রুযী ঈমানের দশ ভাগের নয় ভাগ। এ থেকেই হালাল রুযীর অপরিসীম গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। তাই ঈমান বজায় রাখার স্বার্থেই আমাদের হালাল রুযী অর্জনের প্রচেষ্টা চালাতে হবে এবং যা হারাম তা পরিত্যাগের সর্বাত্মক উদ্যোগ নিতে হবে। প্রকৃতপক্ষে হালাল অর্জন ও হারাম বর্জনের মধ্যেই রয়েছে মুমিনের জীবনের যথার্থ সাফল্য। এই সাফল্য অর্জনের জন্যে চাই নিরন্তন নিরলস প্রয়াস।

ব্যাপক গণসচেতনা সৃষ্টির মাধ্যমেই কেবল সুদ উচ্ছেদের লক্ষ্য অর্জিত হতে পারে।

www.bjilibrary.com

জনগণের চাহিদা এবং তার দৃঢ় বহিঃপ্রকাশ ছাড়া সরকার নিজ থেকে খুব কমই তাদের উপযোগী ও প্রয়োজনীয় কর্মকাণ্ডে অংশ নিয়ে থাকে। সুদ উচ্ছেদের কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে এক্ষেত্রে প্রচলিত ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত। এজন্যে সবার আগে চাই গণসচেতনা। আমাদের দেশের জনগণের একটা অংশ এখনও শিক্ষিত নয়। তাই কাজটা একটু কঠিন ও আয়াসসাধ্য, তবে অসম্ভব নয়। কারণ এ দেশের জনগণ ধর্মভীরু। তাদেরকে যদি যথাযথভাবে ইসলামের দাবী কি এবং তা অর্জনের উপায় কি এটা বোঝানো যায়, প্রকৃতই উদ্বুদ্ধ করা যায় তাহলে এ দেশের অর্থনীতি ও সমাজ কাঠামোয় সুদ বর্জন সময়সাপেক্ষ হতে পারে কিন্তু অসম্ভব নয়। এজন্যে কতকগুলো উপায় অনুসরণ করা যেতে পারে।

প্রথমতঃ মসজিদে জুম'আর খুতবার সাহায্য গ্রহণ। বছরে বায়ান্ন দিন এলাকার জনগণ মসজিদে জুম'আর নামাযে শামিল হন। এই নামাযের খুতবায় নানা বিষয়ের অবতারণা করা হয়। সেসব বিষয়ের পাশাপাশি যদি খতীব বা ইমাম সাহেব সুদী অর্থনীতির কুফল এবং দেশ ও জাতির জন্যে কতখানি ক্ষতিকর তা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে বলেন তাহলে ধীরে ধীরে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি হবে।

দ্বিতীয়তঃ দেশের বিভিন্ন স্থানে ওয়াজ মাহফিল, তাফসীর মাহফিল ও ইসলামী জলসায় উলামায়ে কিরাম ও মুফাসসিরে কুরআনগণ বক্তৃতা করে থাকেন। সেখানে হাজার হাজার লোকের সমাগম হয়। ঐসব অনুষ্ঠানে যদি ইসলামী অর্থনীতির কল্যাণকর দিক এবং সুদী অর্থনীতির কুফল সম্বন্ধে বিশদভাবে বুঝিয়ে বক্তব্য রাখা যায় তাহলে যে আলোড়ন সৃষ্টি হবে, জনমত গড়ে উঠবে তার ধাক্কাতেই সুদী অর্থনীতি উৎখাত হতে পারে, বাস্তবায়িত হতে পারে ইসলামী অর্থনীতি।

তৃতীয়তঃ রেডিও ও টিভিতে কথিকা ও আলোচনা অনুষ্ঠান ও টক শো প্রচলনের ব্যবস্থা গ্রহণ। বর্তমানে টেলিভিশনের প্রভাব বিপুল হলেও রেডিওর কার্যকারিতা ও গ্রহণযোগ্যতা শেষ হয়ে যায়নি। বাংলাদেশে এখন অনেক বেসরকারী রেডিও ও টিভি চ্যানেল রয়েছে। ইসলামী আদর্শ অনুসারী অনেক প্রোগ্রামও প্রচারিত হয় এসব গণমাধ্যম হতে। সেসব প্রোগ্রামেরই অন্তর্ভুক্ত করা যায় এ ধরনের অনুষ্ঠান। এর মাধ্যমে অগণিত দর্শক-শ্রোতার কাছে উপভোগ্যভাবে হারাম উপার্জন ও তার ভয়াবহ পরিণামের কথা তুলে ধরা যেতে পারে। সুদের অপকার সম্বন্ধে মনোজ্ঞ আলোচনা হতে পারে। টক শোর মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা প্রাঞ্জলভাবে বিষয়গুলো উপস্থাপন করলে অজস্র মানুষ এ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে পারে, উপকৃত হতো পারে। তাদের চিন্তার জগতে আলোড়ন সৃষ্টি হতে ব্যাপারে। পরিণামে সুদ পরিত্যাগের জন্যে তাদের অনেকেই যে সক্রিয়ভাবে উদ্যোগ নেবে নিঃসন্দেহে সে আশা করা যায়।

চতুর্থতঃ পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ ও উপসম্পাদকীয় প্রকাশ। দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্র-পত্রিকায় সুদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিকতা বিধ্বংসী প্রসঙ্গসমূহ নিয়ে

www.bjilibrary.com

পরিকল্পিতভাবে নিয়মিত বিশদ আলোচনা প্রকাশিত হতে থাকলে তা যেমন গণসচেতনতা সৃষ্টি করবে, তেমনি গণজাগরণেরও আবহ তৈরী হবে। একই উদ্দেশ্যে সরকারের কাছে আবেদন জানিয়ে, দেশের কর্ণধারদের সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্যে প্রদত্ত আহ্বান জানিয়ে উপসম্পাদকীয়ও প্রকাশিত হতে পারে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে দৈনিক ইত্তেফাকের "রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ" এই ধরনের ভূমিকাই রেখেছিল। দেশে এখন ইসলামী ভাবধারাপুষ্ট কয়েকটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। সেসব দৈনিক এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসলে তা হবে প্রশংসনীয় এক বিরাট খিদমত।

২. আখিরাতে জবাবদিহিতার অনুভূতি জাগ্রত করা ঃ মুসলিমের জীবনে রয়েছে দুটি পর্ব– ইহকাল ও পরকাল বা আখিরাত। পরকালের জীবনটাই অনন্ত, ইহকালের জীবন ক্ষণস্থায়ী, নশ্বর। পরকালের জীবনে রয়েছে অপরিমেয় পুরস্কার অথবা কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আল্লাহ নির্দেশিত পথে ইহকালে জীবন যাপন করলে যেমন আখিরাতে রয়েছে আনন্দময় জীবন তেমনি সেই নির্দেশের পরিপন্থী জীবন যাপনের জন্যে রয়েছে অনন্ত দুঃখভোগ। আল্লাহ নিজেই বলেছেন– অনন্তকাল জাহান্নামে সেই দুঃখভোগ চলতে থাকবে এবং জাহান্নাম নিঃসন্দেহে নিকৃষ্টতম স্থান। এই দুনিয়া পরকালের জন্যে কর্ষণক্ষেত্র স্বরূপ। তাই এখানে যেমন কাজ করা হবে তারই ফল লাভ ঘটবে আখিরাতে। যেসব কারণে আখিরাতে বনি আদমকে ভয়াবহ পরিণামের সম্মুখীন হতে হবে তার অন্যতম হলো হারাম পন্থায় উপার্জন ও হারাম বস্তু ভোগ।

রাসূল (সা) বলেছেন– হারাম খাদ্য হতে শরীরে যে রক্তমাংস সৃষ্টি হয় তা জাহান্নামের আগুনের খোরাক হবে। হারাম খাদ্য শুধু হারাম বস্তু হতেই তৈরী হয় না, হারাম উপার্জন হতে সংগৃহীত খাদ্যও হারাম বলেই গণ্য হবে। সুদ-ঘুষ-চুরি-দুর্নীতি-টেণ্ডারবাজি-জালিয়াতি, ওযনে কম দেওয়া, ভেজাল দেওয়া, নকল করা, জুয়া, ফটকাবাজারী, প্রতারণা প্রভৃতি সবই ইসলামে হারাম। এসব হারাম পন্থায় উপার্জন করা বা বিত্তবান হওয়া যেমন হারাম তেমনি ঐ উপার্জন বা বিত্ত-সম্পদ ভোগ বা ব্যবহার করাও হারাম। পূর্বেই বলা হয়েছে, হালাল রুযী ঈমানের দশ ভাগের নয় ভাগ এবং হালাল রুযী দু'আ কবুল হওয়ার অন্যতম শর্ত। সুতরাং, বলার অপেক্ষা রাখে না যে, হারাম উপার্জন আখিরাতে আমাদের কোন কাজে তো আসবেই না, উল্টো এর পরিণাম ফল হবে ভয়াবহ। এজন্যেই অন্যান্য সব হারাম উপার্জনের মতো সুদও অবশ্যই বর্জন করতে হবে। সুদ খাওয়ার পাশাপাশি সুদের হিসাব লিখে ও সাক্ষ্য দিয়েও উপার্জন করা সম্ভব। এই পথও বন্ধ করতে হবে। অর্থাৎ, কোন প্রকারেই সুদের সাথে কোন সংস্রব রাখা চলবে না। তা না হলে এই আয়ের জন্যে, এই আয়ে জীবন ধারণের জন্যে আখিরাতে ভয়াবহ ও ভীতিকর শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। জনগণের মধ্যে এই চেতনা, এই বোধ জাগিয়ে তোলা অতীব জরুরী।

www.bjilibrary.com

এ দেশের আমজনতার মধ্যে ইসলামপ্রীতি ঈর্ষণীয়। কিন্তু এদের বিপুল অংশই ইসলামের মূল দাবী আমর বিল মারূফ ও নেহী আনিল মুনকারের অনুসরণের মাধ্যমেই যে আল্লাহর ইবাদাত বা তার বন্দেগী হয়, সে সম্বন্ধে প্রায় অনবহিত বললে অত্যুক্তি হবে না। এমন অজস্র লোকের সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে যারা সালাত, সাওম, যাকাত ও হজ্জের আনুষ্ঠানিকতার মধ্যেই ইসলামকে সীমাবদ্ধ করে রেখেছে। অর্থাৎ তাদের বিশ্বাস শুধু এগুলো পালন করলেই একজন মুসলিম হিসাবে আল্লাহর কাছে স্বীকৃত হবে এবং আখিরাতে নাজাত পেয়ে যাবে। আয়-রোজগার, ব্যয়, ভোগ, বিনিয়োগ ইত্যাদি সম্পর্কে ইসলামের নির্দেশ কি সে সম্বন্ধে না তারা জানার চেষ্টা করেছে, না সেসব আমলের ব্যাপারে সতর্ক হয়েছে। তাই এ ব্যাপারে সচেতনা সৃষ্টি করাই হলো অত্যাবশ্যক কাজ।

হালাল রুযী উপার্জনের ব্যাপারে, হালাল আহার ও হালার সামগ্রী ভোগের ব্যাপারে খুলাফায়ে রাশিদীন, সাহাবায়ে কিরাম, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন, এমনকি মাযহাবী ইমামগণ কতদূর সতর্ক ছিলেন সে খবর আমরা কতজন রাখি? অথচ সেইসব উদাহরণই হওয়া উচিৎ ছিল আমাদের পালনীয় আদর্শ। বহু লোক আখিরাতকে ভয় করলেও আখিরাতের জবাবদিহিতা সম্পর্কে হয় অনবহিত, নয়তো গাফিল বা অসতর্ক। বর্তমানের প্রয়োজনের অজুহাতে অথবা শয়তানের কৌশলী প্রতারণা বা প্ররোচনায় বশীভূত হয়ে তারা দুনিয়া তথা এর সম্পদ ও ভোগবিলাস অর্জনের জন্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। ফলে হালাল হারামের বাছ-বিচার তার কাছে গৌণ বা তাচ্ছিল্যের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভ্রান্তি এতদূর পর্যন্ত পৌঁছেছে যে, সুদের কারবার করে, সুদের লেনদেন করে, সুদী উপার্জনের অর্থেই এই উদ্দেশ্যে হজ্জ করতে যায় যে হজ্জের কারণে আল্লাহ তা'য়ালা তার সমুদয় গুনাহ মাফ করে দেবেন। অথচ সহীহ হাদীসের মর্মার্থ এর বিপরীতটাই।

৩. পাঠ্যসূচীতে ইসলামী অর্থনীতি চালু করা ঃ বাংলাদেশের সংখ্যাগুরু জনগণের তথা মুসলিম জনগোষ্ঠীর সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য এই যে স্কুল-কলেজের শিক্ষার বিষয়বস্তুর সঙ্গে তাদের ঈমান ও আকীদার কোন সংশ্রব নেই। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে শিক্ষার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে প্রবর্তিত ইসলামী শিক্ষার কথা বাদ দিলে উচ্চতর শিক্ষা এবং বিশেষ শিক্ষার কোন পর্যায়েই ইসলাম যে একটা পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা তা জানার ও অনুশীলনের কোনও সুযোগ নেই। এই অবস্থার নিরসন হওয়া দরকার। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠ্যসূচীতে দেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর ঈমান-আকীদার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। এজন্যে প্রয়োজন গোটা পাঠ্যসূচীর সংস্কার। যারা আগামী দিনে এ দেশের প্রশাসন বিচার আইন ব্যবসা-বাণিজ্য ও কল-কারখানার কর্ণধার হবে তাদের যদি এখনই সুদী অর্থনীতির কুফল ও ধ্বংসাত্মক দিক সম্বন্ধে অবহিত করা না যায় এবং পাশাপাশি ইসলামী অর্থনীতির গঠনমূলক ও হিতকর দিকগুলো জানানো না যায় তাহলে জাতি যে তিমিরে রয়েছে সেই তিমিরেই রয়ে যাবে।

www.bjilibrary.com

কিশোর বয়সেই যা শেখা যায়, যে বিষয়গুলো স্কুলের পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত থাকে সারা জীবন তার প্রভাব রয়ে যায় মানুষের চিন্তা, চেতনা ও কর্মধারার উপর কখন সচেতনভাবে কখনো অবচেতন মনে। সেজন্যেই বিভিন্ন মতাদর্শের স্কুলের পাঠ্যসূচীর বিষয়সমূহ নির্বাচন করা হয় যথেষ্ট সতর্কতার সাথে, প্রচুর যাচাই-বাছাই ও চিন্তা-ভাবনার পর। জাতীয় আদর্শ ও লক্ষ্য, মানবিক মূল্যবোধ, কল্যাণময় জীবন, সমৃদ্ধ ও নিরাপদ সমাজ গঠনের জন্যে যেসব মৌলিক বিষয়ের জ্ঞান অর্জন অপরিহার্য সেসব বিষয়ই স্কুলের পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত থাকে। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোর স্কুল পাঠ্যসূচী বা যেসব সিলেবাস অনুসরণ করা হয় সেগুলি একটু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে এই সত্য সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়বে। আমাদের দেশেও বিগত দশকগুলিতে স্কুলের পাঠ্যসূচীর পরিবর্তন লক্ষণীয়। দেশের মুক্তি সংগ্রামের গৌরবোজ্জ্বল কাহিনী, বীর শ্রেষ্ঠদের জীবনগাঁথা, জনসংখ্যা বৃদ্ধির কুফল, এমনকি একেবারে সাম্প্রতিককালে এইডসের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কেও আলোচনা বাধ্যতামূলকভাবে ঠাঁই পেয়েছে স্কুলের পাঠ্যসূচীতে।

অথচ গভীর পরিতাপের বিষয়, ইসলামী জীবনাদর্শ, ইসলামী শিক্ষা, অমর মুসলিম মনীষীদের জীবন কাহিনী এই পাঠ্যসূচীতে গুরুত্বের সাথে ঠাঁই করে নিতে পারেনি। ফলে লক্ষ লক্ষ শিশু কিশোর-কিশোরীর ইসলামী ভাবধারাপুষ্ট হয়ে গড়ে ওঠার কোন সুযোগ নেই। এক্ষেত্রে এ দেশের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও বামপন্থী বুদ্ধিজীবিদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিকড়হীন জনসমর্থনহীন বাকসর্বস্ব মুষ্টিমেয় এইসব বুদ্ধিজীবির সুকৌশলী পদক্ষেপ বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। স্কুল-কলেজের পাঠ্যসূচীতে যেন কোনক্রমেই ইসলামী জীবনাচরণ সম্পর্কে জানার ও শেখার সুযোগ না থাকে সেজন্যে এরা প্রায়শঃই সেক্যুলার পাঠ্যসূচীর যৌক্তিকতা, বিজ্ঞানমনস্ক পাঠ্যসূচীর অপরিহার্যতা ইত্যাকার চটকদার ব্যানারে সেমিনার সিম্পোজিয়াম-ওয়ার্কশপের আয়োজন করে গৃহীত সুপারিশ-সমূহ জাতীয় দাবী শিরোনামে সরকারের সংশ্লিষ্ট মহলের কাছে পেশ করে। একই সঙ্গে তাদের ঘরানার পত্রিকাগুলোও জোর সমর্থন দিয়ে যায়। ফলে সরকারের নীতি নির্ধারকরাও বিভ্রান্ত বা বিচলিত না হয়ে পারে না।

অথচ দেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর ঈমান-আকীদার সাথে সম্পর্কিত বিষয় স্কুল-কলেজের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা উচিৎ ছিল। ইসলামী জীবনাচরণ, হালাল উপার্জনের অপরিহার্যতা, যাকাতের সামাজিক-অর্থনৈতিক সুফল সুদের অবশ্যম্ভাবী ক্ষতিকর প্রসঙ্গ প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা খুবই জরুরী। গল্প, প্রবন্ধ, সত্য ঘটনা ইত্যাদি আকারে বয়স উপযোগীভাবে এসব বিষয়ের অবতারণা করা যেতে পারে।

৪. সামাজিক প্রতিরোধ সৃষ্টি ঃ সুদের মতো ভয়াবহ এক অক্টোপাসের খপপর থেকে মুক্তি লাভ করতে প্রয়োজন মজবুত সামাজিক প্রতিরোধ। যথাযথ সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারলে বহু অন্যায়-অপকর্ম ও অসামাজিক কাজ হতে জনগণকে বিরত রাখা যায়। বিপরীতক্রমে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে পারলে, সামাজিকভাবে সচেতন করতে পারলে বহু কঠিন কাজও সহজ হয়ে যায়। এদেশে বনায়ন কর্মসূচী তার জাজ্বল্যমান

www.bjilibrary.com

উদাহরণ। বছর ত্রিশেক পূর্বে দেশের অনেক এলাকায় মরুকরণের লক্ষণ ফুটে উঠেছিল। সেই সময়ে বৃক্ষরোপণের আবশ্যকতা সম্বন্ধে জনমত তৈরীর উদ্যোগ নেওয়া হয়। রেডিও-টেলিভিশন সংবাদপত্র প্রভৃতি গণমাধ্যমে নানা অনুষ্ঠান প্রচার ছাড়াও স্কুল-কলেজ-মক্তব-মাদরাসার ছাত্র-ছাত্রীদের এই কাজে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচী গৃহীত হয়। এ কাজের সামাজিক স্বীকৃতি স্বরূপ শহর, বিভাগ ও জাতীয় পর্যায়ে পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। আজ তার সুফল পাওয়া যাচ্ছে।

সুদ উচ্ছেদের জন্যে এ ধরনের জনমত গঠনের পদক্ষেপ নিতে হবে। এক সময়ে এ দেশের সমাজে সুদ বিরোধী মনোভাব বিদ্যমান ছিলও। কিন্তু আজ সমাজে সুদখোরদের দাপট চোখে পড়ার মতো। গ্রামাঞ্চলে ও শহরে সুদের লেনদেনকারী ব্যবসায়ী-পুঁজিপতিরা সকল কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে নিয়েছে। সুদকে আজ আর ঘৃণার চোখে দেখা হচ্ছে না। সুতরাং, এর প্রতিবিধানের চেষ্টা না করলে এই সর্বনাশা পাপ ও সমাজবিধ্বংসী বিষ আরও ভয়াবহ রূপ নেবে। এজন্যেই প্রয়োজন সামাজিক প্রতিরোধ সৃষ্টি। এই প্রতিরোধ যতই ব্যাপক ও দুর্বার হবে সুদের নিষ্পেষণ ততই আলগা হতে বাধ্য। ক্রমে এক সময়ে তা খসে পড়বে। এসব পদক্ষেপের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা গেল।

১. সুদখোরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ।

সমাজে যারা সুদখোর বলে পরিচিত, তাদের পরিচিতি যাই হোক না কেন ধীরে ধীরে তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতে হবে। তারা যেন বুঝতে পারে যে সুদের সঙ্গে সংশ্রব থাকার কারণেই জনগণ তাদের সঙ্গ বর্জন করছে বা তাদের এড়িয়ে চলছে। কাজটা কঠিন মনে হতে পারে কিন্তু সকলে মিলে এগিয়ে এলে মোটেই দুঃসাধ্য নয়।

২. সুদখোরদের জনপ্রতিনিধি না বানানো।

জনপ্রতিনিধিত্বমূলক কোন কাজে সুদখোরদের নির্বাচিত হতে দেওয়া হবে না। তারা ভোটপ্রার্থী হলে যেন ভোট না দেওয়া হয় সেজন্যে জোর প্রচারণা চালাতে হবে। জনগণকে বুঝাতে হবে এই সব লোকের কার্যক্রমের জন্যেই সমাজে শোষণ নির্যাতন নিপীড়ন জগদ্দল পাথরের মতো চেপে থাকবে।

৩. সুদখোরদের সামাজিকভাবে বয়কট করা।

যারা সুদের ব্যবসা করে, গ্রামে মহাজনী কারবারের (গ্রামাঞ্চলে সুদী ব্যবসার প্রচলিত নাম) সাথে যারা যুক্ত তাদের ছেলে-মেয়ের সাথে নিজেদের ছেলে-মেয়েদের বিয়ে না দেওয়া উত্তম প্রতিষেধকের কাজ করতে পারে। বাংলাদেশেই আজ হতে পঞ্চাশ-ষাট বছর পূর্বে গ্রামাঞ্চলে সুদখোরের দাওয়াত কেউ সহজে গ্রহণ করতে চাইতো না। কিন্তু পুঁজিবাদী অর্থনীতির দাপটে এবং দীনি শিক্ষা বঞ্চিত হওয়ার কারণে সেই অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে।

৪. সরকার যেসব ক্ষেত্রে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে সুদ প্রদান বাধ্যতামূলক করে রেখেছে সেগুলো রহিত করার জন্যে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলা যেতে পারে।

www.bjilibrary.com

উদাহরণতঃ জমির খাজনা যথাসময়ে দিতে না পারলে তার উপর সুদ দিতে হয়। সুদের বদলে সরকার জরিমানা আরোপ করতে পারে। ঈমান ও আকীদা বিরোধী সুদ কেন দিতে হবে? অনতিবিলম্বে সরকার যেন খাজনার খাত থেকে সুদ প্রত্যাহার করে নিতান্তই অপরিহার্য ক্ষেত্রে জরিমানার ব্যবস্থা চালু করে সেই লক্ষ্যে জনমত গঠন করা প্রয়োজন।

উপরে উল্লেখিত কাজগুলো কঠিন নিঃসন্দেহে। কিন্তু মুমিনের জীবনে কোন কাজটি সহজ? বরং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের উপর তাওয়াক্কুল করে তারই সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে সমবেতভাবে এসব উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে।

৫. অনাবশ্যক সামাজিক ব্যয় প্রতিরোধ।

সমাজে বসবাস করতে হলে নানা সামাজিক অনুষ্ঠানে যেমন যোগ দিতে হয় তেমনি আয়োজনও করতে হয়। কিন্তু বিপত্তি বাধে যখন ঐসব অনুষ্ঠান আড়ম্বরও ঐশ্বর্যের প্রদর্শনী হয়ে দাঁড়ায়। উপরন্তু অনেক অনুষ্ঠান ধর্মীয় অনুষ্ঠান বলে প্রচলিত থাকলেও প্রকৃতপক্ষে ঐসব অনুষ্ঠানের কোন ধর্মীয় ভিত্তিই নেই। যেমন কেউ মারা গেলে মৃত্যুর পর চল্লিশ দিনের মাথায় ধুমধাম করে দশ গ্রামের বা মহল্লার লোকজন ডেকে খানাপিনার আয়োজন করা। ছেলের খৎনা উপলক্ষে বন্ধু-বান্ধব, পড়শী-স্বজন সকলকে ডেকে উৎসবমুখর পরিবেশ ও ভোজের আয়োজন এবং অভ্যাগতদেরকে উপঢৌকন প্রদানে বাধ্য করা। এছাড়া রয়েছে জন্মদিন, মৃত্যুবার্ষিকী, বিবাহ-বার্ষিকী প্রভৃতি নানা অনুষ্ঠান। রয়েছে বিচার আচার ও শালিশী বৈঠক। এসব বৈঠকের জন্যে যে প্রচুর ব্যয় হয় তা বলাই বাহুল্য। বিয়ে-শাদীর কথা তো না বলাই ভালো। ইসলামের এই অপরিহার্য ও সরল সামাজিক অনুষ্ঠানটিতে বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুসরণে ঢুকে পড়েছে পান-চিনি বা পাকাদেখা, গায়ে হলুদ, বিয়ের তত্ত্ব পাঠানো এবং অতি অবশ্যই ঘৃণ্য যৌতুক প্রথা। সম্প্রতি যৌতুকবিরোধী মনোভাব দানা বেঁধে ওঠার প্রেক্ষিতে একে গিফট বা উপঢৌকনের লেবাস পরানো হয়েছে।

একজন বিত্তশালী ব্যক্তি অক্লেশে এসব অনুষ্ঠানের ব্যয়ভার বহনে সক্ষম। অনেক ক্ষেত্রে নতুন বিত্তশালী বা হঠাৎ করে ধনী হওয়া লোকেরা সামাজিক পরিচিতি, প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা লাভের জন্যে তাদের অর্জিত নতুন বিত্ত খরচ করেন অকাতরে। সমস্যার সৃষ্টি হয় যখনই একই ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে বলা হয় মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্তশ্রেণীর কাউকে। সমাজপতিরা রায় দেন– এটা করতে হবে, ওটা করতে হবে, এটা দিতে হবে। না হলে সমাজচ্যুত হতে হবে। অথচ এসবের ব্যয়ভার বইবার সাধ্য তার নেই। নিরূপায় হয়ে তখন তাকে সহায় সম্বল বিক্রি করতে হয় অথবা ঋণ নিতে হয় হয় সুদ দেবার শর্তে। সাধারণতঃ এসব সামাজিক প্রয়োজনে ঋণের সুদের হার বেশ চড়া হয়ে থাকে। কারণ ঋণদাতা ভাল করেই জানে যে ঋণ গ্রহীতার বিকল্প কোন উপায় নেই। সামাজিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার জন্যে বাধ্য হয়ে নেওয়া এই ঋণ অতি অবশ্যই অনুৎপাদনশীল ও অপ্রয়োজনীয় শ্রেণীর। ফলে তা পরিশোধ করা হয়ে দাঁড়ায় আরও দুরূহ। তাই ঋণের বোঝা চেপে বসে গ্রহীতার মাথায় জগদ্দল পাথরের মতো। শেষ অবধি তাকে শেষ সম্বল

www.bjilibrary.com

চাষের জমিটুকু, এমনকি ভিটেমাটি পর্যন্ত বেচে দিতে হয় ঋণ পরিশোধের জন্যে। এই পথে গ্রাম বাংলার হাজার হাজার মাঝারি ও প্রান্তিক কৃষক ভূমিহীন চাষীতে পরিণত হয়েছে। চাকুরীজীবিদের অনেকের ক্ষেত্রে এই ব্যয় পুষিয়ে নেবার অন্যতম উপায় ঘুষ যার বোঝা বইতে হয় পরোক্ষভাবে সমাজের সকলকেই। এর প্রতিবিধান ও প্রতিরোধের জন্যে চাই গণসচেতনতা।

অর্থনৈতিক কর্মসূচী

১. শরীয়াহভিত্তিক ফাইন্যান্সিয়াল প্রতিষ্ঠানের প্রসার ঃ আধুনিক সময়ে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে চাঙ্গা রাখতে হলে ব্যাংক, বীমা ও অন্যান্য ফাইন্যান্সিয়াল প্রতিষ্ঠানের অপরিহার্যতার কথা গুরুত্বের সাথেই স্বীকার করতে হবে। কিন্তু প্রচলিত সব প্রতিষ্ঠানই সুদনির্ভর বিধায় শরীয়াহর সাথে সাংঘর্ষিক। এরই প্রতিবিধানের জন্যে গত তিন দশক ধরে মুসলিম বিশ্বে গড়ে উঠেছে ইসলামী শরীয়াহভিত্তিক ব্যাংক, বীমা ও বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান। আনন্দের কথা, প্রতিষ্ঠার সাথে সাথেই এসব প্রতিষ্ঠান ব্যাপক জনপ্রিয়তা এবং একই সঙ্গে সাফল্য অর্জনেও সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু দেশের সর্বত্র এসব প্রতিষ্ঠানের শাখা তথা কার্যক্রম ছড়িয়ে পড়তে পারেনি এখনও। কোন কোন ক্ষেত্রে এসব প্রতিষ্ঠানের যেমন রয়েছে নিজস্ব সীমাবদ্ধতা, তেমনি রয়েছে নানা আইনী প্রতিবন্ধকতা।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, দেশে ক্রমবিকাশমান ইসলামী ফাইন্যান্সিয়াল প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্যে আজ অবধি কোন বিধিবদ্ধ আইন প্রণীত হয়নি। গভীর পরিতাপের বিষয়, এ দেশে সাংবিধানিকভাবেই ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম হলেও এ বিষয়ে কোন সরকারই প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহন করেননি। বরং এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের বিকাশ ও সমজাতীয় প্রতিষ্ঠান নতুনভাবে স্থাপনের ক্ষেত্রে নিরন্তর বিধি-নিষেধ ও নানা পরোক্ষ বাধার বেড়াজাল আরোপিত হচ্ছে সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্তৃপক্ষের তরফ হতেই। এ দেশে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের ঈর্ষণীয় সাফল্যে প্রভাবিত হয়ে কয়েকটি সুদী ব্যাংকের ইসলামীকরণ ঘটেছে। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বেশ কয়েকটি ইসলামী বীমা ও ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন। কিন্তু এরপরই নতুনভাবে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ব্যাপারে কঠোর শর্ত আরোপ করা হয়েছে। এই শর্ত শিথিল করলে জনগণ ইসলামী পদ্ধতিতেই বীমা পলিসি গ্রহণ ও ব্যবসা-বাণিজ্য করার সুযোগ পাবে। ফলে ক্রমশ সুদের বাজার ও দাপট সংকুচিত হয়ে আসবে। সুদ উচ্ছেদের জন্যেই দেশে আরও ইসলামী পদ্ধতির ব্যাংক, বীমা ও বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন এবং একই সাথে সেসবের সেবা তৃণমূল পর্যায়ে পৌছানোর উদ্দেশ্যে যথাযথ কর্মকৌশল উদ্ভাবিত ও বাস্তবায়িত হওয়া আবশ্যক।

২. করযে হাসানা ও মুদারাবা পদ্ধতির বাস্তবায়ন ঃ সমাজে কর্মচাঞ্চল্য সৃষ্টি এবং বিত্তহীন দক্ষ ও যোগ্য লোকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতে পারে করযে হাসানা ও মুদারাবা পদ্ধতি। ইসলামী অর্থনীতির এই অপরিহার্য বিধান দুটি এ দেশে অনুপস্থিত। অথচ পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত, এমনিক সংখ্যালঘু মুসলিমের দেশ শ্রীলংকাতেও

www.bjilibrary.com

মসজিদভিত্তিক করযে হাসানা প্রদান ও সোসাইটিভিত্তিক মুদারাবা ব্যবস্থা চালু রয়েছে। এ দেশেও এই ব্যবস্থা চালু করা প্রয়োজন। সমাজের বিত্তশালী লোকদের করযে হাসানা দেওয়ার জন্যে উদ্বুদ্ধ করতে হবে, এই উদ্যোগ যদি মসজিদকেন্দ্রিক হয় তাহলে সত্যিকার যোগ্য লোককে যেমন সুযোগ দেওয়া যাবে। তেমনি এলাকাভিত্তিক উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণের পাশাপাশি সমাজ সচেতনতা ও সমাজকল্যাণ নিশ্চিত হবে।

মুদারাবা পদ্ধতি এ দেশে চালু করতে সময়ের প্রয়োজন। এ জন্যে প্রয়োজন হবে আইন কাঠামো বদলানোর পাশাপাশি উত্তম চরিত্রের লোক সৃষ্টির। উত্তম ও যোগ্য লোকেরা মুদারাবার মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও উৎপাদন বৃদ্ধি– উভয়বিধ উপায়েই দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে পারে। উপরন্তু সমাজের বিত্তশালী লোকদের মনোভাব পরিবর্তনের জন্যে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। এজন্যে প্রয়োজন তাদের ইসলামী অনুশাসন জানতে ও অনুসরণ করতে উদ্বুদ্ধ করা। এতে দুঃসময়ে প্রয়োজনীয় ঋণ পাওয়া সহজ হবে বিনা সুদেই এবং বিনিয়োগ গ্রহীতা সুদ প্রদানের বাড়তি দায় হতে রক্ষা পাবে। করযে হাসানা দিলে সেই অর্থের জন্যে আয়কর দিতে হবে না এবং মুদারাবার ক্ষেত্রে সাহিব আল-মালকে কেবল মুনাফার নির্দিষ্ট পরিমাণের উর্ধ্বের জন্যে আয়কর দিতে হবে এমন আইন করে বিত্তশালী মুসলিমদের মনোযোগ এ ক্ষেত্রে আকর্ষণ করা সম্ভব।

৩. ক্ষুদ্র বিনিয়োগের উপযুক্ত কৌশল উদ্ভাবন ঃ দরিদ্র অথচ কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের জন্যে পুঁজির প্রয়োজন অনস্বীকার্য। সেই পুঁজির পরিমাণও যে খুব বেশি এমন নয়। কিন্তু তা-ই তাদের কাছে সহজলভ্য নয়। এই প্রয়োজন পূরণের জন্যে স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল হিসেবে ক্ষুদ্রঋণের প্রসার ঘটেছে। আমাদের দেশও তার ব্যতিক্রম নয়। বর্তমানে বাংলাদেশে ছোট-বড় জাতীয়-আঞ্চলিক মিলিয়ে পাঁচ শতাধিক এনজিও এই কাজে অংশ গ্রহণ করে চলেছে। কিন্তু দরিদ্র জনগণ, বিশেষতঃ মহিলারা যারা ক্ষুদ্র ঋণের সর্ববৃহৎ ক্লায়েন্ট তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার কি সত্যি দৃশ্যমান ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটেছে? দু-চারটি সম্মানজনক ব্যতিক্রমী ঘটনাকে উদাহরণ হিসেবে দেখানো যায়, কিন্তু সেসবের ভিত্তিতে সরলীকরণ করে সিদ্ধান্তে উপনীত হলে বিপত্তি ঘটে। ঋণ ও সুদ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। নির্দিষ্ট হারে সুদসহ কিস্তি প্রদানের শর্তেই এনজিওরা ঋণ দিয়ে থাকে। পুঁজি পাওয়ার কোন সহজ উপায় না থাকায় নিরূপায় হয়েই দরিদ্র মহিলা ও পুরুষরা ঋণ নেয়। এই ঋণের সুদের হার যথেষ্টই চড়া।

দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পি.এইচ.ডি ডিগ্রীর জন্যে পরিচালিত সম্প্রতি সমাপ্ত কয়েকটি মাঠ গবেষণা তথ্য হতে দেখা গেছে, এনজিওদের প্রদত্ত ঋণ ব্যবহার করে গ্রামীণ মহিলাদের দারিদ্র্য যেটুকু হ্রাস পেয়েছে তা খুবই অকিঞ্চিৎকর। তাদের স্বনির্ভরতা অর্জন বা নীট দারিদ্র্য হ্রাস ঘটেনি। এর প্রধান কারণ, প্রাপ্ত ঋণ কাজে লাগিয়ে ঋণগ্রহীতারা যা উপার্জন করে তার বৃহৎ অংশই চলে যায় সুদ শোধ করতে। ফলে তাদের হাতে উদ্বৃত্ত থাকে যৎসামান্যই। তাদের অপেক্ষায় থাকতে হয় পুনরায় ঋণ

www.bjilibrary.com

পাবার জন্যে। পুনরায় ঋণ না পেলে তার কর্মসংস্থানের উপায়টিও রুদ্ধ হয়ে যায়। এছাড়া সুদের মূলধনের কিস্তি শোধ করতে গিয়ে বহু সময়েই দারুণ বিড়ম্বনাময় পরিস্থিতির শিকার হতে হয় ঋণগ্রহীতাকে। সুদভিত্তিক এনজিওর মাঠকর্মীরা খাতকের ঘরের চালের টিন খুলে নিয়েছে, শেষ সম্বল দুধের গরু ধরে নিয়ে গেছে, এমনকি ন্যূনতম ভব্যতার মুখোশ ছুঁড়ে ফেলে সধবার নাকফুল পর্যন্ত খুলে দিতে বাধ্য করেছে কিস্তির টাকা পরিশোধের জন্যে, এমন খবর প্রকাশিত হচ্ছে দেশের জাতীয় দৈনিকগুলোতে। কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হয়ে অপমানের জ্বালা সইতে না পেরে আত্মহত্যা করেছে এমন উদাহরণও অপ্রতুল নয়।

এই অবস্থা হতে পরিত্রাণের জন্য বিকল্প ইসলামী পদ্ধতিসমূহের ব্যবহার করতে হবে। উদ্যোগ নিতে হবে ঋণ নয়, বিনিয়োগ প্রদানের জন্যে। এই উদ্দেশ্যে অংশীদারিত্বমূলক বিনিয়োগ স্কীম বা Partcipatory Investment Scheme চালু করা বাঞ্ছনীয়। এটি মুদারাবা পদ্ধতিরই একটি রূপ। এই পদ্ধতিতে বিনিয়োগ হতে অর্জিত মুনাফার একটা অংশ পাবে সংশ্লিষ্ট এনজিও, বাকীটা পাবে উদ্যোক্তা। লাভ যদি না হয় তাহলে উদ্যোক্তাকে কোন বাড়তি ঝুঁকি নিতে হবে না। এক্ষেত্রে যেহেতু পূর্ব নির্ধারিত হারে সুদ পরিশোধের শর্ত নেই সেহেতু লাভ না হলেও বাধ্যতামূলকভাবে সুদ প্রদানের দায়িত্বও নেই। কাজেই কষ্টার্জিত উপার্জনের সিংহভাগ তুলে দিতে হবে না এনজিওদের হাতে। প্রকৃত অর্থে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রহীতারাই উপকৃত হবে এই পদ্ধতিতে। পাইলট স্কীম হিসেবে হলেও এই পদ্ধতি চালু সময়ের দাবী। তৃণমূল পর্যায় হতে সুদ উচ্ছেদের জন্যে এটি কার্যকর কৌশল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

৪. আড়ম্বরপূর্ণ ব্যয় পরিহার ঃ বিলাসিতা ও আড়ম্বরপ্রিয়তার পথ ধরে অর্থ ব্যয়ের পরিমাণ ক্রমশই বৃদ্ধি পায়। এক সময়ে নিয়মিত উপার্জনে ব্যয় সংকুলান না হলে ঋণের আশ্রয় নিতে হয়। এই মোক্ষম সুযোগে সুদ অনুপ্রবেশ করে সংসারে। সাধ্যের বাইরে যেয়ে বিলাসবহুল বাড়ী বানাতে হলে, ফ্যাশনেবল গাড়ী কিনতে হলে, কেতাদুরস্ত লাইফস্টাইল অনুসরণ করতে হলে ঋণ না করে উপায় নেই। পূর্বেই বলা হয়েছে, ঋণ ও সুদ অঙ্গাঙ্গী সম্পৃক্ত। তাই ঋণ পেতে হলে সুদ দেবার অঙ্গীকার করতেই হয়। উপরন্তু বর্তমান সময়ে কিস্তিতে যেসব গৃহসামগ্রী ও ইলেকট্রিক-ইলেকট্রোনিক দ্রব্যসামগ্রী বিক্রি হয় সেসবেও যুক্ত রয়েছে সুদ। তাই ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবন হতে সুদ উচ্ছেদ করতে হলে অতি অবশ্যই বিলাসিতা, অসুস্থ প্রতিযোগিতা, অন্যের অন্ধ অনুসরণ এবং আড়ম্বরপ্রিয়তা পরিহার করা যৌক্তিক দাবী।

উপসংহার

আশা করা যায়, উপরে আলোচিত উপায়সমূহ অনুসরণ ও বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে এ দেশের সুদের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঘোষিত হারাম বর্জনের জন্যে সর্বাত্মক প্রয়াস সূচিত হবে। এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মন-মানসিকতা প্রবলভাবে ইসলামমুখী। পক্ষান্তরে বিদ্যমান আইন-কাঠামো,

www.bjilibrary.com

সামাজিক আচরণ, এমনকি ব্যবসায়ীদের অধিকাংশেরই চিন্তা-চেতনা ঈমান-আকীদার সাথে সাংঘর্ষিক। ফলে সমাজে বিরাজমান রয়েছে এক বিষম অবস্থা।

আজও পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা ও রোমান-বৃটিশ আইন দ্বারা এ দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান নিয়ন্ত্রিত। এই প্রতিকূল অবস্থার কথা বিবেচনায় রেখেই বলা যায়, সুদ বর্জন ও উচ্ছেদের জন্যে যেমন একদিকে চাই ঈমানের জোর ও সুদের নানামুখী ধ্বংসাত্মক কুফল সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান, অন্যদিকে তেমনি চাই সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ। সুদ উচ্ছেদ ও বর্জনের কৌশল হিসেবে যেসব উপায়ের আলোচনা করা হয়েছে সেগুলোই শেষ কথা নয়, আরও উপযুক্ত পথ বা কৌশল উদ্ভাবিত হতে পারে। কিন্তু কাগজের পাতাতেই এসব কৌশল আবদ্ধ থাকলে কোন সুফল আসবে না। বরং বাস্তবায়নযোগ্য একটি এ্যাকশন প্ল্যান রচনা করে সেই অনুযায়ী ধীর অথচ দৃঢ়ভাবে এগিয়ে গেলে আল্লাহর সাহায্য প্রাপ্তিরও আশা করা যায়।

বস্তুতঃ অর্থনীতি সুদবিহীন হলে বিনিয়োগের জন্যে যেমন অর্থের অব্যাহত চাহিদা থাকবে তেমনি সঞ্চয়েরও সদ্ব্যবহার হবে। এর ফলে নতুন নতুন কলকারখানা স্থাপন ও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণের মাধ্যমে অধিক উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও সম্পদের সুষম বণ্টন ঘটবে। প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাবে। একচেটিয়া কারবার হ্রাস পাবে। অতি মুনাফার সুযোগ ও সমাজ স্বার্থবিরোধী বিনিয়োগ বন্ধ হবে। এই সমস্ত উদ্দেশ্য সাধন ও বড় ধরনের শোষণের পথ রুদ্ধ করে দেওয়ার জন্যেই ইসলাম সুদকে হারাম বা অবৈধ ঘোষণা করেছে। বস্তুতঃ যুলম ও বঞ্চনার অবসান ঘটাতে হলে তার উৎসকেই সমূলে বিনাশ করতে হবে। সেটাই বিজ্ঞানসম্মত পন্থা। মহাগ্রন্থ আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে– "নাসরুম মিনাল্লাহি ওয়া ফাতহুন কারীব।" তবে সেজন্যে নিজেদের যোগ্য করে গড়ে তুলতে হবে। এক অর্থে সুদ উচ্ছেদ একটি জিহাদ। তাই এজন্যে যে কোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকতে হবে। তবেই সুদের ভয়াবহ যুলম হতে মানবতা মুক্তি পাবে। হালাল রিযক প্রাপ্তির মাধ্যমে দু'আ কবুলের বদৌলতে আল্লাহর সাহায্য ও ক্ষমা লাভের সুযোগ হবে। একই সাথে ইহলৌকিক কল্যাণের পাশাপাশি পারলৌকিক সাফল্যও নিশ্চিত হবে। ■

লেখক-পরিচিতি : শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান– বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

লেখা-পরিচিতি : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সেমিনারে প্রবন্ধটি উপস্থাপন করা হয়।

www.bjilibrary.com

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক এবং আমাদের অস্তিত্বের সংগ্রাম

আজিজুল হক বান্না

■

প্রাকৃতিক অনিবার্যতা ও ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতার কারণে বাংলাদেশ ভারতের অপরিহার্য প্রতিবেশী। বলা যায়, এটা নিয়তি নির্ধারিত ব্যবস্থাপনা। এ কারণে কাংখিত বা অনাকাংখিত যাই-ই হোক, প্রতিবেশীকে নিয়েই বসবাস করা রাজনৈতিক বাস্তবতা। আর এখানেই আসে প্রতিবেশীর মন-মানসিকতা ও আচরণগত প্রসঙ্গ। বিশ্ব রাজনীতির চূড়ান্ত বিচারে শান্তিই হচ্ছে মানবজাতির অভীপ্সা। শান্তির জন্য চাই সমঝোতা, সম্প্রীতি ও মানবিক সৌহার্দ্যের আকুতি। তার চেয়েও বড়ো কথা, শান্তির জন্য চাই বহুমাত্রিক নিঃশর্ত সদিচ্ছা। পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে চাই সার্বভৌম সমতার প্রতি নিঃশর্ত স্বীকৃতি। কিন্তু ভারত বাংলাদেশের অভ্যুদয় কাল থেকে শান্তিপূর্ণ সমঝোতার আগ্রহ ও সার্বভৌম সমতার নীতির প্রতি কোন শ্রদ্ধা বা আগ্রহ দেখায়নি। এ সত্য আমরা অকপটে উচ্চারণ করতে চাই। অহমিকা, দাদাগিরির রক্ত চক্ষু এবং জাতিগত শঠতার বিচিত্র ধারায় ভারত বাংলাদেশকে কার্যতঃ একটি 'আশ্রিত রাষ্ট্র' বানিয়ে রাখতে চায়। আমাদের অভিজ্ঞতা-লব্ধ সত্য হচ্ছে এই যে, ভারত বাংলাদেশের স্বকীয়তা, বৃহত্তর জনগণের জীবন-বিশ্বাস, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, জাতীয় সমৃদ্ধি এবং রাষ্ট্রীয় শক্তি-সামর্থ্যের প্রতি কখনও শ্রদ্ধা দেখায়নি।

www.bjilibrary.com

ভারত যেমন বাংলাদেশকে সার্বভৌম সমতার ভিত্তিতে সু-প্রতিবেশী হিসেবে মেনে নিতে পারেনি, বাংলাদেশের জনগণও তেমনি ভারতকে সৎ প্রতিবেশী, উন্নয়নের সুহৃদ অংশীদার হিসেবে মেনে নিতে পারেনি। ভারতের মতো শত কোটি মানুষের একটি বড়ো দেশ বাংলাদেশের মতো একটি ছোট প্রতিবেশী দেশকে আস্থা ও সৎ প্রতিবেশীসূলভ আচরণে জয় করতে পারেনি। এটা ভারতেরই সীমাবদ্ধতা। শক্তির দম্ভ এবং শঠতার কলা-কৌশল দিয়েই ভারত বাংলাদেশকে পদানত করে রাখতে চায়।

ইতিহাসের লেগাসী

১৯৪৭-এর ঐতিহাসিক দেশ বিভক্তি এবং একাত্তরে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের মানচিত্রের ওপর স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় ভারত দৃশ্যতঃ সহায়তা দিলেও বাংলাদেশকে মনে-প্রাণে মেনে নিতে পারেনি। ভারত মনে করে, একাত্তরে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের মধ্য দিয়ে ভারত-বিভক্তির ঐতিহাসিক ভিত্তি দ্বি-জাতি-তত্ত্বের অপমৃত্যু ঘটেছে। অর্থাৎ মুসলিম জাতীয়তার ভিত্তিতে উপ-মহাদেশ বিভক্তির রাজনৈতিক সমঝোতার বিষয়টি ভারত অস্বীকার করার মওকা হিসেবেই একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকে ব্যবহার করেছে। রাজনৈতিক বাস্তবতায় বা সামরিক বিবেচনায় কিংবা জনসংখ্যাগত তুলনায়, অর্থনৈতিক শক্তি-সামর্থের বিচারে বাংলাদেশ কোনভাবেই ভারতের জন্য 'থ্রেট' বলে বিবেচিত হতে পারে না। এ হচ্ছে রাজনৈতিক সত্যের যুক্তিসিদ্ধ-বৈজ্ঞানিক সমীকরণ। কিন্তু ভারত তা মনে করে না এবং সত্যের এ সরল ব্যাখ্যায় তার কোন বিশ্বাসও নেই। ভারতের উচ্চ পর্যায়ের নীতি-নির্ধারক এবং নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা সরাসরি বাংলাদেশকে তাদের নিরাপত্তার জন্য হুমকি মনে করছেন। প্রথমতঃ বাংলাদেশের বিপুল তৌহিদবাদী মুসলিম জনসংখ্যা তার উদ্বেগের কারণ। দ্বিতীয়তঃ বাংলাদেশের স্বাধীন-সার্বভৌম পদচারণা এবং বৈশ্বিক পর্যায়ে বাংলাদেশের স্বাধীন সম্পর্কের বিস্তারকে ভারত মেনে নিতে পারছে না। তাদের ধারণা, বাংলাদেশের স্বকীয় জাতি-রাষ্ট্রের বিকাশ ও সমৃদ্ধির ব্যঞ্জনা তাদের লালিত দীর্ঘকালীন আঞ্চলিক প্রভুত্ব বিস্তারের লালসা ও আধিপত্যবাদী জিঘাংসা বাস্তবায়নকে বাধাগ্রস্ত করছে। এ কারণে ভারত বাংলাদেশকে নেপাল-ভুটানের মতোই একটি আধা স্বাধীন বা 'অধীনতামূলক মিত্র' রাষ্ট্র, অ-বিকশিত 'বনসাই' রাষ্ট্র বানিয়ে রাখতে চায়। জাতি-রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের বিপুল অগ্রগতি, সামাজিক ও মানব উন্নয়ন ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মানের অগ্রগতি এবং আন্তর্জাতিক পরিসরে বাংলাদেশের বহুমুখী সাফল্যের স্বীকৃতি সত্বেও ভারত বালাদেশকে প্রতিবন্ধী বানিয়ে রাখতে চায়। নৈতিকতা, আন্তর্জাতিক রীতি-নীতি এবং জাতিগত সহাবস্থানের স্বীকৃত নিয়ম-বিধির বিচারে ভারতের এই মনোভাব মধ্যযুগীয় আগ্রাসী শক্তির সাথেই তুলনীয়। তবে স্বাধীনতার পর থেকেই 'বৃহৎ' গণতন্ত্রের ছদ্মাবরণে ভারত তার আভ্যন্তরীন ও আঞ্চলিক পর্যায়ে ঔপনিবেশিক শক্তির থেকে আহরিত অবদমনমূলক দানবীয় নীতি অনুসরণ করছে। ভারতের সবগুলো দেশীয় রাজ্য একে একে গ্রাস করার পর তারা সিকিম'কেও পাতানো

www.bjilibrary.com

রাজনীতির ফাঁদে গ্রাস করে নিয়েছে। নেপাল ভারতীয়করণের দিকে অনিবার্যভাবে এগিয়ে চলছে। ভুটান ভারতের আধা করদরাজ্য হয়ে টিকে আছে। শ্রীলংকায় তামিল টাইগারদের দিয়ে রক্তক্ষয়ী সংঘাতের দাবানল জ্বালিয়ে ভারত নিভাতে পারছে না। কাশ্মীরের স্বাধীনতা সংগ্রাম ফিলিস্তিনীদের ওপর অনুসৃত কায়দায় দমন করে রাখা হয়েছে। পাঞ্জাবের মুক্তিকামীদের আন্দোলন স্বর্ণ মন্দিরে রক্তাক্ত সেনা অভিযানে স্তব্ধ করে দেওয়া হয়েছে। উত্তর-পূর্ব ভারতের সাত রাজ্যের স্বাধীনতাকামীদের ওপর ভারতের সামরিক এথ্‌নিক নিপীড়ন মানব সভ্যতার জন্য এক কলংকজনক দৃষ্টান্ত। ১৯৪৭ সাল থেকে বিশ্বরাজনীতির বিন্যাস এবং সংস্কৃতি ও সভ্যতার খৃস্টীয় নীল নকশা, ইঙ্গ-মার্কিন-ইউরোপীয় সমর্থন ও প্রশ্রয় ভারতের পক্ষে থাকায় ভারতের আভ্যন্তরীন স্বাধীনতাকামী কোন জাতি-রাষ্ট্রের স্বপ্ন সফল হচ্ছে না। তবে ৯/১১-এর পর একক বিশ্বশক্তির কাছে মুসলিম-বিদ্বেষী ভারতের গুরুত্ব আরও বেড়ে গেছে। বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থার নেপথ্য নিয়ন্ত্রক ইহুদীবাদী রাষ্ট্র ইসরাইল ভারতের সাথে সখ্য গড়ায় এ অঞ্চলের ক্ষুদ্র স্বাধীন জাতি-রাষ্ট্র, বিশেষ করে মুসলিম মেজরিটির উপ-মহাদেশীয় দুটি দেশের ওপর ভারতীয় আগ্রাসী চাপ বহুমুখী ও অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে।

এই পটভূমিতে বিচার করলে স্বীকার করতে হবে যে, ভারতের আগ্রাসী, বহুমুখী অন্তর্ঘাত এবং 'অধীনতামূলক মৈত্রীর' আবাহন মুকাবিলা করা অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে আরও কঠিন হয়ে পড়েছে। উপরন্তু, বাংলাদেশে ভারতপন্থী লবীর রাষ্ট্র ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ ও নীতি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান দখল করে নেবার কারণে বাংলাদেশের নিজস্ব স্বার্থ ও স্বকীয়তা এবং ভারতীয় স্বার্থের মধ্যে পার্থক্য করার প্রয়োজনও অনেকে ভুলে গেছেন। বাংলাদেশের মতো মুসলিম মেজরিটির সম্ভাবনাময় দেশে সামরিক-অসামরিক এলিট-বুদ্ধিজীবি-সাংবাদিক, আইনজীবি, এনজিও-জমিদার এবং কিছু রাজনীতিকের সমন্বয়ে যে নতুন সিভিল সোসাইটি গড়ে উঠেছে, তাদের আন্তর্জাতিকতা ও উদারীকরণের নামে সীমান্তবহির্ভূত আনুগত্যের কারণে বাংলাদেশের মতো জাতি-রাষ্ট্রের স্থিতি, উন্নয়ন এবং জনগণের নামে সংরক্ষিত রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের বিষয়টি উপহাসের বস্তুতে পরিণত হতে চলেছে। বিশ্বায়নের নামে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের কনসেপশন পরিবর্তনে বর্ণচোরা নয়া উপনিবেশবাদ অনেকটাই সফল। তবে এ অঞ্চলে একমাত্র ভারতই কেবল চরম সাম্প্রদায়িকতা, শ্রেণী বিভাজনের নামে 'দলিতদের' মানবেতর জীবন যাপনে বাধ্য করা এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে মুসলিমদের মসজিদ ধ্বংস ও মুসলিম নিধন করেও কোন আন্তর্জাতিক চাপের মুখে পড়েনি।

ভারতের পক্ষে এটা সম্ভব হয়েছে সেনা হস্তক্ষেপমুক্ত নিরবচ্ছিন্ন গণতান্ত্রিক ধারা প্রতিষ্ঠা, জাতীয় লক্ষ্য স্থির করে তার পেছনে হিন্দু জাতীয় ঐক্যের শক্তিকে সংহতকরণ এবং দূরদর্শী ও প্রজ্ঞাশীল রাজনীতির কারণে। ভারতের মতো আগ্রাসী জাতীয়তাবাদ বা পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ না করেও কেবলমাত্র জাতীয়তাবোধ ও জাতীয় ঐক্যের

www.bjilibrary.com

মাধ্যমে বাংলাদেশ আত্মরক্ষা করতে পারে। কিন্তু এজন্য যে জাতীয় নীতি ও নেতা থাকা দরকার তা আমাদের নেই। নেতা থাকলেও জাতীয় প্রশ্নে কেবল ঐক্যেরই আমাদের একমাত্র অভাব। সংগত কারণেই ভারত এই সুযোগ নিচ্ছে। প্রতিপক্ষকে অনৈক্যে-বিভাজনে দুর্বল করা এবং তা থেকে ফায়দা উসুলে ভারত সফল। ভারতের সাফল্যের পেছনে তার নিজের সাফল্যের চেয়েও জাতি-রাষ্ট্র রক্ষা ও জাতি-সত্তা নির্মাণে আমাদের ব্যর্থতা তাদের সাফল্যকে সহজ করেছে।

উপ-মহাদেশীয় দৃশ্যপট

এ উপ-মহাদেশের নিকট অতীতের বিগত আড়াই শত বছরের রাজনীতির ইতিহাস এবং হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে, বিশেষ করে রাজনীতিতে এই দুই প্রধান জাতির ধর্ম-সংস্কৃতির প্রভাব বিচার করলে দেখা যায় যে, উগ্র হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা এবং মুসলিমদেরকে একটি স্বাধীন ও মর্যাদাশীল জাতি হিসেবে বেড়ে উঠতে না দেওয়াই বহুমুখী সংকটকে ঘনীভূত করেছে। সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ মুসলিমদের বিরুদ্ধেই করা হয়। তবে মুসলিমদের কেউ সাম্প্রদায়িক বা সংখ্যালঘু নিপীড়ক হলে তার জন্য পবিত্র ইসলামের শিক্ষা-আদর্শ কোনভাবেই দায়ী নয়। ইসলাম কখনও সাম্প্রদায়িকতার সমার্থক নয়। মুসলিমদের কেউ সাম্প্রদায়িক হলে সেটা দুর্ঘটনা। কিংবা প্রতিপক্ষের সাম্প্রদায়িক সহিংসতার প্রতিরোধের সাথেই সেটা যুক্ত। যেমন- ভারতের গুজরাটে উগ্র সাম্প্রদায়িক নেতা মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে যে মুসলিম নিধনযজ্ঞ চলেছে, তার প্রতিবাদে মুসলিমরা সংগঠিত হয়ে রুখে দাঁড়াতে পারলে হিন্দুদের দিকেও জীবনহানি ঘটতো। আর তখন এটাকেই মুসলিমদের সাম্প্রদায়িকতা হিসেবে চিহ্নিত করা হতো। কিন্তু গুজরাটে যা কিছু ঘটেছে, তা একতরফাভাবেই ঘটেছে। মুসলিমরা মার খাওয়াটাকেই ভারতের নাগরিক হতে পারার পুরস্কার হিসেবে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। ভারতে ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে মুসলিমরা আর্যদের ক্ষাত্রশক্তি ও ব্রাহ্মণ্যবাদী সন্ত্রাসে বার বার জীবন-সম্পদ ও সম্ভ্রম বিলিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তারা যখনই এই সাম্প্রদায়িক দস্যুদের বিরুদ্ধে শক্তির বদলে শক্তি নিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছে, তখনই তাদের চরিত্রের ওপর সাম্প্রদায়িকতার সীল মোহর লাগানো হয়েছে। ইসলামকে সাম্প্রদায়িকতার অপবাদে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে। তবে ভারতে মুসলিম শাসনের শুরু থেকে তারা যদি হিন্দুদের প্রতি অনুদার ও প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে এথনিক ক্লিনজিং বা জাতিগত নির্মূল অভিযানে অবতীর্ণ হতো, তাহলে এ উপ-মহাদেশে হিন্দুদের অস্তিত্ব বৌদ্ধদের মতোই খুঁজে পাওয়া কঠিন হতো। আর্য-হিন্দুদের সন্ত্রাসে বৌদ্ধরা ভারত থেকে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

বিজয়ী জাতির কাছে হিন্দুদের ক্ষাত্রশক্তি যখন পরাভূত হয়েছে, তখন তাদের ওপর পরিকল্পিত হত্যাযজ্ঞ চালানো কোন কঠিন বিষয় ছিল না। কিন্তু মুসলিমরা যখন কোন এলাকার শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছে, তখন তাদের লক্ষ্য থেকেছে আম

www.bjilibrary.com

জনতার জীবন সম্ভ্রম সহ স্ব স্ব ধর্মের নিরাপত্তা দান। মুসলিম শাসকরা সকল পর্যায়ে বা সবদেশে ইসলামের পরিপূর্ণ শাসন-নীতি পুরোপুরি বাস্তবায়ন করতে না পারলেও আইনের চোখে সকল ধর্ম-বর্ণের মানুষের সমতা আনয়ণ করা ছাড়া রাষ্ট্র বা সামাজিক শক্তি ব্যবহার করে কাউকে ধর্মান্তরিত করেনি। এটা হলে এ উপমহাদেশ বা বিশ্বের অন্যান্য স্থানে অমুসলিমরা তাদের ধর্মীয় পরিচিতি নিয়ে টিকে থাকতে পারতো না।

দুর্ভাগ্যজনক সত্য এই যে, যারা শুধু সাম্প্রদায়িক ও ধর্মান্ধই নয়, রাষ্ট্রে যারা ধর্মের নামে মানুষকে এক প্রকার জিম্মি করে রেখেছে, তাদের মুখে কিনা মুসলিমদেরকে 'সাম্প্রদায়িক' গালি শুনতে হচ্ছে এবং ৪৭-এর দেশ বিভাগকেও হিন্দুরা মুসলিমদের "সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ" হিসেবে দেখে আসছে। ভারত এবং ভারতের 'অখন্ড' সত্তাকে বিভক্তির জন্য মুসলিম লীগের 'দ্বি-জাতি তত্ত্বকে' দায়ী করে হিন্দুরা ভারত বিভক্তির সকল দায় এ উপ-মহাদেশের মুসলিমদের ওপর চাপিয়ে আসছে। যদিও ১৯৪৭-এ বাংলা ও পাঞ্জাবের বিভক্তির শর্তে কংগ্রেস দেশ-বিভক্তি মেনে নিয়েছিল। ভারতের সাম্প্রদায়িক নেতা শ্যামাপ্রসাদ যে যুক্তিতে বাংলা বিভক্ত করে হিন্দু প্রধান পশ্চিম বাংলাকে অন্তর্ভুক্ত করে কলকাতার হিন্দু এলিটদের উদরে নিয়েছিলেন, তারও ভিত্তি ছিল মূলতঃ দ্বি-জাতিত্ব। এ অর্থে, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়রা প্রকারান্তরে মুসলিম লীগের দ্বি-জাতিত্বের ফর্মুলাকেই মেনে নিয়েছিল। আধুনিক গণতান্ত্রিক ভারতে যখন তিলক-সাভারকারদের হিন্দু আদর্শের ধ্বজাধারী সংঘ পরিবারের আদভানী-বাল-থ্যাকারে–তেগাড়িয়া-নরেন্দ্র মোদীদের নেতৃত্বাধীন হিন্দুবাদীরা সরকার পরিচালনা করে, তখনও প্রমাণ হয় যে, ভারত মূলত সেক্যুলারিজমের ছদ্মবেশ ধারী একটি কট্টর হিন্দুত্ববাদী এবং সর্বাত্মকবাদী ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্র ছাড়া আর কিছুই নয়। আর এস এস, জনসংঘ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরং, শিবসেনা প্রভৃতি কট্টর হিন্দুবাদী সংগঠনের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা সাম্প্রদায়িক সংঘ পরিবার প্রকাশ্যেই ভারতের রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও সমাজ দর্শনে হিন্দুত্বের প্রদর্শনী করে আসছে। এসব সংগঠন ভারতে হিন্দু মানসিকতার একজন আধুনিক হিটলারের শাসন চায়। এ অর্থে তারা সরাসরি ফ্যাসিবাদী হিন্দুবাদ প্রতিষ্ঠায় অংগীকারাবদ্ধ। যার প্রদর্শনী করেছে সংঘ পরিবার গুজরাটে মুসলিম নিধন এবং অযোধ্যায় বাবরী মসজিদ ধ্বংস করে রাম মন্দির নির্মাণ করে। হিটলারের নাৎসী দর্শনকে তারা হিন্দুত্বের খোলসে উপস্থাপন করতে চায়। হিটলারের স্বস্তিকা তাদেরও পরিচয় চিহ্ন। ভারতের অহিংসবাদী নেতা গান্ধিজীকে কোন তথাকথিত উগ্রবাদী মুসলিম হত্যা করেনি। তাকে হত্যা করেছে হিন্দুত্ববাদী নেতা বিনায়ক সাভারকারের ঘনিষ্ঠ শিষ্য নাথুরাম গডসে। নতুন করে ভারতের পার্লামেন্ট ভবনে সাভারকারের আবক্ষ মূর্তি স্থাপন করে তারা গান্ধিজীর অহিংসবাদের কবর রচনা করেছে। সুতরাং 'অখন্ড ভারতে' হিন্দুত্বের ফ্যাসীবাদী শাসন-ত্রাসনে উপমহাদেশের মুসলিমদের প্রতিবন্ধী করে রাখার রাজনৈতিক অভিলাষের কাছে আত্মসমর্পণ না করে মুসলিমরা যদি স্বতন্ত্র স্বাধীন ভূ-খন্ড প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করে থাকে এবং তা রক্ষায় নিবেদিত থাকে, তাকে কোন্ বিচারে সাম্প্রদায়িক চেতনা বলা যাবে?

www.bjilibrary.com

প্রথমতঃ বৃটিশ বেনিয়াদের সাথে হাত মিলিয়ে হিন্দু এলিটরা মুসলিমদের স্বাধীন নবাবী ছিনিয়ে নিতে পলাশীতে কলাবরেটরের ভূমিকা পালন করেছে।

দ্বিতীয়তঃ পরবর্তী একশ নব্বই বছর ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতা ও শক্তি-সহায়তায় হিন্দুরা হাজার বছরের শাসক জাতি মুসলিমদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভিত্তি ধ্বংস করে তাদেরকে 'ভিস্তি ওয়ালার' জাতে পরিণত করেছিল। উগ্র হিন্দু নেতারা সরাসরি মুসলিমদের দেশ ছেড়ে আরব ভূমির "খেজুরতলায়" যেতে হুমকি দিয়েছে। হিন্দুত্বের উগ্রতা-অসহিষ্ণুতা-জিঘাংসাবৃত্তি এবং বহিরাগত উপনিবেশবাদী শক্তির সাথে হাত মিলিয়ে মুসলিম শক্তিকে চিরতরে নির্মূল করার সংঘবদ্ধ অভিযানই মুসলিমদেরকে পুনরায় উঠে দাঁড়াতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

তৃতীয়তঃ ঔপনিবেশিক যুগে আজাদী পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে হিন্দুরা শুধু মুসলিমদের সাথে হাত মিলাতেই অস্বীকার করেনি। তারা মুসলিমদেরকে রাজদ্রোহী প্রমাণ করে ইংরেজ শাসকদের রোষাণলে ঠেলে দিতে সম্ভব সবকিছুই করেছে। হিন্দুত্বের স্বাধিকারবাদী পুণর্জাগরণের সূচনা ঘটে বঙ্গ-ভঙ্গের পর। ১৮৮৫ সালে গঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে 'স্বরাজ' বা স্ব-শাসনের যে রাজনৈতিক দাবী উঠেছিল, তা কংগ্রেসের অভ্যুদয়ের প্রায় অর্ধশত বছর পরের ঘটনা। ভারতীয় কংগ্রেসের রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণায় মূলতঃ হিন্দুদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার বাসনা ছিল, অন্য কিছু নয়। তারা অত্যন্ত সচেতনভাবে সুপরিকল্পিত পদক্ষেপে ভারতের শাসন ক্ষমতায় মুসলিমদের রাজনৈতিক সত্তার পুনরাবির্ভাবকে প্রতিহত করেছে। এমনকি হিন্দুদের নেতৃত্বে ও কর্তৃত্বে প্রতিষ্ঠিত ভারতে মুসলিমদেরকে ছোট শরীক হিসেবে মেনে নিয়ে তাদের যথার্থ হিস্যা দানেও তারা রাজী ছিল না। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরে ঢাকায় ভারতীয় বাহিনীর কাছে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের পর এক প্রতিক্রিয়ায় ভারতের তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী বলেছিলেন- "আমরা হাজার বছরের 'বদলা' নিয়েছি।" কিছুদিন আগে গান্ধী পরিবারের ভাবী নেতৃত্ব রাহুল গান্ধী বলেছেন- কংগ্রেস যেমন ভারতকে স্বাধীনতা এনে দিয়েছে, তেমনি ১৯৭১ 'পাকিস্তান ভাংগার' দায়িত্বও পালন করেছে। তার ভাষায় কংগ্রেস জাতিগত অংগীকার পালনে কখনও ব্যর্থ হয়নি।

চতুর্থতঃ কংগ্রেস খোলা মনে মুসলিম লীগের রাজনৈতিক আপোষ-মীমাংসার প্রস্তাবে কখনও সম্মত হয়নি। ভারত-বিভক্তির সম্ভাবনা অনিবার্য হবার পূর্ব পর্যন্ত কংগ্রেস নেতৃত্ব সর্ব ভারতীয় জনগণের, বিশেষ করে ভারতীয় মুসলিমদেরও প্রতিনিধিত্ব দাবী করে এসেছে। যদিও ভারতীয় মুসলিমদের বৃহত্তর অংশ মুসলিম লীগের পতাকা তলেই সমবেত ছিল। কংগ্রেসের উদারনৈতিক এবং তথাকথিত সেক্যুলার নেতারাও দলের হিন্দুত্ববাদী উগ্র গোষ্ঠীর দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। এ কারণে মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ কংগ্রেস সভাপতি মাওলানা আবুল কালাম আজাদকে কংগ্রেসের 'শো-বয়' হিসেবে উল্লেখ করতেন। হিন্দু নেতারা মুসলিমদের শীর্ষ নেতৃত্বকে কখনও ঐক্যবদ্ধভাবে এক মঞ্চে বা এক সংগঠনের পতাকাতলে বসতে দেয়নি। তারা এক্ষেত্রে ইংরেজদের

www.bjilibrary.com

'ডিভাইড এন্ড রুল' নীতি সার্থকভাবেই প্রয়োগ করেছে। মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ এবং মাওলানা আজাদের ব্যাপারে তারা যেমন ভেদ-নীতি প্রয়োগে সফল ছিল, তেমনি শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক এবং জিন্নাহ'র ক্ষেত্রেও একই সুযোগ হিন্দুরা নিয়েছে। শেরে বাংলা ফজলুল হকের কট্টর সাম্প্রদায়িক নেতা শ্যামাপ্রসাদের সাথে মিলে বাংলায় 'শ্যামা-হক' মন্ত্রী সভা গঠনে হিন্দুদের এই ভেদনীতিই ফলপ্রসূ হয়েছে। পাকিস্তান আমলে হিন্দু নেতা ও কম্যুনিস্টরা আরও সফলভাবে এই ভেদ নীতি প্রয়োগ করেছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে মুসলিম লীগ থেকে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন এবং মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে ৫৪ সালের যুক্ত ফ্রন্ট গঠন ছিল হিন্দু-কম্যুনিস্টদের রাজনৈতিক চাতুরী ও ভেদ-নীতির ফল।

পঞ্চমতঃ ঔপনিবেশিক ভারতে ইংরেজ শাসকদের প্রশাসনিক বিন্যাস অনুযায়ী ঢাকা কেন্দ্রিক পূর্ব বাংলা-আসাম নিয়ে যে নয়া প্রদেশ গঠিত হয়, তার বিরুদ্ধে হিন্দুদের দেশ কাঁপানো সহিংস আন্দোলন মুসলিমদের কাছে হিন্দু মানসিকতার স্বরূপ আর একবার উন্মোচন করে। দ্বিতীয় পর্বে ১৯৪৭-এ যখন 'অখন্ড স্বাধীন' বাংলার প্রস্তাব উঠলো, তখন হিন্দুরা সম্মিলিতভাবে তাকে নাকচ করে দিয়ে বঙ্গ-ভংগের পুরনো তত্ত্বকেই লুফে নেয়, যা তারা মুসলিমদের বিপক্ষে ব্যবহার করেছিল। স্বাধীন অখন্ড বাংলায় মুসলিম মেজরিটি এবং সিডিউল কাষ্ট হিন্দুদের সম্ভাব্য সমর্থনের প্রশ্নে কলকাতার সাম্প্রদায়িক বাংগালী হিন্দুরা বঙ্গভংগকে আর একবার অনিবার্য করে তোলে। বাংলা প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি শরৎ চন্দ্র বসুর ('নেতাজী' সুভাস চন্দ্র বসুর ছোট ভাই) লেখা অখন্ড স্বাধীন বাংলার সপক্ষের চিঠির জবাবে গান্ধীজি এ ধরনের প্রস্তাব থেকে সরে আসার জন্য সরাসরি নির্দেশ দেন।

ষষ্ঠতঃ ১৯৭১ সালে বাংগালী মুসলিম জনগণ তথা সর্বস্তরের বাংলাদেশী জনগণের সম্মিলিত ইচ্ছায় যে স্বাধীনতা যুদ্ধ সংগঠিত হয়, তাতে ভারত রক্ষকের বেশে সমর্থন দিয়ে '৪৭-পূর্ব ভারতীয় সীমানা ফিরিয়ে আনার কূটকৌশল চালিয়েছে এবং বাংলাদেশকে 'অকার্যকর রাষ্ট্র' অথবা শাসন ক্ষমতায় ভারতের তাবেদার গোষ্ঠীকে বসানোর দাদাগিরি চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের সংকট ও দ্বৈততার পটভূমি এটাই। এখানেই বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের সম মর্যাদা দিতে ভারতের অনীহা। দু'দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে অনাস্থার উৎপত্তি এখান থেকেই। ১৯৭১-এর রাজনৈতিক বাস্তবতা হচ্ছে, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ, যার স্বপ্ন বাংগালী মুসলিমরা যুগ যুগ ধরে পোষণ করে এসেছে। কিন্তু ভারত একাত্তরে বাংলাদেশকে সমর্থন দিয়েছে তার অখন্ড ভারত গড়ার সুযোগ কাজে লাগানোর লক্ষ্যে। ভারতের রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক ভিন্নতা আমাদের জনগণের মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্নকে স্পর্শ করতে পারেনি। সুতরাং দৃশ্যপটের পেছনের রাজনীতি আড়াল করে রেখে দু'দেশের সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটবে না।

www.bjilibrary.com

একাত্তরের ন'মাসের সহযোগিতার হাত হাজার বছরের আগ্রাসী লোমষ হাতের আগ্রাসন কখনও মুছে দিতে পারেনি। এ কারণেই বাংলাদেশের মানুষ পাকিস্তান পর্বের চেয়েও ভারতের অভিসন্ধি ও আচরণের ব্যাপারে আরও বেশি ভীত ও সন্দিগ্ধ। এটাও ভারতের অবদান। ১৯৭১- সালের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সমর্থনের সাথে তাদের 'পাকিস্তান ভাংগার' পুরনো শপথ বাস্তবায়ন এবং উপ-মহাদেশীয় বিভাজন- রেখা বিলুপ্ত করে 'অখন্ড' ভারত নির্মাণের অভিসন্ধি প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে ভারত বাংলাদেশের মানুষের কাছে ভীতিকর আগ্রাসী এক বৃহৎ প্রতিবেশী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

১৯৭১-এ ভারতের ভূমিকা

ভারতের শীর্ষ কূটনীতিক, স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে ভারতের ডেপুটি হাই কমিশনার এবং দিল্লীর সাউথ ব্লকে মুক্তিযুদ্ধকালে 'ইস্ট পাকিস্তান' ডেস্কের প্রধান জে. এন. দীক্ষিতও ভিন্ন আঙ্গিকে এটা স্বীকার করেছেন। তিনি তার বই 'লিবারেশন এন্ড বিয়ন্ডঃ ইন্দো-বাংলা রিলেশানস'-এ লিখেছেন : সুস্পষ্টভাবে এবং প্রকাশ্যে ব্যক্ত না হলেও শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের দৃষ্টিভংগী ছিল ভারতীয় আকাংখা থেকে পুরোপুরিভাবে ভিন্নতর। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতীয় সাহায্যের জন্য শেখ মুজিব অবশ্যই কৃতজ্ঞ ছিলেন। তিনি ভারতের সঙ্গে বাস্তবোচিত ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে আগ্রহী ছিলেন। বাংলাদেশ যদি বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ দেশ সমূহের কাছ থেকে স্বীকৃতি পায় এবং ঐ সব দেশের সঙ্গে দ্বি-পক্ষীয় রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত সম্পর্ক সমূহ একটা নূন্যতম মানে উন্নীত হয়, তাহলে ভারতের সর্বমুখী সমর্থন ও সহায়তার যে প্রয়োজন হবে না, সে সম্পর্কে সচেতন ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। এরূপ দৃষ্টিভংগী নিয়েই তাঁর মনে এরূপ উপলব্ধি সুস্পষ্ট ছিল যে, ভারতের ওপর অতি নির্ভরশীল হওয়া চলবে না। বাংলাদেশ ভারতের একটি করদরাজ্যে পরিণত হোক, এটাও তিনি চাইতেন না।" (সম্পূর্ণ যুক্তি সংগতভাবেই)। (দৈনিক প্রথম আলো : ২১শে জুলাই, ১৯৯৯)

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ-বুদ্ধিজীবি মুক্তিযোদ্ধা ডঃ মাহবুব উল্লাহ লিখেছেন ".....ভারত অবশ্য অপর একটি কারণে বাংলাদেশ আন্দোলনের প্রতি সমর্থন প্রদান করেছিল। সেটি হলো, চির বৈরী পাকিস্তানকে দ্বি-খন্ডিত করে হীনবল করে ফেলা। পৃথিবীর সব শক্তিশালী রাষ্ট্র তাদের জাতীয় স্বার্থের নিরিখেই আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ভূমিকা পালন করে। ১৯৭১ সালে ভারত বাংলাদেশের জন্য যা করেছিল, তার প্রত্যেকটি ভারতের জাতীয় স্বার্থের আলোকেই করেছিল। ভারতের দিক থেকে বিচার করলে বলতে হবে, ভারত অন্যায় কিছু করেনি। তবে আমাদের বুঝতে হবে, সর্বোচ্চ জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে ভারত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে নিজস্ব খাতে নিয়ন্ত্রিত রাখতে চেয়েছে এবং মুক্তিযুদ্ধের স্বাভাবিক স্বনির্ভর ধারাকে ব্যাহত করেছে। এছাড়া ভারত দেখতে চেয়েছে, নবগঠিত বাংলাদেশ রাষ্ট্রে তার প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন নয়, এমন কোন রাজনৈতিক শক্তি যাতে ক্ষমতায় বসে না পড়ে।" (জেনারেল মইন উ আহমেদের ভারত সফর ঃ মাহবুব উল্লাহ- আমার দেশ ঃ ২৮.০২.০৮)

www.bjilibrary.com

ভারতের দিক থেকে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিজয় ছিনিয়ে নেবার দুর্বুদ্ধির প্রথম প্রমাণ আমরা পেয়েছি ১৯৭১-এর যুদ্ধ পরবর্তী আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। সেখানে মুক্তিযুদ্ধের প্রধান পক্ষ বাংলাদেশকে আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত না রেখে বা দালিলিক সাক্ষী হিসেবে গ্রহণ না করে ভারত চাণক্য কূটনীতির নোংরা খেলায় আমাদের বিজয়কে তাদের বিজয় হিসেবে ছিনিয়ে নিয়েছে। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকে ভারত 'দ্বি-পাক্ষিক' যুদ্ধ বা তাদের সাথে পাকিস্তানের যুদ্ধ হিসেবে দালিলিকভাবে সমীকরণ টেনেছে। এখনও কোন কোন বাংলাদেশ বিরোধী ভারতীয় মনে করেন, একাত্তরের সূত্রে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের দলিলটি তাদের সিন্দুকে বন্দী রয়েছে। তবে বাংলাদেশ কিন্তু পাকিস্তানের মূল দলিল নাচক করেই আলাদা হয়েছে। কেননা, এ দলিলে বাংলাদেশও অংশীদার।

১৯৭১ সালের পর থেকে বাংলাদেশ ভারতের অঘোষিত যুদ্ধ মুকাবিলা করেই টিকে আছে। বাংলাদেশের মানুষের জাতি-রাষ্ট্রের প্রতি অংগীকার ও সার্বভৌম চেতনার কাছে এ পর্যন্ত ভারতের চাণক্য কূটনীতি কাজে আসেনি। একাত্তরের দলিলের দোহাই দিয়ে ভারত বরং তার গোপন আগ্রাসনের ভয়ংকর দিকটিই উন্মোচন করছে। যেমন ভারতের নীতিনির্ধারকদের কেউ কেউ এখনও মনে করেন, বাংলাদেশ থেকে তারা সেনা প্রত্যাহার করে ভুল করেছেন। ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি জ্ঞানী জৈল সিং পর্যন্ত একথা বলেছেন। তবে ভারত যে একাত্তরে অস্বস্তি ও অনিচ্ছার সাথে সেনা প্রত্যাহার করে নিয়েছে, তার প্রমাণ বাংলাদেশের জনগণ নানাভাবেই পেয়েছে।

প্রথমতঃ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার যখন একটি নাজুক অবস্থায় ছিল, তখন ৭-দফা গোপন চুক্তি সম্পাদন করিয়ে ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। ৭-দফা চুক্তিতে বাংলাদেশের কোন সেনাবাহিনী থাকবেনা বলে শর্ত ছিল। এমনকি বাংলাদেশের কোন স্বাধীন অর্থনীতি ও পররাষ্ট্র নীতিও থাকবে না বলে কথা ছিল। শেখ মুজিব প্রকাশ্যে এ চুক্তির জন্য তাজউদ্দীনকে ভর্ৎসনা করেন এবং তিনি 'বাংলাদেশ বিক্রির' এ চুক্তিকে অনুমোদন করেননি। পরবর্তী পর্যায়ে ২৫ সালা 'মৈত্রী' চুক্তিতে ৭-দফা গোপন চুক্তির কিছু ধারা সংশোধিত ও পরিবর্তিত করে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তবে ঐ চুক্তিটিও এখন বর্তমান নেই। সময়ের সাথে তা তামাদী হয়ে গেছে। কিন্তু তাদের ব্যর্থতার প্রতিহিংসা প্রতিনিয়ত বাংলাদেশকে ক্ষত বিক্ষত করছে।

ভারতের 'পাকিস্তান ভাংগার' মিশন এবং একাত্তরের মুক্তিপাগল আমাদের জনগণের আবেগ অভিন্ন ধারায় মিলিত হতে পারেনি। শেখ মুজিব নিজে ভারতের আধিপত্যবাদী রাজনীতি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বলেই ভারতীয়দের টোপ এবং জনগণের ভুল বোঝাবুঝির ঝুঁকি অগ্রাহ্য করে একাত্তরে ভারতে গিয়ে যুদ্ধ পরিচালনার নেতৃত্ব দেননি।

তদুপরি পাকিস্তান থেকে ফিরে আসার আগেই পাকিস্তানী নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোর সাথে 'শিথিল কনফেডারেশনের' কথা দিয়ে আসেন। 'Bangladesh Legacy : Anthony Mascarhenas.

www.bjilibrary.com

দ্বিতীয়তঃ শেখ মুজিব তাঁর ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে ভারতীয় এয়ার ব্যবহার না করে বৃটিশ এয়ারে লন্ডন হয়ে ঢাকায় ফেরেন। দিল্লীতে তাঁর যাত্রা বিরতিকালে ভারতের প্রধান মন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর সাথে স্বল্প সময়ের সাক্ষাৎকালে বৃটিশ এয়ারের বদলে ইন্ডিয়ান এয়ারে বাংলাদেশে ফেরার মিসেস গান্ধীর প্রস্তাবও তিনি বিবেচনা করেননি।

তৃতীয়তঃ শেখ মুজিব দেশে ফিরে ঢাকা বিমান বন্দরেই বাংলাদেশকে 'দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ' বলে উল্লেখ করে বাংগালী জাতীয়তাবাদ ভিত্তিক "অখন্ড বাংলার' (যা বাংলাদেশের ভারতীয়করণের নামান্তর) প্রবক্তাদের দুঃস্বপ্ন গুঁড়িয়ে দেন। কেননা শেখ মুজিব দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, বাংগালী জাতীয়তাবাদের কনসেপশনে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব সংরক্ষিত হবে না এবং ভারতীয় আধিপত্যবাদও প্রতিরোধ করা যাবে না। এজন্য তিনি বাংগালীত্বের সাথে ইসলামী ভাবধারা বা মুসলমানিত্ব সংযোজনের পক্ষে ছিলেন। এটা আওয়ামী মুসলিম লীগের মূল বৃত্তে ফেরারই যন্ত্রণাবিদ্ধ বাসনা। এ অর্থে শহীদ জিয়ার বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদকে শেখ সাহেবের রাষ্ট্র ও জাতি-চিন্তার বিকশিত রূপ বলা অযৌক্তিক হবে না।

চতুর্থতঃ শেখ মুজিব দিল্লীর বারণ সরাসরি নাকচ করে লাহোরে অনুষ্ঠিত ইসলামী সম্মেলন সংস্থার সম্মেলনে যোগদান করে বাংলাদেশকে ইসলামী উম্মাহ'র ঐতিহ্যের অংশীদার করে যান। এরই ধারাবাহিকতায় সংবিধানে আল্লাহর ওপর আস্থা-বিশ্বাস, বিসমিল্লাহ সংযোজন এবং রাষ্ট্র ধর্ম হিসেবে সংবিধানে ইসলামের স্বীকৃতির উল্লেখ করা যায়। বাংলাদেশের সংবিধানকে যারা আবারও 'সেক্যুলার' বানাতে চান, তারা শেখ মুজিবের (যাঁকে তারা জাতির জনক বানাতে চান) রাষ্ট্র-দর্শন থেকে সরে এসেই তা করছেন। শেখ মুজিব-প্রবর্তিত সংবিধান অবশ্যই 'সেক্যুলার' ধাঁচের ছিল। তবে এজন্যই তিনি বাংলাদেশকে ইসলামী উম্মাহ'র অংশীদার করেছেন, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মতো প্রতিষ্ঠান পুনর্গঠন করেছেন। তবে ইতিহাস কিন্তু সংবিধানের তথাকথিত চার মূলনীতির প্রবর্তক হিসেবে ভারতকেই জানে। বাংলাদেশের সংবিধান তৈরির অনেক আগেই মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী তাঁদের পার্লামেন্টে একতরফা ঘোষণায় বলেছিলেন, বাংলাদেশ ভারতের সংবিধানের অনুকরণে চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতি তাদের রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করায় তারা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিচ্ছে। ১৯৭২ সালে পূর্ণাঙ্গ সংবিধান রচনার সময় তদানীন্তন পরিস্থিতিতে ভারতের চাপিয়ে দেওয়া 'চার নীতি' পরিহার করা সম্ভব ছিল না। বাংলাদেশকে ভারতের চাপিয়ে দেওয়া রাষ্ট্র নীতিই বহন করতে হয়েছে ১৯৭৫-এর পটপরিবর্তন পর্যন্ত। সেটা আবার তারা পুনর্বহাল করতে চায়।

বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ ও তাদের অনুগামী রাজনৈতিক গোষ্ঠী ১৯৭২ সালের সেক্যুলার সংবিধান পুনঃপ্রতিষ্ঠার কথা বলে আসছে। তবে আওয়ামী লীগ দ্বিতীয় দফা ক্ষমতায় আসার পরও তাতে সফল হয়নি। এ দাবীটি যে ভারতের, তা তাদের

www.bjilibrary.com

কূটনীতিক ও নীতি নির্ধারকদের বক্তব্যে পরিষ্কার। মাস কয়েক আগে ভারতের একজন মন্ত্রী বাংলাদেশে এসে 'সেক্যুলার' বাংলাদেশ দেখতে চান বলে জানিয়েছেন। এবারে আমাদের সেনা প্রধান জেনারেল মইন উ আহমেদ যখন ভারত সফর করেন, তখনও ভারতের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে বাংলাদেশে উদার অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার দাবী জানানো হয়েছে।

প্রশ্ন হচ্ছে, ভারত বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সেক্যুলারিজম চাপিয়ে দিতে চায় কেন? বাংলাদেশ যে কোন বিচারে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির রোল মডেল দেশ। মুসলিম প্রধান দেশ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ ইসলামী জঙ্গীবাদকে নাকচ করে মডারেট ডেমোক্রেটিক দেশের মর্যাদা সমুন্নত রাখতে বদ্ধপরিকর। তবে ইসলামে যে সন্ত্রাসের কোন স্থান নেই, বাংলাদেশের মানুষের মতো তা আর কোন দেশ বিশ্বাসে-আচরণে প্রমাণ করতে পারেনি।

বৃটিশ ভারতে হিন্দু নেতারা মুসলমানদের ডি-মুসলিমাইজড করে অবদমন করে রাখতে চেয়েছে। পাকিস্তান-পর্বে ভারত প্রত্যক্ষ যুদ্ধে মুসলিমদের অর্জন কেড়ে নিতে চেয়েছে। বাংলাদেশ আমলে ভারত বাংলাদেশকে তাদের আশ্রিত করদ রাজ্য বানিয়ে রাখতে চাইছে। ভারতের এই আধিপত্যবাদী থাবা থেকে বাংলাদেশ বেঁচে আছে শুধু জনগণের ঈমানী চেতনা ও স্বাজাত্যবোধ এবং ইতিহাস জ্ঞানের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা ভারতীয় আধিপত্যবাদকে ঘৃণা ও প্রতিরোধ করার কারণে।

ভারতের দৃষ্টি ভংগীর পরিবর্তন না ঘটলে দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক কখনও উন্নত ও সন্দেহমুক্ত হবে না। বাংলাদেশ ভারতকে যতো কিছুই দিক না কেন, দিল্লীর কাছে নতজানু হওয়া এবং ছাড় দিতে দিতে 'লীন' হয়ে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ভারতের আধিপত্যবাদী লালসার নির্বাণ হবে না। বাংলাদেশের জাতীয় মর্যাদা ও সার্বভৌম জাতি রাষ্ট্রের গরিমায় যাদের বিশ্বাস আছে, তাদের পক্ষে ভারতের ব্যাপারে তাই সংরক্ষণবাদী হওয়া ছাড়া উপায় নেই। সমুদ্রে আগ্রাসী দাঁতাল হাংগরের সামনে ক্ষুদ্র স্যামন ফিশ যেমন ডুবসাঁতারের কুশলতায় আত্মরক্ষা করে, বাংলাদেশকে সেই কৌশলই নিতে হবে। চূড়ান্ত বিচারে দেখা যায় যে, ভারত বাংলাদেশের কোন ক্যারিশমেটিক জাতীয়তাবাদী নেতা-নেত্রীদের বিকাশের পক্ষপাতিও নয়। শেখ মুজিব থেকে জিয়া হত্যার পূর্বাপর ঘটনায় ভারতের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ ভূমিকা এবং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বাংলাদেশের মানুষ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে। বাংলাদেশকে উন্নয়ন-অগ্রগতিতে এগিয়ে নেবার মতো কোন নেতৃত্বকেই ভারত সহায়তা করেনি। ভারতের মতো একটি বড়ো 'বন্ধুদেশ' বাংলাদেশের পাশে থাকা সত্ত্বেও ১৯৭৪-এর দুর্ভিক্ষ তদানীন্তন আওয়ামী লীগ সরকার ঠেকাতে পারেনি। সেদিন যেমন ভারত প্রতিবেশীর দায় নিয়ে এগিয়ে আসেনি, তেমনি আজও বাংলাদেশের খাদ্য সংকটে ভারতের চাল নিয়ে চালবাজি বাংলাদেশের মানুষকে আহত করেছে, তবে বিস্মিত করেনি।

www.bjilibrary.com

বাংলাদেশী রাজনীতির উত্তরণ ঃ ভারতের গাত্রদাহ

২০০১ সালের নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী শক্তির ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক ধারায় বাংলাদেশে ভারতের আধিপত্যবাদী থাবা বিস্তারের কার্যক্রম নানাভাবে বাধাগ্রস্ত হয়েছে। একারণেই চারদলীয় জোটকে ক্ষমতাচ্যুত করা বা চারদলীয় জোটের ঐক্য ভাঙ্গা ভারতের প্রধান এজেন্ডায় পরিণত হয়েছে। ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' কানেক্টেড থিংকট্যাংকের অন্যতম সদস্য ভাস্কর রায়ের সাম্প্রতিক লেখায় চারদলীয় জোটের রাজনীতি ও রাষ্ট্র পলিসি এবং আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনার সর্বশেষ পাকিস্তানমুখী 'মুভ' সম্পর্কে নয়াদিল্লীর দৃষ্টিভংগীর প্রতিফলন ঘটেছে বলে অনেকে মনে করেন।

ভাস্কর রায় লিখেছেন- "Even Awami League Chairperson and elder daughter of Sheikh Mujibur Rehman began to believe that without the blessings of Pakistan and Pakistan's supporters like China and Saudi Arabia, she would not be able to return to power. The cause of liberation of Bangladesh began to be questioned in a deliberate strategy." (What Dhaka Needs to Learn: Bhaskar Roy : SIFY. com. Dated 27 February '08.)

তবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মূল আদর্শ-উদ্দেশ্য থেকে এতে শেখ হাসিনা কিভাবে বিচ্যুত হয়েছেন, ভাস্কর রায় তা ব্যাখ্যা করেন নি। বহুদলীয় সংসদীয় গণতন্ত্রে ক্ষমতার রাজনীতিতে আভ্যন্তরীণ মেরুকরণ একটি দেশের নিজস্ব ব্যাপার। ভারতেও গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে কংগ্রেস-বাম এবং হিন্দুত্ববাদী আঞ্চলিক দলের মধ্যে যুক্তফ্রন্টীয় ঐক্য-ধারা গড়ে উঠেছে। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টেও নেজামে ইসলাম পার্টি অংশীদার ছিল। বাংলাদেশ এক স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র। কিন্তু ভারতের নীতি নির্ধারক ও থিংকট্যাংকের লোকজনের আলোকপাতে যে দৃষ্টিভংগীর প্রতিফলন ঘটেছে, তাতে তারা এখনও বাংলাদেশকে 'করদরাজ্য' ছাড়া আর কিছু মনে করে বলে ধরে নেওয়া সম্ভবপর নয়। গণচীন বা পাকিস্তান কিংবা পাকিস্তানের সমর্থক বলে বাংলাদেশে কোন পক্ষ নেই। তবে ভারতীয়দের পক্ষ আছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সম্পর্ক গড়ে উঠে পারস্পরিক স্বার্থ, সার্বভৌম সমতা ও সম্প্রীতিমূলক সদিচ্ছার ভিত্তিতে। আওয়ামী লীগকে ভারতের ওপর নির্ভরশীল ও তাদের কাছে জিম্মি করে রাখতে চায় বলেই দিল্লী কর্তৃপক্ষ শেখ হাসিনার নির্বাচনী ট্র্যাটেজী পরিবর্তনকে ক্ষমা করতে পারেনি। এ কারণেই ভারত ব্যক্তিগতভাবে শেখ হাসিনার বর্তমান দুর্দিনে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়নি।

শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগকে জিম্মি করে ইন্ডিয়ান কংগ্রেসের শাখা বানানো এবং বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোটকে অন্তর্ঘাত ও 'থ্রেট' দিয়ে চাপের মুখে নতি স্বীকার করানোর দ্বৈত কৌশলে ভারত বাংলাদেশের জনগণকে

www.bjilibrary.com

পরাভূত করে রাখতে চায়। ভারতীয় আধিপত্যবাদী রাজনীতির এই দ্বি-মুখী বর্শা ফলকের আঘাত মুকাবিলায় কৌশল নির্ধারণই হবে জাতীয় অস্তিত্ব ও সার্বভৌম রাষ্ট্র-সত্তা রক্ষার অপরিহার্য শর্ত। তবে জাতীয় পর্যায়ে এই সত্যের উপলব্ধি কবে হবে, তা আমরা জানি না। ভারতীয় আধিপত্যবাদী থাবার কাছে আত্মসমর্পণ যখন অত্যাসন্ন হয়, তখনই জনগণের অভ্যুত্থান স্বাধীনতা সুরক্ষায় নতুন ইতিহাস তৈরি করে। রাজনীতির দুর্দিন, রাজনীতিকদের বিচ্যুতি এবং বর্তমানের অসহায়ত্বের পটভূমিতে জনগণের সংঘবদ্ধ জাতীয়তাবাদী অভ্যুত্থানই কেবল রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা দিতে পারে।

ভাস্কর রায় আরও লিখেছেন ঃ "Pakistan wanted to avenge 1971. It found forces in Bangladesh who at ..... wanted an alliance with Pakistan. Their forces had their own reasons and the BNP-JIB government was reportedly working towards a confederate relationship with Pakistan."

পাকিস্তানের সাথে চারদলীয় জোট সরকারের ঘনিষ্ঠতা এবং 'পুনঃসংযুক্তির' কল্পিত তথ্য প্রচার করে ভারত মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নামে 'স্বাধীনতা বিরোধিদের' বিরুদ্ধে ক্রুসেড শুরুর পরিকল্পনায় তাদের বিশ্বস্ত চরদের মাঠে নামিয়েছে। একাত্তরের "যুদ্ধাপরাধীদের" বিচারের দাবী এই সূত্রেই গাঁথা। এটা ভারতের গেম প্লানেরই অংশ। এই এজেন্ডাকে তারা তাদের আধিপত্যবাদী জিঘাংসা আড়াল করার কৌশল হিসেবে ব্যবহার করতে চায়। বাংলাদেশকে ভারতের একক প্রভাব বলয় থেকে বের করে আনতে হলে বাংলাদেশকে চীন, পাকিস্তান, সৌদী আরব সহ দুনিয়ার সকল সভ্য রাষ্ট্রের সাথেই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। এ অধিকার শুধু ভারতের একার থাকার কথা নয়। যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ভারত পরমাণু সহযোগিতা চুক্তির পরও গণচীনের সাথে সদ্ভাব ও সম্পর্কের স্থিতাবস্থা রক্ষায় নয়া কূটনৈতিক উদ্যোগ শুরু করেছে। বাংলাদেশ বিচ্ছিন্ন দ্বীপ নয়। কিংবা ভারতের 'অধীনতামূলক মিত্র' হওয়ার জন্য বাংলাদেশের জন্ম হয়নি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে নিরাপোষ ভূমিকার জন্যই মুজিব-জিয়াকে জীবন দিতে হয়েছে। একই কারণে ২০০৬-এর জানুয়ারীর নির্বাচন হতে দেওয়া হয়নি। একই সূত্রে বেগম খালেদা জিয়া, শেখ হাসিনা সহ বিশিষ্ট রাজনীতিকরা কারাবন্দী। ভাস্কর রায় বাংলাদেশের আভ্যন্তরীন রাজনীতিতে ভারতের নেপথ্য ভূমিকার কথা প্রকারান্তরে স্বীকার করে বলেছেনঃ "২০০৬ সালের ৮ই জানুয়ারী বিএনপি-জামায়াত জোটের পক্ষে একটি সেনা অভ্যুত্থান ঘটিয়ে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসেছে।" চারদলীয় জোট একটি নির্বাচনের জন্যই রাজনীতি বিন্যাস করেছিল। জনগণের বিপুল সমর্থনে যাদের পুনরায় ক্ষমতায় আসার সম্ভাবনা ছিল, তারা কেন সামরিক অভ্যুত্থানের কথা ভাববে? এমনকি তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে জরুরী অবস্থা ঘোষণার পরামর্শ দিলেও তিনি তা নাকচ করেছেন। ভারতীয় লবী চারদলীয় জোটের সামরিক অভ্যুত্থানের গুজব ছড়িয়ে তাদের পক্ষে সামরিক-অসামরিক মেরুকরণ করে নিয়েছে।

www.bjilibrary.com

এদিকে ভারত বাংলাদেশের কাছে নিরাপত্তার গ্যারান্টি চায়। দীর্ঘদিন ধরেই ভারতের নীতি নির্ধারকরা বাংলাদেশে তাদের দেশের জঙ্গী ঘাঁটি থাকার কথা বলে আসছেন। এসব কথিত ঘাঁটি ধ্বংসে বাংলাদেশের সাথে 'যৌথ সামরিক অভিযানের' প্রস্তাবনাও তাদের রয়েছে। পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, (যাঁর পূর্বপুরুষ বাংলাদেশের ফরিদপুরের বাসিন্দা) বাংলাদেশকে ভারতের জন্য 'থ্রেট' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এমনকি দিল্লির কাছে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর প্ররোচনাও দিয়েছেন। কয়েকদিন আগে ত্রিপুরা রাজ্য সভার নির্বাচনী প্রচারণায় এসে বুদ্ধ বাবু আবারও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে একই 'ব্লেইম গেম' এর পর্দা উন্মোচন করে বলেছেন, 'বাংলাদেশের ভূমি ব্যবহার করে উত্তর-পূর্ব ভারতের জঙ্গীরা হামলা চালাচ্ছে।' ভারত সফরে গিয়ে আমাদের সেনাপ্রধান জেনারেল মইন উ আহমেদ পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর সাথেও কথাবার্তা বলেছেন। এতে তিনি জঙ্গী ইস্যু অবশ্যই তুলেছেন। ওয়াকিফহাল সূত্রে প্রকাশ, ভারত চায় জঙ্গী উচ্ছেদে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী তাদের সেবায়েত হিসেবে হুকুম তামিল করবে। অর্থাৎ উত্তর-পূর্ব ভারতের বিদ্রোহ দমনে ভারত বাংলাদেশকে ওয়ার ফ্রন্ট হিসেবে ব্যবহার করতে চায়। একই উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের কাছে ভারত আমাদের ভূ-খন্ডের ভেতর দিয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতে যোগাযোগের জন্য স্থল ট্রানজিট চায়। তারা চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারের সুযোগও চায়। বাংলাদেশের তেল-গ্যাসের ওপর নিয়ন্ত্রণ চায়, চায় টাটার বিনিয়োগ ছড়াতে।

এদিকে ভারত সার্ক আঞ্চলিক সহযোগিতার চেতনা থেকে সরে যেতে চায়। তারা মনে করে, সার্ক-কাঠামোতে 'ভারত বৈরীদের' ভারতের ওপর চাপ সৃষ্টির সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। যেহেতু ভারত প্রতিবেশীদের সাথে সার্বভৌম সমতার নীতি-কৌশল মেনে নেয়নি, সে কারণে তার স্বার্থে দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্কের বিস্তার চায়। যাতে এসব দেশ স্বেচ্ছায় ভারতের 'বিশালত্ব' ও আধিপত্যবাদী ক্ষুধার খোরাক হতে বাধ্য হয়। ভারত মনে করে, তার রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও জাতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্যই বাংলাদেশসহ প্রতিবেশী রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হয়েছে। ভারতের সর্বগ্রাসী অর্থনৈতিক আগ্রাসন ও সার্বভৌম সত্তা বিলোপকারী এগ্রেসিভ ফরেন পলিসির মুখে বাংলাদেশকে টিকে থাকার লাগসই পলিসি নিতে হবে।

বাণিজ্য ঘাটতি নিরসন, সীমান্ত সন্ত্রাস ও গণহত্যা বন্ধ, গঙ্গা নদী প্রবাহ সহ সকল অভিন্ন আন্তর্জাতিক নদী প্রবাহের পানির ন্যায্য হিস্যা আদায়, বাংলাদেশ বিরোধী বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতা বন্ধ সহ দ্বি-পাক্ষিক ক্ষেত্রে সমতা ও আন্তর্জাতিক রীতি-নীতির প্রবর্তনে ভারত সদিচ্ছার প্রমাণ দিলেই বাংলাদেশ শুভেচ্ছার হাত প্রসারিত করতে পারে। বাংলাদেশ ভারত সম্পর্ক বিশ্লেষণে ডঃ মাহবুবউল্লাহ সেনা প্রধান জেনারেল মইন উ আহমেদের সদ্য প্রকাশিত বইয়ের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আমিও তাঁর এই উদ্ধৃতির পুনরুল্লেখ করাকে আমার লেখার প্রাসঙ্গিক বিষয় বলে মনে করছি।

www.bjilibrary.com

"ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক বিষয়ে জেনারেল মইন উ আহমেদের লেখা 'নির্বাচিত সংকলন' গ্রন্থটি থেকে উদ্ধৃতি দেয়া সঙ্গত হবে। তিনি লিখেছেন, 'বাংলাদেশ ও ভারতের অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক বুঝতে হলে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরের দিনগুলোর চিত্র জানতে হবে। ভারতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের শুরু আন্তরিকতার মধ্য দিয়ে। যা হোক প্রথম তিন বছর যে জটিল দ্বি-পাক্ষিক বিষয়গুলো সামনে আসে তা হলো ঃ

* গঙ্গার পানি বণ্টন,

* সীমানা নির্ধারণ বিষয়,

* বঙ্গোপসাগরের সীমানা নির্ণয়।

দুটি চুক্তি "Indo-Bangladesh Joint Declaration 1974" এবং "Indo-Bangladesh Land Boundary Agreement 1974" বাংলাদেশ-ভারত সুসম্পর্কে টানাপোড়েন নিরসন করবে বলে আমরা আশা করেছিলাম। দুর্ভাগ্যজনক যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের পর সম্পর্কের আরো অবনতি হচ্ছিল। সময়ের আবর্তে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের সঙ্গে আরো অনেক নতুন সমস্যার জন্ম হয়। যেমন-

* তালপট্টি ভূখন্ডের মালিকানা,
* সীমানা নির্ধারণী বেড়া,
* নদীর পানি বণ্টন,
* ট্রানজিট সুবিধা,
* বাণিজ্য ঘাটতি।

আমি স্বীকার করছি যে, বাংলাদেশ ভারতের মতো সুস্থির সম্ভাবনাপূর্ণ ও গতিশীল পররাষ্ট্রনীতির অনুসরণ করতে পারেনি। ভিন্ন মতাদর্শের নানা রাজনৈতিক দল দেশের স্বার্থের চেয়ে দলের স্বার্থকে বড় করে দেখেছে। ফলে ভারতের সঙ্গে আমাদের দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক পিছিয়ে গেছে। একই সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির জন্য বাংলাদেশকে এককভাবে দায়ী করা সমীচীন হবে না। বাংলাদেশের চারদিকের সীমানা জুড়ে অবস্থান নেয়া বিশাল ভারতের দায়িত্ব ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে দ্বি-পক্ষীয় আলোচনার মাধ্যমে সব সমস্যার সমাধান করা। পারস্পরিক বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে আমরা এ সম্পর্কের উন্নতি ঘটাতে পারি। এই আলোকে দু'পক্ষের সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে খোলামেলা আলোচনার প্রয়োজন। আর এভাবেই আমরা প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে রচনা করতে পারি আস্থাভাজন ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক।"

জেনারেল মইনের মূল লেখাটি ইংরেজি ভাষায় লেখা। গ্রন্থের বাংলা অংশে তার ইংরেজি লেখার যে অনুবাদ দেয়া হয়েছে, সেটি অত্যন্ত দুর্বল এবং অনেক জায়গায় মূল বক্তব্যের বিকৃতি ঘটিয়েছে। যেমন তিনি লিখেছেন : I must admit that Bangladesh has not been able to work out a consistent, robust

www.bjilibrary.com

or resilient foreign policy with respect to India. এই লাইনটির অনুবাদ করা হয়েছে, 'আমি স্বীকার করছি যে, বাংলাদেশ ভারতের মতো সুস্থির, সম্ভাবনাপূর্ণ ও গতিশীল পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ করতে পারেনি।' স্পষ্টতই অনুবাদে মূল কথার বিরাট বিকৃতি ঘটেছে। যাই হোক, জেনারেল মইন ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কে যেসব সমস্যার উল্লেখ করেছেন, সেইসব সমস্যা এত বড় যে, খুব সহজে কিংবা নিকট-ভবিষ্যতে সমতার ভিত্তিতে এগুলোর সমাধান আশা করা যায় না। এ পর্যন্ত বাংলাদেশ ভারতকে অনেক কিছুই দিয়েছে, কিন্তু ভারত কি কিছু দিয়েছে? বাংলাদেশ ফারাক্কা বাঁধ পরীক্ষামূলকভাবে চালু করতে দিয়েছিল, কিন্তু সেটা চিরকালের জন্য চালু হয়ে গেছে। বাংলাদেশ ভারতের কাছে বেরুবাড়ি হস্তান্তরের জন্য সংবিধান পর্যন্ত সংশোধন করেছে, কিন্তু ভারত তিনবিঘা করিডোর বাংলাদেশের কাছে লিজ দেয়নি। বাংলাদেশ ভারতকে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে Most favoured nation treatment দিতে গিয়ে বস্তুতঃ বাংলাদেশের পুরো বাজারটাকে উন্মুক্ত করে নিয়েছে। বিনিময়ে খুবই মুষ্টিমেয় সংখ্যক রফতানি পণ্য বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশের ক্ষেত্রে কোনো সুবিধা পাওয়া যায়নি। তাহলে আমরা কি করে আশা করতে পারি, দুই দেশের মধ্যে জেনারেল মইন লিখিত বড় সমস্যাগুলোর কোনো সমাধান হবে? ভারত কূটনীতিতে, বিশেষ করে দুর্বল প্রতিবেশীদের সঙ্গে অনুসৃত কূটনীতিতে ষোল আনাই নিজের সুবিধা চায়, এক পয়সার ছাড় দিতেও সে রাজি নয়। দিল্লিতে কূটনৈতিক এনক্লেভের নাম 'চাণক্যপুরি'। চাণক্যের কূটনীতিতে বিশ্বাসী ভারতের কাছ থেকে কোনো উদারতা আশা করা বাতুলতা মাত্র। জেনারেল মইনকে শুভেচ্ছার নিদর্শনস্বরূপ ভারতীয় সেনাপ্রধান জেনারেল কাপুর ছয়টি ঘোড়া উপহার দিয়েছেন। আবার বলেও দেয়া হয়েছে, এই ঘোড়া ছয়টির দাম সাড়ে আট লাখ ডলার। উপহারের দাম বলে দিয়ে কেমন সুরুচির প্রকাশ ঘটানো হয়েছে তাতো বোঝাই যায়। এ যেন "শৈবাল দীঘিরে বলে দিলেম এক বিন্দু শিশির।"

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের সর্বশেষ হালচাল

ইতিহাস জ্ঞানের অভাব, জনগণের হাজার বছরের সংগ্রামের গতি-প্রকৃতি নির্ধারণে অক্ষমতা এবং ভারতের জাতিগত অজগর নীতি এবং রাষ্ট্রীয় পলিসির আগ্রাসী স্বরূপ অনুধাবনে ব্যর্থতা অথবা নীতি নির্ধারক পর্যায়ে অযোগ্যতা ও বিপথগামিতা ভারতের সাথে সম্পর্ক নির্ণয়ের সঠিক পথ আমাদের জন্য কোনটি, তা নিরূপণে ধূম্রজাল সৃষ্টি করে। ১৯৭১- সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের মানুষ পানির হিংস্র হাংগর থেকে বাঁচতে ডাঙ্গার হিংস্র বাঘের কোলে আশ্রয় নিয়েছিল। স্বাধীনতার প্রথম প্রহর থেকেই বাংলাদেশের মানুষ তা উপলব্ধি করে আসছে। কিন্তু জাতীয় প্রজ্ঞা ও আত্মবিশ্লেষণের অভাবে আমাদের রাজনৈতিক বা সামরিক নেতৃত্ব প্রতিবেশী ভারতকে চিনতে যেমন পারেনি, তেমনি ভারতকে মুকাবিলার লাগসই কৌশলও নির্ধারণ করতে পারেনি। অথচ বাংলাদেশের আর্থ-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যার বারো আনাই তৈরি করে

www.bjilibrary.com

রেখেছে ভারত ও তার এজেন্টরা। তারপরও বর্তমান নির্দলীয় অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেছিলেন, বাংলাদেশ ভারতের সাথে এমন সম্পর্ক তৈরি করবে, যা হবে 'চিরস্থায়ী'।

পররাষ্ট্র উপদেষ্টার এই বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ হয়েছে। আন্তর্জাতিক মানের রাষ্ট্র বিজ্ঞানী প্রফেসর ডঃ তালুকদার মনিরুজ্জামান পররাষ্ট্র উপদেষ্টার এই অ-কূটনীতিক সূলভ বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। সাধারণ রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করেন, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে চিরস্থায়ী সম্পর্ক হয় না। এমনকি প্রভু-গোলামের সম্পর্কও 'চিরস্থায়ী' হয় না। রাষ্ট্রাচারের নীতি-অবস্থান নিজ নিজ দেশের স্বার্থের অনুকূলেই হয়ে থাকে। প্রতিবেশী বৈরী ও আগ্রাসী শক্তির সাথে সম্পর্ক স্থায়ী করতে হলে রাষ্ট্রের সার্বভৌম সমতার সম্পর্ক থাকে না। সেটা প্রভু-গোলাম সম্পর্কে পর্যবসিত হতে পারে।

বর্তমান সরকারের থিংকট্যাংক হিসেবে যে সুশীল সমাজ আবির্ভূত হয়েছেন তাদের মতে, বিগত চারদলীয় জোট সরকারের আমলে ভারতের সাথে সম্পর্ক শীতলতার সর্বশেষ স্তরে নেমে আসে। তারা মনে করেন, এতে ভারতের কোন হাত বা ভূমিকাও ছিল না। এরা মনে করেন, চারদলীয় জোট সরকার ভারতের সাথে পাকিস্তানী আমলের অনমনীয় নীতি-অবস্থান গ্রহণ করায় সম্পর্ক হিমশীতলতায় এসে উপনীত হয়েছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে, জাতীয় স্বার্থের প্রশ্নে ছাড় না দিয়ে সুদৃঢ় নিরাপোষ নীতি অবস্থান গ্রহণ করা ছাড়া বড়ো প্রতিবেশীর কাছের ছোট প্রতিবেশীর আর কোন উত্তম পলিসি হতে পারে না। বিশ্বজনীন কূটনৈতিক সংস্কৃতির স্বীকৃত পলিসি হচ্ছে, বড়ো দেশের পাশের ছোট দেশকে কনজারভেটিভ বা এগ্রেসিভ-রক্ষণাত্মক হতে হয়। অন্যথায়, সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে। এই এগ্রেসিভ-রক্ষণশীলতার ফলেই বড়ো দেশ এক সময় ছোট দেশের সার্বভৌম সমতা স্বীকার করে নিয়ে যুক্তিসংগত শর্তে দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্কের উন্নয়ন সাধন করতে এগিয়ে আসতে বাধ্য হয়। আমেরিকার সাথে কিউবার নীতি-অবস্থান প্রশ্নে কিউবার নেতা ফিদেল ক্যাস্ট্রো যে নীতি অবলম্বন করেছেন, সেটাই ভারতের মতো বৃহৎ আঞ্চলিক শক্তির মুকাবিলায় বাংলাদেশের মর্যাদার সাথে টিকে থাকার উত্তম পলিসি হতে পারে। একথা না বলা পাপ হবে যে, বাংলাদেশের সার্বভৌম অস্তিত্বের পথে ভারতই প্রধান অন্তরায়। এ সত্য সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হবার পর কোন দেশপ্রেমিক নেতা বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার নামে ভারতের ইচ্ছা পূরণের করদরাজ্য হতে পারে না। ভারত সেটাই চাইছে। ১/১১-এর পর জাতি যখন একটি নির্বাচিত সরকারের প্রতীক্ষায় রয়েছে, তখন সেনা বাহিনী ও অন্তর্বর্তী কেয়ার টেকার সরকারের প্রতি ওপারের প্রলোভন ও বিপথগামিতার হাতছানি আমাদেরকে শংকিত করে তুলেছে। এই শংকা আরও প্রকট করে তুলেছে সম্প্রতি বাংলাদেশের সেনাপ্রধান জেনারেল মইন উ আহমেদের ভারত সফরের সময় ভারতের কিছু অশুভ আকাংখা এবং বাংলাদেশের কাছে তাদের অনাকাংখিত প্রত্যাশার পরিধি দেখে। এর আগে ভারতের একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জয়রাম রমেশ ঢাকায় এসে

www.bjilibrary.com

বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় 'সেক্যুলার' চরিত্র পুনর্বহালের দাবী জানান। অনেকেই জানেন, ১৯৭২ সালের সংবিধান প্রনয়ণের আগেই ভারতের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী তাদের পার্লামেন্টে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে যে আগাম ঘোষণা দেন, স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগ সরকার জনমত যাচাই না করে তা সংবিধানে এক প্রকার বাধ্যতামূলকভাবে সংযোজন করে। তবে শেখ মুজিব পাকিস্তান থেকে ফিরে এসে ঢাকা বিমানবন্দরেই যখন বাংলাদেশকে বিশ্বের "দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র" হিসেবে ঘোষণা দেন এবং দিল্লী সরকারের বারণ উপেক্ষা করে শেখ মুজিব লাহোরে ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (ও-আই-সি) সম্মেলনে যোগদান করে জাতি রাষ্ট্রের যে চরিত্র নির্ধারণ করেন, তখন থেকেই ভারত আশা ভংগের প্রতিশোধে প্রতীক্ষার প্রহর গুণতে থাকে। '৭৫-এর রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে বিসমিল্লাহ ও আল্লাহর ওপর আস্থা এবং বিশ্বাস সংযোজন করা হয়। সংবিধানের ৮ম সংশোধনীয় মাধ্যমে ইসলামকে রাষ্ট্র ধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এসব কিছুই হয়েছে জনমতের অনুকূলে এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায়।

প্রতিটি জাতি-রাষ্ট্রের চরিত্র নির্ধারিত হয় সে দেশের বৃহত্তর জনগণের ধর্মীয় বিশ্বাস, জাতিগত ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে। বাংলাদেশের জনগণের সরকার পদ্ধতি বাছাই, রাষ্ট্র সরকার পরিচালনায় পছন্দমাফিক নেতৃত্ব নির্বাচন এবং রাষ্ট্রের সংবিধান রচনার স্বাধীনতাও ভারতীয় আধিপত্যবাদী অন্তর্ঘাতের ঘূর্ণাবর্তে পড়ে বিপন্ন হতে চলেছে। ভারতের আঞ্চলিক আধিপত্যবাদকে আরও বেগবান ও বিপজ্জনক করেছে যায়নবাদীদের সুবিস্তৃত গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক। ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর সাথে ইসরাইলী গোয়েন্দা সংস্থা 'মোসাদ'-এর প্রাতিষ্ঠানিক, অবকাঠামোগত ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা ছাড়াও তাত্ত্বিক ও আদর্শিকভাবে তাদের মধ্যে ইসলাম বিনাশী অশুভ ঐক্য গড়ে উঠেছে। যার রাজনৈতিক লক্ষ্য হচ্ছে, হয় বাংলাদেশকে অকার্যকর-সংঘাতপূর্ণ ও দারিদ্র ক্লিষ্ট একটি রাষ্ট্রে রূপান্তর করা, আর না হয়, রাষ্ট্র ক্ষমতায় ভারতীয় আধিপত্যবাদ এবং ইউরো-খৃস্টীয় যায়নবাদী চক্রের পক্ষে 'ফিফ্থ কলামিস্টের' ভূমিকা পালনকারী ব্যক্তিদের মনোনীত একটি তাবেদার সরকারকে ক্ষমতায় বসানো। বাংলাদেশের জনগণকে ঐতিহ্যবাহী গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতির বদলে 'সংস্কারের নামে' রাজনীতি শূন্যতার এক ঘূর্ণাবর্তে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। বৈশ্বিক রাজনীতিতে ইসলাম ও মুসলিমদের চানমারীর নিশানা বানানোর ফলে ৯/১১-উত্তর কালে সন্ত্রাস নির্মূলের নামে, 'ইনফিনিট জাস্টিস'-এর নামে, যে অন্তহীন যুদ্ধের দাবানল জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, বিলম্বে হলেও বাংলাদেশে তার উত্তাপ এখন তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে। বাংলাদেশের মানুষ গভীর আশংকা ও বিস্ময়ের সাথে প্রত্যক্ষ করছেন যে, অতি সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমাদের সরকারের আপত্তি উপেক্ষা করে 'হরকতুল জেহাদ' বা হুজি-র মতো রহস্য জনক সংগঠনকে 'আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী' সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করেছে। গত বছর ভারতের প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং

www.bjilibrary.com

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে গিয়ে বলে এসেছিলেন যে, বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক ইসলামী জঙ্গীদের 'অভয়ারণ্য' হয়ে ওঠার আশংকা করছেন তারা। এদিকে ভারত বেশ কিছুদিন ধরে সুযোগ পেলেই বাংলাদেশের রহস্যাচারী ও জনগণের কাছে অপরিচিত হুজি-র বিরুদ্ধে তাদের দেশের বোমাবাজি ও সন্ত্রাসের সম্পর্ক আবিষ্কার করে বাংলাদেশকে পাকিস্তানের মতোই বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিতে চাইছে। এ অবস্থায় বাংলাদেশকে রাষ্ট্রীয়ভাবে আরও প্রতিবাদী এবং সামাজিকভাবে আরও কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, আমাদের সেনাবাহিনীকে মনস্তাত্ত্বিক বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে সুশীল-এলিটদের অনুগামী এবং প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় সেনাবাহিনীর লাঠিয়াল বানিয়ে দেশটিকে ভারতের করদ রাজ্য বানানোর চক্রান্ত চলছে।

উল্লেখ্য যে, প্রথমত ঃ ভারত একটি বৃহৎ আঞ্চলিক শক্তি, তার সামনে পরাশক্তি হবার হাতছানি।

দ্বিতীয়তঃ একাত্তরের যুদ্ধে সহায়তার সূত্রে ভারত বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও তার দ্বৈততা-দুর্বলতা জালে বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের একাংশের ক্ষমতার লোভ, ক্ষমতার জন্য সংঘাত, বুদ্ধিজীবীদের একাংশের অর্থলোভ ইত্যাদি ব্যবহার করে তাদের দীর্ঘদিনের গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক এগিয়ে নিচ্ছে।

তৃতীয়তঃ পাকিস্তান-পর্ব থেকে শুরু করে বাংলাদেশের উদ্ভবকাল এবং পরবর্তী ৩৬ বছরে বাংলাদেশের উত্থান-পতনে ভারতই হচ্ছে একমাত্র আঞ্চলিক অনুঘটক ও ঘটনা প্রবাহের নিবিড় পর্যবেক্ষক। বাংলাদেশের বিভিন্ন সেক্টরে ভারতের বিপুল সংখ্যক 'পঞ্চম বাহিনী' সক্রিয়। স্বাধীনতার পর এসব 'পঞ্চম বাহিনীর' কবল থেকে দেশ মুক্ত করার কোন রাজনৈতিক কর্মসূচী কোন পক্ষই নেয়নি।

চতুর্থতঃ একক বিশ্ব ব্যবস্থার সুবাদে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'বৃহৎ' আঞ্চলিক সুহৃদ হিসেবে ভারতের বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্তি এবং গণচীনের বিরুদ্ধে ভারতকে দাঁড় করানোর সাম্রাজ্যবাদী ষ্ট্র্যাটেজি ভারতকে জবাবদিহিহীন আঞ্চলিক দানবে পরিণত করেছে। পশ্চিমাদের এই সুহৃদ রাষ্ট্র-শক্তিটির বেশ কিছু অনাচার ও পড়শীদের উপর তার দাদাগিরিকে বিশ্ব-পরাশক্তি সমূহ উপেক্ষার নীতিতে গ্রহণ করেছে। এছাড়াও ভারতীয় উচ্চ শিক্ষিত ও দক্ষ নাগরিকদের একটি অংশ বিশ্বব্যাংক, এডিবি সহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সংস্থায় চাকুরীর সুবাদে ভারতের আধিপত্য সংরক্ষণে এসব সংস্থার পদ-পদবী ব্যবহার করে বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক ফোরামে আরও কোনঠাসা করে রেখেছে।

পঞ্চমতঃ বর্তমান করপোটোক্রেসীর যুগে যেখানে তেল-গ্যাস-কোম্পানী-অস্ত্র উৎপাদক, অস্ত্র ব্যবসায়ী এবং আন্তর্জাতিক লগ্নি পুঁজির দাসত্ব করতে বাধ্য হচ্ছে বিশ্ব রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ, সেখানে বাংলাদেশের রাজনীতিতেও এই মহলের ভয়ংকর থাবা

www.bjilibrary.com

বিস্তৃত হয়েছে অবধারিতভাবে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক খাতের সাফল্য, অচিরেই মধ্যবর্তী আয়ের দেশ হিসেবে বাংলাদেশের আত্মবিকাশের উজ্জ্বল সম্ভাবনা, আমাদের তেল-গ্যাস, কয়লাখনি এবং ভৌগোলিক গুরুত্বপূর্ণ ষ্ট্র্যাটেজিক অবস্থান বাংলাদেশকে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী শক্তির টার্গেটে পরিণত করেছে। বিগত চারদলীয় জোট সরকারের কাছে সুবিধা চেয়ে যারা পায় নি, সেই বিশ্বব্যাংক, এডিবি, এশিয়া এনার্জী, টাটা, ইউনোকল মিলে জাতীয় রাজনীতিতে ধ্বংসের প্রলয় ডেকে এনেছে। বেগম খালেদা জিয়া, শেখ হাসিনা নিজেরা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হলেও তাঁরা দুজনই এদের বিরাগভাজন হয়ে মামলা মাথায় নিয়ে জেলের ঘানি টানছেন।

ষষ্ঠতঃ অনেকেরই মনে থাকার কথা, ১/১১- এর পরিবর্তনের সাথে সাথে ভারতীয় মিডিয়া তাদের দীর্ঘ দিনের আশা পূরণে বাংলাদেশ এবার অনুগত সহযোগী হবে বলে আশাবাদী হয়েছিল। ভারতীয় মিডিয়ার ভাষ্যকাররা পরিষ্কার করে লিখেছেন যে, জাতিসংঘের শান্তি মিশনে বাংলাদেশী সেনাবাহিনীর সম্পৃক্ততার কারণে সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল বা জাতীয় নীতি নির্ধারণে অন্যান্য সামরিক জান্তার মতো স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী ভূমিকা নিতে পারবে না। ১/১১-এ বা তার আগে সেনাবাহিনীর ক্ষমতা দখল না করার পেছনে এই বিশ্লেষণ ভূমিকা রেখেছে বলে অনেকে মনে করেন। অতি সম্প্রতি সেনা প্রধান জেনারেল মইন উ আহমদের ভারত সফরকে উপলক্ষ করে ভারতীয় সাংবাদিক- থিংকট্যাংকের সদস্যরা এমন কিছু কথা বলেছেন, যাতে মনে হতে পারে যে, ভারত বাংলাদেশ প্রশ্নে এখন আমাদের সেনা বাহিনীর উপর বেশি আস্থাশীল হয়েছে। ভারতীয়দের এই আস্থার কারণ জানা না গেলেও ভারতীয় সংবাদ বিশ্লেষক ও নিরাপত্তা ভাষ্যকার হিরন্ময় কারলেকার ও ভাস্কর রায় লিখেছেন যে, বাংলাদেশের সেনা প্রধান ভারতের কাছে তার ক্ষমতার 'বৈধতা' Legitimacy চান। এমনকি হিরন্ময় কারলেকার ভারতের The Pioneer পত্রিকার ২৭ ফেব্রুয়ারী/০৮ সংখ্যায় লিখেছেন ঃ "Gen. Moeen U Ahmed, Chief of Army Staff, Bangladesh has requested Indian authorities not to insist on the release of Sheikh Hasina and Begum Khaleda Zia, leaders of the Awami League and the Bangladesh Nationalist Party, before the election in his country." তবে এই অনুরোধটা জেনারেল মইনের নামে চতুর ভারতীয় সাংবাদিকরা চালিয়ে দিলেও এটা ভারতেরই এজেন্ডা বলে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহল মনে করেন। অপর ভারতীয় লেখক ভাস্কর রায়ের লেখার সূত্রেই বলতে হচ্ছে যে, বেগম খালেদা জিয়াকে ইন্ডিয়ান আঁতেলরা ভারতীয় স্বার্থের প্রশ্নে ভারত বৈরী অনমনীয় রাজনীতিক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। একই সাথে তারা পাক-চীন-সৌদী লবীর সাথে শেখ হাসিনার সাম্প্রতিক সময়ের নবতর নির্বাচনী আঁতাতের কারণে তাঁর ওপরও বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছেন। গ্রেফতার হবার আগে শেখ হাসিনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকা অবস্থায় ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়ের সাথে টেলিফোনের আলাপে আস্থা পুনরুদ্ধার ও তার দুর্দিনে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবার

www.bjilibrary.com

অনুরোধ জানিয়ে সাড়া পান নি। যার ফলে দেশে এসে তাকে গ্রেফতার হতে হয়েছে। সুতরাং মাইনাস টু' বা মা'ইনস থ্রি' ফর্মূলা নয়াদিল্লীর সাউথ ব্লক এবং 'র' এর হাত ঘুরে বাংলাদেশে এসেছে বলে অনেকে বিশ্বাস করছেন। ভারতীয় সাংবাদিকরা সেটাকেই সেনা প্রধানের এজেন্ডা হিসেবে চালিয়ে দিতে চাইছেন। হিরন্ময় কারলেকার নিজের পরিচয় লুকালেও তিনি যে ভারতের এস্টাবলিশমেন্টেরই থিংকট্যাক হিসেবে কাজ করেছেন, তা তার লেখায়ই সুস্পষ্ট। তিনি লিখেছেন ঃ Before gifting legitimacy to Gen. Moeen U Ahmed, India must insure that he closes the camps Bangladesh maintains for North-Eastern insurgents, handover ULFA'S Paresh Baruah. (Anup Chetia alone is not enough), tries war criminals and curbs the JIB. It must also demand that the present regime holds the elections on time and lifts the draconian restrictions on political activity and press freedom it has imposed. It owes this to the course of democracy. (The pioneer : Feb. 27-2008) বাংলাদেশের গণতন্ত্র, নির্বাচন, প্রেস ফ্রীডম চালু এবং জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার ভারতীয়দের চমক সৃষ্টির কুশলতা। সবাই জানেন, আমাদের সংবিধান নির্ধারিত নির্বাচন বানচাল ছিল ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' এর নাম্বার ওয়ান এজেন্ডা। মাইনাস টু বা মাইনাস থ্রি ফর্মূলা বাস্তবায়ন করে ভারত প্রহসনের নির্বাচনে তাবেদার সরকার প্রতিষ্ঠা করতে চায়। নির্বাচনের তাকিদটা এজন্যই। অনুপ চেটিয়াকে ভারতের হাতে তুলে দেওয়া কিংবা বাংলাদেশের ভেতরে তথাকথিত জঙ্গীঘাঁটি বন্ধ অথবা আমাদের সেনাবাহিনীকে সাথে নিয়ে "যৌথ অভিযান" চালানোর নামে পাকিস্তানের ওয়াজিরিস্তানের মতো গৃহযুদ্ধের সূচনার যে প্ররোচনা ও চাপ দিয়ে আসছে ভারত, তা থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব না হলে বাংলাদেশকে ইরাক কিংবা আফগানিস্তানের পরিণতির দিকে ঠেলে দেওয়ার নেপথ্য কুশীলবরাই জয়ী হতে পারে। হিরন্ময় কারলেকার বছর কয়েক আগে বাংলাদেশের জঙ্গীবাদ নিয়ে 'ডেইলি স্টার-প্রথম আলো' -যুগলের বানোয়াট রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে একখানা বই লিখেছিলেন, যার নাম হচ্ছে– Bangladesh : Next Afghanistan? কিন্তু এখনও বাংলাদেশকে আর একটি আফগানিস্তান হতে দেয়নি বাংলাদেশের মানুষ। তবে জনগণ ও তাদের আস্থাভাজন রাজনৈতিক নেতৃত্বকে নিষ্ক্রিয় ও সিদ্ধান্তহীন করে রাখা হলে নকল জঙ্গীবাদীরা বাংলাদেশকে আফগানিস্তান বানাবে না, তার নিশ্চয়তা কোথায়?

আমাদের সেনা প্রধান একাত্তরের যুদ্ধে ভারতীয় সেনা বাহিনীর নিহত সদস্যদের সমাধি-স্মারকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন। ভারতীয় সূত্র দাবী করেছে, ২৫ শে মার্চকে "শোক দিবস" হিসেবে পালন করে ভারতীয় আত্মত্যাগী সৈনিকদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হবে এবং এরপর প্রতিবছরই এটা করা হবে। ভারত নতুন করে স্থল ট্রানজিট, টাটার বিনিয়োগ বাস্তবায়ন, চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার, বাংলাদেশের গ্যাস-কয়লার ওপর

www.bjilibrary.com

আধিপত্য প্রতিষ্ঠা, তাদের দেশের কয়েক কোটি 'অবৈধ' বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের ফিরিয়ে আনা সহ উত্তর-পূর্ব-ভারতের নিরাপত্তা রক্ষায় বাংলাদেশকে যুদ্ধফ্রন্ট হিসেবে ব্যবহারের প্রস্তাব গিলাতে চায়। ৩৬ বছর পর বাংলাদেশের ভারতীয়করণ প্রক্রিয়া তাই নব উদ্যমে শুরু হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

কিন্তু বাংলাদেশ আজও একাত্তরের আত্ম সমর্পণের মূল দলিল ফেরৎ পায় নি। আত্মসমর্পণ দলিলে বাংলাদেশকে পক্ষ না করায় ভারত বাংলাদেশের কাছে অনুশোচনাও করেনি, একাত্তরের লুণ্ঠনের খেসারতও দেয়নি, আমাদের পানির হিস্যা আটকে রেখে দেশকে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেবার ষড়যন্ত্র আরও ব্যাপক করেছে ভারত। সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে আমাদেরকে বৈরী হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। গঙ্গার প্রবাহ বন্ধ ছাড়াও সবকটি অভিন্ন আন্তর্জাতিক নদীতে ভারত একতরফা বাঁধ দিয়ে রেখেছে। নতুন করে টিপাই মুখে বাঁধ দিয়ে মেঘনার প্রবাহ স্তিমিত করা ছাড়াও ব্রহ্মপুত্রের পানি ডাইভার্ট করার লক্ষ্যে সংযোগ বাঁধের মহাপরিকল্পনা নিয়েছে নয়া দিল্লী। ভারতের একতরফা বাণিজ্য ঘাটতির তোড়ে বাংলাদেশের অর্থনীতি ফোকলা হচ্ছে। সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া ছাড়াও পুশ ইন, বিএসএফ-এর বাংলাদেশী হত্যার উৎসব চলছে। সীমান্ত-সংঘাত জিইয়ে রাখার জন্য ১৯৭৪-এর মুজিব-ইন্দিরা চুক্তির র‍্যাটিফিকেশন না করা, তিনবিঘা করিডোরের স্বত্ব-প্রত্যর্পণ না করা এবং তালপট্টি জবর দখল করে রাখা সহ ভারত আমাদের সমুদ্র সীমায় অব্যাহত আগ্রাসী তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। ভারত সরকারের প্রশ্রয়েই ডাঃ কালীদাস বৈদ্য, চিত্ত রঞ্জন সুতারদের নেতৃত্বে 'স্বাধীন বঙ্গভূমি' আন্দোলন চলছে।

এই অবস্থায় বাংলাদেশ যদি জাতীয় স্বার্থ, রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সতর্ক ও কঠোর না হতে পারে, তাহলে স্বাধীনতার স্বপতি শেখ মুজিব, স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ জিয়ার স্বপ্নই শুধু ব্যর্থ হবে না, বাংগালী মুসলিমদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত প্রিয় বাংলাদেশকেও রক্ষা করা যাবে না। ভারতের সাথে আমাদের রাষ্ট্রাচারের মডেল কী হবে, নতুন করে তার গবেষণার প্রয়োজন নেই। মরহুম শের-এ বাংলা ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদী, মজলুম জননেতা মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, মরহুম শেখ মুজিবর রহমান, শহীদ জিয়ার আদর্শেই আধিপত্যবাদী ভারতের প্রতি আমাদের জাতিগত আচরণের দিকদর্শন নিহিত রয়েছে। ১৯৭১-এ যারা ভারতীয় আধিপত্যবাদের শৃংখল এড়াতে স্বাধীনতার প্রতিপক্ষ বা বিরোধী হিসেবে নাম লিখিয়েছেন এবং এখনও যারা সেই পুরনো রাজনৈতিক অবস্থানের অপবাদে নানাভাবে খেসারত দিচ্ছেন, ইতিহাস তাদের সামনে আধিপত্যবাদী চক্র ও মীরজাফরী পঞ্চম বাহিনীর কবল থেকে প্রিয় মাতৃভূমির আজাদী রক্ষার সম্মুখ সমরে রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেবার আর একটি সুযোগ এনে দিয়েছে। এবারে ভুল করলে স্পেনের মতো জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী শক্তির চূড়ান্ত পরাভব ঘটতে পারে এই বাংলাদেশে। তবে দেশ রক্ষার এ মহাসংকটে এ দেশের ইসলামী শক্তিকে সুসংহত করে দেশপ্রেমিক শক্তি

www.bjilibrary.com

নিয়ে একাত্তরের মতোই মহাসংগ্রামের নয়া ইতিহাস নির্মাণের উদ্যোগ নিতে হবে এটাই সময়ের দাবী। 'পাকিস্তান ভাংগার' আত্মস্বীকৃত কুশীলব এবং ১৯৭১-এর ২৫শে মার্চের ক্র্যাকডাউনের পূর্ব পর্যন্ত শেখ মুজিবের গোপন মিশনে ভারতীয় পক্ষের কন্টাক্ট পারসন ডাঃ কালীদাস বৈদ্য ১৯৭৫-এর বিপর্যয়ের পর আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে ভারতে গিয়ে সাহায্য না চাওয়ায় ক্ষোভের সাথে শেখ মুজিবের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, তিনি তার রাজনৈতিক অনুসারীদের 'বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে' বলে গেছেন যে, ভারতকে কখনও বিশ্বাস করবে না। সুযোগ পেলেই ভারত বাংলাদেশকে গ্রাস করবে। শত বিপদে পড়েও তোমরা কখনও রাজনৈতিক সাহায্যের জন্য ভারতমুখী হবে না। অনেক কষ্টে আমি ভারতীয় সেনাদের ভারতে পাঠিয়েছি। ভারতীয় সেনারা বাংলাদেশে আবার আসার সুযোগ পেলে তারা আর ফিরে যাবে না। (বাঙ্গালির মুক্তিযুদ্ধে অন্তরালের শেখ মুজিব, ডাঃ কালিদাস বৈদ্য ঃ পৃ-২১৫)

এই ডাঃ কালিদাস বৈদ্য ভারতে অবস্থান করে বাংলাদেশের সীমান্ত সন্নিহিত দক্ষিণ-পশ্চিমের কয়েকটি জিলা নিয়ে "স্বাধীন বঙ্গভূমি" প্রতিষ্ঠার আন্দোলন চালাচ্ছেন। জঙ্গী ঘাঁটি ধ্বংসে বা বাংলাদেশে বিদেশী প্ররোচনায় সংগঠিত কথিত ইসলামী জঙ্গীবাদ দমনে ভারতের "যৌথ সামরিক অভিযান" পরিচালনার লক্ষ্য পূরণ হলে কিংবা উত্তর-পূর্ব ভারতের বিদ্রোহ দমনে তারা বাংলাদেশকে স্থল করিডোর হিসেবে ব্যবহার করতে পারলে বাংলাদেশ পরোক্ষভাবে ভারতীয় সেনাদের বিচরণ ভূমিতেই পরিণত হবে। সুতরাং সাবধান, মহা সাবধান! ■

লেখক পরিচিতি : আজিজুল হক বান্না– বিশিষ্ট সাংবাদিক এবং কলামিস্ট।

লেখা পরিচিতি : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত ২৭শে মার্চ, ২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সেমিনারে প্রবন্ধটি উপস্থাপিত হয়।

www.bjilibrary.com

বাংলাদেশের প্রতি ভারতের আচরণ

ড. মাহফুজ পারভেজ

■

বৈরী আচরণ, যাকে তাত্ত্বিক ভাষায় আধিপত্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদ বলা হয়, সেটা ঐতিহাসিকভাবেই ভারত-কর্তৃক বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য প্রতিবেশি দেশের ওপর প্রবল ও ভয়ঙ্করভাবে লক্ষ্যণীয়। আন্ত র্জাতিক/আঞ্চলিক সম্পর্ক/ রাজনীতির প্রধান আলোচ্য বিষয়ের মধ্যেও ভারতের বৈরী আচরণ সংক্রান্ত পাঠ বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে অধীত। দক্ষিণ এশিয়া, ভারত, পাকিস্তান বা বাংলাদেশ বিষয়ক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং শীর্ষ গবেষকগণ দীর্ঘকাল ধরে রাষ্ট্রগত সম্পর্কের নিরিখে বৈরী আচরণ তথা আধিপত্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদ প্রসঙ্গে নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা চালিয়ে ভয়াবহ তথ্য উপস্থাপন করেছেন। ২০০৮ সালে স্বাধীনতার ৩৬ বছরঃ বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক বিষয়ক পর্যালোচনায় কিছু মৌলিক প্রশ্ন বা ইস্যু আমাদের সামনে চলে আসে, যার মাধ্যমে ভারতের বৈরী আচরণের ধারাবাহিকতা ফুটে উঠে। যেমনঃ

www.bjilibrary.com

১. বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূলকথা: কারও সাথে শত্রুতা নয়, সবার সাথে বন্ধুত্ব। বাংলাদেশ কারও সঙ্গে শত্রুতা না করলেও অনেক বারই শত্রুতার শিকার হয়েছে। প্রচার-প্রচারণা ও অন্যবিধভাবে বাংলাদেশের ইমেজ বিনষ্ট বা বাংলাদেশকে নেতিবাচক পরিচয়ে পরিচিত করার প্রচেষ্টা ভারতীয় পক্ষ থেকে লক্ষ্য করা গেছে।

২. দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর সহযোগিতামূলক সংস্থা 'সার্ক'-এর বাংলাদেশও একটি সদস্য রাষ্ট্র, ভারতও একটি সদস্য রাষ্ট্র। প্রতিটি দেশই স্বাধীন। কিন্তু সাত দেশের মধ্যে ভারতের দাদাগিরির বিষয়টি বার বার দেখা যাচ্ছে।

৩. ভারতের সাথে বাংলাদেশের কয়েকটি বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। যেমন:

ক) ভারত আমাদের প্রতিবেশি দেশ। ভারতের সাথে রয়েছে আমাদের সীমান্ত সম্পর্ক।

খ) ভারতের সাথে রয়েছে আমাদের অভিন্ন নদী এবং পানি সম্পর্ক।

গ) আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারত আমাদের সাহায্য করেছে।

ঘ) আমাদের উভয় দেশের মধ্যে রয়েছে উভয়ের ছিটমহল।

ঙ) উভয় দেশের মধ্যে রয়েছে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পর্ক।

৪. সকল প্রকার বিষয়ে বাংলাদেশ তার প্রতিবেশি রাষ্ট্র ভারতের সাথে সমমর্যাদা এবং অধিকারের ভিত্তিতে বন্ধুত্ব ও সুসম্পর্ক রাখতে চায়। একই মানসিকতা ভারতের কাছে প্রত্যাশা করে পাওয়া যায় নি।

৫. বরং আমরা ভারতের পক্ষ থেকে বেশ কিছু সমস্যাও লক্ষ্য করছি। কোনও কোনও ক্ষেত্রে লক্ষ্য করছি বৈরিতা। এর মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল:

ক) বাংলাদেশের প্রাপ্য পানির হিস্যা না পাওয়া।

খ) বাণিজ্য বৈষম্য।

গ) ছিটমহল সমস্যা।

ঘ) বিএসএফ কর্তৃক আমাদের জনগণ এবং জোয়ানদের হত্যা করা।

ঙ) নতুন চর ও দ্বীপ নিয়ে সমস্যা।

চ) সন্ত্রাসীদের আশ্রয়-প্রশ্রয় প্রদানের সমস্যা।

ছ) সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদ।

জ) বড় ভাই সুলভ আচরণ।

৬. স্বাধীনতার ৩৬ বছরে এসব ক্ষেত্রে আমাদের অধিকার এবং মর্যাদা পেয়েছি কি-না, তা বিশ্লেষণ করা হলে হতাশ হতে হয়। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই আমরা ভারতের কাছ থেকে ন্যায্য অধিকার ও মর্যাদা পাই নি।

৭. দ্বিপাক্ষিক বিষয়গুলো নিয়ে বছরের পর বছর আলোচনা হলেও নিষ্পত্তি করা যায় নি মূলতঃ ভারতের সদিচ্ছার অভাবে।

৮. পিনাক বাবু (ভারতীয় হাইকমিশনার) বলেছেন, 'আমরা বাংলাদেশকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে দেখতে চাই।'

একটি স্বাধীন দেশকে এই ডিক্টেশন দেওয়ার অধিকার তার আছে কি ? এই প্রশ্নও সাধারণের মধ্যে দেখা দিয়েছে।

www.bjilibrary.com

বিদ্যমান বাস্তবতায় প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যভাবে বাংলাদেশ তথা দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে দৃশ্যমান ভারতীয় বৈরী আচরণ তথা আধিপত্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদের ক্রিয়াশীল-ঐতিহাসিক বীভৎস আক্রমণের সামগ্রিক চিত্রটি ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় জনগণ, বিশেষ করে, দেশপ্রেমিক-রাজনীতি ও প্রশাসনের সঙ্গে জড়িত নীতি প্রণেতাসহ সচেতন পাঠকের নজরে আসা অত্যন্ত জরুরি। পাশাপাশি বর্তমানের বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার সর্বগ্রাসী খোলা অর্থনীতি ও মুক্ত বাজার ব্যবস্থায় ভারতীয় সর্বব্যাপী আগ্রাসন ও সম্প্রসারণ প্রতিরোধে এ অঞ্চলের মুক্তি ও স্বাধীনতাকামী মানুষের জন্য এ বিপদ সম্পর্কে ঐক্যবদ্ধভাবে সচেতন, সংগঠিত, পরিজ্ঞাত ও প্রতিরোধমুখী হওয়াও একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য।

প্রসঙ্গত, ভারতীয় বৈরী আচরণ তথা ভারতীয় আধিপত্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদের মূল শক্তি নিহিত রয়েছে বর্ণ-হিন্দুত্ববাদের প্রাচীন ঐতিহ্যে, যা ইংরেজ আমলে পুনরুজ্জীবিত হয়ে বর্তমানে সর্বগ্রাসীরূপ পরিগ্রহ করেছে এবং ভারতের ভেতরে নিম্ন বর্ণ ও সংখ্যালঘু আর ভারতের বাইরে অন্য প্রতিবেশিদের নানাভাবে অবদমিত করার জন্য চরম বৈরী আচরণ করছে, যার কুপ্রভাব লক্ষ্যণীয় আন্তর্জাতিক রাজনীতি, আঞ্চলিক নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক স্বার্থবাদ ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলীর মধ্যেও।

সঙ্গত কারণেই, বিশেষজ্ঞ, গবেষক বা থিঙ্ক ট্যাঙ্ক, সুধী সমাজসহ সকলেই বাংলাদেশের প্রতি ভারতের বৈরী আচরণের ব্যাপারে ভীষণভাবে উদ্বিগ্ন। এ প্রসঙ্গে দৈনিক সংগ্রাম সম্পাদক এবং বিশিষ্ট লেখক ও বুদ্ধিজীবী আবুল আসাদ বলেন:

"ভারতীয় আধিপত্যবাদের একটি সর্বগ্রাসী দর্শন আছে। তারা মনে করে, প্রাচীনকাল থেকে বহমান তাদের শক্তি ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটাতে হবে দেশের সীমানা পেরিয়ে বাংলাদেশেও। এজন্য বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক বিভিন্ন ইস্যুতে আন্তরিকতার সাথে সমাধানের পথে এগুলেও ভারত সুকৌশলে তা এড়িয়ে যায়। তারা কোনও সমস্যারই সমাধান চায় না। বরং বাংলাদেশকে কিভাবে দাবিয়ে রাখা যায়, কিভাবে বাংলাদেশকে একটি অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত করা যায়, কিভাবে এই দেশটি তাদের হাতের মুঠোয় রাখা যায়--সেই অপকৌশলই তারা ক্রমাগত চালিয়ে যাচ্ছে। অর্থনীতি, বাণিজ্য, সীমানা নির্ধারণ, পানি বণ্টন, পররাষ্ট্রনীতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের এই ঘৃণ্য মানসিকতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ভারতের আধিপত্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদী নীতি নিয়ে এখন ব্যাপক বিশ্লেষণ ও আলোচনা-পর্যালোচনা হওয়া প্রয়োজন। এদেশের জনসমক্ষে তাদের চরিত্র আরও পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা জরুরি।"

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার (বিআইসি)-এর পরিচালক এবং মাসিক পৃথিবী ও মাসিক আল ইসলাম-এর সম্পাদক, বিশিষ্ট লেখক ও বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক এ.কে.এম. নাজির আহমদ বলেন: "ভারত একটি বড়ো দেশ। কিন্তু এই বড়ো দেশ পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্তদের অধিকাংশই বড়ো মনের অধিকারী বলে পরিচিত হতে পারেন নি।

www.bjilibrary.com

তাদের অনুসৃত নীতিতে আধিপত্যবাদী মনোভঙ্গি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। তাদের অনুসৃত নীতি দৃষ্টে মনে হয়েছে, ছোট দেশ হলে তার যেন চোখ তুলে তাকাতে নেই কিংবা মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে নেই। ভারত সরকারের আধিপত্যবাদী মনোভঙ্গিই ভারত-বাংলাদেশ সখ্যতার পথে প্রধান অন্তরায়। সখ্যতা তো কখনও একতরফা হয় না। বাংলাদেশ চাইলেও ভারত যদি তা না চায়, তাহলে সখ্যতা গড়ে ওঠে না। আর সখ্যতার শর্ত যদি হয় তাবেদারী, তাহলে বাংলাদেশ তা মেনে নিতে পারে না। স্বাধীনচেতা একটি জাতি তা কখনও মেনে নিতে পারে না। উল্লেখ্য যে, ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারে যখন উদারচিত্ত ব্যক্তিরা সমাসীন হয়েছেন, তখন অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিকভাবেই ভারতের সাথে বাংলাদেশের সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এই ক্ষেত্রে মি. মোরারজী দেশাই এবং মি. ভি.পি. সিং উজ্জ্বল উদাহরণ। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে অনেকগুলো বিরোধীয় বিষয় বিদ্যমান। ভারত সরকার যদি উদারচিত্ততা ও আন্তরিকতার সাথে এগিয়ে আসে, ক্রমান্বয়ে এগুলোর সমাধান সম্ভব। প্রয়োজন ভারত সরকারের আধিপত্যবাদী মনোভঙ্গির পরিবর্তন। ভারত সরকারের নীতি নির্ধারকদের মনে রাখা দরকার, যেই জনগোষ্ঠী ইসলামাবাদের আধিপত্য মেনে নেয় নি, সেই জনগোষ্ঠী দিল্লির আধিপত্যও কোনদিন মেনে নেবে না। অতএব আধিপত্যবাদী নীতি অনুসরণ করে বাংলাদেশের সাথে সখ্যতা স্থাপন করা সম্ভব হবে না।"

সাংবাদিক-রাজনীতিবিদ জনাব মুহাম্মদ কামারুজ্জামান বলেন:

"ভারতের আধিপত্যবাদের মূল লক্ষ্যই হলো অখণ্ড ভারত। তারা আবার সেই অখণ্ড ভারতকে পেতে চায়। এইজন্য যত প্রকার কূটকৌশল আছে, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তার সবগুলোই তারা প্রয়োগ করছে। বাংলাদেশের জন্য শুধু নয়, ইসলাম ও মুসলিমদের জন্যও ভারত একটি বড় সমস্যা। তারা শুধু এই দেশটিকে করতলগত করতে চায় না, চায় এদেশের ইসলামী কৃষ্টি-কালচার, আদর্শ-ঐতিহ্যকেও সমূলে ধ্বংস করতে। এজন্য ভারতের আগ্রাসী ভূমিকার ব্যাপারে আমাদের আরও সতর্ক হতে হবে। তাদের অপকৌশল ও কূটচাল যত বেশি আলোচিত হবে, এদেশের মানুষ ততো বেশি সতর্কতা অবলম্বন করতে পারবে।"

শিক্ষাবিদ ড. হাসান মুহাম্মদ মুঈনুদ্দীন বলেন: "আধিপত্য বিস্তারের স্বপ্ন লালন করছে ইহুদি, আমেরিকা ও ভারত। কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সাধারণ মানুষের কাছে খুব স্পষ্ট নয়। আজ সময় এসেছে সেসব স্পষ্ট করার। ভারতের আধিপত্যবাদের একটি নতুন কৌশল ও মাত্রা হলো মিডিয়া সন্ত্রাস। মিডিয়ার মাধ্যমে তারা তাদের অপসংস্কৃতি এদেশের ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দিচ্ছে। এসব ব্যাপারে আমাদের সজাগ হওয়া প্রয়োজন। প্রয়োজন ভারতের আধিপত্যবাদের সত্য ইতিহাস তুলে ধরা।"

উত্তরাধুনিক তাত্ত্বিক ও সংস্কৃতি-বিশ্লেষক ডা. ফাহমিদ-উর-রহমান বলেন: "ভারতীয় আধিপত্যবাদী মানসিকতা আজ যেভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, তাতে করে আমরা শঙ্কিত না হয়ে পারি না। তাদের দোসররা এদেশের মাটিতে বসে দেশকে ধ্বংস করার

www.bjilibrary.com

এক গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। ভারতীয় আধিপত্যবাদের সাথে সাথে তাদের দোসরদেরও স্বরূপ উন্মোচন করা প্রয়োজন। ভারত এমনই একটি ছুঁৎ-মার্গীয় দেশ, যেখানে তারা বর্ণাশ্রমের মাধ্যমে নিজ দেশের এক বৃহৎ অংশকে অচ্ছুত মনে করে দূরে ঠেলে দেয়, তারাই আবার বাংলাদেশের মানুষের কিভাবে বন্ধু কিংবা সুহৃদ হতে পারে ? বিষয়টি নিয়ে ভাববার অবকাশ আছে। আমাদের জেনে রাখা উচিত যে, ভারত বাংলাদেশকে কখনই আপন ভেবে কাছে টেনে নিতে পারে না। তাদের অভিধানে তেমন সহনশীল ও উদার চরিত্রের উদাহরণ নেই।"

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. আবদুল মা'বুদ বলেন: "ভারতের আগ্রাসী নীতি নতুন কোনও বিষয় নয়, এটা বহু পুরনো। বলা যায়, আধিপত্যবাদী ব্যাধিতে তারা সকল সময় আক্রান্ত ছিল এবং এখনও আছে।"

গবেষক-প্রাবন্ধিক জনাব শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির বলেন: "ভারতীয় আগ্রাসন এখন মারাত্মক আকার ধারন করেছে। সকল দিকেই তারা তাদের লালসার হাত সম্প্রসারিত করছে। তাদের তাবেদার এজেন্টরা এদেশের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে ঘাঁটি গেড়ে বসে আছে। অর্থনীতি ও সংস্কৃতি-এই দুই দিক থেকেই ভারত বাংলাদেশকে গ্রাস করতে চাইছে। কিন্তু তাদের জানা উচিত যে, পরাজয় বরণ করার জন্য মুসলিম জাতির সৃষ্টি হয় নি। আমরা অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে আত্মমর্যাদার সঙ্গে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সক্ষম হলে বাংলাদেশ ও আমাদের নতুন প্রজন্মকে ভারতীয় আগ্রাসন থেকে মুক্ত করতে পারবো ইনশাআল্লাহ।"

ইসলামী ব্যাঙ্কিং ও অর্থনীতি বিশেষজ্ঞ জনাব মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম বলেন: "বাংলাদেশের জন্য ভারতীয় আগ্রাসন আজ এক ভীতিকর অবস্থায় পরিণত হয়েছে। তারা বাংলাদেশকে গ্রাস করার জন্য চর্তুমুখী অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিকভাবে এদেশকে পঙ্গু করে দিচ্ছে। এদেশের বড় বড় চিহ্নিত সন্ত্রাসীকে তারা আশ্রয় দিয়ে তাদের মাধ্যমে এদেশে সন্ত্রাস ছড়িয়ে দিচ্ছে। তাদের চক্রান্তের জাল বিপুল-বিশাল। তবু আশার কথা এই যে, ভারতীয় আগ্রাসনকে এদেশের প্রকৃত মুসলিম জনগোষ্ঠী কখনও মেনে নেয় নি, আগামীতেও নেবে না।"

সাংবাদিক জনাব মীযানুল করীম বলেন: "ভারতীয় আগ্রাসন আগেও ছিল, এখনও আছে। আমাদের চিন্তা বাংলাদেশ নিয়ে। কারণ, ভারত এখন প্রকাশ্যে ও গোপনে বাংলাদেশের পেছনে উঠে পড়ে লেগেছে। এই দেশটিকে অকার্যকর ও ধ্বংস করার জন্য তারা সর্বপ্রকার কূটকৌশলের অস্ত্র ব্যবহার করছে।"

লেখক জনাব মাহফুজুর রহমান চৌধুরী বলেন:"ভারতের আগ্রাসী নীতি সম্পর্কে এদেশের জনগণকে সতর্ক করতে হবে। ভারতীয় চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা গড়ে তোলা এখন সময়ের অপরিহার্য দাবি।"

সাধারণভাবে লক্ষ্য করলে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভারতের বৈরী আচরণের উলঙ্গ প্রকাশ দেখা যায় ফারাক্কা, পানি বণ্টন, সীমান্ত বিরোধ, বাণিজ্য ঘাটতি, পুশ ইন, নাশকতা,

www.bjilibrary.com

অস্ত্র ও মাদক চোরাচালান এবং ভারতের উস্কানিতে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ অন্যত্র অন্তর্ঘাতমূলক সংঘাতসহ বেশকিছু ইস্যু/ফ্রোত্রের মধ্যে।

উদাহরণস্বরূপ মাত্র একটি ক্ষেত্রের (সীমান্ত সন্ত্রাস) উল্লেখ করা হলে দেখা যায় যে:

"১৯৭১ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বিএসএফ-এর হাতে ৯৩০০ বাংলাদেশী নিহত হয়েছে। ৩ হাজারের বেশি অপহৃত হয়েছে। ৮৫২ মহিলা ও শিশু ধর্ষিত হয়েছে।" কেবলমাত্র "২০০১ সালের ১০ অক্টোবর থেকে ২০০৬ সালের ১৮ মার্চ পর্যন্ত সময়কালে বিএসএফ-এর হাতে ৩৭৪ বাংলাদেশী নিহত হয়েছে। ৪৩৮ জন গ্রেফতার ও ৪২০ জন অপহৃত হয়েছে। ৮ শিশুসহ ৫৩ জন নিখোঁজ হয়েছে এবং ৬ নারী ধর্ষিত হয়েছে।" ভারতীয় ভূভাগে বাংলাদেশের ছিটমহলের সংখ্যা ৫১ হলেও তার আয়তন ২৯২২,২৫ একর। পক্ষান্তরে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতীয় ছিটমহলের আয়তন ২৭৪৯,১৫ একর, তবে সংখ্যায় ১১১টি; যাদের জীবন ভারতীয়দের হাতে জিম্মি। সিলেট, কুমিল্লা প্রভৃতি সীমান্ত-সংলগ্ন এলাকার বেশ কিছু কেস-স্টাডি করে দেখতে পেয়েছি যে, কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে এক ও অভিন্ন গ্রাম ও জনপদকে বিভক্ত করছে ভারত--ভেঙে দিচ্ছে তাদের চিরকালীন লেনদেন ও সামাজিক-ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক জীবন। এ চিত্র ৪ হাজার মাইল প্রলম্বিত বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের সর্বত্র পরিদৃশ্যমান; অথচ এর মাত্র ৬.৫ কিলোমিটারের জন্য ভারত অসমাপ্ত রেখেছে সীমানা নির্ধারণের কাজ; এমন কি, ১৯৭৪ সালে সীমানা নির্ধারণের লক্ষ্যে মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি বাংলাদেশ মেনে নিয়ে সংসদে পাস করালেও ভারত সেটা মেনে নেয়নি এবং যা এখনও 'অসমাপ্ত রয়েছে', এ অজুহাতে তাদের সংসদে পাশও করায় নি!

একই তথ্য দেখা যায়, ফারাক্কার পানি প্রাপ্তির পরিসংখ্যানেও, যেখানে গড়ে ওঠেছে প্রতিনিয়ত পানির হিস্যা কমিয়ে দেওয়ার রেকর্ড।

রৌমারীর ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ, বাণিজ্য ঘাটতির পরিসংখ্যান ও বাংলাদেশ বিরোধী ভারতীয় প্রচারণাসহ প্রায় সকল ক্ষেত্রে মিডিয়া ক্লিপিং ও আর্কাইভের তথ্য থেকে ভয়ঙ্কর সব তথ্য বেরিয়ে আসছে, যা ভারতীয় আধিপত্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদকে বুঝতে এবং এর মাত্রা-প্রকৃতি-গভীরতাকে অনুধাবন করতে সাহায্য করবে।

যেমন: বাংলাদেশ আরডিএস নামক বিস্ফোরক আমদানি বা উৎপাদন না করলেও ভারত সব সময়ই তার দেশের সহিংসতায় ব্যবহৃত ঐ বিস্ফোরকের জন্য বাংলাদেশকে প্রচণ্ডভাবে দোষারোপ করেছে। বাংলাদেশ বর্তমান মুসলিম জগতের মধ্যে মাত্র চারটি প্রকৃত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে তুরস্কের পর এবং মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার উপরে থেকে মুসলিম বিশ্বে দ্বিতীয় বৃহত্তম গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা হিসাবে স্বীকৃত হলেও তথাকথিত বৃহৎ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ধ্বজাধারী কিন্তু বর্ণ হিন্দুত্বের আধিপত্য ও সম্প্রসারণকামী ভারতের চোখে সেটা ধরা পড়ে না! নিজে প্রকৃত গণতান্ত্রিক দেশ হলেও ভারতের চোখে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিকতার ধারা ধরা পড়ে না। ভারত

www.bjilibrary.com

গণতান্ত্রিক চোখে তাকালে তার পাশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে অবশ্যই দেখতে পেতো/সাহায্য করতো, উপকার করতে না পারলে চুপ থাকতো, অন্তত ক্ষতি করতো না। ভারতের বাংলাদেশ বিদ্বেষী আধিপত্যবাদী-সম্প্রসারণবাদী আচরণ ও প্রচারণা ভারতের গণতান্ত্রিক মানসিকতাকেই প্রশ্নবিদ্ধ ও বিতর্কিত করেছে; দেশটির আগ্রাসী-আধিপত্যবাদী-সম্প্রসারণমূলক-বর্ণহিন্দুত্ববাদী মানসিকতাকেই ফুটিয়ে তুলেছে এবং বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ এশিয়ার ক্যানভাসে ভারতীয় আধিপত্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদ পর্যালোচিত হওয়ায় এর দানবীয় নগ্নরূপ আরো পরিষ্কারভাবে উন্মোচিত হয়েছে।

অতএব দক্ষিণ এশিয়া বা উপমহাদেশের সকল দেশকে এবং সেসব দেশের জনগণকে ভারতের আগ্রাসনবাদ ও সম্প্রসারণবাদের নানা দিক সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা নিয়ে আত্মরক্ষামূলক সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। বিশেষ করে, বাংলাদেশ ও এর মতো অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র শান্তিপ্রিয় প্রতিবেশি রাষ্ট্রসমূহকে নিরাপত্তা, উন্নয়ন, স্বাধীন ও অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে অধিকতর তৎপর হতে হবে। এবং এ সচেতন তৎপরতা কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে হলেই হবেনা; জনগণের মধ্যেও বিস্তৃত হতে হবে। কেননা, জনগণের মধ্যে আত্মপরিচয়, আদর্শবাদী মূল্যবোধ, স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট্যের শক্তিশালী উপস্থিতিই পারে ভারতসহ যে কোন আধিপত্য ও আগ্রাসনকে প্রতিহত করতে।

প্রসঙ্গত একটি বিষয় মনে রাখা দরকার যে, ভারতীয় আগ্রাসন বা আধিপত্যবাদ বলতে হিন্দু শ্রেষ্ঠত্ববাদী রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক এলিট শ্রেণীর অপতৎপরতাকেই সামনে দেখা যায়--যারা সরাসরি হিন্দুত্ব বা কৌশলে ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশের আড়ালে দেশের ভেতরের সিংহভাগ নিম্নবর্ণ এবং ভিন্ন ধর্ম ও জাতিত্বের মানুষকে এবং দেশের বাইরের অন্যান্য দেশের শান্তিপ্রিয় নিরীহ প্রতিবেশিদের প্রতিনিয়ত নিষ্পেষিত করছে। অতএব, ভারতীয় আগ্রাসন বা আধিপত্যবাদকে নিরীক্ষণ করতে হবে এই বর্ণহিন্দুত্ববাদী এলিট শ্রেণী এবং এদের উন্নাসিক ও আগ্রাসী চারিত্রিক মানসিকতার আদলে গড়ে ওঠা সমগ্র ভারতব্যাপী তৎপর নানা সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক-ধর্মীয় শ্রেণী-গোষ্ঠীর নিরিখে। কোনভাবেই ভারতীয় আগ্রাসন বা আধিপত্যবাদের সঙ্গে সে দেশে বসবাসকারী সাধারণ মানুষকে এক করে দেখা উচিত হবে না। একজন সাধারণ কাশ্মীরি, বা শিখ, বা মণিপুরী বা তামিল, বা হরিজন ভারতীয় হলেও কোনভাবেই দেশে বা দেশের বাইরে আগ্রাসন বা আধিপত্যের লড়াইয়ে লিপ্ত নন; তিনি এবং তার মতো অসংখ্য জাত-পাতে বিভক্ত ভারতীয়রা বরং নিজ দেশেই দলিত হচ্ছেন হিন্দুত্বের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠায় লিপ্ত বর্ণবাদী ভারতীয় শ্রেণীর হাতে। অতএব, বর্ণ হিন্দুত্বের ছদ্মাবরণে কার্যকর ভারতীয় বৈরী আচরণ, আগ্রাসনবাদ, আধিপত্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদকে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত ও অনুধাবন করাই আমাদের দেশ ও জনগণের অস্তিত্ব এবং বিকাশের স্বার্থে প্রয়োজন। ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় আমরা নিচের বিষয়গুলোকে যদি লক্ষ্য করি, তাহলে ভারতের চলমান বীভৎস, আক্রমণাত্মক আচরণ, বৈরিতা, আগ্রাসন ও আধিপত্যের ব্যাপারে একটি পরিষ্কার ধারণা পেতে পারি।

www.bjilibrary.com

১. ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির সময় বাংলাদেশ ছিল পূর্ব পাকিস্তান। সে সময় দিল্লিতে অনুষ্ঠিত বাটোয়ারা অনুযায়ী পাকিস্তানের ভাগের সম্পদ, অর্থ ও প্রাপ্য হিস্যা না পাওয়ায় স্বাভাবিকভাবে বাংলাদেশও সে সকল ন্যায্য অংশ প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এর সঠিক পরিমাণ ও পরিসংখ্যান পর্যন্ত নিরূপণ করা যায় নি।

২. সীমানা নির্ধারণের সময় অবিভক্ত বাংলার জনসংখ্যা অনুপাতে মুসলিমরা ন্যায্য হিস্যা পায় নি। যেসব অঞ্চল পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা ছিল, সেগুলো সাবেক পূর্ব পাকিস্তান তথা বর্তমান বাংলাদেশে আসতে পারে নি।

৩. ১৯৪৭ সালের পর থেকে আজ পর্যন্ত মুসলিম খেদাও আন্দোলনের নামে বাংলাদেশের সীমান্তরেখায় অবস্থিত ভারতের পশ্চিম বঙ্গের চব্বিশ পরগণা, নদীয়া, বর্ধমান, মালদা, মুর্শিদাবাদ, কুচবিহার, পশ্চিম দিনাজপুর, আসামের করিমগঞ্জ, কাছার, শিলচরসহ বা পশ্চিম বঙ্গ-আসাম-বিহারের লক্ষ-লক্ষ মুসলিমকে দাঙ্গা ও উত্তেজনার মাধ্যমে ভিটে-মাটি ছাড়া করে কিংবা সময়ে সময়ে 'পুশ ইন'-এর নামে নির্যাতন করে বা আতঙ্ক ছড়িয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঠেলে দিয়েছে।

৪. বিহারের মুসলিমদের গণহত্যার মাধ্যমে নিধন করার পর বাকীদের তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান বা বর্তমান বাংলাদেশে পাঠানো হয়, যারা পরে এদেশে সামাজিক-রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণ ঘটায় এবং ভারতীয় রাজনীতির বলি হয়ে দেশহীন মানুষ হিসাবে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে বিপন্ন জীবন যাপন করছে।

৫. ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত সময়কালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান বা আজকের বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল রাখতে এবং সংহতি বিনষ্ট করতে ভারতের পক্ষ থেকে নানা ষড়যন্ত্র ও প্রকল্প নেওয়া হয়। পূর্ব পাকিস্তান যাতে মাথা উঁচু করে না দাঁড়াতে পারে, সেজন্যও নানাভাবে তৎপর ছিল ভারত এবং গোয়েন্দা সংস্থাসহ সামরিক-বেসামরিক প্রতিষ্ঠানসমূহ। এহেন দেশ ও জাতিবিরোধী কাজকে আমাদের আবেগ ও অনুভূতির সঙ্গে মানান সই করার জন্য স্বাধিকার বা জাতীয়তাবাদী স্রোতের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়। পরে ভারতের নানা সূত্রে প্রকাশ পায় যে, আসলে সেগুলো ষড়যন্ত্র ছিল।

৬. ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ভারত মূলত আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে প্রবাসী সরকার গঠন করে। এতে আওয়ামী বিরোধী কাউকে রাখা হয় নি। এমন কি, মাওলানা ভাসানীসহ জাতীয়তাবাদী নেতাদের গৃহবন্দী বা নজরবন্দী রাখা হয়। বহু দেশপ্রেমিক-স্বাধীনচেতা-জাতীয়তাবাদী নেতা-কর্মী ভারতীয় বাহিনী কর্তৃক নিহত হন। নেতৃত্বের ওপর এ ধরনের রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার আধিপত্য ও

www.bjilibrary.com

নিয়ন্ত্রণকে সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যাভিসারী, যা পরে নানা ক্ষেত্রে বিস্তৃত হয়ে স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়।

৭. শুধু নেতৃত্বই নয়, সমগ্র মুক্তিযুদ্ধকেই সব সময় ভারতের নিয়ন্ত্রণে ও তার পছন্দের নেতৃত্বের অধীনে রাখা হয়, যাতে যুদ্ধ শেষে বাংলাদেশ সব সময়ের জন্য ভারতে অনুগত ও নিয়ন্ত্রণে থাকে। ভারতের অপছন্দের রাজনীতিকরা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে গিয়ে সীমাহীন বাধা ও হেনস্তার সম্মুখীন হন। কেউ কেউ অন্তর্দ্বন্দ্বের শিকার হয়ে নিহত হন কিংবা প্রাণ বাঁচাতে ভারত থেকে পালিয়ে স্বদেশের মাটিতে ফিরে আসেন।

৮. চীনপন্থী কমিউনিস্টরা ভারতের বিরাগভাজন হওয়ায় ভারতের আশ্রয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নেওয়ার সুযোগ পান নি; তারা দেশের ভেতর থেকেই স্বতন্ত্রভাবে মুক্তিযুদ্ধ করতে থাকেন।

৯. ভারত ধর্মনিরপেক্ষ, বিশেষ করে ইসলাম ও মুসলিমবিরোধী হওয়ায় ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলের পক্ষে ভারতে যাওয়া নিরাপদ ছিল না। বাংলাদেশ সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশ হলেও ভারত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি ছাড়া দেশপ্রেমিক-জাতীয়তাবাদী-ইসলামিক শক্তির অংশ গ্রহণের পথ রুদ্ধ করে রাখে। ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিকে সঙ্গে নিয়ে তারা মিত্র বাহিনী গঠন করে এবং বাংলাদেশের ইতিহাস চেতনা ও রাজনৈতিক সংগ্রামের ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার মূলে কুঠারাঘাত করে ১৯৭১ সালের পরে বাংলাদেশের মুসলিম জাতিসত্তার উপরে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মহীনতাকে চাপিয়ে দেওয়ার পরিবেশ সৃজন করে।

১০. বাংলাদেশের প্রধান সেনাপতিকে বাদ দিয়ে ভারতীয় জেনারেলের হাতে পাকিস্তানি বাহিনীকে আত্মসমর্পন করানো হয়। যুদ্ধের ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ডিসেম্বর ১৯৭১ যখন ভারতীয় বাহিনী ও পাকিস্তানের সৈন্যদের মধ্যে আত্মসমর্পনের আলোচনা চলে তখন বাংলাদেশ বাহিনীর কারও কোনও মতামত বা পরামর্শ নেওয়ার তথ্য পাওয়া যায়নি। এমন কি, ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে মিত্র বাহিনী গঠিত হলেও এ বাহিনীর কৌশল, পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়নের জন্য কোথায় ও কখন মিটিং বা আলোচনা হয়েছে সেটারও কোনও তথ্য নেই।

১১. যুদ্ধের পর পাকিস্তানের যুদ্ধবন্দীদের ভারতীয় বন্দীদের সঙ্গে বিনিময় করা হয়। এর ফলে বাংলাদেশ পাকিস্তানের সঙ্গে কোন দরকষাকষি বা পাওনা সম্পদ ও অর্থ আদায়ার্থে সামান্যতম চাপ দিতে পারে নি; বরং ভারত প্রায় এক লক্ষ বন্দী সৈন্য ও তাদের কাছ থেকে পাওয়া বিরাট অস্ত্রসম্পদের বিনিময়ে পাকিস্তানের কাছ থেকে প্রভূত সুযোগ-সুবিধা আদায় করতে সমর্থ হয়। তদুপরি পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণের দলিলটি ভারতের কাছে সংরক্ষিত থাকায় বিষয়টি ভারতীয় আধিপত্যবাদের নির্লজ্জ কালিমায় কলঙ্কিত হয়।

www.bjilibrary.com

১২. ভারতের কলিকাতাস্থ ফোর্ট উইলিয়ম সেনানিবাসে ১৬ ডিসেম্বর ভারত পালন করে 'ইস্টার্ন কমান্ড ভিক্টরি ডে'।

১৩. মুক্তিযুদ্ধকালে সাহায্যের সুবাদে ভারত সর্বদা বাংলাদেশের ওপর 'দাদাগিরি' ফলাতে চেষ্টা করে এবং বিভিন্ন সময় এমন সব আচরণ করেছে যে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব ভারতীয় হুমকির মুখোমুখি হয়। ভারত গোড়া থেকেই কোনও দ্বিপক্ষীয় বিষয়ে বাংলাদেশের পরামর্শ বা সিদ্ধান্তের তোয়াক্কা করেছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। কৌশলে বা জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার একটি স্বৈরাচারী মানসিকতা ভারতের দিক থেকে সব সময়ই লক্ষ্য করা গেছে।

১৪. মুক্তিযুদ্ধ শেষের পর দিন থেকেই ভারতের অন্য চেহারা বেরিয়ে আসে; ভারত তার ঐতিহাসিক আধিপত্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী ঘৃণ্য চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করে; মুক্তিযোদ্ধারা দেশের বিভিন্ন রণাঙ্গন থেকে এবং আওয়ামী নেতারা কলকাতার হোটেল থেকে ঢাকা পৌঁছার পূর্বেই ভারতীয় সৈন্য, আমলা, বিশেষজ্ঞরা ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর স্থাপনা, সম্পদকেন্দ্র, কার্যালয় দখল করে বসে।

১৫. যুদ্ধ শেষ হলে ভারত তার সেনা বাহিনী ফিরিয়ে নেয় নি; দীর্ঘদিন বাংলাদেশের সর্বত্র অবস্থান করে। ১৬ ডিসেম্বর রেসকোর্স ময়দানে আত্মসমর্পনের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ঢাকাসহ সারা দেশে ভারতীয় বাহিনী নজিরবিহীন লুটতরাজ শুরু করে। তারা অস্ত্র, গোলা বারুদ, যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, এমন কি, বাড়ি-ঘরের আসবাবপত্র পর্যন্ত ট্রাক ভর্তি করে সীমান্তের ওপারে পাঠিয়ে দিতে থাকে। ডিসেম্বর ১৯৭৪ সালে আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যম এ তথ্য প্রকাশ করে যে: "Indian army took away capital goods, industrial raw materials and military hardware worth $ 1,000 million." ঢাকায় ভারতীয় সৈন্য বাহিনীর লুট- তরাজ সরেজমিনে তদন্ত করে বিলাতের বিখ্যাত দৈনিক *গার্ডিয়ান* ২১ জুন, ১৯৭২ সালের সংখ্যায় জানায়: "Systematic Indian army's looting of mills, factories and offices in Khulna area has angered and enraged Bangladeshi civil officials here. The looting took place in the first days after the Indian troops arrived in the city on December 17.

১৬. চট্টগ্রাম বন্দরে ভারতীয় বাহিনী যে তাণ্ডব চালায় তাতে বহু দেশি-বিদেশি জাহাজের মালামাল ও বন্দরের মূল্যবান সম্পদ ও যন্ত্রপাতি লোপাট হয়।

১৭. দেশের সমৃদ্ধ নগর-বন্দর ছাড়াও অন্যত্র ভারতীয় সৈন্যদের দ্বারা ব্যাপক পরিমাণ সম্পদ লুটতরাজ হয়েছে, এমন কি, কোথাও কোথাও মুক্তিযোদ্ধা ও ভারতীয় বাহিনীর মধ্যে মুখোমুখি অবস্থার সৃষ্টি হয়।

www.bjilibrary.com

১৮. বীর মুক্তিযোদ্ধা মেজর আ. জলিল ভারতীয় সম্প্রসারণবাদী লুটতরাজে বাধা দেন। সরাসরি প্রতিরোধ ছাড়াও তিনি বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ ও সংবাদপত্রে এ বিষয়ে প্রতিবাদ জানান। মেজর আ. জলিলের প্রতিবাদের কারণে ভারতীয় চাপে তাকে সেনাবাহিনী থেকে বাধ্যতামূলক অবসর দেওয়া হয়। ভারতের দাদাগিরি এখানেই সীমাবদ্ধ থাকে নি। তারা যে সম্পদ লুণ্ঠন করে তা ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারেও বাংলাদেশের দাবি অগ্রাহ্য করে। *হলিডে* জানায়: "In November 1972, a Bangladesh Defense Ministry delegation to Delhi raised the question of returning the captured arms but received a cool response." অন্যদিকে, ১৮ জুন ১৯৭৪ সালের সংখ্যায় *বাংলাদেশ অবজারভার* জানায়: "At a stage, in reply to a written question in Parliament from an Awami League member, the State Minister for Information and Broadcasting said that India had already returned a substantial quantity of arms and ammunition which it had captured from the occupation forces and that the transfer of those arms and ammunition was still in progress. In reply to another question, however, the minister refused to disclose the full figure of the transfer in the interest of the state." এক লক্ষ পাকিস্তানি সৈন্য ও তাদের ব্যবহৃত বিপুল পরিমাণ অস্ত্র-গোলাবারুদসহ দেশের কি পরিমাণ সম্পদ ভারতীয়রা লুট করেছিল এবং তার কতটুকু ফেরত (!) দিয়েছিল, সেটা তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার তাদের তথাকথিত 'রাষ্ট্রীয় স্বার্থে' প্রকাশ করেনি। আজ পর্যন্ত ভারতে এ সংক্রান্ত কোন তথ্য প্রকাশ না হওয়ায় প্রমাণ হয়েছে,, বিষয়টি বাংলাদেশ নয়, ভারতের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট। আর তাবেদার আওয়ামী লীগ 'রাষ্ট্রীয় স্বার্থে'র দোহাই দিয়ে প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতের স্বার্থ রক্ষার্থেই সচেষ্ট থেকেছে।

১৯. ভারতীয় সৈন্যের হাতে বন্দী নারীদের নির্যাতনের বহু ঘটনা জানা যায়। বিশেষ করে, ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সৈয়দপুর, জয়পুরহাটে বন্দী অবাঙ্গালী নারীরা চরম লাঞ্ছনার শিকার হয়।

২০. ১৬ ডিসেম্বর থেকেই ভারতীয় আমলা ও গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর এজেন্টরা স্রোতের মতো স্বাধীন বাংলাদেশে আসতে থাকে এবং বিশেষজ্ঞ বা পরামর্শকের ছদ্মপরিচয়ে সকল সরকারি অফিসের উচ্চতর পদগুলো দখল করে। বাংলাদেশকে অধীনস্থ রাখার সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্রের বাস্তবায়নে তারা তৎপর হয়; এ অপতৎপরতা প্রচ্ছন্নে এখনো বহাল রেখেছে ভারত।

২১. সমাজতান্ত্রিক ও জাতীয়করণ নীতি অবলম্বণ করায় ভারত নিজ দেশে বিদেশি দ্রব্য আমদানি করা থেকে বিরত থাকে। যুদ্ধের পর বাংলাদেশে ভারতীয়

www.bjilibrary.com

সৈন্যরা এসেই দীর্ঘ সীমান্ত খুলে দেয় এবং চোরাকারবারের জোয়ার লেগে যায়। ভারত কোন বৈদেশিক মুদ্রা খরচ না করেই নব্য স্বাধীন বাংলাদেশের বিদেশি মালামাল পেতে থাকে আর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। সামরিক বাহিনীর তত্ত্বাবধানে চোরাচালানের এমন জঘন্য নজীর বিশ্বে আর একটিও নেই। মাওলানা ভাসানীর মতো বর্ষীয়ান নেতা পর্যন্ত আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় অভিযোগ করেন যে: "He claimed that smuggling and confiscation of goods transferred to India by the Indian army accounted to a total approx. TK. 6,000 crores." অন্য একটি বিদেশি সংবাদ সূত্র দাবি করে: "The value of goods smuggled from Bangladesh to India between 1972 and 1975 was estimated to be not less than $2,000 million." [দ্রষ্টব্য: *হলিডে*।]

২২. নতুন দেশের যুদ্ধবিধ্বস্ত কাঠামোয় আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করার সঙ্গে সঙ্গে ভারত ১ জানুয়ারি, ১৯৭২ তারিখে ৩টি চুক্তি/সিদ্ধান্ত পাস করিয়ে নেয়, যা অর্থনৈতিকভাবে বাংলাদেশকে পঙ্গু করে ভারতীয় স্বার্থ হাসিলের জন্য যথেষ্ট: ক) পাকিস্তান আমলে আরোপিত ভারতে পাট ও পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানি নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা; খ) ভারতীয় মুদ্রার বিপরীতে বাংলাদেশি টাকার (সাবেক পাকিস্তানি টাকা, যার মূল্য ভারতের টাকার চেয়ে বেশি ছিল) অবমূল্যায়ন করা; এবং গ) ১৬ ডিসেম্বরের আগের সকল রপ্তানি চুক্তি বাতিল করে দেওয়া। ফলে পাট ও পাটজাত দ্রব্যের একক ক্রেতায় পরিণত হয় ভারত এবং কম দামে বৈধ ও অবৈধ (চোরাচালান) পন্থায় তৎকালীন বাংলাদেশের একমাত্র অর্থ উপার্জন খাত পাট ভারতের কব্জায় চলে যায়। এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরদিন *বাংলাদেশ অবজারভার* লিখে: According to business and financial experts, all three measures had gone to the advantage of India and it was alleged that these decisions were taken at the instance of the Indian advisers." ২০০৬ সালে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব কামাল সিদ্দিকী এ প্রসঙ্গে ১৯৭৫ সালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে করা তার "The Political Economy of Indo-Bangladesh Relations: 1971- '75" শীর্ষক পিএইচডি থিসিসে লিখেন: "For several decades India was able neither to export raw jute nor to produce enough jute to feed its own industries. The position changed dramatically after the birth of Bangladesh. In 1973, India exported 1 million bales of raw jute and by 1974 not only were its existing mills running at full capacity, but it had also started to set up more jute mills."

www.bjilibrary.com

২৩. স্বাধীনতার পর থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত সময়কালে বাংলাদেশে যে চরম অরাজকতা, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে, তাতে দেখা যায় প্রতিদিনই কোন না কোন বিখ্যাত পাটকল বা পাটের গুদাম/বাজার ভস্মিভূত হয়। কারা বাংলাদেশের পাটের বাজারের সর্বনাশ করেছে, সেটা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে না দিলেও প্রাপ্ত তথ্য থেকে এটা উল্লেখ করা যায় যে, তৎকালীন প্রধান বৈদেশিক উৎপাদনকারী পাটখাত এতটাই শোচনীয় পর্যায়ে পৌছায় যে, ১৯৭২-৭৩ সালে পাট সংক্রান্ত দু'টি প্রধান সংস্থা যথাক্রমে Jute Marketing Corporation and Jute Trading Corporation হেভি-লস্ সহ্য করতে না পেরে ফতুর হয়ে যায়। ১৯৭৪ সালের শুরুতে তৎকালীন পাট মন্ত্রী সংসদকে শোচনীয় পরিস্থিতির জানান দেন এভাবে: "স্বাধীনতার পর থেকে শুধু অগ্নিকাণ্ডজনিত কারণে ১৩৯.২ মিলিয়ন টাকার পাট পুড়েছে।" [দ্রষ্টব্য: মওদুদ ২০০২; পৃষ্ঠা ১৫১।]

২৪. ১৯৭২ সালের মে মাসে আওয়ামী লীগের শাসনাধীন সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশ সরকার ভারতের সঙ্গে চারটি ক্রেডিট এগ্রিমেন্ট এবং একটি দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন করে। ১৯৭৩ সালের শুরুতে উভয় পক্ষ ৫০০ কোটি টাকার 'বার্টার চুক্তি' করে। বিশেষজ্ঞদের মতে: "these agreements failed due to the non-purchase of Bangladeshi goods by India." [দ্রষ্টব্য: *সাপ্তাহিক হলিডে*, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩।) চোরাচালানের মাধ্যমে বাংলাদেশি পণ্য পাওয়ার ব্যবস্থা থাকায় বৈদেশিক মুদ্রা দিয়ে ভারতকে কোন পণ্য কিনতে হয় নি। পাশাপাশি বাংলাদেশ অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি বাতিল করায় সব কিছু ভারতে প্রবেশ করে এবং বাংলাদেশ বৈদেশিক মুদ্রা শূণ্য হতে থাকে। এ পরিস্থিতি বাংলাদেশের জন্য আরো ভয়াবহ ও বিপজ্জনক রূপ লাভ করে তখনই, যখন আওয়ামী লীগ সরকার বাংলাদেশের টাকা ছাপানোর দায়িত্ব ভারতকে প্রদান করে। এ সুযোগে ভারত নিজের কাছে প্রচুর বাংলাদেশি টাকা ছাপিয়ে রাখে এবং নিজের কোন অর্থ ব্যয় না করে সে টাকায় চোরাচালানের মাধ্যমে পণ্য সামগ্রী ক্রয় করে। অভিযোগ রয়েছে যে, বাংলাদেশে ভারতপন্থীদের প্রতিষ্ঠিত করার কাজেও সে সকল বাংলাদেশি মুদ্রা এদেশে পাঠানো হয়। ফলে বাংলাদেশি মুদ্রা মানে এক ভয়াবহ ধ্বস নামে। পাকিস্তান আমলে আমাদের যে টাকার মূল্যমান ভারতের চেয়ে অনেক বেশি ছিল, আমাদের সে টাকাই মাত্র কয়েক দিনের ব্যবধানে স্বাধীনতার পর ভারতীয় হস্তক্ষেপ ও যোগসাজসে অবমূল্যায়িত হয়ে ভারতের রূপির চেয়ে অনেক কম দামে নেমে আসে। এতে বাংলাদেশের অর্থনীতি প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে ভারতের অধীনস্থ হয়ে যায়।

২৫. ভারতের কাছে রফতানি বাণিজ্য হারিয়ে আওয়ামী লীগ শাসনামলে বাংলাদেশ সরকার ভয়ঙ্কর মুলধনের সংকটে পড়ে; দেশে বিরাট মুদ্রাস্ফীতি হয়,

www.bjilibrary.com

চোরাচালানে মালামাল চলে যায় সীমান্তের ওপারে, নাশকতা ও অগ্নিকাণ্ডে বাংলাদেশের সম্পদ বিনষ্ট করা, ব্যবসার পারমিট-লাইসেন্স ভারতপন্থীদের হাতে তুলে দেওয়াসহ নানা কারণে যে অর্থনৈতিক আধিপত্য ভারত বাংলাদেশের ওপর বহাল করে, তাতে সাধারণ মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়ে। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, বাজারে মালামালের অভাব ও হাহাকার, চিনি-দুধসহ নিত্য ব্যবহার্যের সীমাহীন অপ্রতুলতায় জনজীবন ভেঙে যায়। দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে অসংখ্য মানুষের মৃত্যু হয়। লঙ্গরখানায় আদিঅন্তহীন নগ্নপদ বুভুক্ষু মানুষের আহাজারিতে বাতাস ভারী হয়ে যায় এবং বাংলাদেশের মানুষ জীবনের কঠিন বাস্তবতার মধ্য দিয়ে ভয় ও বিস্ময়মিশ্রিত বিহ্বল চোখে দেখতে পায় স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে তথাকথিত মিত্রের বেশে আগত ভারতের শোষণ, আধিপত্য ও সম্প্রসারণ নীতির লোলুপ রাক্ষস-মূর্ত্তির দানবীয়রূপ।

২৬. বাংলাদেশের মানুষকে স্বাধীনতার পর পরই একটি বিরূপ ও কষ্টকর পরিস্থিতিতে ঠেলে দেওয়ার গভীর ষড়যন্ত্রের সুদূরপ্রসারী নীল-নকশা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে ভারতের শোষণ, আধিপত্য ও সম্প্রসারণমূলক যে নীতি ও কর্মকাণ্ডের উত্থান বা সূচনা হয়, তার জন্য গবেষকরা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভারতের যে যে আগ্রাসী নীতি ও তৎপরতাকে চিহ্নিত করেছেন, তা হলো: "1. Transfer of the country's assets by the Indian army; 2. Influence of the Indian experts/bureaucrats in the Bangladesh administration; 3. Large-scale smuggling across the border; 4. Removal of the ban on exporting raw jute and jute goods to India; 5. Printing of currency notes in India; 6. Establishing oppressive force *Rakkhi Bahini* under Indian instruction; 7.Devaluation of currency; 8. Presence of Indian army on the soil of Bangladesh; 9. Undemocratic actions against anybody who opposed the expioitory role of India and Awami League; 10. Making of underground armed forces."

২৭. স্বাধীনতার পর পরই ভারতের প্রবল বেরিতা, আধিপত্য ও উপস্থিতির ফলে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক কাঠামো ভেঙে তছনছ হওয়ায় এবং মারাত্মক দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে অসংখ্য মানুষের মৃত্যু ঘটায় স্বাভাবিকভাবে ভারতীয় আধিপত্যের প্রশ্ন সামনে চলে আসে। আওয়ামী লীগ ও এর লেজুড় দলগুলো ছাড়া প্রায় সকল জাতীয়তাবাদী-দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দলই ভারতীয় আধিপত্যের এবং তার আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়; অতিবামপন্থী কিছু দল দেশব্যাপী সশস্ত্র যুদ্ধ শুরু করে। স্বাধীনতাত্তোরকালে এ সকল জাতীয় সংহতিবিরোধী হানাহানি সৃষ্টি করে আওয়ামী লীগ ও ভারত বাংলাদেশকে সুপরিকল্পিতভাবে সংকট ও

www.bjilibrary.com

সংঘাতের দিকে ঠেলে দেয়; যে দায়ভার বাংলাদেশের একটি বিশেষ রাজনৈতিক শক্তির 'একগুঁয়েমী ও ভারতের প্রতি চিরকালীন নীতিগত বাধ্যবাধকতার' কারণে সমগ্র জাতিকে এখনো বহন করতে হচ্ছে।

২৮. ভারতের সৈন্য ও বিশেষজ্ঞদের উপস্থিতিতে আওয়ামী লীগের মাধ্যমে যে জাতিনাশক কাজটি করা হয় তা হলো স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষকরণ। যারা আওয়ামী লীগের সঙ্গে একমত হয় নি এবং যারা নানা কারণে ভারতে যায় নি, দেশের ভেতরে থেকেই স্বাধীনতার পক্ষে কাজ করেছেন বা পাকিস্তানে বন্দি ছিলেন নানা পেশা ও শ্রেণীর এমন সকলকে পাকিস্তানপন্থী বা রাজাকার অ্যাখ্যা দিয়ে স্ব স্ব ক্ষেত্র থেকে উৎপাটন করা হয়। এ অপধারায় সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্র থেকে প্রতিপক্ষকে হটানোর এক চরম নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির অবতারণা ঘটে। এতে ভারত বা আওয়ামী লীগপন্থীদের অযোগ্যতা সত্ত্বেও আর্মি-প্রশাসন-ব্যবসা-বাণিজ্য-শিক্ষা-সংস্কৃতিসহ সর্বত্র উপরের স্তরে বসিয়ে দেওয়া হয় বটে কিন্তু দেশ ও জাতি মেধাশূণ্য ও ফতুর হয়ে লুটপাটের রামরাজত্বের কাছে জিম্মি হয়ে পড়ে; দুর্নীতির বিষবৃক্ষটিও সুকৌশলে ভারতীয়দের দ্বারা রোপিত হয় সে সময়ই। বহু অফিস-আদালত-কল-কারখানায় যোগ্য লোকের অভাবে প্রভূত ক্ষতি হতে থাকে; ভারতীয় ও আওয়ামী লুটতরাজ সহজ হয়। এতে বাংলাদেশকে দুর্বল করে ভারতের অধীনস্থ রাখার দুরভিসন্ধিরই প্রতিফলন ঘটে।

২৯. রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে নিধনের জন্য এবং দেশের সার্বিক ঐক্য বিনষ্টের জন্য স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষ তত্ত্বকে সুকৌশলে কাজে লাগাচ্ছে ভারত এবং এর মাধ্যমে দেশপ্রেমিক-জাতীয়তাবাদী-ধর্মীয় নেতৃত্ব এবং আধিপত্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদবিরোধী আদর্শিক শক্তিকে প্রতিনিয়ত আক্রমণের লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত করা হচ্ছে।

৩০. দেশকে মেধা ও যোগ্যতাশূণ্য করা এবং আওয়ামী ও ভারতবিরোধীশূণ্য করার লক্ষ্যে বাংলাদেশে বুদ্ধিজীবি হত্যার ঘটনাও ঘটানো হয়েছে। স্বাধীন দেশে আওয়ামী লীগ ও ভারতীয় সৈন্যের উপস্থিতিতে কতিপয় বুদ্ধিজীবিকে হত্যা এবং এ সকল হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে কোন তদন্ত করতে না দেওয়ায় এ অভিযোগ ভিত্তি পায়। বিশেষ করে, চিত্র পরিচালক জহির রায়হানের হত্যা রহস্য অনুন্মোচিত থাকার কারণ আজো অজ্ঞাত। তার কাছে ভারতের হোটেলে মুক্তিযুদ্ধকালের আওয়ামী লীগ ও ভারতীয়দের কর্মকাণ্ডের বিপজ্জনক ছবি ও তথ্য ছিল বলে জানা যায়। ভারতের হোটেলে আওয়ামী লীগ ও ভারতের কর্মকাণ্ডের বহু কথা পরে পত্র-পত্রিকায়ও ছাপা হয়। আহমদ ছফা যুদ্ধকালীন কলকাতার নানা কাণ্ড-কারখানা নিয়ে 'অলাতচক্র' নামে একটি আস্ত উপন্যাস লিখে ফেলেন। মুক্তিযুদ্ধের আগে-পরে ভারত ও তার রাজনৈতিক সহযোগীদের

www.bjilibrary.com

দুর্নীতি-দুর্মতির চিত্র পাওয়া যায় সংশ্লিষ্টদের কাছে, যাতে বাংলাদেশকে ভারতের সম্প্রসারণবাদের আওতায় রেখে আধিপত্য বজায় রাখার ছাপ পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে।

৩১. ভারতীয় সৈন্যের উপস্থিতি, যোগ্য অথচ ভারতবিরোধী কর্মকর্তাদের অপসারণসহ নানা কারণে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আলোচিত হতে থাকে যে, বাংলাদেশকে ভারত দখল করে রেখেছে এবং আওয়ামী লীগের শাসন অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা না থাকায় ভারতীয়রা বাংলাদেশকে শাসন করে দিচ্ছে। এর ফলে মুক্ত গণতান্ত্রিক বিশ্বে ও ইসলামী দুনিয়ায় বাংলাদেশের ইমেজ দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তৎকালীন স্নায়ু যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ভারত তথা সোভিয়েত পন্থীরূপে বাংলাদেশের ভাগ্যে হিন্দু ও কমুনিস্টপন্থী রাষ্ট্রের কলঙ্ক কালিমা লেপনের ফলে দ্বিতীয় বৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও আমরা ইসলামী দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই এবং নৈতিক ও অন্যবিধ সাহায্য-সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হই। ভারতের সৈন্য থাকায় এদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দেয় নি চীন, সৌদি আরবসহ বহু প্রভাবশালী ও পুরাতন বন্ধু রাষ্ট্র। একদিকে ভারতীয়দের দ্বারা আভ্যন্তরীণ শোষণ-লুণ্ঠন আর অন্যদিকে পরীক্ষিত বন্ধুদের কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়ার মতো ঘটনার সৃষ্টি করে ভারত সদ্য-স্বাধীন বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বন্ধুহীন এবং ভারতের ওপর নির্ভরশীল ও তাবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করার পথ সুগম করে। এর ফলে সমগ্র আওয়ামী লীগ আমলে বাংলাদেশ বিশ্বব্যাপী নিঃসঙ্গ, একেলা ও ভারত-নির্ভর থাকতে বাধ্য হয়। তদুপরি বন্যা ও দুর্ভিক্ষে আন্তর্জাতিক সাহায্য বঞ্চিত হয়ে এদেশের এক ভয়াবহ মঙ্গা ও দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু ঘটে স্বাধীনতার পর পরই। ভারতীয় আমলা-বিশেষজ্ঞ উপস্থিতি ও সৈন্য সমাবেশের ঘটনায় দেশে ও বিদেশে বিরূপ প্রতিক্রিয়া এবং সর্বব্যাপী শোষণ-লুণ্ঠন ও বন্ধুহীনতার মতো দৃশ্যমান আধিপত্যমূলক সম্প্রসারণের ঘটনা ঘটলেও আওয়ামী লীগ ও এর নেতা শেখ মুজিব কোন কিছুকেই তোয়াক্কা করেন নি; বরং তাদের পক্ষে সাফাই গেয়েছেনঃ "...praising the impeccable behaviour of the Indian troops during their stay in Bangladesh.'; (Joint Indo-Bangladesh Declaration, 19 March 1972.) জাতীয় প্রতিরোধ ও আন্তর্জাতিক চাপের কাছে নতি স্বীকার করে লুণ্ঠনকারী ভারতীয় সৈন্যদের ফিরে যাওয়ার দিনও শেখ মুজিব তাদের প্রশংসা করে তাদেরকে 'ভালোবাসা বয়ে নেওয়ার আকুতি' জানানঃ "Mujib's message to departing Indian soldiers in a farewel address was 'to carry love from the people of Bangladesh." [দ্রষ্টব্যঃ মওদুদ ২০০২; পৃষ্ঠাঃ ১৫৩.)

www.bjilibrary.com

৩২. বাংলাদেশ থেকে ভারতের সৈন্য প্রত্যাহারের পরও নানা সন্দেহ জনমনে দেখা দেয় এবং ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের গোপন চুক্তির কথা প্রকাশ্যে চলে আসে। মাওলানা ভাসানীসহ প্রায় সকল বিরোধী দলই দাবি করে যে, মুক্তিযুদ্ধকালে আওয়ামী লীগের সঙ্গে ভারতের অধীনতার গোপন চুক্তি হয়। আওয়ামী লীগ প্রকাশ্যে এ চুক্তির ব্যাপারে অস্বীকৃতি জানালেও অল্পদিনের মধ্যেই মানুষের সন্দেহ আরো ঘনীভূত হয় ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের স্বার্থ বিরোধী দু'টি উদ্যোগের কারণে। যে উদ্যোগ দু'টি হলো: এক. ২৫ বছর মেয়াদী মৈত্রী চুক্তি; এবং দুই. যৌথ ইশতেহার ।

৩৩. বলা হয় যে সরাসরিভাবে বাংলাদেশকে সামরিক দিক দিয়ে আধিপত্যের অধীনে রাখা যুদ্ধোত্তর দেশে সম্ভব হচ্ছিল না। তদুপরি ভারতীয় সৈন্যদের লুটতরাজের কারণে তাদের সামরিক শৃঙ্খলাতেও ভাঙন দেখা দেয়। ফলে ভারতের পক্ষ থেকে আইন ও চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশকে দীর্ঘ মেয়াদে বশীভূত রাখার দরকার হয়। এ কারণেই একদিকে সৈন্য প্রত্যাহার করা হয় আর অন্য দিকে চুক্তির জালে বাংলাদেশকে জড়িয়ে ফেলা হয়। ১২ মার্চ ১৯৭২ সৈন্য প্রত্যাহারের মাত্র ৫ দিনের মাথায় সফররত ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি ১৭ মার্চ মৈত্রী চুক্তি ও ১৯ মার্চ যৌথ ইশতেহার প্রণয়ন করিয়ে নেন।

৩৪. বাংলাদেশে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী, আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিব ১৯৭২ সালে তার জন্মদিনে (১৭ মার্চ) ঢাকায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির সঙ্গে Treaty of Friendship, Cooperation and Peace বা 'মৈত্রী চুক্তি'র নামে যাতে স্বাক্ষর করেন, তাকে বাংলাদেশের জনগণ নাম দিয়েছে 'গোলামীর চুক্তি'। ২৫ বছর মেয়াদী এ চুক্তির মুখবন্ধে ১০টি লক্ষ্য এবং ১২টি ধারা ছাড়াও প্রধান অনুপ্রেরণা হিসাবে 'শান্তি, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের বিকাশে' উভয় দেশের একতাবদ্ধ লড়াইয়ের অঙ্গীকার ঘোষণা করা হয়। এ চুক্তির অধীনে বাংলাদেশের জন্য ভারত ছাড়া অন্য কোনো দেশের সঙ্গে সামরিক-অর্থনৈতিক-শিক্ষা-সাংস্কৃতিক চুক্তি করার পথ রুদ্ধ করা হয় এবং একদেশ আক্রান্ত হলে অন্যদেশ সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসার মাধ্যমে আধিপত্য ও সম্প্রসারণের আইনি সুযোগ রাখা হয়। তাছাড়া বাণিজ্য-নদী-পানিবণ্টন-সীমান্ত সংক্রান্ত ক্ষেত্রে উভয় দেশের যৌথ সমীক্ষা ও সিদ্ধান্তের বিধান রাখা হয়। এ চুক্তির ধারাবাহিকতায় ভারত ফিরে যাওয়ার দিন (১৯ মার্চ) স্বাক্ষরিত ইন্দিরা গান্ধি-শেখ মুজিবের মধ্যে দু'দেশের একটি যৌথ ইশতেহার প্রকাশ পায়; যে ইশতেহারে চুক্তির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে বলা হয়: "the reason of signing such a treaty was mentioned as (in paragraph 8) to give concrete expression to the similarity of views, ideals and interests between India and Bangladesh." এ

www.bjilibrary.com

ইশতেহারে মৈত্রী চুক্তির বাইরে আরো কিছু সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, যার মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছেঃ 1. Revive transit trade and the agreement on border trade; 2. In order to strengthen cooperation between the two countries, there would be consultation in Foreign Affairs, Defence, Planning Commissions and the Ministries and Departments dealing with economic, commercial, cultural and technical affairs of the two governments. They decided that such consultations would take place periodically at least once every six months. And, 3. they decided to establish a Joint River Commission to carry on a comprehensive survey of the river systems shared by the two countries and formulate projects concerning both the countries in the fields of flood control and to implement them. 4. They further determined to formulate detailed proposals on advance flood warnings, flood forecasting, the study of flood control and irrigation projects on the major river system and examine the feasibility of linking the power grids of Bangladesh with the adjoining areas of India. (Detailed text of TREATY and JOINT DECLARATION, see Bangladesh Documents, Vol:2, p. 648) একই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৩ সালের ৪ জানুয়ারি আরেকটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় for setting up a Joint Power Coordination Board to study the possibility of exchanging surplus power of the two countries. (Bangladesh Observer, 5 January, 1973.) প্রধানত এ দু'টি চুক্তি এবং পরবর্তীতে সম্পাদিত অপরাপর চুক্তির আওতায় ভারত বাংলাদেশের প্রায় সকল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী ও স্বার্থকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে নিয়ে আসে; বাংলাদেশ তার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয়কে নিয়ে একা চলার অধিকার হারায় এবং ভারতকে এড়িয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যাওয়ার পথে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়। বাংলাদেশের প্রায় সকল বিরোধী দল ও আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমের ভাষায়: "the treaty had been signed not in the interest of Bangladesh, but to guarantee India its influence and domination over the future course of Bangladesh. Moreover, India had signed the treaty in order to extend and strengthen its sphere of influence over the sub-continent." (weekly Holiday, 11 January 1974)। ২৫ বছর মেয়াদী চুক্তির সময়কাল ১৯৯৭ সালে উত্তীর্ণ হয়ে যায় এবং সেটা আর নবায়ন করা হয়নি।

www.bjilibrary.com

৩৫. যে একটি মাত্র বিষয়ই বাংলাদেশের ওপর ভারতের আধিপত্যবাদী-সম্প্রসারণবাদী আচরণের সত্যতা প্রমাণের জন্যে যথেষ্ট বলে বিবেচিত হতে পারে, তা হলো ফারাক্কা ও পানি বণ্টন ইস্যু। বিষয়ের গুরুত্ব তুলে ধরার জন্য কিছু টেকনিক্যাল ইফরমেশন দেওয়া জরুরি, যে সকল তথ্য আরো বিস্তারিতভাবে রয়েছে Khurshida Begum, Tension over the Farakka Barrage, Dhaka: UPL, 1987 শীর্ষক গ্রন্থে। ২৫০০ কিলোমিটার দীর্ঘ গঙ্গা নদী ইন্দো-চীন সীমান্ত থেকে চীন-নেপাল-ভারত-বাংলাদেশ হয়ে বঙ্গোপসাগর অব্দি গতিপথ অতিক্রমকালে ২৫০ মিলিয়ন মানুষের জন্য ২ মিলিয়ন কিউসেক শুদ্ধ পানি বহন করে। নেপালের প্রধান তিন নদী--কোসি, গন্ধক, কর্নালার ৪০ভাগ জলধারা আসে গঙ্গা থেকে। বাংলাদেশের সাবেক ১৯ জিলার ৮টিকে স্পর্শ করে গঙ্গা/পদ্মা নদী দেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মানুষ এবং দু'টি বন্দরকে সজিব রেখেছে। ভারত সব ধরনের আন্তর্জাতিক আইন ও নীতি লঙ্ঘন করে ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ করায় দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল মরুভূমিতে পরিণত হচ্ছে; জীব-বৈচিত্র্য বিনষ্ট হচ্ছে। বাংলাদেশ প্রয়োজনীয় ও ন্যায্য পানির হিস্যা পাচ্ছে না।

৩৬. ভারত সে দেশ দিয়ে আসা অর্ধ-শতাধিক নদীতে বাঁধ দিয়ে বাংলাদেশের সমস্ত অংশকেই পানি-শূন্য মরুভূমি বানাতে চাচ্ছে। শুধু উত্তর বঙ্গই নয়, সিলেট অঞ্চলের নদীগুলোরও বর্তমানে মরণদশা দেখা দিয়েছে।

৩৭. পানি ও অন্যান্য বিষয়ে দাবি উত্থাপন করা হলে শর্ত হিসাবে ট্রানজিট, গ্যাস পাইপ লাইন ইত্যাদি প্রসঙ্গ জুড়ে দিয়ে বাংলাদেশকে চাপের মধ্যে রাখছে এবং মূল দাবি থেকে সরিয়ে দিচ্ছে ভারত এবং আরও নতুন নতুন সুবিধা হাতিয়ে নিতে তৎপর হচ্ছে।

৩৮. তদুপরি, গঙ্গার পানি বণ্টন বা অন্য কোনো জাতীয় স্বার্থকে সামনে নিয়ে বাংলাদেশ যখনই ভারতের সঙ্গে দেন-দরবার করে, তখনই ভারতের পক্ষ থেকে কিছু নাশকতামূলক কাজ ও সশস্ত্র উৎপাত বাংলাদেশের বিরুদ্ধে শুরু করা হয়। '৭৫ পরবর্তীতে বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘে ফারাক্কা ইস্যু উত্থাপন করলে এবং তথাকথিত মৈত্রী চুক্তিকে না মেনে স্বাধীনভাবে নানা বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে থাকলে ভারত বহু বিদ্রোহীকে আশ্রয় ও সাহায্য করে। "to liberate the country once again" বলে তারা ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বিএসএফ-এর ছত্রছায়ায় দেশের ভেতরে প্রবেশ করে স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব নস্যাতের অপচেষ্টা চালায়। প্রায়ই স্বাধীন বঙ্গভূমি আন্দোলনের নামে বাংলাদেশের কিছু জিলাকে নিয়ে 'হিন্দু বাংলা' গড়ার আন্দোলনও ভারতভূমিতে ভারতের ইন্ধনে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে পরিচালিত হচ্ছে।

৩৯. বাংলাদেশের বিরুদ্ধে নাশকতা ও রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ডের সবচেয়ে শক্তিশালী ভারতীয় উদ্যোগ লক্ষ্য করা গেছে পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রসঙ্গে। ভারত-কর্তৃক শান্তি

www.bjilibrary.com

বাহিনীকে জন্ম দিয়ে অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ দেওয়াসহ সব ধরনের নৈতিক ও বৈষয়িক সাহায্য দেওয়ার সকল তথ্য শান্তিচুক্তির পর প্রকাশ পেয়েছে। মজার ব্যাপার হলো, বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদের বিরোধিতায় পাহাড়ি জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠা কল্পে পার্বত্য আন্দোলন মুজিব আমলে উৎপত্তি লাভ করলেও পাহাড়িরা সশস্ত্র আন্দোলন করেছে তাদেরকে তত্ত্বগতভাবে স্বীকৃতি প্রদানকারী জিয়ার বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদী আমলে। কারণ মুজিব বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদের আলোকে পাহাড়িদের 'বাঙ্গালি হয়ে যেতে' বলেছিলেন। আর বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদে বাঙ্গালি ও পাহাড়িসহ সকল জাতিসত্তার অধিকার ও স্বীকৃতি নিশ্চিত করা হয়। তত্ত্বগত বাস্তবতায় বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রাম করবার কথা না থাকলেও ভারতের স্বার্থে বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করার লক্ষ্যে চলে সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামব্যাপী হত্যা ও রক্তপাতের অধ্যায়। এতে না হয়েছে পাহাড়িরা লাভবান, না থাকতে পেরেছে বাংলাদেশ শান্তিতে। পরে যখন পাহাড়িরা লক্ষ্য করলেন যে তাদেরকে নিজস্বার্থে ব্যবহার করছে ভারত, তখন তারা আলোচনার পথে অগ্রসর হয়। আরো পরে ভারতপন্থী বলে পরিচিত আওয়ামী লীগ শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের ক্ষমতায় এলে তাদেরকে চুক্তি করতে বাধ্য করা হয়। চুক্তি না করে তাদের উপায় ছিল না। কারণ, আসাম, ত্রিপুরা, অরুণাচল, মিজোরামে আশ্রয় গ্রহণকারী পার্বত্য চট্টগ্রামের আশ্রিত বহিরাগতদের খেদাও আন্দোলন শুরু হয়; তাদের ওপর হামলা ও আক্রমণ হতে থাকে এবং আশ্রয় শিবিরে তাদেরকে প্রদত্ত সাহায্য-সহযোগিতা হ্রাস করা হয়। অভিযোগ রয়েছে যে, ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, তঞ্চংকা প্রভৃতি উপজাতির বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনকালে ভারত তার দেশে বসবাসকারী সে সকল উপজাতির অপরাপর মানুষদেরকেও শরণার্থী দলের সঙ্গে এদেশে ঠেলে দিয়েছে। একই চুক্তির মাধ্যমে বহু পক্ষকে ঘায়েল করার এমন নজির আর নেই। এ চুক্তিতে পাহাড়ে হিংসার আগুন আরো প্রজ্জ্বলিত করা হয়েছে ৫০% বাংলাভাষী-পাহাড়ির অধিকার খর্ব করার মাধ্যমে। আবার চুক্তির প্রতি মদদ দিয়েও ভারত তার ঐতিহাসিক দ্বিমুখী নীতির আলোকে 'প্রীতি গ্রুপ' নামে পরিচিত একদল বিদ্রোহী পার্বত্য তরুণকে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ট্রেনিং, আশ্রয় ও রসদ দিয়ে যাচ্ছে, (দ্রষ্টব্য: মাহফুজ পারভেজ, বিদ্রোহী পার্বত্য চট্টগ্রাম ও শান্তিচুক্তি, ঢাকা: ১৯৯৮) যেমনটি তারা '৭১ সালে আওয়ামী লীগকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যে জাসদকে দিয়েছিল বলে অভিযোগ রয়েছে।

৪০. বাংলাদেশের রাজনীতিতে কখনো যদি আওয়ামী লীগ ভারতের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় তাহলে একটি বিকল্প শক্তি তৈরি রাখার লক্ষ্যে গোয়েন্দা কর্মকর্তা জেনারেল উবানের নেতৃত্বে জাসদ সৃষ্টি করার তথ্য দিয়েছেন এ্যান্থনি মাসকারেনহাস, লরেন্স লিফসুজ প্রমুখ গবেষকরা। বাংলাদেশের রাজনীতিতে

www.bjilibrary.com

জাসদ এবং জাসদ থেকে খণ্ড-বিখণ্ড হওয়া ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র উপদল, যারা বর্তমানে নামসর্বস্ব অস্তিত্ব নিয়ে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ১৪ দলের ব্যানারে সমবেত হয়েছে, তারা রাজনীতিতে উদ্দেশ্যহীনতা, রোমান্টিক বৈপ্লবিকতা ও হঠকারিতা ছাড়া আর কিছুই দিতে পারেনি। তাদের তৎপরতা পর্যালোচনা করা হলে এ সত্য অনুধাবন করা যায়। ৪০ হাজার কর্মীর রক্তের বিনিময়ে তারা বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিভেদ, ষড়যন্ত্র, নৈরাজ্য ছাড়া কিছুই দিতে পারেনি; আর ভারতীয় পৃষ্ঠপোষকরা বাংলাদেশের রাজনীতিতে এমন দুরবস্থাই প্রত্যাশা করে।

৪১. রাজনৈতিক অঙ্গন ছাড়াও ব্যবসা-বাণিজ্যে ভারতীয় আধিপত্যের শিকড় বেশ সুদৃঢ়। বিগত আওয়ামী লীগের আমলে শেয়ার বাজার থেকে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার কষ্ট এখনো মানুষ ভুলতে পারেনি। বাংলাদেশের পণ্য ভারতের বাজারে প্রবেশ করতে না দিয়ে এবং তাদের পণ্য দিয়ে এদেশের বাজার সয়লাব করে দিয়ে ভারত বাংলাদেশকে বাণিজ্যিকভাবে নির্ভরশীল রাখতে চাচ্ছে এবং এর ফলে বাণিজ্য ভারসাম্য দিনে দিনে বিনষ্ট হয়ে ভারতের অনুকূলে চলে যাচ্ছে।

৪২. বাণিজ্য ভারসাম্য বলতে কিছুই মানছে না ভারত। এদেশে তার পণ্যের মুক্ত প্রবেশাধিকার চাইলেও বাংলাদেশের পণ্য ভারতে প্রবেশ করতে দিচ্ছে না।

৪৩. চোরাচালানকে উৎসাহিত করে এদেশ থেকে তেল ও অন্যান্য সম্পদ লুটের ধারা বর্তমানেও চলছে। অন্যদিকে, ফেনসিডিল ও অন্যান্য নেশা ও মাদক দ্রব্য দিয়ে এদেশের তরুণ সমাজকে ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে।

৪৪. বাংলাদেশের প্রায় সকল সন্ত্রাসী ও নাশকতামূলক কাজের অস্ত্র ও সরঞ্জাম আসে ভারত থেকে। ভারতীয় অস্ত্র চোরাচালান থেকে প্রাপ্ত আগ্নেয়াস্ত্রই বাংলাদেশের আইন-শৃঙ্খলাগত বিপত্তির প্রধান কারণ। এর ফলে যা হয়েছে, সে বিবরণ: In Bangladesh, most of the weapons in circulation are those that were not collected after its 1971 independence war. Bangladesh is also being used as a corridor for smuggling firearms. Currently, Bangladesh has more than 200,000 small arms and most of these are with various organised criminal gangs and their political godfathers. There are about 80 crime syndicates around the country of which more than 28 are active in Dhaka alone. Politicians, too, use armed private militia to protect themselves, as well as to intimidate opponents. Law-makers are also turning a blind eye both to border patrol agents who are poorly equipped and to police officers

www.bjilibrary.com

who rent out their arms to criminals and terrorists. Clandestine manufacturers operate small operations that can be set up, dismantled and relocated overnight. In 2002, Bangladesh introduced tighter controls on firearms, but the problem remains. [Malik Qasim Mustafa is a Research Fellow at the Institute of Strategic Studies, Islamabad. Proliferation of Small Arms and Light Wepons: case study- South Asia Strategic Studies, XXV, Summer, 2005, Number 2.]

৪৫. পুশ ইন-এর মাধ্যমে প্রতিদিনই বহু মানুষকে বাংলাদেশে জোরপূর্বক ঠেলে পাঠানোর ঘটনা ঘটছে। বিশেষ করে, ভারতীয় বাংলাভাষী মুসলিমদেরকে বাংলাদেশি বলে চিহ্নিত করে সমানে এদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

৪৬. সীমান্ত সন্ত্রাসে ভারতের আগ্রাসনে বহু বেসামরিক লোক প্রায়-প্রতিদিনই মারা যাচ্ছে। এমন নিরব ও নির্বিচার হত্যাকাণ্ডের নজির পৃথিবীতে বিরল। প্রবন্ধের শুরুতে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে।

৪৭. প্রসঙ্গত সীমান্ত সমস্যার প্রতি আলোকপাত করা যেতে পারে। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার সীমান্ত সমস্যা সমাধানের ব্যাপারেও ভারতের মনোভাব সম্পূর্ণ বৈরী, আধিপত্য ও সম্প্রসারণবাদমূলক। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, উভয় দেশের মধ্যে সীমান্ত সমস্যা সমাধানকল্পে ২০০১ সালে 'বাংলাদেশ-ভারত যৌথ সীমান্ত ওয়ার্কিং গ্রুপ' গঠিত হয়। এরপর ২০০২ সালে একবার বৈঠকে বসা ছাড়া ৪ বছর ধরে এর আর কোনো খবর ছিল না। ৪ বছর পর ২০০৬ সালের ১৭ জুলাই (বিস্তারিত বিবরণ : নয়া দিগন্ত ১৮ জুলাই ২০০৬) যুগ্ম সচিব পর্যায়ে যে বৈঠক হয়েছে, সে বৈঠকে প্রতি বছর অন্তত একবার বৈঠক অনুষ্ঠানের ব্যাপারে মতৈক্য হয়েছে। ভারতের অপদখলে থাকা বাংলাদেশের ৩ হাজার ৫০৬ একর এবং বাংলাদেশের অপদখলে থাকা ভারতের ৩ হাজার ২৪ একর ভূমি পরস্পরের কাছে হস্তান্তরের সম্ভাব্যতা খতিয়ে দেখতে উভয় পক্ষ বার বার একমত হলেও সমস্যার সুরাহা হচ্ছে না ভারতীয়দের কারণে। বাংলাদেশ ও ভারতের ছিটমহল এবং বিরোধপূর্ণ ভূখণ্ডের ব্যাপারে সমঝোতায় আসার লক্ষ্যে সরেজমিনে যৌথ পরিদর্শনের সিদ্ধান্তও অতীতের মতো বর্তমান সময়কালে বার বার হয়েছে। ৩২ বছর আগে সম্পন্ন সীমান্ত সংক্রান্ত বিষয়ে মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি কার্যকর করা বা সীমান্ত বিরোধ মীমাংসায় সততার সঙ্গে উদ্যোগ নেওয়ার ক্ষেত্রে ভারতের পিছুটান বরাবরই দেখা গেছে। সীমান্ত সমস্যার ঐতিহাসিক স্তরকে উন্মোচিত করতে গিয়ে দৈনিক *আমার দেশ* এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে জানায়: "১৯৭১ সালে স্বাধীন-

www.bjilibrary.com

সার্বভৌম বাংলাদেশের উদ্ভব ঘটলেও বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের আজকের চেহারা নির্ধারিত হয়েছিল ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ কর্তৃক ভারত ভাগের সময়। র‍্যাডক্লিফ সাহেব সে সময় আমাদের সীমান্ত রেখা চিহ্নিত করতে গিয়ে স্থানীয় সমস্যাবলীর দিকে আদৌ কোনো দৃষ্টি দিয়েছিলেন বলে মনে হয় না। এমনিতেই আমাদের সীমান্ত প্রাকৃতিকভাবে বিভক্ত নয়। তার সঙ্গে র‍্যাডক্লিফের খেয়ালিপনা যুক্ত হয়ে গোটা বিষয়টিকে এমনই জটিল করে ফেলেছে যে, এত বছর পরেও সাড়ে ৬ কিলোমিটার সীমান্ত আদৌ চিহ্নিত হয় নি। এর সঙ্গে গোদের ওপর বিষফোঁড়া হয়ে চেপে বসেছে ছিটমহল নিয়ে জটিলতা। উপনিবেশিক ব্রিটিশ আমলে জমিদাররা পরস্পরের সঙ্গে তালুক বাজি রেখে দাবা খেলতে গিয়ে বিষবৃক্ষের যে চারা রোপণ করে গেছেন, তা যে ভবিষ্যতে মহীরুহ হয়ে দুই প্রতিবেশী দেশকে দশকের পর দশক ভোগাবে তা হয়ত তখন কেউ কল্পনাই করতে পারে নি। কিন্তু অতীতের ভুলের কারণে সৃষ্ট জটিলতা নিরসন করে সামনে এগিয়ে যাওয়াই রাষ্ট্রনায়কোচিত প্রজ্ঞার পরিচায়ক। এ দূরদৃষ্টি উভয় দেশের নেতৃত্বের কাছে কাম্য।" (১৯/০৭/০৬)

৪৮. সীমান্ত সন্ত্রাস আরেকটি মৌলিক সমস্যা, যা ভারতীয় বৈরিতার জন্য বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত বিপদের কারণ হিসাবে দেখা যাচ্ছে। প্রায় ৪ হাজার কিলোমিটারব্যাপী বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত রেখায় ভারতীয় আগ্রাসন-আধিপত্য-সন্ত্রাস এক নিয়মিত ঘটনা। প্রায়-প্রতিদিনই কোন না কোন মনগড়া অজুহাতে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বাংলাদেশের ভূখণ্ডে প্রবেশ বা গুলি বর্ষণ করে নিরীহ মানুষ শহীদ করে। উত্তেজনা সৃষ্টি বা গরু-মহিষ-মানুষ ধরে নেওয়ার ঘটনা তো আকসার ঘটছে। বিশেষ কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বা বাংলাদেশ সরকার ও জনগণকে চাপের মধ্যে রাখার লক্ষ্যে ভারত নিয়মিতভাবে সীমান্ত সন্ত্রাস অব্যাহত রেখেছে। অতীতে কত-শত বাংলাদেশীর জীবন আর রক্ত সীমান্তের মৃত্তিকায় মিশে গেছে, সে তথ্য উদ্ধারের জন্য প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদী-নিবিড় গবেষণার। শুধু ২০০৬ সালের প্রথম ক'মাসের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে ভারতীয় আগ্রাসনের বীভৎসতায় শিহরিত হতে হয়। *দৈনিক বাংলাবাজার পত্রিকার* (১০ জুলাই, ২০০৬) একটি রিপোর্ট: "বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায় নানা অজুহাতে সমানে নিরীহ বাংলাদেশীদের নিধন চলছে। ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী 'বিএসএফ'-এর এহেন রক্তলোলুপ ভূমিকার কারণে সীমান্ত এলাকার গ্রামবাসীর মধ্যে তীব্র আতঙ্ক বিরাজ করছে। সীমান্তে যখন নিয়মিতভাবে বিএসএফ-এর বাংলাদেশী নিধন চলছে, তখন ভারতীয় হাই কমিশনের ভূমিকাও ছিল মারমুখী। নির্বিচার হত্যা ও হামলার ঘটনা শুধু অস্বীকার নয়, উল্টো বাংলাদেশী মিডিয়াকে ভারতীয় হাই কমিশনের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে দোষারোপ করা হয়েছে মিথ্যা প্রচারণার দায়ে। বলা হয়েছে, ভারতীয় বিএসএফ নির্দোষ। বিডিআর জঘন্য, তারাই উস্কানিমূলক গুলিবর্ষণ

www.bjilibrary.com

করে। আত্মরক্ষা ও ভারতীয়দের জানমাল রক্ষায় বিএসএফ পাল্টা গুলিবর্ষণ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু এ পাল্টা গুলিবর্ষণে যেসব বাংলাদেশী নিহত হচ্ছে, তার দায় অস্বীকার করে ভারতীয় হাই কমিশন বলেছে, এরা গরু চোরাচালানি। তাই এদের পাখির মতো গুলি করে মারা নাজায়েজ নয়! এভাবে গত এক মাসেই বিএসএফ গুলি করে হত্যা করেছে ৯ বাংলাদেশীকে।" ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার গবেষণা সেলের প্রদত্ত প্রতিবেদন উদ্ধৃত করে ঢাকার *দৈনিক জনতা* পত্রিকায় প্রকাশ: "১৯৭১ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত বিএসএফ-এর হাতে ৯৩০০ বাংলাদেশী নিহত হয়েছে। ৩ হাজারের বেশি অপহৃত হয়েছে। ৮৫২ মহিলা ও শিশু ধর্ষিত হয়েছে।" বাংলাদেশের গবেষণা সংস্থা 'অধিকার' প্রদত্ত এক রিপোর্টে পরবর্তী চিত্র পাওয়া যায়: "২০০১ সালের ১০ অকটোবর থেকে ২০০৬ সালের ১৮ মার্চ পর্যন্ত সময়কালে বিএসএফ-এর হাতে ৩৭৪ বাংলাদেশী নিহত হয়েছে, ৪৩৮ জন গ্রেফতার ও ৪২০ জন অপহৃত হয়েছে, ৮ শিশুসহ ৫৩ জন নিখোঁজ হয়েছে এবং ৬ নারী ধর্ষিত হয়েছে।" বিশিষ্ট ভূ-রাজনৈতিক বিশ্লেষকের মতে: "এই শেষোক্ত রিপোর্টের সঙ্গে বর্তমান যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপের একটা ধারাবাহিক সংযোগ রয়েছে। কারণ বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ২০০১ সালের ১৮ এপ্রিল কুড়িগ্রামের রৌমারী সীমান্তে বাংলাদেশ রাইফেলস বা বিডিআর এবং সীমান্তবাসী জনতার সঙ্গে আসামের মানকেরচর সীমান্ত থেকে আগত বিএসএফ অনুপ্রবেশকারীদের যে রক্তাক্ত সংঘর্ষ ঘটে, তার জেরেই আজ পর্যন্ত সীমান্ত-সন্ত্রাস বজায় রেখে চলেছে ভারতীয় বিএসএফ। রৌমারী সংঘর্ষে কমপক্ষে পনের জন বিএসএফ সৈন্য নিহত হয় এবং কিছু আহত ও মৃত সৈন্যের লাশ ফেলে রেখে পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয় বিএসএফ। পরে পতাকা বৈঠক করে পরিত্যক্ত নিহত ও আহত ভারতীয়দের ফেরত দেওয়া হয়। বাংলাদেশ রাইফেলসেরও দুই জওয়ান শহীদ হন। নিরীহ সীমান্তবাসীদের কাঁটাতারের বেড়ার ওপার থেকে গুলি করে কিংবা অপহরণ করে হত্যা বা নির্যাতনের শিকারে পরিণত করতে বিএসএফ-এর একাংশ আজো সেই পরাজয়ের শোধ নেওয়ার জন্য সংঘাতের অজুহাত সৃষ্টি করে চলেছে। সীমান্ত সংঘাতের প্রত্যক্ষ কারণ দূর করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ-ভারত যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপের প্রতিষ্ঠা হয় রৌমারীর ঘটনার পর পরই। এর প্রথম বৈঠক হয় ২০০১ সালের মে মাসে নতুন দিল্লিতে। এক মাস পরে ঢাকায় দ্বিতীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ২০০২ সালের মার্চ মাসে দিল্লিতে তৃতীয় বৈঠকের পর গত চার বছর চার মাসে আর কোনো বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় নি। (দুঃখজনক সত্য এটাই যে) এবারের যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপের বৈঠকের মধ্যেও সীমান্তে সন্ত্রাস চালিয়েছে ভারত; বিএসএফ-এর গুলিতে বাংলাদেশের কৃষকের মৃত্যুর একাধিক ঘটনা ঘটেছে।" (সাদেক খান, সীমান্ত সহযোগিতা ও আঞ্চলিক অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, আমার দেশ, ১৯ জুলাই, ২০০৬) অতএব

www.bjilibrary.com

ভারতীয় তথাকথিত সদিচ্ছা ও প্রকাশ্য-মনোভাবের আস্তিনের ভেতর বৈরিতা, আধিপত্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদের কী ভয়ঙ্কর বিষধর সাপ লুকানো রয়েছে, সেটা তো বিলক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

৪৯. ছিটমহলের বন্দীত্ব বাংলাদেশের জনগণের একটি অংশকে স্বাধীন জীবন-যাপন থেকে বঞ্চিত করেছে। আঙ্গরপোতা, দহগ্রাম, তালপট্টি নিয়ে ভারতের আচরণ ও অবস্থান স্পষ্টই সম্প্রসারণবাদীর। ছিটমহলের মানুষের প্রায়-জিম্মি এবং প্রায়-বন্দী জীবনের যন্ত্রণা সব ধরনের মানবিকতাকে বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শন করছে। বিশেষ করে ২০০৬ সালের জুলাই মাসে বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে যৌথ সীমান্ত ওয়ার্কিং গ্রুপের বৈঠক চলাকালেই ছিটমহলের নাগরিকদের ওপর এক অবর্ণনীয় অত্যাচার চালানো হয়। জুলাই-এর প্রথম সপ্তাহে প্রায় দু'সপ্তাহের অধিক সময় ধরে সীমান্তবর্তী কুড়িগ্রাম জিলার সন্নিকটে ১৮টি ছিটমহল অবরুদ্ধ করে রাখে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ। ওইসব ছিটমহলের বাসিন্দাদের বাজারহাট বন্ধ, বাচ্চারা স্কুলেও যেতে পারছে না। কারণ, ভারতীয় ভূমির মধ্য দিয়ে তাদের ফুলবাড়ি উপজিলার বালার হাট গিয়ে হাটবাজার আর বাচ্চাদের স্কুলের কাজ সারতে হয়। ২০ জুলাই-এর পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী: 'এ সমস্যা নিয়ে ভারতের কাছে পতাকা বৈঠক করার অনুরোধ জানিয়ে সাড়ার অপেক্ষায় রয়েছে বাংলাদেশ পক্ষ।' (আমার দেশ, ২১ জুলাই, ২০০৬) প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যাচ্ছে যে, ভারতীয় ভূভাগে বাংলাদেশের ছিটমহলের সংখ্যা ৫১ হলেও তার আয়তন ২৯২২,২৫ একর। পক্ষান্তরে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতীয় ছিটমহলের আয়তন ২৭৪৯,১৫ একর, তবে সংখ্যায় ১১১টি। ১৯৭৪ সালে ইন্দিরা-মুজিব চুক্তির আওতায় স্থল-সীমান্ত নির্দেশ শুরু হলেও আজো এক অজ্ঞাত কারণে তা শেষ হয় নি! প্রায় চার হাজার কিলোমিটার সীমান্তের মধ্যে মাত্র ৬.৫ কিলোমিটারের জন্য অসমাপ্ত রয়ে গেছে স্থলসীমা নির্ধারণ। বাংলাদেশ ওই চুক্তি তৃতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদে অনুমোদন করলেও ভারত এখন পর্যন্ত তা অনুমোদন করে নি। ভারতের অজুহাত: 'সীমান্ত নির্দেশ সমাপ্ত না হলে ভারতীয় পার্লামেন্ট ওই চুক্তি অসম্পূর্ণ বলে গণ্য করবে।' [সাদেক খান, পূর্বোক্ত] ওই চুক্তি মোতাবেক বাংলাদেশ সংলগ্ন বেরুবাড়ির বৃহৎ ছিটমহল ভারতকে প্রত্যার্পণ করা হলেও আঙ্গরপোতা-দহগ্রাম ছিটমহলে বাংলাদেশ থেকে প্রবেশের জন্য তিনবিঘা করিডোর আজো হস্তান্তর করা হয় নি। তবে নির্দিষ্ট কিছু সময়ের জন্য যাতায়াতের বিশেষ পথ খোলা রাখার ব্যবস্থা রয়েছে, যা প্রায়শই ভারতীয়দের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশকে নিয়ন্ত্রণে রাখা বা প্রভাব বিস্তারের কোনো না কোনো অস্ত্র ভারত সব সময়ই হাতে রাখতে চায়। ছিটমহল প্রসঙ্গটি তেমনি একটি ইস্যু, যার মাধ্যমে ভারত তার আধিপত্যকে বজায় রাখতে সচেষ্ট রয়েছে।

www.bjilibrary.com

৫০. বাংলাদেশ বিরোধী অপপ্রচার লক্ষ্য করলে ভারতের বৈরী আচরণের মাত্রা, প্রকৃতি ও গভীরতা অনুধাবন করা যায়। নেকড়ে আর মেষের গল্পের মতো যে কোনো ধরনের সমস্যার দায়ভার বাংলাদেশের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার হীন চেষ্টায় ভারত সদা সর্বদাই তৎপর। বিশেষ করে, বাংলাদেশে কোনো দেশপ্রেমিক-জাতীয়তাবাদী-ধর্মীয় মূল্যবোধে বিশ্বাসী সরকার ক্ষমতায় থাকলে তো কথাই নেই! বাংলাদেশকে অকার্যকর বা সন্ত্রাসী রাষ্ট্র বলে চিহ্নিত করতে হামলে পড়ে ভারত তার রাষ্ট্রযন্ত্রের সকল শক্তি-সামর্থ্য আর মিডিয়াকে নিয়ে। বাংলাদেশকে চাপের মধ্যে রেখে এবং আরো আন্তর্জাতিক চাপ বৃদ্ধি করার মাধ্যমে কোনঠাসা করা এবং সে সুযোগে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে ভারতীয় আধিপত্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদ বহাল রাখার কু-মতলবকে হাসিল করাই যে মূল উদ্দেশ্য, তা বলাই বাহুল্য। উদাহরণ দীর্ঘ না করে সাম্প্রতিক ঘটনার আলোচনার মধ্য দিয়ে বিষয়টি উন্মোচিত করা যেতে পারে। জুলাই ২০০৬ ভারতের বাণিজ্যিক রাজধানী মুম্বাই শহরে সিরিজ বোমা বিস্ফোরণের পর পরই মাঠে নেমে পড়েন বাংলাদেশবিরোধী ভারতীয় প্রচারবিদগণ। তাদের প্রাপ্ত তথ্যও খুবই মজার! পাকিস্তান থেকে নাকি বাংলাদেশে একটি ফোনে বোমা বিস্ফোরণের পর 'কংগ্র্যাচুলেশন' বা 'মোবারকবাদ' জানানো হয়েছে! শুধু এহেন তথ্য আবিষ্কার করেই ক্ষান্ত হয় নি তারা; বরং নানা রঙ-ঢঙ দিয়ে সে খবর প্রকাশ করেছে সে দেশের প্রধান প্রধান পত্রিকায়! ঘটনা সেখানেই থেমে থাকে নি; এমন জল্পনা-কল্পনাও ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে শুরু হয় যে, মুম্বাইয়ের ওই বোমাবাজিতে ব্যবহৃত 'আরডিএস' বিস্ফোরক বাংলাদেশ থেকে চোরাচালান হয়ে অকুস্থলে গেছে। মজার ব্যাপার হলো, বাংলাদেশ ওই ধরনের বিস্ফোরক উৎপাদন তো করেই না; বরং কস্মিনকালে আমদানিও করে নি! ভারতীয় পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত এসব সন্দেহকে অস্বীকার করে বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেছেন: 'বাংলাদেশ থেকে ভারতে বিস্ফোরক গেছে-এটা হাস্যকর কথা, অসম্ভব। জেএমবি'র বোমাবাজির ঘটনার সময় সীমান্ত পার হয়ে ভারত থেকে বাংলাদেশে বিস্ফোরক ও পাওয়ার জেল এসেছিল। সম্ভবত এ কারণেই ভারত এ কথা বলেছে।' [আমার দেশ, ১৯ জুলাই, ২০০৬] শুধু মুম্বাই ঘটনা নয়, ভারতের যে কোনো সমস্যার জন্য বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে এ দেশটিকে চাপের মধ্যে রাখার ভারতীয় কৌশল বর্তমানে স্পষ্ট।

৫১. বাংলাদেশবিরোধী প্রচারণার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশবিদ্বেষী প্রচারণাও ভারতীয় বৈরী আচরণ, আধিপত্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদের উৎকৃষ্ট প্রমাণবহ। ভারতের আরেকটি প্রধান অভিযোগ হলো বাংলাদেশে তালেবান যোদ্ধাদের ঘাঁটি রয়েছে! তালেবানদের সামান্যতম গন্ধ পেলেও যে সকল পশ্চিমা দেশ ঝাঁপিয়ে পড়ে তারা পর্যন্ত যে ভিত্তিহীন অভিযোগ করার মতো তথ্য-উপাত্ত পায় নি, ভারতের

www.bjilibrary.com

প্রচারযন্ত্র দিল্লি বা কলকাতা বসে সে তথ্য-উপাত্ত পেলো কিভাবে? বাংলাদেশের সকল ইউরোপিয় ও আমেরিকান দূতাবাস ও সংস্থা তন্নতন্ন করে সন্ধান চালিয়ে বলেছে যে বাংলাদেশে কোনো ধরনের জঙ্গিবাদীদের ঘাঁটি নেই এবং বাংলাদেশ একটি শান্তিবাদী-মধ্যপন্থী/মডারেট মুসলিম দেশ। আর ভারত শুধু নিজ দেশেই নয়, আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমে এবং পশ্চিমা গবেষক/লেখকদের ভুল তথ্য দিয়ে বাংলাদেশকে জঙ্গিবাদী মুসলিম দেশ হিসাবে চিত্রিত করার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিকভাবে 'শান্তিবাদী-মধ্যপন্থী/মডারেট মুসলিম দেশ' বলার পাশাপাশি মুসলিম বিশ্বের (বর্তমান মুসলিম বিশ্বে তুরস্ক, বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়াকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।) দ্বিতীয় প্রধান মুসলিম-গণতান্ত্রিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থাধীন দেশ বলা হলেও তথাকথিত বড়ো গণতন্ত্রের দাবিদার ভারতের চোখে সেটা ধরা পড়ে না! বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ ইংরেজি দৈনিক *দ্য ডেইলি স্টার*-এর 'উইক্যান্ড ম্যাগাজিন'-এ ২১ জুলাই ২০০৬ তারিখে এ প্রসঙ্গে একটি খবর প্রণিধানযোগ্য, যার শিরোনাম: "India Must Clean its Own House First': "It has lately become a fad in the Indian establishment to blame Bangladesh for all the miseries it is being plagued with. There is a problem with illegal immigration: Blame Bangladesh. A new insurgent group has crept in somewhere in the already troubled Northeast: Blame Bangladesh. But the fact is that India, a riot-prone country with 900 million poor, has never been a viable option for migration even for poor Bangladeshi. Hordes of India managers and engineers come to Bangladesh to work in different Multinationals and thus grab the jobs of many qualified young Bangladeshis. Bangladesh has never been a heaven for Indian insurgents; it is India, which actively armed anti-Bangladesh 'Shanti Bhahini' in the mid eighties and early nineties (causing serious instability in the hills of Chittagong Hill Tracts.). Bangladesh's repeated requests to stop funding these terrorists fell into deaf ears. India's economic development, if one calls it so, is not a homogenous phenomenon. The country is seething with poverty and exploitation, and it is a little less than surprising that India is haunted by problems like armed rebellions in different parts. India must know that blaming Bangladesh for these homegrown problems will not help its cause. Indian media's latest diatribe has come

www.bjilibrary.com

after the Mumbai blasts that have killed 200 innocent people. Though Indian police are yet to find the perpetrators behind the blasts, and the Indian Prime Minister himself has hinted at the involvement of Pakistan-based Kashmiris [the main group involved in the blasts was anti-law elements of India's own land], Indian newspapers have made a claim that the bombs used in the ghastly incidents were supplied from Bangladesh! The claim, preposterous that it is, is based on nothing but malice and the intention is nothing but to malign Bangladesh's image abroad. The irony does not escape us: The bombs used in different suicide blasts in Bangladesh came through its porous border with India. Before pointing fingers at Bangladesh, Indian intelligentsia must mend its own problems. A Balkanization of India will surely harm Bangladesh's democratic polity; instead of finding a goose that does not exist, India should address its own ethnic and economic problems. Ignoring them or playing an indifferent fool will only bring its peril."

৫২. সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও ভারতীয় আগ্রাসন অব্যাহত রয়েছে। শুধুমাত্র ভারতীয় সাংস্কৃতিক আগ্রাসন নিয়েই একটি আলাদা সমীক্ষা সম্পন্ন করা সম্ভব। ভারতের অসংখ্য চ্যানেল, পত্র-পত্রিকা বাংলাদেশে বহাল থাকলেও ভারতে এদেশের চ্যানেল বা পত্র-পত্রিকার প্রবেশাধিকার নেই। এর ফলে বাংলাদেশের ওপর ভারতের একতরফা সাংস্কৃতিক আধিপত্য বজায় থাকছে এবং ভারতীয় সংস্কৃতির সম্প্রসারণ ঘটছে। বাংলাদেশের শিল্পী সমাজ এবং লোকায়ত বাংলাদেশের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি বিকশিত হতে পারছে না।

৫৩. বাংলাদেশ বিরোধীদের পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়ার মাধ্যমে এদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব বিনষ্টের সকল তৎপরতাই ভারত করছে দ্বিধাহীনভাবে। তসলিমা নাসরিন বা দাউদ হায়দার বা এমন চরিত্রের যে কোনো বিতর্কিত ও বিতাড়িত ব্যক্তির আশ্রয়স্থল হিসাবে ভারত দু'হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসে। বাংলাদেশের ওপর চাপ প্রয়োগের মাধ্যম হিসাবে এদেরকে লালন-পালন করে ভারত। ভারত বাংলাদেশের প্রকৃত বন্ধু হলে বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের জনগণের শত্রুদেরকে সে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ, আশ্রয় ও পৃষ্ঠপোষকতা দিত না।

৫৪. বাংলাদেশের চিহ্নিত ও মোস্ট ওয়ান্টেড আসামীদেরকেও দিল্লি-মুম্বাই-কলকাতাসহ প্রায়-সর্বত্র আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়ে এদেশের আইন-শৃঙ্খলার ওপর

www.bjilibrary.com

ভারত নিয়ন্ত্রণ রাখতে চায় সদা-সর্বদাই। পাশাপাশি অস্ত্র ও অন্যান্য বিপজ্জনক পণ্যে চোরাচালানীতেও ভারতের অদৃশ্য হাতের কারসাজি টের পাওয়া যায়।

৫৫. সাংস্কৃতিক ও সাংবাদিকতার অঙ্গনে নানা বৃত্তি ও পদক দিয়ে এদেশের শিল্প-সাহিত্য-সাংবাদিকতাকে কলুষিত করছে ভারত। একদল ভারতপন্থী সাহিত্যিক-সাংবাদিক-সাংস্কৃতিক ব্যক্তিকে বাংলাদেশের জাতিসত্তা ও বিশ্বাসের বিপরীতে ভারতীয় আদর্শের প্রচার ও প্রসারে লিপ্ত রাখা হয়েছে। বাংলাদেশে ভারতবন্ধু বা ভারতমিত্র বা ভারতভক্ত চক্রের সদস্য রাজনীতিক-পেশাজীবী-সাহিত্যিক-সাংবাদিকের আচরণ সময় সময় নিজ দেশের স্বার্থের চেয়েও ভারতের স্বার্থের দিকে অত্যন্ত বিপজ্জনক ও অদেশপ্রেমিকসুলভভাবে অধিকতর ঝুঁকে যেতে দেখা যায়।

৫৬. ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর তৎপরতার কথা প্রায়ই সংবাদপত্রে প্রকাশ পাওয়ায় জনমনে শঙ্কার সৃষ্টি হচ্ছে। বাংলাদেশের প্রায়-সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে 'র'-এর প্রভাব ক্রমে বৃদ্ধি পাওয়ার কথা সর্বত্র আলোচিত বিষয়।

৫৭. ভারতীয় কূটনীতিকদের আধিপত্যবাদী আচরণ ও অতিউৎসাহ প্রায়ই দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের পর্যায়ে চলে আসছে। বিশেষ করে, ২০০৭-০৮ সময়কালের বিদ্যমান পরিস্থিতিতে তাদের বক্তব্য, আচরণ ও কর্মকাণ্ডের কারণে তীব্র সমালোচনা পরিলক্ষিত হচ্ছে।

৫৮. কূটনৈতিক প্রটোকল ভেঙে একটি বিশেষ ধর্ম-সম্প্রদায়ের সঙ্গে খোলামেলা যোগাযোগ ও তাদের নানা বিষয়ে অংশ গ্রহণ ও তাদের স্বার্থে সমাজ-রাষ্ট্র-প্রশাসনে চাপ প্রয়োগের বিষয়টি উদ্বেগজনক।

৫৯. বাংলাদেশে বিনিয়োগ করার ক্ষেত্রে ভারত ও এর নানা প্রতিষ্ঠান ছক্কা-পাঞ্জা করে। কোনও পরিচ্ছন্ন পরিকল্পনা ও কর্মসূচি না দিয়ে আলাপ-আলোচনার নামে জাতি-স্বার্থ বিরোধী পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

৬০. বাংলাদেশের প্রতি কোন কাজ বা ওয়াদার ক্ষেত্রে কমিটমেন্ট বা শ্রদ্ধার অভাব লক্ষ্য করা যায়। দেখা যায়, বাংলাদেশকে সাহায্যের নামে এগিয়ে এসে বিপদে ফেলার প্রচেষ্টা। সাম্প্রতিক সময়ে (২০০৮) চাল আমদানির সময় তেমনই চিত্র দেখতে পাওয়া গেল।

৬১. সবচেয়ে মারাত্মক যে কাজটি ভারত সচরাচর বাংলাদেশের সঙ্গে করে, তাতে ব্যাকমেলিং ও হুমকির সুস্পষ্ট প্রকাশ দেখা যায়। বাংলাদেশ পানি বা অন্য কোন ন্যায্য দাবি উত্থাপন করলেই ভারত এর সঙ্গে ট্রানজিট প্রদান, গ্যাস বিক্রি বা চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার করার শর্ত জুড়ে দেয়, যার মাধ্যমে ভারত সমস্যা সমাধানের বদলে জিইয়ে রাখে এবং এভাবেই বাংলাদেশ বা অন্যান্য সুপ্রতিবেশি দেশকে বশ্যতা ও আধিপত্যের অধীনে রাখতে সচেষ্ট হয়। এর

www.bjilibrary.com

ফলে মূলত ভারতের আধিপত্যকামী আচরণের কারণে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে অমীমাংসিত বিষয়/ক্ষেত্র এবং সংকট উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং কয়েকটি তো তীব্র আকার ধারণ করেছে। যেমন:

1. The sharing of water of common rivers, especially the Ganges. Though there is still no permanent agreement on how to augment and share the water of Ganges, Dhaka, after years of ad hoc and intermittent periods of no agreements, has managed to sign an agreement covering a period of 30 years on 10 December 1996. The experts and oppositions allege that the agreement has not enhanced the flow of the water in any significant way. The government of Awami League under the primership of Sk. Hasina maintains that is a fair agreement. It should be noted here that this was done in the context of the coparatively liberal 'Gujral Doctrine', but its viability is under question in the context of emergence of Hindu extremist power like BJP or North Indian upper class elite learership of the Congress. [Detailed accounts, opinions about the issue can be seen in contemporary news papers.]
2. The huge trade gap between the two countries is a serious problem suffering Bangladesh a lot. Bangladesh's official reports (which does not include the huge smuggling across the borders) from India now amounts to about US $ 1.5 billion, while the exports to India are just around US $ 70 million. During the recent secretary-level talks held in Dhaka, New Delhi asked it to 'sell transit and port facilities' in order to correct the trade imbalance but only got assurances for the measures which would really promote economic cooperation and reduce the trade imbalance—like 'zero-tariff', removal of existing non-tariff barrier or setting up of joint venture industries on buy-back basis. [For full context of above discussion, see, Dilara Choudhury, "Security Studies in Bangladesh: Continuity and Change", in

www.bjilibrary.com

Dipankar Banerjee (eds.), Security Studies in South Asia: Change and Challenges, Colombo: Regional Centre for Strategic Studies, 2000. p.143-157.]

3. The issue of 'illegal immigrants' is a continuous problem for Bangladesh. According to Indian government sources, there are about one crore alleged Bangladeshi illegal immigrants and Indian power elite's manifesto called for a 'push-back' policy. The Indian authority, however, has called for the identification of these so-called foreigners so that they can be provided some services but there are apprehensions in Bangladesh that under this garb even Indians belonging to minority communities would be pushed back.
4. India's pressure on Bangladesh is always seen regarding the issue of insurgency in the north-eastern provinces of India.

উপরে বর্ণিত ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার সঙ্গে নতুন দুইটি মাত্রা সর্বসাম্প্রতিক সময়ে এসে যুক্ত হয়েছে।

এক. ছয় দিন ভারত সফর শেষে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল মইন উ আহমেদ গত ১ মার্চ (২০০৮) রাতে দেশে ফিরেন। সফরকালে তিনি ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়, প্রতিরক্ষামন্ত্রী এ.কে এন্থনি, তিন বাহিনীর প্রধানসহ বিভিন্ন পদস্থ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করেন। বৈঠককালে উভয় পক্ষ দু'দেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে কথা বলেন। দেশে ফেরার প্রাক্কালে সেনাপ্রধান পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন এবং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশ্বভারতী পরিদর্শন করেন। সেনাপ্রধানের ভারত সফর সম্পর্কে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপদেষ্টা ২ মার্চ এক প্রেস ব্রিফিং-এ বলেন যে এ সফর অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছে। সফরকালে জেনারেল মইন উ আহমেদকে ভারতের সেনাপ্রধান জেনারেল দীপক কাপুর শুভেচ্ছার নিদর্শনস্বরূপ ছয়টি ঘোড়া উপহার দেন। ঘোড়াগুলো অতি উন্নতমানের এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। মূল্য ৭ কোটি টাকার অধিক। গত ১৯ মার্চ ভারতীয় সেনাবাহিনীর কর্ণেল মিহির ভট্টাচার্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কর্ণেল আমিনুল হকের কাছে ঘোড়াগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করেন। বেনাপোল চেকপোস্ট দিয়ে ঘোড়াগুলো বাংলাদেশে প্রবেশ করে। পরে সেগুলো ঢাকায় নিয়ে আসা হয়। 'শুধু ঘোড়া নয়--চালও চাই' শিরোনামে চট্টগ্রামের প্রসিদ্ধ দৈনিক পূর্বকোণ-এ গত ৭ এপ্রিল এডভোকেট এস. এম. এবাদ উল্লাহ এক

www.bjilibrary.com

উপসম্পাদকীয় নিবন্ধে লেখেন:

"ঘোড়াগুলো যখন বেনাপোল সীমান্ত অতিক্রম করছিল তখন সীমান্তের ওপারে শত শত চাল বোঝাই ভারতীয় ট্রাক লাইন ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। উক্ত ট্রাকগুলো রফতানিকৃত চাল নিয়ে বাংলাদেশে আসছিল। সীমান্ত অতিক্রমের পূর্বে ভারত সরকারের নিষেধাজ্ঞার কারণে চাল বোঝাই ট্রাকগুলো বাংলাদেশে প্রবেশ করতে পারে নি। ফলে সীমান্তের ওপারে দিনের পর দিন অপেক্ষারত আছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বিগত বছর বাংলাদেশ তিনটি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হয়। পর পর দু'বার বন্যা ও প্রলয়ঙ্করী সিডরের কারণে বাংলাদেশে জানমালের ব্যাপক ক্ষতি হয়। গোলার ধান ও ক্ষেতের ফসল নষ্ট হয়ে যায়। ফলে দেশে ব্যাপক খাদ্য ঘাটতি দেখা দেয়। সিডরের ক্ষয়ক্ষতি সরেজমিনে দেখার জন্য ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় বাংলাদেশে আসেন। জনগণের দুঃখ-দুর্দশা দেখে দিনি সরকারী পর্যায়ে বাংলাদেশে ৫ লক্ষ টন চাল রফতানির ঘোষণা দেন। তাঁর এ ঘোষণায় বাংলাদেশের জনগণ আশ্বস্ত হন। এছাড়া ভারত সরকার সিডর পরবর্তীতে বাংলাদেশে চাল রফতানির উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেয়। ফলশ্রুতিতে ভারত থেকে চাল আমদানির জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে উদ্যোগ নেয়া হয়। বাংলাদেশের ব্যবসায়ীগণ চাল আমদানির নিমিত্তে ভারতের বরাবরে বিভিন্ন এলসি খোলেন। ভারতীয় চালের তখন মূল্য ছিল প্রতি মেট্রিক টন ৪২৫ মার্কিন ডলার। ভারতীয় ব্যবসায়ীগণ প্রাপ্ত এলসির বিপরীতে বাংলাদেশে চাল রফতানির প্রক্রিয়া যখন প্রায় সম্পন্ন করেন তখন বাধ সাধে খোদ ভারত সরকার। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয় ৫০৫ ডলারের নিচে চাল রফতানি করা যাবে না। ফলে ভারত থেকে চাল আমদানি প্রক্রিয়া বন্ধ থাকে। বাংলাদেশে খাদ্য সঙ্কট ও মূল্য বৃদ্ধির কথা বিবেচনা করে ব্যবসায়ীগণ প্রতি মেট্রিক টন ৫০৫ ডলার মূল্যে চাল আমদানি করতে সম্মত হয়। ব্যাংকিং প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে চাল ভর্তি শত শত ট্রাক ভারতীয় সীমান্তে এসে জড়ো হয়। চাল বোঝাই ট্রাকগুলো বাংলাদেশে ঢুকার পূর্ব মুহূর্তে ভারতের কাস্টমস কর্তৃপক্ষ থেকে জানানো হয় যে, প্রতি মেট্রিক টন ৬৫০ ডলারের নিচে চাল রফতানি করা যাবে না। হালে উক্ত মূল্য ১০০০ ডলার করা হয়েছে। ভারতের এহেন সিদ্ধান্তে উভয় দেশের ব্যবসায়ীগণ (এবং বাংলাদেশের জনগণ) বিপদে পড়েন। সীমান্তের ওপারে শত শত চাল বোঝাই ট্রাক দিনের পর দিন অপেক্ষা করতে থাকে। ট্রাকগুলো যাতে বাংলাদেশে প্রবেশ করতে না পারে সে জন্য ভারত সরকার সীমান্তের পেট্রাপোল বন্দরে ব্ল্যাক ক্যাট, বিএসএফ এবং অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করে। ভারত সরকার কর্তৃক চাল রফতানি আটকে দেয়াতে খোদ ভারতীয় ব্যবসায়ীগণ ক্ষুব্ধ হন। সে দেশের এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ করা হয়। সমাবেশে নেতৃবৃন্দ ঘোষণা দেন যে সরকার পূর্বের মূল্যের চাল রফতানি করতে অনুমতি না দিলে

www.bjilibrary.com

অনির্দিষ্টকালের জন্য দু'দেশের আমদানি-রফতানি বন্ধ করে দেওয়া হবে। প্রয়োজনে তারা হাইকোর্টে যাবেন বলেও ঘোষণা দেন। ভারত সরকারের এহেন নেতিবাচক সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের মানুষকে মর্মাহত করেছে। তার চেয়েও বেশি মর্মাহত হয়েছে ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের তদসংক্রান্ত মন্তব্যে। সাংবাদিকদের তিনি বলেছেন: 'আমরা না খেয়ে আপনাদের খাওয়াবো নাকি?' তাঁর এহেন মন্তব্য ক্ষুধার্থ মানুষকে উপহাস করার শামিল। অন্যদিকে সরকারিভাবে আমদানিতব্য ৫ লক্ষ মেট্রিক টন চালও আসে নি। সরকার এ ব্যাপারে অনেক দেন-দরবার করেছেন। বেসরকারি পর্যায়ে পূর্বের দামে চাল রফতানি করতে ভারতকে রাজি করানোর জন্য বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তাও চেয়েছেন। অবশ্য ইতোমধ্যে ১ লক্ষ টন চাল বাংলাদেশে আসার পর্যায়ে রয়েছে। বাকী ৪ লক্ষ টন চালের কোন খবর নেই। চাল রফতানি নিয়ে ভারতের এহেন গড়িমসির কারণে এদেশের জনগণ আশাহত হয়েছে। কারণ ভারত বাংলাদেশের বৃহৎ প্রতিবেশি দেশ। খাদ্যদ্রব্য থেকে শুরু করে সকল পণ্যদ্রব্য ভারত থেকেই আমদানি করা হয়। সে কারণে বাংলাদেশ ভারতীয় পণ্যের বিশাল বাজার। বাংলাদেশের সাথে ভারতের বছরে কয়েক হাজার কোটি টাকার বাণিজ্য হয়। বাণিজ্যিক ভারসাম্য সব সময় ভারতের অনুকূলেই থাকে। এত বড় বাজারের ভোক্তাদের অসন্তুষ্ট করার কারণ কি তা সাধারণ মানুষের বুদ্ধি বিবেচনায় আসে না। এ সবের পেছনে কোন রাজনৈতিক সুবিধা হাসিলের উদ্দেশ্য থাকলে তার ফলাফল কিন্তু ভালো হবে না। কারণ বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ।"

দুই. ভারতের শীর্ষ ইংরেজি দৈনিক দ্য টেলিগ্রাফ ৫ এপ্রিল ২০০৮ তারিখে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ৬ এপ্রিল বাংলাদেশের দৈনিক নয়া দিগন্ত পত্রিকা জানায়:

"ভারতের সাবেক সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল মানেকশ'র জন্মদিনে বাংলাদেশের উপহার নিয়ে গতকাল এক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে কলকাতার দ্য টেলিগ্রাফ। ফিল্ড মার্শালের জন্মদিনে ঢাকার উপহার হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে জ্যাকবের নেতৃত্বে ভারতীয় জেনারেলদের ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবসে সম্মানিত করার বিষয়টিকে। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের কয়েক যুগের অনিচ্ছার অবসান ঘটেছে বলেও উল্লেখ করেছে পত্রিকাটি। টেলিগ্রাফের প্রতিবেদনটি ছিল এ রকম: অসুস্থতার কারণে ফিল্ড মার্শাল স্যাম মানেকশ'র তামিলনাড়ুর হাসপাতালে যাওয়া-আসাটা প্রায় নিয়মিত। ৫ এপ্রিল ছিল তার ৯৫তম জন্মদিন। হৃদয়ে উত্তাপ সৃষ্টিকারী এক খবর পাওয়ার মধ্য দিয়ে তিনি উদযাপন করেছেন এই দিনটি। খবরটি হলো, বাংলাদেশ তাদের ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ১০ ভারতীয় জেনারেলকে স্বাগত জানিয়েছে; সম্মাননা দিয়েছে। ১৯৭১ সালের যুদ্ধকে ভারত সহায়তার আবরণে মোড়া আধুনিককালে তাদের সবচেয়ে বড় বিজয় হিসাবে বিবেচনা করে। 'স্যাম বাহাদুর' হিসাবে অধিক পরিচিত এই ফিল্ড মার্শাল

www.bjilibrary.com

গত সপ্তাহের শুরুর দিকে (মার্চের শেষ সপ্তাহ) আবারো ওয়েলিংটন সামরিক হাসপাতালে (মাদ্রাজ) ভর্তি হন। তাকে দেখতে যাওয়া স্বজন ও ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের মধ্যে একজনের কাছ থেকে তিনি জানতে পারেন, ১৯৭১ সালে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামের চিফ অব স্টাফ হিসাবে কর্মরত লেফটেন্যান্ট জেনারেল জে এফ আর জ্যাকব বাংলাদেশ সফর শেষ করে ফেরার পথে রয়েছেন। ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক মুখপাত্র জানান, ১৯৭১ সালের পর বাংলাদেশ এই প্রথম তাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবদান স্বীকার করল। এই উৎসাহব্যঞ্জক স্বীকারোক্তি যথেষ্ট না হলেও বাংলাদেশের সেনাপ্রধান মইন উ আহমেদের গত ফেব্রুয়ারিতে ভারত সফরের পর থেকে দু' দেশের মধ্যে সেনাবাহিনী পর্যায়ে সম্পর্ক পুনরুজ্জীবিত করার একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। জেনারেল মইনের সফরকালে তাকে ছয়টি ঘোড়া দেওয়া হয়। ১৯৭৫ সালে নিহত হওয়ার আগে শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ভূমিকার কথা স্বীকার করেন। বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা অর্থাৎ মুক্তিবাহিনী ভারতীয় বাহিনীকে 'মিত্র বাহিনী' হিসাবে অভিহিত করত। ভারতের প্রতিরক্ষা বাহিনী এক বিবৃতিতে জানায়: 'বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর ভূমিকা সব সময় প্রশংসা করলেও এই প্রথম তাদের স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপনে আমাদের যোদ্ধাদের আমন্ত্রণ জানানোর মাধ্যমে সম্মানিত করল।' প্রতিরক্ষা সূত্রগুলো জোর দিয়ে জানায়, ভারতীয় জেনারেলদের সফরটি এমন সময় অনুষ্ঠিত হলো, যখন ঢাকার সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার বছরের শেষ নাগাদ নির্বাচন আয়োজনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তারা জানায়, বাংলাদেশ সরকার দুর্নীতিবিরোধী একটি পরিচ্ছন্নতা অভিযানও শুরু করেছে। বাংলাদেশ সফররত ভারতের জেনারেলরাও এই অভিযানে তাদের সমর্থনের কথা উল্লেখ করেছেন। একই সঙ্গে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ব্যাপারে একটি দাবির প্রতিও সমর্থন জানিয়েছেন তারা। নয়া দিল্লির সামরিক প্রশাসনের প্রবল আগ্রহও অকারণ নয়। ১৯৭১ সালের পর থেকে ৩৬ বছরের বেশির ভাগ সরকারই মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদানকে অগ্রাহ্য করার চেষ্টা করেছে। বাংলাদেশের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন, সেনাপ্রধান কার্যালয়ের এমন এক কর্মকর্তা জানান, প্রধানত দু'টি কারণে এমন ঘটনা ঘটেছে। প্রথমত, তারা নিজেদের নমনীয় রাষ্ট্র হিসেবে দেখতে চাচ্ছিল না। আর পরবর্তী সময়ে মৌলবাদী শক্তির উত্থানের কারণে ঢাকা আমাদের সাথে একটা দূরত্ব বজায় রাখতে আগ্রহী ছিল। ভারতীয় প্রতিনিধিদলের সব সদস্যই অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা। সেনাবাহিনী আশা করছে, জেনারেল মইনের সফরের পর বাংলাদেশে ভারতীয় সেনা কর্মকর্তাদের সফরের পথও উন্মুক্ত হবে। এ ধরনের কিছু এখনো না ঘটলেও 'তা হবে একটি চমৎকার সূচনা'। কলকাতা ফোর্ট উইলিয়ামের পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড এ সফরের সমন্বয় করে। গোয়া ও পাঞ্জাবের সাবেক গভর্নর জেনারেল জ্যাকব ছাড়াও এই সফরে অংশ নেন

www.bjilibrary.com

লেফটেন্যান্ট জেনারেল পি এন নাথপিলিয়া, লেফটেন্যান্ট জি এস বক্সি, মেজর জেনারেল আর কে খান্না, মেজর জেনারেল লক্ষ্মণ সিং, মেজর জেনারেল অশোক ভার্মা কল্যাণ ও ব্রিগেডিয়ার আমরিত কাপুর। লক্ষ্মণ সিং এই প্রতিনিধিদলের পক্ষ থেকে কথা বলেন এবং তিনি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ব্যাপারে মুক্তিবাহিনীর দাবির প্রতিও সমর্থন জানান। বাংলাদেশে এটি একটি চাঞ্চল্যকর ইস্যু। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান বাহিনীকে সাহায্যকারী বাংলাদেশী সহযোগীদের যুদ্ধাপরাধের দায়ে বিচারের দাবি তুলেছেন মুক্তিযোদ্ধারা। ২৫ থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত ভারতীয় সাবেক জেনারেলরা ঢাকায় স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন জনসমাবেশে যোগ দেন।"

কেবল ভারতীয় রাষ্ট্রদূত পিনাক বাবুই নন, সফরকারী ভারতীয় সামরিক অতিথিরাও বাংলাদেশের নানা প্রসঙ্গ নিয়ে খোলামেলা মত দিলেন এবং আভ্যন্তরীণ বেশ কিছু স্পর্শকাতর বিষয়ে অকপটে নিজেদের অবস্থান জানালেন। অন্য দেশে নিজস্ব বিষয়ে কথা বলার ব্যাপারে তারা স্বীকৃত শিষ্টাচার সম্পর্কে সতর্ক ছিলেন না বলেও বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকায় কলাম ছাপা হয়।

গতানুগতিক যে সকল সমস্যার সম্মুখীন বাংলাদেশ ভারতের দিক থেকে হচ্ছে, সেগুলো নবরূপ ধারন করে নতুন মাত্রা ও ব্যাপকতা পেয়েছে স্নায়ু যুদ্ধের পর এককেন্দ্রীক বিশ্ব ব্যবস্থায়। ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইজরায়েলের সঙ্গে সামরিক-বেসামরিক-কৌশলগত মৈত্রী গড়ে দক্ষিণ এশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদ, বিশ্ব পুঁজিবাদ ও ইসলামবিরোধী শক্তির স্থানীয় এজেন্টে পরিণত হয়েছে। এবং এর ফলে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বৈরিতার দিক থেকে আরও কিছু বিষয় সাম্প্রতিক পর্যবেক্ষণে সামনে চলে আসছে। যেমন:

১. বিরাজমান সমস্যাগুলোর মীমাংসা না করে জটিল করা এবং ঝুলিয়ে রাখা। (এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের সঙ্গে কোন সমস্যারই নিষ্পত্তি করেনি ভারত।)
২. অমীমাংসিত সমস্যার কারণে বাংলাদেশকে কোণঠাসা করা এবং নিজস্ব স্বার্থ হাসিল করা।
৩. বাংলাদেশ ভেঙে বাংলাদেশকে স্বাধীন করে ভারত এক পাকিস্তানের স্থলে দুইটি পাকিস্তান সৃষ্টি করেছে বলে সে দেশের বুদ্ধিজীবিদের মত প্রকাশ এবং এর মাধ্যমে বাংলাদেশকে শত্রু হিসাবে নির্ধারণ করা।
৪. বাংলাদেশকে মানবাধিকারবিরোধী এবং মৌলবাদ-জঙ্গিবাদের ঘাঁটি বলে প্রচার করে বিশ্বব্যাপী ইমেজ বিনষ্ট করা এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের শত্রুর সংখ্যা বাড়িয়ে তোলা।
৫. বাংলাদেশকে বাস্তব পদক্ষেপ ও প্রচারণার মাধ্যমে অকার্যকর রাষ্ট্র বানানোর ষড়যন্ত্র করা।
৬. রাষ্ট্র ও প্রশাসনকে দুর্বল করে নিজের কর্তৃত্ব করার পথকে সুগম ও নিরাপদ রাখা।
৭. সমাজের মানুষের মধ্যে নানা মতভেদ ও আদর্শিক বিভাজন জাগিয়ে রেখে

www.bjilibrary.com

আমাদেরকে জাতি হিসাবে ঐক্যবদ্ধ ও অগ্রসর হতে না দেওয়া।

৮. ভারতের হয়ে কাজ করার জন্য নানা পেশা ও শ্রেণীর মধ্যে এজেন্ট ঢুকিয়ে দেওয়া।

৯. আন্তর্জাতিক সংস্থা ও মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানির মাধ্যমে প্রচুর ভারতীয়র অনুপ্রবেশ ঘটানো এবং এদের মাধ্যমে রাজনীতি, অর্থনীতি, মিডিয়াসহ নানা ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ মজবুত করা।

১০. দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা এবং বিরোধের মধ্যে ইন্ধন দেওয়া বা পক্ষাবলম্বন করা।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ভারতের বৈরী তৎপরতা, সম্প্রসারণবাদী আচরণ ও আধিপত্যবাদী-আগ্রাসী কর্মকাণ্ড করা হচ্ছে প্রকাশ্যে এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আইনকে মনে রেখেই। অর্থাৎ বিধিবদ্ধ নিয়মের মধ্যেই ভারত হাসিল করে নিচ্ছে নিজস্ব স্বার্থ; যেমনটি ১৯৭১ সালের পর পরই সহযোগিতা ও বন্ধুত্বের ছদ্মাবরণে করেছিল। অতএব, ভারতের 'বন্ধুত্ব ও শত্রুতা' উভয়বিদ প্রসঙ্গই তুলাদণ্ডে পরিমাপ-যোগ্য; পরীক্ষা-নিরীক্ষা সাপেক্ষ বিষয়। এর অর্থ হলো, ভারতের প্রতিটি আচরণই সন্দেহজনক এবং গোপনে বৈরীতা, সম্প্রসারণবাদ ও আধিপত্যবাদ কায়েমের মতলবজাত। ভারতের পক্ষ থেকে তথাকথিত বন্ধুত্ব ও শত্রুতা; উভয় আচরণই প্রথমত এবং প্রধানত ভারতের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে করা হয়। যেমন, সুযোগ পেলেই বন্ধুর বেশে ভারত হস্তক্ষেপ করে বাংলাদেশের রাজনীতি ও ক্ষমতায় নিজের পক্ষের শক্তিকে এনে নিজস্ব স্বার্থ হাসিল করেছে; নিজের স্বার্থের অনুকূলে সুবিধাজনক নানা চুক্তি ও নানা কার্যক্রম করিয়ে নিয়েছে। আবার ভারতবিরোধিরা ক্ষমতায় থাকলে শত্রুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে ভারত প্রকাশ্য ও গোপন চাপ ও সমস্যা সৃষ্টির মাধ্যমে স্বীয় আধিপত্য ও সম্প্রসারণকে বহাল রাখছে। ঐতিহাসিক ঘটনা পরম্পরা এ সত্যকেই প্রতিভাত করে। অতএব ভারতীয় সকল কার্যক্রমের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সতর্কতামূলকভাবে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক-বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষায় সরকার ও জনগণের পক্ষ থেকে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। এ জন্যে প্রয়োজন ক্ষমতা ও ক্ষমতার বাইরের শক্তিসমূহের মধ্যে সর্বাত্মকভিত্তিক দেশপ্রেমিক-জাতীয়তাবাদী-ধর্মীয় মূল্যবোধে উজ্জীবিত সমন্বিত ও ঐক্যবদ্ধ উদ্যোগ। পাশাপাশি ইতিহাসের কিছু বিষয় ও ঘটনাকে আমাদের জাতীয় স্বার্থের আলোকে পুনর্গঠন ও পুনর্বিবেচনা করাও জরুরি। যেমন:

১. ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যকার চুক্তিসমূহের ব্যাপারে শ্বেতপত্র প্রকাশ করে বাংলাদেশের স্বার্থের আলোকে প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তির ব্যাপারে তথ্যনিষ্ঠ পর্যালোচনার ব্যবস্থা করা উচিত।

২. জাতীয় স্বার্থানুসন্ধানে বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে টাস্ক ফোর্স গঠন করে ভারতের সঙ্গে সম্পর্কিত সকল বিষয়ে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে বাংলাদেশের স্বার্থ-নিশ্চিতকারী পরিকল্পনা প্রণয়নের ব্যবস্থা থাকা দরকার।

৩. ভারত কর্তৃক বাংলাদেশে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কিভাবে আধিপত্য বিস্তারের

www.bjilibrary.com

প্রচেষ্টা চলছে তা জনসমক্ষে প্রকাশ করে দেশপ্রেমিক চেতনার বিস্তার ঘটানো আবশ্যিক কর্তব্য।

৪. বিশ্বায়নের সুযোগে ভারতের আগ্রাসনের বিস্তার সম্পর্কে দেশের নীতি নির্ধারক ও প্রশাসন-আমলাতন্ত্র-পরিকল্পনাবিদদের সতর্ক থাকার ব্যবস্থা নেওয়া আবশ্যক।

৫. দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে ভারতীয় বৈরী আচরণ, আগ্রাসন, আধিপত্য ও সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে কূটনৈতিক ও কৌশলগত ঐক্য গঠন।

৬. দেশে-বিদেশে ভারতীয় আগ্রাসন ও তৎপরতার ব্যাপারে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সহ উচ্চতর পর্যায়ে বিস্তারিত গবেষণার প্রসার করা প্রয়োজন।

৭. বর্ণহিন্দু ও ব্রাহ্মণ্যবাদী অত্যাচারে নিগৃহীত ভারতীয় নিম্ন বর্ণ ও সংখ্যালঘু মানুষের পক্ষে বিশ্বজনমত গঠন।

৮. ভারতীয় সংস্কৃতির নানামুখী আগ্রাসনের একতরফা প্রভাব বন্ধের কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়ার লক্ষ্যে দেশে জাতীয় সংস্কৃতির বিস্তার ঘটানো।

৯. ভারতীয় সংস্কৃতি ও বিশ্বাসের অনুসারী সাংবাদিক-সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব তথা বুদ্ধিজীবি তকমাধারীদের 'দিল্লিতে বৃষ্টি হলে ঢাকায় ছাতা খোলার' গোলামীপনা থেকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করে তাদেরকে জাতীয়তাবাদী-দেশপ্রেমিক-ধর্মনিষ্ঠ স্তরে উন্নীত করার কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া।

১০. পত্র-পত্রিকা ছাড়াও তথ্য যোগাযোগের আধুনিক সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে ওয়েব সাইট বা টিভি নেট ওয়ার্কের মাধ্যমে আধিপত্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদ সম্পর্কে বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনার মাধ্যমে জনগণকে প্রশিক্ষিত করা এবং এ কার্যক্রমকে দক্ষিণ এশিয়ার তথা আন্তর্জাতিক পরিধিতে নিয়ে যাওয়া।

১১. অন্ধভাবে ভারতবিরোধিতার অবসান ঘটিয়ে যৌক্তিক, তথ্যপূর্ণ ও স্বার্থ সংরক্ষণমূলক পদ্ধতিতে বিরোধিতা করা। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে একটি কথা আছে যে, প্রয়োজনে স্ত্রী বদলানো গেলেও প্রতিবেশি বদলানো যায় না। ভারত আমাদের প্রতিবেশি আছে এবং থাকবে; তাকে তুলে নিয়ে অন্য কোথাও সরিয়ে দেওয়ার কোন সুযোগ নেই। আমরা আমাদের এবং ভারতের নিপীড়িত মানুষের স্বার্থে ভারতের ক্ষমতাসীনদের বর্ণবাদী, আগ্রাসী ও সম্প্রসারণমূলক মনোভাব ও আচরণকে বদলাতে চাই। আমাদের জন্যে যেমন ভারতের প্রয়োজন রয়েছে, ভারতের জন্যেও আমাদের প্রয়োজন আছে। অতএব পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সম্মানের পরিবেশ সৃষ্টি হলে অনেক সমস্যার সমাধান হতে বাধ্য।

১২. এ কারণে ভারতের প্রতি নতজানু ব্যক্তি-দল-আদর্শকে দেশপ্রেমিকতা-

www.bjilibrary.com

জাতীয়তাবাদ-ধর্মীয় মূল্যবোধের মোহনায় নিয়ে আসতে হবে। যদি তারা তাদের চিরাচরিত ভারত তোষণ নীতি থেকে জাতিস্বার্থকেন্দ্রিক নীতিতে চলে না আসে, তাহলে তাদেরকে জনগণের সামনে চিহ্নিত ও বিচ্ছিন্ন করতে হবে।

১৩. ভারতকে তার বহুবিধ স্বার্থেই, আধিপত্যবাদী-সম্প্রসারণবাদী-বর্ণহিন্দুত্ববাদী দর্শনকে সরিয়ে রেখে মানবতা ও বাস্তবতার আলোকে বাংলাদেশ ও অন্যান্য প্রতিবেশির সঙ্গে সদ্ভাব ও সুসম্পর্ক বজায় রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন, এ সত্যটুকু নয়া দিল্লিকে অনুভব করতে প্রতিনিয়ত প্রণোদনা দিতে হবে। কেননা, বর্তমানের বহুমাত্রিক বিশ্বব্যবস্থায় বা বিশ্বায়নের প্রক্রিয়ার মধ্যে অন্য কারো সাহায্য-সহযোগিতা ছাড়া এককভাবে কোন একটি দেশের পক্ষে খরা, মন্দা, পরিবেশ বিপর্যয়, প্রাকৃতিক তাণ্ডব, মাদক দ্রব্যের প্রসার, সন্ত্রাস, সহিংসতা ইত্যাদির মুকাবিলা করা কঠিন এ কারণেই যে, সমস্যা ও সংকটও বিশ্বায়নের তোড়ে ছড়িয়ে গেছে এক দেশ থেকে অন্য দেশে। এমন কি, এক দেশে বিদ্যমান সমস্যার শিকড় খুঁজে পাওয়া যাবে অন্য দেশের মৃত্তিকায়। ভারত বড় আয়তন ও বড় জনসংখ্যার দেশ বলেই তার সমস্যা ও সংকটও বড় আর বেশি। অতএব, বৃহৎ ভারত তার প্রতিবেশিকে যতটুকু সমস্যায় ফেলতে পারবে, তারচেয়ে বেশি ও বহুমাত্রিক সমস্যায় তাকে ঠেলে দিতে পারবে প্রতিবেশিরাও । এই ঠেলাঠেলির খেলায় যদিও কেউই জিতবে না, তথাপি ক্ষতি বেশি হবে ভারতেরই--তাকে একা লড়তে হবে অনেকের সঙ্গে। ভারত যদি 'এশিয়ান পাওয়ার' হতে চায় তবে তো প্রতিবেশিদের সঙ্গে ঠেলাঠেলিতে শ্রম আর অর্থ ব্যয় মারাত্মক ক্ষতির কারণ হবে দেশটির জন্যে! আঞ্চলিক প্রতিযোগিতায় হিমসিম খেয়ে আন্তর্জাতিক ময়দান পর্যন্ত পৌছুনোও হয়তো ভারতের পক্ষে সম্ভব হবে না। বুদ্ধিমানের কাজ হবে বড়র বড়ত্ব আর উদারতা দিয়ে প্রতিবেশিদের আস্থা ও সমর্থন পাওয়া, প্রয়োজনে ছাড় দেওয়া; তাতেই যে ভারতের মঙ্গল এ কথাটুকু তাদের নীতিনির্ধারকরা অনুধাবণ করতে পারলেই ভারতও বাঁচবে; ভারতের প্রতিবেশিরাও হাফ-ছেড়ে বাঁচবে।

শত বছরের যুদ্ধকে ভুলে গিয়েও ইউরোপ এক হয়েছে সম্পদ বাঁচাতে ও আরো সম্পদ সংগ্রহ করতে। বিশেষ করে, জ্বালানি সংগ্রহ, পরিবেশ সুরক্ষা, রোগ ও মারী প্রতিরোধে তারা একাট্টা। কেউ কারো স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বে আঘাত না করা এবং যার যার ন্যায্য প্রাপ্য ঠিক ঠিক বুঝিয়ে দেওয়ার নীতিতেই এমন সৌহার্দ্য সম্ভব হয়েছে। নিজেদের মধ্যে কামড়া-কামড়ি করলে আবার তারা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ স্থানে আসতে পারতো না। ইউরোপের সৌভাগ্য যে, সেখানে কোন 'ভারত' নেই; থাকলে লুক্সেমবার্গ বা সুইজারল্যান্ডের মতো নিরীহ ও ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের ভাগ্যে কী ঘটতো কে জানে! আরেকটি

www.bjilibrary.com

উদাহরণ ভারতের মনে থাকলে ভালো। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন আমজনতাকে দুধের নদী আর ক্ষীরের সাগরে ভাসিয়ে ভূমিতলে স্বর্গসুখ দিতে চেয়েছিল। বাস্তবে কী দিল! একদিকে অদৃশ্য-শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্র প্রতিযোগিতা-তারকা যুদ্ধ-মহাকাশের লাল-রাঙ্গার সদম্ভ উন্নাসিকতা আর অন্যদিকে জনতার জন্যে যুধ-বুঁজে সব সহ্য করার নির্দেশ নচেৎ সাইবেরিয়ার বরফ-শীতল জগতে নিঃসঙ্গ নির্বাসন এবং একখণ্ড রুটির জন্যে হাহাকারময় লৌহ-যবনিকার আড়ালের বন্দী জীবন। ভারতও যদি একদিকে প্রতিবেশিদের বিরুদ্ধে অস্ত্র প্রতিযোগিতায় উন্মত্ত হয়ে থাকে এবং নিজের অহিন্দু জনগণকে নিঃস্ব ও বঞ্চিত করতে থাকে; ভিন্ন মত-পথ-ধর্ম-আদর্শের টুঁটি চেপে ধরে; তাহলে আমরা কি আবার দেখবো ইতিহাসের সেই অমোঘ পালাবদল: সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে সুদূর জার্মানি পর্যন্ত লাল দূর্গ খান্ খান্ ভেঙে যাওয়ার অবিশ্বাস্য ধারাচিত্রের মতোই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তিতে আসমুদ্র হিমাচলব্যাপী জনপদের-জনমানুষের স্বাধীন পুনরুত্থান!

পরিশেষে বলতে চাই, বৈরী আচরণ, আধিপত্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদসহ যে কোনো ধরনের মানবতা বিরোধী মতবাদ বা আচরণের তাত্ত্বিক বা ব্যবহারিক চর্চ্চার বিরুদ্ধে কোন কার্যকর আদর্শিক শক্তি ছাড়া লড়াই করা অর্থহীন। ভারতের বিরুদ্ধে টিকে থাকতে হলে এবং বেঁচে থাকতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন আদর্শিক প্রস্তুতি। ভারত যেভাবে অক্টোপাশের মত ধর্ম-দর্শন-আর্থিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে আক্রমণ করছে, সেটা একটি মাত্র দিক দিয়ে প্রতিহত করা যাবে না। প্রতিহত করা যাবে বর্ণ-ব্রাহ্মণ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে মানবতাবাদী আদর্শের অনুসরণের মাধ্যমেই। ঐতিহাসিক বাস্তবতা এ সত্যকেই প্রতিষ্ঠিত করে। অর্থাৎ যে আদর্শ একদিন বর্ণবাদ ও ব্রাহ্মণ্যবাদের অমানবিক নিগড় থেকে হাহাকাররত মানবতাকে মুক্তি দিয়েছিল, সেই আদর্শের পথেই আজকেও ভারতের আক্রমণের হাত থেকে বাঁচার পথ সন্ধান করতে হবে। এক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ার নির্যাতিত মানবতা, বিশেষ করে বাংলাদেশের সামনে উজ্জ্বল উদ্ধারের দিশা দিয়ে যাচ্ছে ইসলাম এবং ইসলামী মানবতাবাদী আদর্শ।

ইতিহাস আমাদেরকে এই সত্যের সন্ধান দিয়েছে যে, বৈরী আচরণ, আধিপত্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদসহ যে কোনো ধরনের মানবতা বিরোধী মতবাদ বা আচরণের তাত্ত্বিক বা ব্যবহারিক চর্চ্চার বিরুদ্ধে ইসলামের সুস্পষ্ট বিধান বিদ্যমান। ইসলাম কোনো মুসলমানকে আধিপত্য-সম্প্রসারণবাদী হতে নিষেধ করে এবং আক্রান্ত হলে প্রতিরোধ গড়তে বলে। অর্থাৎ নিজে তো আধিপত্য-সম্প্রসারণবাদী হবেই না, অন্যকেও হতে দেবে না।

ইসলামের ইতিহাসে আধিপত্য-সম্প্রসারণবাদী অপতৎপরতার বিরুদ্ধে কী কৌশল নেওয়া উচিত, তার উদারহণ রয়েছে। মদীনায় যখন প্রথম ইসলামি রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা কায়েম হয়, তখনই তা আধিপত্য-সম্প্রসারণবাদী অপশক্তি দ্বারা আক্রান্ত হয়। ভেতরের ইহুদিরা চেয়েছিল তাদের আধিপত্য বজায় রাখতে বা বাড়াতে আর চারদিকের মুশরিক/তাগুতি শক্তি চেয়েছিল তাদের অবস্থানকে/মতকে সম্প্রসারিত করতে।

www.bjilibrary.com

সে সময় আধিপত্য-সম্প্রসারণবাদ-এর মুকাবিলায় ইসলামি প্রতিরোধ কৌশল অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ ছিল; তাতে ছিল প্রকৃত শান্তির অন্বেষা আর প্রতিরোধের পূর্ণ প্রস্তুতি। যেমন:

- মানব সম্পদ উন্নয়ন, যোগ্য লোকবল তৈরি এবং তাদের মানসিক-আদর্শিক-প্রশাসনিক-সামরিকসহ সর্বক্ষেত্রে সুদক্ষরূপে গড়ে তোলার মাধ্যমে আত্মরক্ষা ও সব ধরনের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য প্রস্তুকরণ;
- চুক্তি ও শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে আত্মমর্যাদা রক্ষার পন্থা অবলম্বন;
- মৈত্রী জোট গঠন করে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ থাকা;
- দূত ও দাওয়াত প্রেরণ করে প্রতিপক্ষকে আদর্শিক ও নৈতিকভাবে জয় করার প্রচেষ্টা নেওয়া; এবং
- প্রয়োজনে প্রতিরোধ ও প্রতিরক্ষার সার্বক্ষণিক ব্যবস্থা তৈরি রাখা।

আল্লাহর নির্দেশিত পথে পরিচালিত হয়ে রাসূল (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করে অতীতের মতো আজ এবং ভবিষ্যতেও যে কোন ধরনের তথাকথিত মহাশক্তিধর বৈরী চক্র-আধিপত্যবাদ-সম্প্রসারণবাদসহ সকল মানব রচিত মতবাদের অপশক্তিকে মুকাবেলা করা সম্ভব। সম্ভব তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিকভাবে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও সৌন্দর্য উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে মানবতা, সমানাধিকার, শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নকারীদের মুকাবিলায় শুভবোধসম্পন্ন মানুষের সীসা-ঢালা ঐক্য ও প্রতিরোধ ব্যূহ রচনা করা। এ ঐক্য কেবল মুসলমানের ঐক্যই হবে না, হবে মুসলমান-অমুসলমান নির্বিশেষে সকল মযলুম ও শান্তিকামী মানুষের ঐক্য। মানুষের ভারসাম্যপূর্ণ ঐক্য--যা জাতি-ধর্ম-ভাষা-বর্ণ-লিঙ্গ-অঞ্চল নির্বিশেষে সকলের মানবাধিকার, সমানাধিকার, ন্যায় বিচার ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের ভিত্তিতে বিশ্বজনীনভাবে রচনার প্রয়াস চালায় ইসলাম–তার প্রকৃত প্রতিফলন ঘটানো সম্ভব হলে বাংলাদেশ বা দক্ষিণ এশিয়ায় তো বটেই, তাবৎ বিশ্বজুড়ে একদলীয়বাদ, একনায়কতন্ত্রবাদ, ফ্যাসিবাদ, নাৎসিবাদ, আধিপত্যবাদ, সম্প্রসারণবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ, বর্ণবাদ, সামরিকবাদ, হিংসাবাদসহ সকল কালো ও পাশবিক মতবাদের কবর রচিত হয়ে বিজয় সূচিত হবে মানবতাবাদের; পশুত্বের বিরুদ্ধে জয়ী হবে মানুষ; সুনিশ্চিত হবে সকল দেশের, সকল মানুষের অধিকার, শান্তি ও নিরাপত্তা। ■

লেখক-পরিচিতি : ড. মাহফুজ পারভেজ– কবি, প্রাবন্ধিক, গবেষক এবং অধ্যাপক, রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

লেখা-পরিচিতি : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত ২৪শে এপ্রিল, ২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সেমিনারে প্রবন্ধটি উপস্থাপিত হয়।

www.bjilibrary.com

ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ কৌশল

শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান

■

ক. সংজ্ঞা

মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আল-কুরআনে সুস্পষ্ট ভাষায় সর্বকালের জন্যে, সকল বনি আদমের জন্যে একদিকে যেমন ব্যবসাকে বৈধ ঘোষণা করেছেন অন্য দিকে সুদ ও সুদভিত্তিক সকর কার্যক্রমকে চিরতরে নিষিদ্ধ করেছেন। অথচ আজকের দুনিয়ায় সুদের সর্বগ্রাসী সয়লাব চলছে। সব ধরনের অর্থনৈতিক লেনদেন, ব্যবসায়িক কায়-কারবার বর্ত্রই সুদের অগ্রতিহত ও অবারিত গতি। সুদ সমাজ শোষণের সবচেয়ে বড় হাতিয়া, যুলমের সবচেয়ে মারাত্মক অস্ত্র। সুদের মাধ্যমে সমাজকে সবচেয়ে সুকৌশলে ও বেশি শোষণ করছে আজকের সনাতনী ব্যাংক ব্যবস্থা। কি পুঁজিবাদী দেশ, কি সমাজতন্ত্রী দেশ, কি মুসলিমপ্রধান দেশ সর্বত্রই সনাতনী ব্যাংকগুলো সুদী কারবারে লিপ্ত। যারা ব্যাংক হতে নানা প্রয়োজনে ঋণ নেয় তারা তো সুদ দিতে বাধ্য হয়ই, এমন কি যারা শুধু নিরাপত্তা ও সঞ্চয়ের জনে/ই ব্যাংকে টাকা আমানাত রাখে তাদেরও মুনাফার লেবাস পরিয়ে ব্যাংক সুদ নিতে প্ররোচিত করে।

সমাজ বিধ্বংসী, যুল্মকারী এবং শোষণের সফল মাধ্যম এই সুদের হাত থেকে মুসলিম মিল্লাতকে রক্ষার করার জন্যেই বর্তমানকালে সৃষ্টি হয়েছে ইসলামী ব্যাংকের।

www.bjilibrary.com

ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (OIC) জেনারেল সেক্রেটারিয়েট ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞা দিয়েছে এভাবে– "Islami bank is a financial institution whose statues, rules and procedures expressly state its commitment to the principles of Islamic Shariah and to the banning of the receipt and payment of interest on any of its operations".

অর্থাৎ, ইসলামী ব্যাংক এমন একটি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান যা তার বিধি, আইন-কানুন এবং কর্মপদ্ধতির মধ্য দিয়ে ইসলামী শারীয়াহর নীতিমালার প্রতি সুস্পষ্ট আনুগত্য প্রকাশ করে এবং তার কোন কার্যক্রমেই সুদের কোনও রকম লেনদেন করে না।

যেহেতু ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান সেহেতু ইসলামে অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, পারস্পরিক লেন-দেন প্রভৃতি সব কিছুরই সুস্পষ্ট বিধি-বিধান রয়েছে। অথচ সুদ প্রথা চালু থাকার ইসলামী বিধি-বিধান মেনে এসব কাজে অংশগ্রহণ করা মুসলিমদের পক্ষে অসম্ভব। ইসলামী ব্যাংক এই সমস্যা পূরণের জন্যেই এগিয়ে এসেছে। এর কাজের পদ্ধতি অন্যান্য সব ধরনের ব্যাংক হতে ভিন্ন। কোন্ কোন্ দিক হতে ইসলামী ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংক হতে পৃথক চার্ট আকারে তা দেখাবার চেষ্টা করা হলো।

খ. ইসলামী ব্যাংক ও সুদী ব্যাংকের মধ্যে পার্থক্য

ইসলামী ব্যাংক এবং সুদী ব্যাংকের মধ্যে বেশ কিছু বড় ধরনের পার্থক্য রয়েছে। বৈশিষ্ট্যমন্ডিত এই পার্থক্যগুলি যার মধ্যে অনেকগুলিই মৌলিক, জানা খুবই প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয়! নীচে ইসলামী ব্যাংক ও সুদী ব্যাংকের মধ্যে পার্থক্যদেখানো হলো।

সুদী ব্যাংক	ইসলামী ব্যাংক
১.	সুদী ব্যাংকের কার্যক্রম ও পরিচালনা প্রণালী মানুষের তৈরি।
২.	বিনিয়োগকারী পূর্ব নির্ধারিত হারে সুদ পাওয়ার নিশ্চয়তা পেয়ে থাকেন।
৩.	কোন বাছ-বিচার ও বাধা-নিষেধ ছাড়াই মুনাফা সর্বোচ্চকরণই এখানে চূড়ান্ত লক্ষ্য।
৪.	যাকাতের কোন সংশ্রব নেই।
৫.	অর্থ ধার দেওয়া এবং সুদসহ তা ফেরত পাওয়াই প্রধানা কাজ।
৬.	ইসলামী ব্যাংকের তুলনায় এর কাজের পরিধি সংকীর্ণ।
৭.	ঋণ খেলাফীদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অর্থ বা চক্রবৃদ্ধি সুদ দাবী করতে পারে।
৮.	এই পদ্ধতিতে ব্যক্তিস্বার্থই প্রায়শঃই মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। ভারসাম্যপূর্ণ প্রবৃদ্ধির নিশ্চয়তার জন্যে এখানে উদ্যোগ বা কৌশল নেই।
৯.	সুদভিত্তিক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির পক্ষে মুদ্রাবাজার হতে ঋণগ্রহণ তুলনামূলকভাবে সহজ।
১০.	প্রদেয় ঋণ হতে প্রকাশ্যে আয় পুনর্নির্ধারিত হওয়ার ফলে প্রজেক্ট মূল্যায়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব প্রদান গৌন প্রসঙ্গ।
১১.	সুদীন ব্যাংকগুলির মক্কেলের ঋণ গ্রহণযোগ্যতার উপরই অধিক গুরুত্ব দেয়।
১২.	মক্কেলের সঙ্গে সম্পর্কের দিক থেকে ব্যাংকের স্ট্যাটাস হলো-উত্তমর্ণ ও অধমর্ণের।
১৩.	সকল ধরনের আমানতের নিশ্চয়তা দিতে হয়।

www.bjilibrary.com

ইসলামী ব্যাংকে

১. কার্যক্রম ও পরিচালনা প্রণালী ইসলামী শারীয়াহর নীতিমালার উপর প্রতিষ্ঠিত।
২. মূলধন সরবরাহকারী (বিনিয়োগকারী) এবং তহবিল ব্যবহারকারীর (উদ্যোক্তা) মধ্যে ঝুঁকি বন্টনকেই উৎসাহিত করা হয়ে থাকে।
৩. মুনাফা সর্বোচ্চকরণ লক্ষ্য, তবে তা শারীয়াহর সীমারেখার মধ্যে।
৪. পদ্ধতিতে যাকাত সংগ্রহ ও বন্টন এর অন্যতম সেবামূলক কাজে পরিণত হয়েছে।
৫. লাভ- লোকসানের অংশীদারী ব্যবসায়ে অংশ ইসলামী ব্যাংকের প্রধান কাজ।
৬. সুদী ব্যাংকের তুলনায় কাজের পরিধি অনেক বেশি বিস্তৃত। কার্যতঃ এটি একটি বহুমুখী প্রতিষ্ঠন।
৭. ঋণ খেলাফীদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অর্থ দাবী করার কোন সুযোগ নেই।
৮. জনস্বার্থের উপর যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়। এর চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো ভারসাম্যপূর্ণ প্রবৃদ্ধির নিশ্চয়তা।
৯. ইসলামী ব্যাংকগুলির পক্ষে মুদ্রাবাজার হতে ঋণ গ্রহণ তুলনামূলকভাবে কঠিন।
১০. লাভ-ক্ষতির অংশীদারিত্বের নীতি ও কৌশল থাকায় প্রজেক্ট মূল্যায়ন ও দক্ষতা অর্জনের জন্যে সমধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়।
১১. প্রজেক্টের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ও টেকসই উন্নয়নের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করে।
১২. মক্কেলের সঙ্গে সম্পর্কের দিক থেকে ব্যাংকের স্ট্যাটাস হলো অংশীদারী বিনিয়োগকারী ও উদ্যোক্তা।
১৩. যথার্থভাবে বলতে গেলে ইসলামী ব্যাংক এটা করতেই পারে না।

গ. বৈশিষ্ট্য

ইসলামী ব্যাংকের রয়েছে পাঁচটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। যথা- (১) সুদ বর্জন, (২) শারীয়াহ্সম্মত উপায়ে শিল্পোদ্যোগ ও ব্যবসায়ে অংশগ্রহণ, (৩) শারীয়াহ সুপারভাইজারী বোড, (৪) যাকাত ব্যবস্থার বাস্তবায়ন এবং (৫) সমাজ উন্নয়নে অংশ গ্রহণ।

১. সুদ বর্জন : ইসলামী ব্যাংকের প্রথম ও মৌলিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই ব্যাংক সুদের ভিত্তিতে কোন প্রকার লেন- দেন বা ব্যবসা-বাণিজ্য করবে না। যে সুদ হারাম, ঘৃণ্য ও সমাজবিনাশী সেই সুদের অনুপ্রবেশ যেন ইসলামী সমাজে ঘটতে না পারে সেজন্যে এই ব্যাংক নিজেই শুধু সুদী কারবার হতে বিরত থাকবে না, অন্যকেও বিরত থাকতে সহায়তা করবে। সুদ নেবে না, দেবে না, খাবে না এবং খাওয়াবে না। সুতরাং, সুদের হিসাব রাখা বা সাক্ষী থাকারও প্রয়োজন হবে না। সহীহ হাদীস অনুসারে সুদের হিসাব রাখা বা সাক্ষী থাকাও কবীরা গুনাহ। তাই সুদের পাপ হতে মুসলিমদের মুক্ত রাখার

www.bjilibrary.com

জন্যে সাধ্যমত চেষ্টা করবে এই ব্যাংক। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কল-কারখানা স্থাপন, বৈদেশিক লেন-দেন সব ক্ষেত্রেই এই ব্যাংকের নীতি ও কৌশল হচ্ছে সুদ বর্জন করা এবং ধীরে ধীরে সমাজ হতে এর উচ্ছেদ করা।

২. শারীয়াহসম্মত শিল্পোদ্যোগ ও ব্যবাসয়ে অংশগ্রহণ : ইসলামী ব্যাংকের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শারীয়াহসম্মত শিল্পোদ্যোগ ও ব্যবাসায়ে অংশগ্রহণ। শিল্পোদ্যোগ ও ব্যবসা-বাণিজ্য পুঁজি বিনিয়োগের সময় ঐসব উদ্যোগ শারীয়াহর বিচারে হালাল না হারাম তাও ইসলামী ব্যাংক বিচার করে থাকে। প্রচলিত পদ্ধতিতে কোন ঋণ দেওয়ার সময় আদৌ বিচার করা হয় না যে, যে উদ্দেশ্যে ঋণ দেওয়া হচ্ছে সেই কাজটি সমাজের জন্যে কল্যাণকর না ক্ষতিকর। সমাজের তাতে মঙ্গল হবে, না সর্বনাশ ডেকে আনবে? সমাজের বিপর্যয় ও সর্বনাশ সৃষ্টিকারী মদ ও মাদক দ্রব্যের ব্যবসা, চরিত্র বিধ্বংসী নানা ধরনের উপকরণসহ সিনেমা, নাচ-গান, তামাক ও সিগারেটের মতো জনস্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর সামগ্রী উৎপাদন, মজুতদারী, মুনাফাখোরী প্রভৃতি নানা কাজে সুদী ব্যাংকগুলো ঋণ দিয়ে থাকে। এতে সমাজের সর্বনাশ আরও বেশি করে ডেকে আনা হয়। আগুনে পেট্রোল ঢাললে যেমন আগুন আরও দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে এও ঠিক তেমনি। সমাজ হতে অনাচার, পাপাচার, অশ্লীলতা প্রভৃতি দূর করার চেষ্টা করা দূরে থাক সুদী ব্যাংকগুলো নির্বিচারে ঋণ দেওয়ার ফলে এসব বরং আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইসলামী ব্যাংক এর প্রতিরোধ করতে চায়। এ জন্যেই শুধু শারীয়াহসম্মত শিল্প কল-কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতিতে এই ব্যাংক সহযোগিতা করে। ব্যাংক দুভাবে এটি করে থাকে। (ক) লাভ-লোকসানের অংশীদারিত্বের চুক্তিতে অংশ গ্রহণ এবং (খ) প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ।

(ক) লাভ-লোকসানের অংশীদারিত্বের চুক্তিতে অংশ গ্রহণ : ইসলামী ব্যাংক বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প, কল-কারখানা প্রভৃতি তৈরিতে তার মূলধন বা তহবিল দিয়ে অংশ গ্রহণ করে থাকে। ব্যাংক এক্ষেত্রে উদ্যোক্তার সাথে লাভ- লোকসানে অংশ গ্রহণের চুক্তিতে পুঁজির অংশবিশেষ বা পুরোটাই সরবরাহ করতে পারে। এসব কাজে লাভ- লোকসান যাই হোক না কেন পূর্ব নির্ধারিত শর্ত অনুসারেই ব্যাংক তা ভাগাভাগি করে নেবে। অর্থাৎ লাভ হলে ব্যাংক যেমন তার পূর্ব নির্ধারিত অংশ পারে, তেমনি লোকসান হলে তারও অংশ ব্যাংক বহন করবে।

(খ) প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ : ইসলামী ব্যাংক তার নিজস্ব তহবিল এবং আমানতকারীদের সম্মতিক্রমে তাদের তহবিল হতে সম্পূর্ণ নিজের উদ্যোগে নিজস্ব মালিকানাতেই শারীয়াহ অনুমোদিত ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প-কারখানা প্রভৃতি গড়ে তুলবে। এ ক্ষেত্রে লাভ-লোকসান যাই হোক না কেন তার দায়-দায়িত্ব ব্যাংকেরই সুদভিত্তিক ব্যাংকগুলো এরকম কোন উদ্যোগ নেয় না।

সুদভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থার কোথাও এমন পদ্ধতি নেই। প্রচলিত ব্যাংকগুলো ব্যবসায়ী বা উদ্যোক্তাদের ঋণ দেয় ঠিকই, কিন্তু ব্যাংক নিজে এসব প্রকল্প বা ব্যবসায়ে জড়িয়ে

www.bjilibrary.com

পড়ে না। তাই ঐসব কারবারের লাভ- লোকসান বা সাফল্য ও ব্যর্থতা নিয়ে ব্যাংকের কোন মাথা ব্যথা নেই। বরং লোকসানের কোন রকম সম্ভাবনা দেখলেই সুদনির্ভর ব্যাংকগুলো তাদের দেওয়া ঋণ দ্রুত পরিশোধের জন্য চাপ দেয় কিংবা ঋণ প্রত্যাহার করে নেয়। ফলে ঐ ব্যবসা বা কারবারটি আরও সংকটের সম্মুখীন হয়, এমনকি ধ্বংসও হয়ে যায়।

৩. শারীয়াহ সুপারভাইজরী বোর্ড : ইসলামী ব্যাংকসমূহের একটি প্রধান ও ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর শারীয়াহ সুপারভাইজরী বোর্ড। ব্যাংকের লেন-দেন, ব্যবসা-বাণিজ্য, অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে মূলধন বা তহবিল বিনিয়োগ, নিজস্ব প্রকল্প স্থাপন ইত্যাদি কোন কিছুতেই যেন সুদের স্পর্শমাত্র না থাকে, কোন কাজেই যেন শারীয়াহর বরখেলাপ না হয় তা দেখার জন্য প্রতিটি ইসলামী ব্যাংক তার প্রতিষ্ঠার শুরুতেই গঠন করে শারীয়াহ বোর্ড। কোন কোন ইসলামী ব্যাংক এর নাম শারীয়াহ সুপারভাইজরী কাউন্সিল। এই বোর্ডের সদস্য সংখ্যা পাঁচ বা সাত জন হয়ে থাকে। এদের মধ্যে সংখ্যাগুরু থাকেন সুবিজ্ঞ আলেম ও ফকিহগণ। বাকীদের মধ্যে থাকেন একজন প্রখ্যাত ইসলামী অর্থনীতিবিদ ও অন্যজন অভিজ্ঞ ইসলামী আইনবিদ এবং ক্ষেত্রবিশেষে একজন্য প্রবীণ ব্যাংকার। এরা শুধু যে ব্যাংককে শারীয়াহসম্মতভাবে চলতে পরামর্শ দেন তা নয়, ব্যাংক ভুল পথে চলতে চাইলে ব্যাংকের আর্টিকেলস অব এগ্রিমেন্টই তাতেই বাধা দেবার ক্ষমতাও এই বোর্ডের রয়েছে।

৪. যাকাত ব্যবস্থার বাস্তবায়ন : ইসলামী ব্যাংকের চতুর্থ ও অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যাকাত ব্যবস্থার বাস্তবায়ন। যাকাত ইসলামের পাঁচটি রুকনের অন্যতম এবং গুরুত্বের দিক দিয়ে নামাযের পরেই এর স্থান। ইসলামী ব্যাংক তার উদ্বৃত্ত তহবিল ও অব্যবহৃত অর্থের উপর যাকাত দিয়ে থাকে। ব্যাংক তার গ্রাহকদের নিকট থেকেও যাকাত সংগ্রহ করে থাকে। যাকাত তহবিলের এই টাকা শারীয়াহসম্মত খাতেই ব্যয় করা হয়। আজকের সমাজে মুসলিমরা বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন ও উদ্দেশ্যহীনভাবে যাকাত প্রদান করে থাকে। এতে সমাজের কোন স্থায়ী কল্যাণ সাধন হয় না। দরিদ্র ও সমাজের কম ভাগ্যবানদের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হয় না। তাই ইসলামী ব্যাংক চেষ্টা করে যাকাত তহবিলের অর্থ দিয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান, কর্মসংস্থানমুখী উপকরণ সরবরাহ ও শিক্ষা কার্যক্রম সহায়তা করতে। এভাবে যাকাতের অর্থ ব্যবহার একই সঙ্গে কর্মসংস্থান ও নিয়মিত আয়ের একটা নিশ্চয়তা গড়ে তুলতে ইসলামী ব্যাংকগুলো বদ্ধপরিকর। সমাজের ধনী-দরিদ্রের শ্রেণী বৈষম্য হ্রাস করার জন্যে এটি একটি কার্যকর ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

৫. সমাজ উন্নয়নে অংশগ্রহণ : ইসলামী ব্যাংকের সর্বশেষ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো, অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে সামাজিক উন্নতি অর্জন করা। দুইয়ের মধ্যে সমন্বয় ও সম্পর্ক না থাকলে কারোরই প্রকৃত উন্নতি সম্ভব নয়। তাই ইসলামী ব্যাংক কি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যবসায়ে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে, কি নিজস্ব প্রকল্প নির্মাণের ক্ষেত্রে সব সময়ই এই লক্ষ্য সামনে রাখে যে, এসব কাজ সমাজের উন্নতিতে কতটা সহায়ক

www.bjilibrary.com

হবে? ব্যক্তির অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে সাথে জনসাধারণের উন্নতি কতটা হবে?

সমাজের প্রয়োজন ব্যাপক ও বহুমুখী। অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। এজন্যেই সুদভিত্তিক ব্যাংকগুলো সিনেমা হল নির্মাণ বা সিনেমা শিল্পে অর্থ ঋণ দেয়। ইসলামী ব্যাংক তা আদৌ চাইবে না। কারণ সিনেমার প্রসারের ফলে সমাজের নৈতিক অবক্ষয় আরও দ্রুত ও ব্যাপক হবে। সুদভিত্তিক ব্যাংকগুলোর আদৌ এ বিষয়ে মাথা ব্যথা নেই। আবার ইসলামী ব্যাংকগুলো সৎ ও যোগ্যতাসম্পন্ন বিত্তহীন লোককে করযে হাসান বা মুদারাবার ভিত্তিতে অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করবে, কিন্তু সুদভিত্তিক ব্যাংকগুলো এই উদ্যোগ নেবে না। ইসলামী ব্যাংকের লক্ষ্য হলো ব্যক্তির কর্মসংস্থানের মাধ্যমে তার ও তার পরিবারের ভরণ- পোষণের সুযোগ সৃষ্টি করা। ফলে সমাজে সুস্থ ও কল্যাণধর্মী পরিবেশ সৃষ্টি হবে। পক্ষান্তরে সুদভিত্তিক ব্যাংকগুলো শুধু স্ব স্ব স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে তৎপর। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের ক্ষেত্রে সুদভিত্তিক ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকের মধ্যে দুস্তর ও দুরতিক্রম্য ব্যবধান রয়েছে। বিশেষ করে সমাজকল্যাণ ও সমাজের সুস্থ ও সুষ্ঠু উন্নয়নের জন্যে সুদভিত্তিক ব্যাংকগুলোর কোন পরিকল্পনা নেই। এদিক দিয়ে ইসলামী ব্যাংকগুলো একটি স্বস্তিকর ও মহৎ ব্যতিক্রম। এটি এই ব্যাংকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যও বটে।

এ সব বৈশিষ্ট্য অর্জনের সাথে সাথে নীচের উদ্দেশ্যগুলো অর্জনেও ইসলামী পদ্ধতির ব্যাংকগুলোকে তৎপর থাকতে হবে। তাহলে একাধারে ইসলামী বৈশিষ্ট্য অর্জন ও দেশের অর্থনীতিতে কাঙ্ক্ষিত অবদান রাখার পাশাপাশি বর্তমান সময়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যারা অবহেলিত ও পশ্চাৎপদ তাদের কল্যাণ সাধনের মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংক সত্যিকার কল্যাণধর্মী প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা ও গুরুত্ব অর্জনে সক্ষম হবে। এসবের মধ্যে রয়েছে :

১. ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতিতে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা;

২. বিত্তহীন ও স্বল্প আয়ের লোকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন;

৩. মানব সম্পদ উন্নয়ন ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;

৪. ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ; এবং

৫. মানব কল্যাণের জন্যে পরিবেশের উন্নয়ন।

সুদী ব্যাংকের সাথে ইসলামী ব্যাংকের যে বিপুল পার্থক্য তার প্রায় সবটাই কাজের প্রকৃতির ক্ষেত্রে। ব্যাংককে যেমন তহবিল ও আমানাত সংগ্রহ করতে হয় তেমনি তা কাজে লাগিয়ে অর্থ উপার্জনও করতে হয়। আমানাত সংগ্রহ ও সংগৃহীত অর্থ ব্যবহার দু'টি ভিন্নধর্মী কাজ। প্রথমটির ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকের পদ্ধতির সাথে সুদী ব্যাংকিং পদ্ধতির যথেষ্ট মিল রয়েছে। পার্থক্য যা তা অধিকাংশই আমানাতের শিরোনাম ও ব্যবহারগত। দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রেই সুদী ব্যাংকের সাথে রয়েছে তার আমূল পার্থক্য।

একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, অর্থনৈতিক দিক থেকে চালু ও সফল প্রতিষ্ঠান

www.bjilibrary.com

হিসেবে টিকে থাকতে হলে এবং অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে চাইলে ইসলামী ব্যাংক ও বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠানসমূহকে যথেষ্ট পরিমাণ মুনাফা অর্জন করতে হবে। এর থেকেই তার নিজস্ব পরিচালনা ব্যয় নির্বাহ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ মেটানো ছাড়াও শেয়ারহোল্ডার, বিনিয়োগকারী ও আমানাতকারীদের সন্তোষজনক হারে ডিভিডেন্ড ও মুনাফা দিতে হবে। এই সমুদয় কাজই করতে হবে শারীয়াহসম্মত উপায়ে। কিন্তু কিভাবে?

প্রচলিত সুদী ব্যাংকগুলো এমন অনেক উপায়ে উপার্জন করে যেগুলো শরী'আতের দৃষ্টিতে বৈধ। কিন্তু যেহেতু সেই আয় পৃথক করে না রেখে অন্যান্য সুদী আয়ের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলা হয় সেহেতু তা শারীয়াহর দৃষ্টিতে আর হালাল বা বৈধ থাকে না। সুদী ব্যাংকের এসব আয়ের মধ্যে রয়েছে– নির্দিষ্ট সার্ভিস চার্জ বা 'উজরার' (ফি ও কমিশন) বিনিময়ে জনসাধারণের জন্য নানা ধরনের সেবামূলক কাজ। উদাহরণস্বরূপ ডিমান্ড ড্রাফ্ট, পে-অর্ডার, ক্রেডিট কার্ড প্রভৃতি ইস্যু, বিভিন্ন বিলের অর্থপ্রদান, অর্থ সম্পদ হস্তান্তর, লকার সার্ভিস, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয়ে সাহায্য প্রভৃতির উল্লেখ করা যেতে পারে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের পরিসংখ্যান নিয়ে দেখা গেছে সুদভিত্তিক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো তাদের মোট আয়ের ৩০%-এরও বেশি এই ধরনের সেবামূলক কাজ হতে আয় করে থাকে। ইসলামী পদ্ধতির ব্যাংকও জনগণকে এই ধরনের সেবা দিয়ে যাবে এবং সঙ্গতভাবেই তার মোট আয়ের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ এই প্রথাগত কিন্তু হালাল উপায়ে উপার্জন করবে।

প্রশ্ন হলো, ইসলামী ব্যাংক কিভাবে তার তহবিল বিনিয়োগ করবে? সুদের ভিত্তিতে বিনিয়োগ ইসলামে নিষিদ্ধ, কিন্তু লাভ-লোকসানের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিনিয়োগ শারীয়াহসম্মত। সুতরাং, ইসলামী ব্যাংক সুদের পরিবর্তে লাভ-লোকসানের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিনিয়োগ করেই উপার্জনের চেষ্টা করবে। বস্তুতঃপক্ষে ইসলামী ব্যাংকের সকল ধরনের আর্থিক সহযোগিতাই বিনিয়োগমূলক, সুদী ব্যাংকের মতো ঋণমূলক নয়। এভাবে বিনিয়োজিত অর্থ হতে প্রাপ্ত মুনাফা থেকেই ইসলামী ব্যাংক তার পরিচালনা ব্যয় নির্বাহ ছাড়াও শেয়ারহোল্ডার, বিনিয়োগকারী ও আমানাতকারীদের মুনাফা দেবে। বিভিন্ন দেশের ইসলামী ব্যাংকগুলো ইতিমধ্যে এ ব্যাপারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছে এবং তাদের গৃহীত পদক্ষেপসমূহের মধ্যে কুড়িটি পদ্ধতি আর্থিক দিক দিয়ে সফল বলে প্রমাণিত হয়েছে। এই ব্যাংকগুলো শুধু যে আজ নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে তাই নয়, বরং উত্তরোত্তর সাফল্য অর্জন করে চলেছে। তাদের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে আরও ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। শুধু মুসলিম দেশসমূহেই নয়, অমুসলিম দেশগুলোতে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী ব্যাংকগুলোও একই পদাংক অনুসরণ করে চলেছে। এই পদ্ধতিগুলো সম্পূর্ণ ইসলামী শারীয়াহসম্মত। নিম্নে এগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল।

১. মুদারাবা : এই পদ্ধতিতে ব্যাংক কোন যৌথ উদ্যোগ ব্যবসায় বা কারবারে একাই

www.bjilibrary.com

সমুদয় অর্থ সরবরাহ করে এবং উদ্যোক্তা তার শ্রম, সময় ও অভিজ্ঞতা বিনিয়োগ করে থাকে। এখানে ব্যাংককে বলা হয় সাহিব আল-মাল এবং তহবিল ব্যবহারকারী বা উদ্যোক্তাকে বলা হয় মুদারিব। এই পদ্ধতিতে ব্যাংক সরাসরি ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে অংশ নেয় না অথবা মুদারিবের কাজে হস্তক্ষেপ করে না। মুদারাবা পদ্ধতিতে ব্যাংক ও উদ্যোক্তা পূর্ব নির্ধারিত হারে (৭৫% ঃ ২৫%; ৭০% ঃ ৩০%; ৬০ ঃ ৪০%; ৫০% ঃ ৫০%; ৪৫% ঃ ৫৫%; ৪০% ঃ ৬০%; ইত্যাদি) লাভের অংশ ভাগ করে নেয়। মূলধনের পরিমাণের সাথে লাভের অংশ কোনক্রমেই সম্পর্কযুক্ত নয়। উপরন্তু কোন পক্ষই মুনাফার পরিমাণ নির্দিষ্ট করে নিতে পারবে না। তবে লোকসান হলে তার পুরোটাই ব্যাংক বহন করবে। এক্ষেত্রে মুদারিব বা উদ্যোক্তাকে হারাতে হয় তার শ্রম ও সময়, কোন আর্থিক লোকসান তাকে বহন করতে হয় না। অবশ্য যদি নিরপেক্ষ তদন্তে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, মুদারিবের গাফলতির জন্যই লোকসান হয়েছে তাহলে ব্যাংক লোকসানের পুরো দায়ভার বহনে সম্মত নাও হতে পারে।

মুদারাবা পদ্ধতিতে ব্যবসা বৈধ হতে হলে নীচের শর্তগুলো পূরণ করা অত্যাবশ্যক।

ক) সাহিব আল-মাল ও মুদারিবের মধ্যে লিখিত চুক্তি হতে হবে। চুক্তিতে মূলধনের পরিমাণ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে।

খ) মূলধন নগদ অর্থের মাধ্যমে নির্ধারণ করতে হবে, পণ্য সামগ্রীকে মূলধন হিসাবে গণ্য করা যাবে না।

গ) সমুদয় মূলধন মুদারিবের কাছে হস্তান্তর করতে হবে যেন মুদারিব নিজেই তা বিনিয়োগ করতে পারে।

ঘ) যদি সাহিব আল-মাল মুদারিবের সাথে সরাসরি ব্যবসায়িক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে তাহলে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে।

ঙ) কারবারের মুনাফায় মুদারিবের সুনির্দিষ্ট অংশের উল্লেখ থাকবে, কোন সুনির্দিষ্ট অংকের উল্লেখ থাকবে না।

চ) মুদারিব কারবারের মুনাফা হতেই তার অংশ পাবে, মূলধন হতে নয়। যদি কারবারে লোকসান হয় তবে কোন অবস্থাতেই মুদারিব মূলধন থেকে কিছু দাবী করতে পারবে না।

এই পদ্ধতি স্বনির্ভর সমাজ গঠনে উৎসাহ যোগায়। দক্ষ কিন্তু অসচ্ছল ব্যক্তিরা মুদারাবা পদ্ধতিতে নিজেদের কর্মসংস্থান করতে পারে। ফলে বেকার জনসংখ্যা জনসম্পদে পরিণত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। ব্যাংকও বিনা ঝামেলায় পুঁজি বিনিয়োগ ও মুনাফা উপার্জনের সুযোগ পায়। এসব সুবিধার জন্যই মুসলিম দেশ ছাড়াও পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে সম্প্রতি বহু মুদারাবাভিত্তিক বিনিয়োগ কোম্পানী গড়ে উঠেছে। এগুলো ক্রমেই সংখ্যায় বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসব কোম্পানী ব্যবসায় সফল প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইতিমধ্যে পরিচিতিও লাভ করেছে।

২. মুশারাকা : এই পদ্ধতিতে ব্যাংক ও উদ্যোক্তার বা উদ্যোক্তাদের মধ্যে অংশীদারী

www.bjilibrary.com

ভিত্তিতে চুক্তি অনুসারে সুনির্দিষ্ট কারবার পরিচালিত হয়। আরবী পরিভাষায় একে বলা হয় শিরকাতুল উকুদ। ব্যাংকসহ সকল অংশীদারই পরস্পর সম্মত অংশ অনুসারে মূলধন সরবরাহ করে এবং স্বীকৃত অনুপাত অনুসারে মুনাফা ভাগ করে নেয়। লোকসান হলে অবশ্য প্রত্যেকে মূলধনের অনুপাতেই তার ভাগ নেবে। এই পদ্ধতিতে বিনিয়োগের কিছু পূর্বশর্ত রয়েছে। যথা: অংশীদারগণ তাদের কারবারের যাবতীয় হিসাব সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ করবে, অংশীদারদের নৈতিক মান উন্নত হবে এবং কারবারের/প্রকল্পের যথাযথ তদারকী ও পর্যবেক্ষণের জন্যও উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পর্যাপ্ত সংখ্যক জনশক্তিও থাকতে হবে। পুঁজির প্রকৃতি অনুসারে শিরকাতুল উকুদ চার ধরনের হয়ে থাকে :

(ক) শিরকাত আল-মুফাওয়াদা (সমঅংশীদারী কারবার),
(খ) শিরকাত আল-ইনান (অসমঅংশীদারী কারবার),
(গ) শিরকাত আল-সানায়ী (পেশাভিত্তিক অংশীদারী কারবার) এবং
(ঘ) শিরকাত আল-ওয়াজুহ (সুনামভিত্তিক অংশীদারী কারবার)।

মধ্যম শ্রেণীর বিত্তবান লোকেরা বা বিভিন্ন সংস্থা এই পদ্ধতিতে ব্যাংকের সহায়তা লাভের সুযোগ নিতে পারে। ফলে ব্যাংক যেমন বিস্তৃত পরিসরে বিনিয়োগের সুযোগ পায় তেমনি অর্থনীতিতে কর্ম উদ্যোগের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

৩. বায়ই মুরাবাহা : ইসলামী অর্থনীতিতে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এটি একটি সাধারণ ও সর্বজনগ্রাহ্য পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে ইসলামী ব্যাংক বিভিন্ন ধরনের পণ্য সামগ্রীর আমদানী-রপ্তানী ও ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবসায়ে সরাসরি অংশগ্রহণ করতে পারে। ব্যাংক সাধারণত আগ্রহী ক্রেতার চাহিদামাফিক পণ্য ক্রয় করে তার সাথে একটা মুনাফা (মার্ক আপ নামে সচরাচর পরিচিত) যুক্ত করে তার কাছেই এটা বিক্রয় করে দেয়। ইসলামের দৃষ্টিতে এটি সম্পূর্ণ বৈধ। তবে পদ্ধতিটিকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়ার জন্য নীচের শর্তগুলো আরোপ করা হয়েছে।

ক) ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়পক্ষই দ্রব্য সামগ্রীর মূল ক্রয়মূল্য সম্বন্ধে অবহিত থাকবে;

খ) উভয় পক্ষ অন্তর্নিহিত মুনাফার পরিমাণ বা হার সম্বন্ধে অবহিত থাকবে;

গ) মূল ক্রয়মূল্য এবং নির্ধারিত বিক্রয়মূল্যের মধ্যে সুদের কোন অংশ বা সংশ্রব থাকবে না। পণ্যের প্রকৃতি, পরিমাণ, গুণাগুণ, সরবরাহের স্থান ও সময় প্রভৃতির সুনির্দিষ্ট উল্লেখ থাকবে;

ঘ) ব্যাংক গ্রাহকের নিকট বিক্রির উদ্দেশ্যে পণ্যের মূল্য নির্ধারণের সময়ে ক্রয়মূল্য ছাড়াও অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচও যোগ করার এখতিয়ার রাখে।

ঙ) চুক্তি সম্পাদনের সময়ে পণ্যের অস্তিত্ব থাকতে হবে এবং করযোগ্য হতে হবে।

চ) চুক্তিবদ্ধ পণ্যের বাজার দর কমে গেলেও ক্রেতাকে পূর্বনির্ধারিত মূল্যই পরিশোধ করতে হবে।

ছ) বাজার দর বাড়লেও ব্যাংক পণ্যের বিক্রয়মূল্য বাড়াতে পারবে না এবং চুক্তি বহাল

www.bjilibrary.com

থাকা পর্যন্ত অন্য কোথাও বিক্রি করতে পারবে না।

জ) চুক্তিবদ্ধ বিনিয়োগ গ্রাহক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মালামালের সরবরাহ নিতে ও মূল্য পরিশোধে বাধ্য থাকে;

ঝ) বিক্রয় চুক্তির শর্তাবলী স্বীকৃত ও স্বাক্ষরিত হয়ে যাবার পর আর কোন পরিবর্তন বা পরিবর্ধন অনুমোদনযোগ্য নয়।

ঞ) বিনিয়োগ গ্রাহকের নিকট পণ্য বিক্রয় ও সরবরাহের পূর্ব পর্যন্ত পণ্যের যাবতীয় ঝুঁকি ব্যাংক বহন করে। বিক্রয় ও সরবরাহ সম্পন্ন হওয়ার পর যাবতীয় ঝুঁকি বিনিয়োগ গ্রাহকের।

ট) বিক্রিতব্য দ্রব্যটি এক মুহূর্তের জন্য হলেও ব্যাংকের মালিকানায় থাকতে হবে।

ক্রেতা একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্যাংকের নিকট থেকে একেবারে কিংবা কিস্তিতে পণ্যটি পূর্ব নির্ধারিত মূল্যেই ক্রয় করে। চুক্তিতে নির্ধারিত মুনাফা কোনভাবেই বৃদ্ধি করা যাবে না, এমনকি গ্রাহক যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পণ্যটির ডেলিভারী নাও নেয়। এই পদ্ধতিতে যদি পণ্য সামগ্রী তাৎক্ষণিক ক্রয়-বিক্রয় হয় তাহলে হবু ক্রেতাকে কোন সিকিউরিটি বা জামানত দিতে হয় না, অথবা মূল্যের কোন অংশ পূর্বাহ্নেই আমানাত হিসেবে ব্যাংকে জমা রাখতে হয় না। শুধু একটা চুক্তি পত্রে স্বাক্ষর করতে হয় যেন হবু ক্রেতার পক্ষে ব্যাংকই বিক্রয়ের ঝামেলা বা দায় সম্পন্ন করতে পারে এবং সঙ্গত কোন কারণে হবু ক্রেতা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পণ্যটি কিনতে অপারগ হলে ব্যাংক ঐ পণ্য অন্যের কাছে বিক্রি করে দিতে পারে।

এদেশে বিদ্যমান ব্যাংকিং আইনের আওতায় কোন ব্যাংকই সরাসরি পণ্য বাণিজ্যে নিয়োজিত হতে পারে না। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্য এবং ইউরোপের ইসলামী ব্যাংকগুলো অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক পণ্য বাণিজ্যে সরাসরি অংশ গ্রহণ করছে। এটি ইসলামী ব্যাংকের আয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। অধিকাংশ ইসলামী ব্যাংকের আর্থিক কর্মকাণ্ডে বড় একটা অংশ জুড়ে রয়েছে এই পদ্ধতি।

৪. ব্যায়-ই-সালাম (অগ্রিম ক্রয়) : এই পদ্ধতিতে ব্যাংক কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাথে পণ্য সামগ্রী ক্রয়ের চুক্তি করতে পারে এই শর্তে যে, বিক্রেতা আগাম মূল্য নেবে এবং নির্ধারিত সময়ে ও নির্দিষ্ট স্থানে পণ্যটি সরবরাহ করবে। ব্যাংক পণ্যটি পরে নিজের পছন্দমতো সময়ে ও মূল্যে বিক্রয় করতে পারবে। অগ্রিম ক্রয় চুক্তি সম্পাদনের সময়েই বিক্রেতার নিকট মূল্য হস্তান্তরিত হবে। চুক্তি বৈধ হওয়ার স্বার্থে চুক্তিপত্রে পণ্যের ধরন, পরিমাণ, গুণাগুণ বা বৈশিষ্ট্য, সরবরাহের স্থান, পরিবহন খরচ, গুদামভাড়া ইত্যাদি যাবতীয় শর্ত স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে। কৃষিজাত পণ্য ও কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা খুবই উপযোগী। ইসলামী ব্যাংকগুলো সাফল্যের সাথে পদ্ধতিটি ব্যবহার করে আসছে এবং প্রভূত মুনাফা অর্জন করছে। কৃষিপ্রধান দেশে এই

www.bjilibrary.com

পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষকদেরও স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করা হচ্ছে।

৫. বায়-ই-মুয়াজ্জাল (বাকীতে বিক্রয়) : এই পদ্ধতিতে বিক্রেতা (ব্যাংক বা বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান) ক্রেতার পক্ষে পণ্য সামগ্রী ক্রয় বা সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট মূল্যে তার কাছে বিক্রয়ের চুক্তি করে। ক্রয়মূল্য পরিশোধের পূর্বেই পণ্য সামগ্রী ক্রেতার মালিকানায় চলে যায়। এ পদ্ধতিতে বিক্রেতা ক্রেতাকে পণ্যের ক্রয়মূল্য, লাভের পরিমাণ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ জানাতে বা চুক্তিপত্রে উল্লেখ করতে বাধ্য নয়। কেবল বিক্রয়মূল্য উল্লেখই যথেষ্ট। এই ব্যবস্থায় নির্ধারিত বিক্রয়মূল্য নির্দিষ্ট সময়ের পরে একসাথে বা কিস্তিতে পরিশোধ করার সুযোগ রয়েছে। চুক্তিপত্রে পণ্যের ধরন, গুণাগুণ, পরিমাণ, সরবরাহের স্থান ও সময়, গ্রাহক কর্তৃক মূল্য পরিশোধের সময়সীমা ও পদ্ধতি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকে। বায়-ই-মুয়াজ্জাল চুক্তি সম্পাদনের সময়ে অবশ্যই পণ্যের অস্তিত্ব থাকতে হবে এবং ক্রয়যোগ্য হতে হবে। উল্লেখ্য, চুক্তিপত্রে নির্ধারিত বিক্রয়মূল্য কোন অবস্থাতেই হ্রাস বা বৃদ্ধি করা যাবে না। অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অর্থ যোগানোর জন্যও এ পদ্ধতি বিশেষ ফলপ্রসূ। শিল্প ও কৃষিক্ষেত্রেও এ পদ্ধতি উপযোগী। ব্যাংক কৃষকদের সার, বীজ, কীটনাশক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী এই ব্যবস্থায় সরবরাহ করতে পারে। কৃষকরা শস্য কাটার পর বা অন্য কোন নির্দিষ্ট সময়ে এই অর্থ পরিশোধ করতে পারে। বিভিন্ন দেশের ইসলামী ব্যাংক সাফল্যের সাথে পদ্ধতিটি ব্যবহার করছে।

৬. ইজারা : মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের জন্য ইজারা একটি বিশেষ কৌশল। এই পদ্ধতিতে সম্পদের মালিকানা ইজারাদারদেরই (এক্ষেত্রে ব্যাংকের) থাকে। ইজারাগ্রহীতা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দিষ্ট অর্থ প্রদানের চুক্তিতে ইজারাকৃত সম্পত্তি ব্যবহার ও ভোগ দখল করে থাকে। এই পদ্ধতিতে ইজারাদাতা প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত সময়ে পণ্যের সূত্রে প্রাপ্ত অর্থ থেকে তার মূলধন ব্যয় পূরণ করে মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হয়। এ প্রক্রিয়ায় ঝুঁকিও অনেক কম। ইসলামী ব্যাংকসমূহ বিশেষ সাফল্যের সাথে এই পদ্ধতি ব্যবহার করে আসছে। এর ফলে শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহও পুঁজিনিবিড় মূলধন সামগ্রী ব্যবহার করার সুযোগ পায়। উদাহরণস্বরূপ ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক পণ্যবাহী জাহাজ, তেলবাহী ট্যাংকার, রেলওয়ে ওয়াগন, মাছ ধরার ট্রলার, দামী ও অত্যাধুনিক ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম প্রভৃতি আগ্রহী প্রতিষ্ঠানের কাছে, ক্ষেত্রবিশেষে উন্নয়নশীল দেশের সরকারের কাছেও ইজারা দিচ্ছে।

৭. ইজারা বিল-বায়ই (ক্রয়ের চুক্তির ভাড়া) : এ পদ্ধতিতে ব্যাংক সম্পূর্ণ নিজস্ব তহবিল দিয়ে গ্রাহকের ফরমায়েশ অনুযায়ী কোন সামগ্রী ক্রয় করে এবং তার নিকট এই শর্তে ভাড়া দেয় যে, গ্রাহক যদি কিস্তিতে সামগ্রীর মূল্য ও নির্ধারিত হারে ভাড়া পরিশোধ করে তাহলে চুক্তি মুতাবিক নির্ধারিত সময় শেষে গ্রাহক সামগ্রীটির মালিক হয়ে যাবে। সম্পদের মূল্য সম্পূর্ণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত ব্যাংক নির্ধারিত কিন্তু ক্রমহ্রাসমান হারে ভাড়া পেতে থাকবে। চুক্তি সম্পাদন হওয়ার সাথে সাথে চুক্তিবদ্ধ

www.bjilibrary.com

সম্পদ গ্রাহকের নিকট হস্তান্তর করা হয়। কিন্তু সম্পদটির মালিকানা থাকে ব্যাংকের হাতেই। এক্ষেত্রে গ্রাহকের ব্যবহার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়, মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় না। বিক্রিত সম্পদের পূর্ণ মূল্য ও নির্ধারিত ভাড়া পরিশোধের সাথে সাথে সম্পদের মালিকানা গ্রাহকের নিকট হস্তান্তরিত হয়। বিভিন্ন ধরনের যানবাহন ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকগুলো সাফল্যের সাথে পদ্ধতিটি ব্যবহার করে আসছে।

৮. হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিলক (যৌথ মালিকানাভিত্তিক ভাড়ায় ক্রয়-বিক্রয় বা ইসরা বিল বায়ই তাহতা শিরকাতিল মিলক) : এ পদ্ধতিতে ব্যাংক গ্রাহকের আবেদন অনুযায়ী তার নিকট বিক্রী করার চুক্তিতে অংশীদারী ভিত্তিতে পুঁজির যোগান দিয়ে গাড়ী, যন্ত্রপাতি, বাড়ী ইত্যাদি ক্রয় করে থাকে। এরপর নির্ধারিত কিস্তিতে বিক্রীমূল্য পরিশোধের শর্তে গ্রাহক পণ্যটি ক্রয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়। একই সাথে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত নির্ধারিত হারে ভাড়া প্রদানের জন্যও অঙ্গীকার করে। এজন্যেই একে তিন চুক্তির সমাহার বলা হয়ে থাকে। যৌথভাবে পুঁজির যোগান দেবার কারণে ব্যাংক ও গ্রাহক নির্ধারিত ভাড়া তাদের স্ব স্ব পুঁজির অংশ অনুপাতে ভাগ করে নেয়। সামগ্রীটির ব্যাংকের মালিকানাভুক্ত অংশের বিক্রয় মূল্য ও ভাড়ার অংশ কিস্তিতে পরিশোধিত হয়ে গেলে চুক্তির শর্তানুযায়ী নির্ধারিত সময়ের পর গ্রাহক সামগ্রীটির নিরংকুশ মালিকানা লাভ করে। পদ্ধতিটির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :

(ক) এই পদ্ধতিতে সম্পদের উপর ব্যাংকের মালিকানাধীন অংশ গ্রাহকের নিকট নির্দিষ্ট সময়ের জন্য চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত হারে ভাড়া দেওয়া হয়।

(খ) মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেও গ্রহাক ব্যাংকের অংশের পুরো টাকা পরিশোধ করে সম্পদটির পূর্ণ মালিকানা পেতে পারে।

(গ) ব্যাংক ও গ্রাহক স্ব স্ব পুঁজি অনুপাতে সম্পদের ঝুঁকি বহন করে।

(ঘ) চুক্তিপত্র সম্পাদনের সময়ে ব্যাংক গ্রাহকের কাছে সম্পদ বিক্রি করে না অথবা গ্রাহক ব্যাংকের কাছ থেকে সম্পদ ক্রয় করে না। এক্ষেত্রে ব্যাংক তার মালিকানাধীন অংশ পর্যায়ক্রমে/কিস্তিতে গ্রাহকের নিকট বিক্রি করার অঙ্গীকার করে এবং গ্রাহকও ঐ সম্পদ নির্দিষ্ট মূল্যে ও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ক্রয় করে নেওয়ার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়;

ঙ) চুক্তির শর্তানুসারে গ্রাহক কিস্তি পরিশোধ ব্যর্থ হলে ব্যাংক সম্পদটি নিজ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিয়ে পারে এবং তা বিক্রি ও হস্তান্তরের মাধ্যমে ব্যাংকের বিনিয়োগ সমন্বয় করতে পারে;

চ) ব্যাংকের লিখিত সম্মতি ব্যতিরেকে গ্রাহক সম্পদটির কোন সংস্কার পরিবর্তন, পরিবর্ধন, প্রাকৃতিক রূপান্তর ইত্যাদি করতে পারে না;

ছ) সম্পদটি অবশ্যই পচনশীল বা ব্যবহারের ফলে অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায় এমন প্রকৃতির হবে না;

www.bjilibrary.com

জ) ভাড়া মেয়াদের শুরুতে সম্পদটি ব্যবহার উপযোগী অবস্থায় এবং দখল ভাড়া গ্রহণকারীর কাছে অর্পণ করতে হবে;

ঝ) সম্পদটি ক্রয় বিক্রয়ের চুক্তি ভাড়াসহ ক্রয় বিক্রয়ের অঙ্গীকার হতে স্বতন্ত্র/ভাড়া হচ্ছে সম্পদের সেবা বা সুবিধা ব্যবহারের মূল্য; তাই ভাড়ার পরিমাণকে দামের সাথে এক করা যাবে না;

ঞ) ভাড়া গ্রহীতার কাছে সম্পদটি একটি ট্রাস্ট সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হবে। তাই তার অবহেলা, অব্যবস্থাপনা, দায়িত্বহীনতা ইত্যাদির জন্যে সম্পদটি ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হলে ভাড়া গ্রহীতা দায়ী হবে।

৯. কিস্তিতে বিক্রয় : ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগের অপর অন্যতম কৌশল হলো কিস্তিতে বিক্রয়। এ পদ্ধতিতে স্বল্প আয়ের লোকদের, বিশেষত: চাকুরীজীবীদের কিস্তি তে মূল্য পরিশোধের ভিত্তিতে ব্যাংক গৃহসামগ্রী, কম্পিউটার, এয়ারকুলার ইত্যাদি সরবরাহ করে থাকে। ফলে স্বল্প আয়ের লোকেরা যেমন উপকৃত হয় তেমনি ব্যাংকও তহবিল বিনিয়োগের মাধ্যমে উপার্জন করতে পারে।

১০. ইসতিসনা : এ পদ্ধতিতে ব্যাংক কোন প্রতিষ্ঠান বা উৎপাদনকারীকে ফরমায়েশ মত কোন জিনিস নির্দিষ্ট মূল্যে নির্ধারিত সময়ে তৈরি বা উৎপাদন করে সরবরাহের প্রস্ত াব করলে সংশ্লিষ্ট পক্ষ তা মেনে নিলে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত বলে গণ্য হয়। এ ক্ষেত্রে ফরমায়েশকৃত দ্রব্য সামগ্রীর দাম, পরিমাণ, প্রকৃতি, গুণাগুণ ইত্যাদি চুক্তিপত্রে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকে। ফলে ভবিষ্যতে উৎপাদনকারী (সানী) এবং ফরমায়েশ দাতার (মুসতাসনি) মধ্যে বিরোধ দেখা দেওয়ার পথ রুদ্ধ হয়। চুক্তি সম্পাদনের পর কোন পক্ষই একতরফাভাবে শর্তের পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন বা এককভাবে চুক্তি বাতিল করতে পারবে না। প্রকৃতিগতভাবে তাই ইসতিসনা চুক্তি চূড়ান্ত ও অপরিবর্তনীয়। ইসতিসনায় সাধারণতঃ অগ্রিম কোন অর্থ প্রদান করতে হয় না। তবে পণ্যের পরিবহন খরচ, বীল, গুদামজাতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে যদি কোন শর্ত থাকে তাহলে তা সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্টভাবে চুক্তিতে উল্লেখিত থাকতে হবে। উল্লেখ্য, ফরমায়েশকৃত পণ্যের সম্পূর্ণ বা আংশিক মূল্যের লেনদেন হয়ে থাকলে অথবা উৎপাদন কাজ শুরু হয়ে থাকলে কোন পক্ষই চুক্তিটি বাতিল করতে পারে না।

১১. জু'আলাহ : জু'আলাহ প্রকৃতিতে অনেকটাই ইসতিসনার মতো। ইসতিসনায় বিক্রেতা দ্রব্য সামগ্রী বা পণ্য সরবরাহ করে, জু'আলাহতে বিক্রেতা সেবা সরবরাহ করে থাকে। বিক্রেতা নির্দিষ্ট মূল্যের বিনিময়ে নির্দিষ্ট সময় ধরে সেবা প্রদান বা সরবরাহ করে থাকে। এক্ষেত্রে নিয়োগকারীকে বলা হয় জায়েল, স্বীকৃত মজুরী বা দেয় অর্থকে বলা হয় জোআল এবং সরবরাহকারী বা ঠিকাদারকে বলা হয় আমেল। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে প্রয়োজনীয় বাণিজ্যিক বা অন্যান্য সেবামূলক কাজ সম্পাদনের দায়িত্ব গ্রহণ করে ব্যাংক নিজেই আমেল-এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে। যেক্ষেত্রে ব্যাংক এধরনের ভূমিকা নেবে সেক্ষেত্রে জু'আলাহ চুক্তিতে অন্য কাউকে ব্যাংক আমেল

www.bjilibrary.com

হিসেবে নিয়োগের ক্ষমতা রাখে এমন ব্যবস্থাও থাকতে পারে। এটি হতে পারে মূল চুক্তির আওতায় সহযোগী চুক্তি। অনুরূপভাবে ব্যাংক যখন জায়েল তখন মূল আমেল ব্যাংকের পূর্ব অনুমতি নিয়ে কাউকে সহযোগী আমেল হিসেবে নিয়োগ দিতে পারে। সেবা প্রদানের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও উপায়-উপকরণ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আমেল বা জায়েল যে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব গ্রহণ করবে তাও সংশ্লিষ্ট চুক্তিতে উল্লেখ থাকতে পারে।

১২. মুজারাহ : এই পদ্ধতিতে ব্যাংক যদি কোন কৃষি জমির মালিক বা অন্য কোনভাবে স্বত্ত্বাধিকারী হয় তাহলে তা চাষ করার জন্য কৃষকদের সাথে চুক্তি করতে পারে। এক্ষেত্রে ব্যাংক (মোজারে) নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দিষ্ট ভূখণ্ডটি কৃষককে (আমেল) চাষের জন্য দেবে। বিনিময়ে ব্যাংক নির্ধারিত হারে উৎপাদিত ফসলের অংশ পাবে। চুক্তির মধ্যেই উৎপাদনের পরিমাণ ও গুণাগুণ বৃদ্ধির জন্য উন্নতমানের বীজ, সার সেচ সুবিধা, পরিবহন ও কৃষি সরঞ্জাম সরবরাহের ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। অবশ্য এজন্য ফসলের প্রাপ্য হারেরও তারতম্য হবে।

১৩. মুশাকাত : এই পদ্ধতিতে ইসলামী ব্যাংক তার মালিকানাধীন অথবা কোন না কোন ভাবে স্বত্ত্বাধীন বৃক্ষ, ফলের বাগান ইত্যাদির পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য কৃষককে দায়িত্ব অর্পণের জন্য চুক্তি করে। উৎপন্ন ফল বা কাঠ উভয়ের মধ্যে চুক্তি অনুসারে বণ্টিত হয়। মুজারাহ পদ্ধতির মতো এ ক্ষেত্রে সেচ, পরিবহন বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সরবরাহের সুবিধা প্রদান এবং সেই অনুসারে ফসলের অংশ প্রাপ্তির শর্তের তারতম্য হতে পারে।

১৪. শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় : ইসলামী ব্যাংক শেয়ার বাজারে শেয়ার কেনা-বেচায় সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে পারে এবং কার্যতঃ নিচ্ছেও। যথাযথভাবে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হলে এটিও ব্যাংকের বিনিয়োগ ও আয়ের অন্যতম উৎস হওয়া সম্ভব। সুপ্রতিষ্ঠিত, সুপরিচালিত ও সন্তোষজনক হারে ডিভিডেন্ড দিতে সক্ষম এমন সরকারী ও বেসরকারী যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান, কর্পোরেশন বা কোম্পানীর স্টক ও শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংক তহবিল বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জন করতে পারে। তবে এই ব্যাংক যেহেতু শুধুমাত্র হালাল ব্যবসায়ে অংশ গ্রহণ করতে পারে সেহেতু শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এবং দেখতে হবে এসব কোম্পানীর কার্যক্রম শারীয়াহাসম্মত কি না। অর্থাৎ এদের লেনদেনে সুদের সংশ্রব আছে কিনা এবং কার্যক্রম হালাল-হারামের বাছ-বিচার করে কি না। যদি তা না হয় তাহলে ঐসব কোম্পানীর শেয়ার কেনা-বেচায় অংশ নেওয়া যাবে না।

১৫. বৈদেশিক মুদ্রার উপস্থিত ক্রয়-বিক্রয় : ইসলামী ব্যাংক খোলা বাজার হতে বৈদেশিক মুদ্রা কিনে আবার তা খোলা বাজারেই বিক্রয় করতে পারে। এ থেকে প্রচুর মুনাফা অর্জনের সুযোগ রয়েছে। শারীয়াহর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করার স্বার্থে বৈদেশিক মুদ্রা উপস্থিত ক্রয় বা বিক্রয় করতে হবে এবং তা অবশ্যই নগদ মূল্যে হতে হবে। বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কঠোর নিয়ন্ত্রণ

www.bjilibrary.com

রয়েছে। কিন্তু অন্যান্য দেশে বিশেষত: মধ্যপ্রাচ্য এবং ইউরোপীয় দেশগুলোতে এ ধরনের নিয়ন্ত্রণ নেই। তাই সেসব দেশের ইসলামী ব্যাংক এই ব্যবসায়ে অর্থ বিনিয়োগ করছে এবং এ থেকে প্রচুর মুনাফা অর্জন করছে। কোন কোন ব্যাংকের মোট আয়ের এক-তৃতীয়াংশই অর্জিত হচ্ছে এই একটি মাত্র পদ্ধতি থেকেই।

১৬. মেয়াদী অংশগ্রহণকারী সার্টিফিকেট : ইসলামী ব্যাংকগুলো কখনও তারল্যের সমস্যায় পতিত হয়নি। বরং তাদের হাতে বিপুল অব্যবহৃত আমানাত পড়ে থাকে। এই অর্থ অনায়াসে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের জন্য ব্যবহার করা যায়। বহু ইসলামী ব্যাংক তাই বর্তমানে পাঁচ হতে দশ বছর মেয়াদী বিনিয়োগ সার্টিফিকেট ইস্যু করছে যেন গৃহ নির্মাণ, স্থাবর সম্পত্তির উন্নয়ন, শিল্প কারখানা স্থাপন প্রভৃতি কাজে এই অর্থ বিনিয়োগ করা যায়। এই ধরনের সার্টিফিকেট নূন্যতম এক বছরের পূর্বে ভাঙ্গানো যায় না। লাভ-লোকসানের অংশীদারীত্বের শর্ত থাকে বলেই ক্রেতারা যেমন মুনাফা আশা করে তেমনি লোকসানের অংশ নিতেও প্রস্তুত থাকে। দেখা গেছে এসব বিনিয়োগে মুনাফাই হয়ে থাকে। অভিজ্ঞতায় আরও লক্ষ্য করা গেছে, ইসলামী ব্যাংক এই ধরনের সার্টিফিকেট ক্রেতাদের সরকার ঘোষিত ন্যূনতম নিশ্চিত বা গ্যারান্টিযুক্ত সুদের চেয়েও বেশি হারে মুনাফা প্রদান করেছে। এ থেকে এই ধরনের বিনিয়োগ ইসলামী ব্যাংকের সাফল্য সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়।

১৭. বিনিয়োগ নীলাম : বিনিয়োগ নীলাম ইসলামী পদ্ধতিতে বিনিয়োগের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়। শিল্পখাতে মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক বিনিয়োগ বা সহযোগিতার জন্য এটি একটি কার্যকর পন্থা। এ পদ্ধতিতে ব্যাংক একা কিংবা অন্যের সাথে যৌথভাবে শিল্প প্রকল্প প্রস্তুত করে এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করে। এরপর ঐ প্রকল্পটি নীলামের ব্যবস্থা করে। অবশ্য প্রকল্পটি তৈরির কাজ সম্পূর্ণ করেও ব্যাংক নীলামে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করতে পারে। যুক্তিসঙ্গত হারে লাভ ধরেই ব্যাংক প্রকল্পটির বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করে থাকে। যে কোন দরপত্র বা নীলাম ডাক গ্রহণ বা বর্জনের অধিকারও ব্যাংকের থাকে। কৃতকার্য ক্রেতার নিকট থেকে ব্যাংক সম্পূর্ণ নগদ গ্রহণ করতে পারে অথবা পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে ক্রেতাকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কিস্তিতে মূল্য পরিশোধের সুযোগ দিতে পারে। ইসলামী ব্যাংকের জন্য এটি একটি লাভজনক বিনিয়োগ কৌশল। দ্রুত শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান ও পুঁজি সংগঠনের জন্যও পদ্ধতিটি নিঃসন্দেহে সহায়ক।

১৮. সরাসরি বিনিয়োগ : ইসলামী ব্যাংক কারো সাহায্য না নিয়ে নিজেই কোন লাভজনক প্রকল্প বা আর্থ-সামাজিক দিক দিয়ে প্রয়োজনীয় নানা ধরনের প্রকল্প স্থাপন করতে পারে। এ ক্ষেত্রে প্রকল্পের স্কীম তৈরি থেকে শুরু করে প্রকল্প বাস্তবায়ন, ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি যাবতীয় কাজ ব্যাংক নিজস্ব উদ্যোগেই করে থাকে। প্রকল্পের মূলধন সরবরাহ, নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং স্থায়ী মালিকানা সকল কিছুই ব্যাংকের নিজের হাতে থাকে। প্রকল্প বাস্তবায়নের পর লাভ হলে তার পুরোটাই ব্যাংকের। লোকসান হলেও তারও পুরোটাই ব্যাংক বহন করে। পৃথিবীর বহু ইসলামী ব্যাংকের এ ধরনের নিজস্ব প্রকল্প রয়েছে। এসবের মধ্যে ডেইরী ফার্ম হতে

www.bjilibrary.com

এলুমিনিয়াম ও ফাইবার গ্লাস ফ্যাক্টরী, মাছ ধরার ট্রলার হতে গৃহায়ন প্রকল্প সবই রয়েছে।

১৯. স্বাভাবিক মুনাফার হারে বিনিয়োগ : চায়ের দোকান, ফেরীওয়ালা, কামার, নাপিত, মুদীওয়ালা প্রভৃতি নানা ধরনের ছোট ছোট দোকানদার রয়েছে যাদের পুঁজির প্রয়োজন। তারা ব্যবসার দৈনন্দিন হিসাবপত্র রাখে না বা রাখতে পারে না। এজন্য উপরের পদ্ধতিগুলোর কোনটির মাধ্যমেই এদের আর্থিক সহযোগিতা করা সম্ভব নয়। অথচ এদেরকে পুঁজি দিয়ে সহযোগিতা করতে পারলে এরা কর্মসংস্থান ও ব্যবসা-বাণিজ্যে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে। এরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই ঋণ ফেরত দিয়ে থাকে। বরং বড় ঋণ গ্রহীতারাই ঋণ পরিশোধে দীর্ঘসূত্রীতা অবলম্বন করে। তাই ইসলামী ব্যাংক নির্ধারিত স্বাভাবিক হারে মুনাফা প্রদানের শর্তে এসব ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের ব্যবসায়ের অর্থ বিনিয়োগ করে থাকে।

স্বাভাবিক মুনাফার হার নির্ধারণের পূর্বে ইসলামী ব্যাংকসমূহ এই ধরনের ব্যবসাসমূহের কমপক্ষে তিন বছরের লেনদেনের হিসাব নেবে, লাভ-লোকসানের হিসাব করবে এবং এর গড় হারের ভিত্তিতেই মুনাফার স্বাভাবিক হার নির্ধারিত হবে। সুদের হারের মতো এই হার স্থির বা সুনির্দিষ্ট নয়। অবশ্য বিনিয়োগের সময় চুক্তিতে উল্লেখ থাকবে যে, যদি প্রকৃত লাভ নির্ধারিত স্বাভাবিক মুনাফার হারের চেয়ে বেশি হয় তাহলে ব্যবসায়ী স্বেচ্ছায় অতিরিক্ত লাভের অংশবিশেষ ব্যাংককে প্রদান করবে। অপরপক্ষে যদি অর্জিত মুনাফা নির্ধারিত স্বাভাবিক হারের চেয়ে কম হয় কিংবা লোকসান হয় এবং সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী তা সন্তোষজনকভাবে প্রমাণ করতে পারে তাহলে ব্যাংক মুনাফার ঐ নিম্নহার বা লোকসানই মেনে নেবে। সুতরাং, মুনাফার স্বাভাবিক হার আসলে একটি নিয়ন্ত্রণমূলক কৌশলমাত্র। সন্দেহ নেই, অর্থায়নের এই পদ্ধতি খুব আকর্ষণীয় ও সহজ। কিন্তু এর সঠিক বাস্তবায়ন দুরূহ।

২০. করযে হাসানা : দানের চেয়ে করযে হাসানার সওয়াব বেশি। সওয়াবের নিয়াতে এবং গ্রহীতার সাময়িক প্রয়োজন পূরণের মাধ্যমে তার অসুবিধান দূর করার উদ্দেশ্যেই এবং কোন রকম প্রত্যুপকারের বিন্দুমাত্র আশা না করে করযে হাসানা প্রদানকারী অর্থ ঋণ দিয়ে থাকে। সুদনির্ভর ব্যাংকগুলো তো বটেই, বিত্তশালীরা পর্যন্ত এরকম ঋণ দিতে নারাজ। অথচ সচ্ছল ব্যক্তিরও অনেক সময় ঋণের প্রয়োজন পড়ে সাময়িক অভাব বা প্রয়োজন পূরণের জন্যে। সে সময় যদি করযে হাসানার সুযোগ না থাকে তাহলে তাকে হয় সহায়-সম্বল বিক্রি করতে হবে অথবা নিরুপায় হয়েই সুদের ভিত্তিতে ঋণ নিতে হবে। ইসলামী ব্যাংক এই সমস্যা দূর-করার উদ্দেশ্যেই করযে হাসানা দিয়ে থাকে। সুদভিত্তিক ব্যাংকে এই ধরনের সহযোগিতা পাওয়া কল্পনাতীত ব্যাপার। ইসলামী ব্যাংক তার গ্রাহকদের জরুরী ও স্বল্প মেয়াদী প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে ন্যূনতম হারে সার্ভিস চার্জের বিপরীত ঋণ দিয়ে থাকে। ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের ক্ষেত্রে এই হার ০.৫০ হতে সর্বোচ্চ ২.০% পর্যন্ত। পাকিস্তানে এই হার প্রায় ৩.০%।

www.bjilibrary.com

করযে হাসানা মঞ্জুরের সময়েই ঋণ গ্রহীতার সুবিধা অনুসারে ঋণ পরিশোদের সময় ও পদ্ধতিও নির্ধারিত হয়।

উপসংহার : বিশ্বের ইসলামী ব্যাংকসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন ও ব্যালান্সশীটসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় উপরে উল্লেখিত কর্ম কৌশলসমূহ ব্যবহার করে তারা শুধু বিপুল মুনাফাই অর্জন করেনি, সুদভিত্তিক ব্যাংকগুলোর তুলনায় আমানাতকারীদের বেশি হারে মুনাফা প্রদান করছে। স্মরণ রাখা দরকার, সুদভিত্তিক ব্যাংকগুলোর বয়স যেখানে দুইশ বছরের বেশি ইসলামী ব্যাংকের বয়স সেখানে তিন দশকের কিছু বেশি। এখনও তার শৈশবকাল কাটিয়ে ওঠেনি ইসলামী ব্যাংক। আশার কথা, ইসলামী ব্যাংক ও ফাইন্যান্সিয়াল ইন্সটিটিউশনগুলো বিনিয়োগের জন্য শারীয়াহর দৃষ্টিতে বৈধ নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং সম্মিলিতভাবে একে অন্যের অভিজ্ঞতা হতে শেখার চেষ্টা করছে। ইসলামী ব্যাংকের সাফল্য একদিকে যেমন তার কর্মীবাহিনীর ঐকান্তিকতা, পেশাগত কর্মকুশলতা এবং দক্ষতার উপর নির্ভরশীল, তেমনি নির্ভরশীল তার অংশীদারী বিনিয়োগকারীদের সততা, যোগ্যতা এবং ব্যবসায়িক দূরদর্শিতার উপর। বিশেষতঃ আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে প্রয়োজনীয় দক্ষতা, অভিজ্ঞতা এবং সততাসম্পন্ন ব্যবসায়ী পাওয়া খুবই দুরূহ। এই সমস্যা সমাধানের জন্য ইসলামী ব্যাংকসমূহকে নিজ উদ্যোগে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

পরিশেষে এ কথা বলতেই হবে বর্তমান অনৈসলামী পরিবেশ, বিশেষতঃ প্রচলিত বাণিজ্যিক, রাজস্ব ও দেওয়ানী আইনের অনেকগুলোই ইসলামী ব্যাংকের সুষ্ঠু কার্য পরিচালনার পথে বিষম বাধা। এসব আইনের পরিবর্তন বা সংশোধন প্রয়োজন। যেহেতু সংশ্লিষ্ট সরকারের অনুমতিক্রমে এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনেই ইসলামী ব্যাংকগুলো পরিচালিত হচ্ছে, সেহেতু এসব আইন সংশোধন বা পরিবর্তনের দায়-দায়িত্ব তাদের উপরও বর্তায়। ইসলামী ব্যাংক এসব প্রতিকূলতার মধ্যেই কাজ করে যাচ্ছে এবং ক্রমাগত সাফল্যের সোপানে উত্তরণ লাভ করছে। বস্তুতঃ সুদী ব্যাংক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ইসলামী ব্যাংক এক সাহসী ও ভিন্নধর্মী চ্যালেঞ্জ। সনাতন ব্যাংকগুলো যেখানে শুধুমাত্র আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ইসলামী ব্যাংকগুলো সেখানে একই সাথে আর্থিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের যোগফল। এই ব্যাংক শারীয়াহসম্মত উপায়ে মুসলিমদের রুটি-রুজীর ব্যবস্থার পাশাপাশি সমাজের বৃহত্তর কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্যও পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ইসলামী ব্যাংক তাই মুসলিমদের জন্য প্রয়োজনীয় এক প্রতিষ্ঠানই নয়, মুসলিম উম্মাহর জন্যও অপরিহার্য এক ইন্সটিটিউশন। ■

লেখক-পরিচিতি: শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, প্রফেসর, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

লেখা-পরিচিত : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত ১২ই জুন, ২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সেমিনারে প্রবন্ধটি উপস্থাপিত হয়।

www.bjilibrary.com

অর্থনৈতিক ভারসাম্য সৃষ্টিতে যাকাতের ভূমিকা

ড. আ. ক. ম. আবদুল কাদের

■

ভূমিকা

'ইসলাম' মানব জাতির জন্য মহান রাব্বুল আলামীন কর্তৃক প্রদত্ত দীন, ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। আল-কুরআনে এই দীনের অনুসারীগণকে 'উম্মাতে ওয়াসাত'– মধ্যপন্থা অনুসরণকারী উম্মাত নামে অভিহিত করা হয়।[১]

মুসলিম উম্মাহ আল্লাহ নির্দেশিত পন্থায় ইবাদাত-বন্দেগীর মাধ্যমে মহান সত্তার সাথে এক নিবিড় আধ্যাত্মিক সম্পর্ক কায়েম করে। এই সব ইবাদাতের মধ্যে কিছু আছে দৈহিক আর কিছু আর্থিক। আর্থিক ইবাদাতের মধ্যে যাকাতের স্থান প্রথম আর মৌলিক ইবাদাতগুলোর মধ্যে এর স্থান তৃতীয়।[২] মহান আল্লাহ মুসলিম উম্মাহর কল্যাণার্থে যাকাতের বিধান প্রবর্তন করেন আর মহানবী (সা) বিধানের পুংখানুপুংখ নির্দেশনা প্রদান করে একে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দান করেন। যাকাত ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় বাইতুল মালের প্রধান উৎস যা অর্থনৈতিক গতি প্রবাহ ও ভারসাম্য সৃষ্টিতে অনবদ্য অবদান রাখে।

---

১. وكذلك جعلنكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا, আল বাকারা : ১৪৩।

২. ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল বুখারী, সহীহ আল বুখারী, (দেওবন্দ : ১৪০৭ হি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৬।

www.bjilibrary.com

যাকাত কী

'যাকাত (الزكوة) আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ কোন বস্তুকে পরশুদ্ধিকরণ (صفوة الشيئ), প্রবৃদ্ধি সাধন (البركة والنماء), পবিত্রতা (الطهارة), সুসংবদ্ধকরণ (الصلاح), আত্মস্তুতি (مدح النفس) ইত্যাদি।[৩] কোন বস্তুতে প্রবৃদ্ধি সাধিত হলে আরবরা বলে- زكا الشيئ আর ফসলে প্রবৃদ্ধি সাধিত হলে বলে- زكا الزرع।[৪] আর কুরআনে শব্দটি 'আত্মশুদ্ধি'[৫] এবং পবিত্রতা[৬] অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বস্তুতঃ যাকাত মানব হৃদয়কে লোভ-মোহ, স্বার্থপরতা, কার্পণ্য প্রভৃতি হতে স্বচ্ছ, নির্মল ও পবিত্র করে।

ইসলামী শরীআতের পরিভাষায় যাকাত হল- নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক তথা আর্থিকভাবে স্বচ্ছল ব্যক্তির প্রযোজ্য ধন-সম্পদের শরীআহ নির্ধারিত ফরয অংশ যথাযথ প্রাপ্যের নিকট আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে ইবাদাতের নিয়্যাতে শরীয়াহ নির্ধারিত পন্থায় বণ্টন করা।[৭] ব্যবহারিক অর্থে- বহনযোগ্য কিংবা স্থানান্তরযোগ্য সম্পদ একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে উপনীত হলে (নিসাব পরিমাণ) তার উপর প্রদেয় অংশকে যাকাত বলা হয়।[৮]

আল কুরআন ও হাদীসে যাকাতের আলোচনা

ইসলামের মৌলিক স্তম্ভগুলোর মধ্যে সালাতের পরেই যাকাতের স্থান। সালাত দৈহিক ইবাদাত আর যাকাত আর্থিক ইবাদাত। মানব জীবনের এক বিরাট অধ্যায় অর্থনীতির সম্পর্কযুক্ত। মানব সভ্যতার সূচনালগ্ন হতেই অর্থনীতি মানুষের সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত, তাই তখন থেকেই মানব সমাজে যাকাত ব্যবস্থার প্রচলন ছিল বলে আল কুরআনে সুস্পষ্ট বক্তব্য বিদ্যমান। হযরত ইবরাহীম (আ), হযরত ইসমাইল (আ), হযরত ইসহাক (আ), হযরত ইয়াকূব (আ), হযরত মূসা (আ), হযরত ঈসা (আ), সর্বোপরি আহলি কিতাব তথা বনী ইসরাইলের প্রতি যাকাত প্রদানের নির্দেশ সম্বলিত আল কুরআনের বাণী সুদীর্ঘকাল হতে মানব সমাজে আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নির্দেশিত

---

৩. ড. ইবরাহীম আনীস ও অন্যান্য, আল মু'জাম আল ওয়াসীত (কায়রো : ১৯৭২), পৃ. ৩৯৬।

৪. ড. ইউসুফ আল কারযাভী, ফিকহুস যাকাত, দিরাসাতুন মুকাররাতুন লি আহকামিহা ওয়া ফালসাফাতিহা ফী দাউ আল কুরআন ওয়া আস সুন্নাহ, (কায়রো) পৃ. ৩৮।

৫. فلا تُزكوا انفسكم, আন নাজম : ৩২।

৬. قد افلح من زكها, আশ শামস : ৯।

৭. আবদুর রহমান আল জাযিরী, কিতাব আল ফিকহ 'আলা আল মাযাহিব আল আরবা'আহ (ইস্তাম্বুল : ১৯৮৩), ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৯০।

৮. ড. ওহবাত আল যুহাইলী, আল ফিকহী আল ইসলামী ওয়া আদিল্লাহু, (বৈরূত : দার আল ফিকর : ১৯৮২) ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৭৮৮।

www.bjilibrary.com

যাকাত ভিত্তিক অর্থব্যবস্থার কথা আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়।[৯] উম্মাতে মুহাম্মাদীর উপর যাকাত ভিত্তিক অর্থব্যবস্থার প্রবর্তন উক্ত ধারাবাহিকতারই অংশ।

আল কুরআনে ৩২টি স্থানে যাকাতের উল্লেখ রয়েছে। তন্মধ্যে ২৭টি স্থানে সালাত ও যাকাত একত্রে এবং একটি স্থানে (সূরাতুল মু'মিনূন) সালাতের আলোচনার ১ আয়াত পরে যাকাতের উল্লেখ বিদ্যমান। ৮টি স্থানে যাকাতের উল্লেখ মক্কী সূরায় এবং অবশিষ্টগুলো মাদানী সূরায় বিদ্যমান।[১০] প্রখ্যাত মুফাসসির হাফিয ইবন কাছীর (রহ) এর মতে যাকাত মহানবীর (সা) মক্কী যিন্দেগীতে ফরয হয়। তবে এর নিসাব, হার, পরিমাণ ইত্যাদি নির্ধারণ করা হয় মাদানী যুগে।[১১] কিন্তু অধিকাংশ রিওয়ায়াতে দেখা যায়, যাকাত দ্বিতীয় হিজরী সালে ফরয হয়।[১২] মক্কী জীবনে মুসলিমগণ সঙ্গত কারণে বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করতেন। কিন্তু মহানবী (সা) ও সাহাবীগণ মদীনায় হিজরাত করার পর এখানে তাঁরা সামাজিক ও সামষ্টিক জীবন যাপন শুরু করেন। এখানে মুসলিমদের স্বতন্ত্র ভূখণ্ড, রাষ্ট্র ও প্রশাসন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইসলামী রাষ্ট্র প্রশাসনিক রূপ পরিগ্রহ করলে এখানে যাকাত প্রশাসন গড়ে উঠে বলে প্রতীয়মান হয়।

মহানবীর (সা) হাদীসে যাকাতের গুরুত্ব, বিধান, যাকাত আদায় না করার পরিণাম ইত্যাদি বিষয়ে বিশদ আলোচনা বিদ্যমান। হাদীস গ্রন্থসমূহে এ বিষয়ে স্বতন্ত্র অধ্যায় রয়েছে। মহানবীর (সা) বেশ কিছু হাদীসে সালাতে পাশাপাশি যাকাতের উল্লেখ পাওয়া যায়।[১৩] এতে প্রতীয়মান হয় যে, গুরুত্বের দিক দিয়ে সালাত এবং যাকাত পাশাপাশি অবস্থান করছে। হযরত আবূ বকর (রা) তাঁর খিলাফাতকালে যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে বলেন– আমি অবশ্যই যুদ্ধ করবো ঐসব জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে, যারা সালাত ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য বিধান করে।[১৪]

যাকাত ফরয হওয়ার দার্শনিক ভিত্তি

এ পৃথিবীতে মানুষ আল্লাহর খালীফা তথা প্রতিনিধি। খালীফা হিসাবে মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত সকল নিয়ামত ভোগ-ব্যবহার করে চলছে। এখানে সে নিজের সকল অধিকার পরিপূর্ণরূপে উপভোগ করলেও অন্যের অধিকার আদায়ে সে নেহায়েত উদাসীন। এই

---

৯. দ্রষ্টব্য, আল কুরআন, সূরা আল আম্বিয়া : ৭৩; মারইয়াম : ৫৫; আল আ'রাফ : ১৫৬; মারইয়াম : ৩১; আল মায়িদাহ : ১২; আল বাকারা : ৮৩; আল বায়্যিনাহ : ৫।

১০. মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকী, আল মু'জাম আল মুফাহরাস লি আলফায আল কুরআন আল কারীম, দ্রষ্টব্য 'যাকাত'।

১১. হাফিয ইমাদ উদ্দীন ইবন কাছীর, তাফসীর আল কুরআন আল আযীম (বৈরূত : দার আল ফিকর, ১৯৮০), ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩৯-২৪০।

১২. আবদুর রহমান আল জাযিরী, কিতাব আল ফিকহ আলা আল মাযাহিব আল আর রা'আহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৯০।

১৩. মুহাম্মাদ ইবন ইসমাইল আল বুখারী, সহীহ আল বুখারী (দেওবন্দ : ১৪০৭ হি.) ১ম খণ্ড, পৃ. ৮; ১৩।

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮।

www.bjilibrary.com

উদাসিনতা মানুষকে অনেক সময় হৃদয়হীন ও সীমাহীন স্বার্থপরে পরিণত করে। এই স্বার্থপরতা সমাজে ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করে। আর ভারসাম্যহীনতা দূরীকরণে সে কখনো দ্বারস্থ হয় পুঁজিবাদের, কখনো সমাজতন্ত্রের, কখনো সাম্যবাদের আবার কখনো অন্যকোন মানব রচিত মতবাদের। কিন্তু এইসব মতবাদ কখনো মানবতার সমস্যার সমাধান দিতে পারেনি, বরং বিশ্বমানবতাকে উপহার দিয়েছে শোষণ, বঞ্চনা আর দারিদ্র্যের গ্লানি। এই গ্লানি হতে মুক্তির একমাত্র যুগান্তকারী আদর্শ ইসলাম।

মানুষের ধর্ম, সংস্কৃতি, পরিবার ও সামাজিক স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে ইসলাম দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে এবং দারিদ্র্যকে একটি মারাত্মক সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করেছে।[১৫] দেশের সকল নাগরিকের সম্মানজনক জীবন জীবিকার নিশ্চয়তা বিধানের স্বার্থে তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণের প্রতি ইসলাম সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। মানুষ যে সম্পদ ভোগ-ব্যবহার করে সে তার প্রকৃত মালিক নয়, রক্ষণাবেক্ষণকারী ও আমনতদার মাত্র। এর প্রকৃত মালিক আল্লাহ। সুতরাং একজন আমনাতদার হিসাবে মানুষ প্রকৃত মালিকের নির্দেশনা ও ইচ্ছা অনুযায়ী সম্পদ আয়-উপার্জন ও ব্যয়-বিনিয়োগ করবে এটাই বিবেকের দাবী।

মানুষের জীবন-জীবিকার মানগত তারতম্যের বিষয়টি ইসলাম স্বীকার করে। মানুষের দৈহিক ও মানসিক শক্তি-সামর্থ্য এবং যোগ্যতা ও প্রতিভার পার্থক্য মহান আল্লাহর অমোঘ বিধানেরই অংশ। তাই বলে মানব সমাজে ধনী-দরিদ্রের আকাশ-পাতাল তারতম্য হবে এটি কাঙ্ক্ষিত নয়। দরিদ্র তার শ্রম বিনিয়োগ করে আর ধনী বিনিয়োগ করে তার পুঁজি তথা মূলধন। দরিদ্র তার শ্রমের বিনিময়ে পায় পারিশ্রমিক, পক্ষান্তরে ধনী তার পুঁজির বিনিময়ে অর্জন করে প্রচুর মুনাফা। ধনীর উপার্জন দরিদ্রের শ্রম থেকে আসে বিধায় একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, ধনীর পুঁজি এবং দরিদ্রের শ্রম একটি অপরটির সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত।[১৬] ধনীর সম্পদ দরিদ্রের শ্রম হতে আসে বিধায় ধনীর সম্পদে দরিদ্রের অধিকার প্রতিষ্ঠিত। আর শরীআত সম্মত অধিকার হল যাকাত। এজন্য ইসলামে যাকাতকে বলা হয় قنطرة الاسلام - ধনী-দরিদ্রের মধ্যে সেতু বন্ধন রচনাকারী এবং সমাজ দেহের রোগ নিরাময়ের অন্যতম প্রতিষেধক।[১৭]

যাকাত কারা পাবেন

আল কুরআন যাকাত বিষয়ক আলোচনায় সম্পদের প্রকৃতি, ধরন, পরিমাণ, বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বিষয় বিশদভাবে আলোচিত হয়নি। তবে এতে যাকাত বণ্টনের খাতসমূহ

---

১৫. ড. ইউসুফ আল কারযাভী, মুশকিলাতুল ফাকর ওয়া কাইফা আলাজাহাল ইসলাম, (বৈরূত : মুয়াস্সাসাহ আল বিসালাহ, ১৯৮৫) পৃ. ১৩।

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭।

১৭. ড. ওহবাত আল যুহাইলী, আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৭৯০।

www.bjilibrary.com

সুনির্দিষ্টরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল কুরআনের আয়াতটি হল–[১৮]

انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمولفة قلوبهم وفى الرقاب والغرمين وفي سبيل الله وابن السبيل ـ فريضة من الله والله عليم حكيم.

এই আয়াতের যাকাত বণ্টনের আটটি খাতের উল্লেখ রয়েছে। আর তা হল– ১. ফকীর, ২. মিসকীন, ৩. যাকাত সংগ্রহ ও বিতরণের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ, ৪. মন জয় কিংবা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, ৫. দাসত্বের শৃঙ্খল হতে মুক্তি দান, ৬, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গ, ৭. আল্লাহর পথে, ৮. মুসাফির বা প্রবাসী। যাকাত বণ্টনের জন্য এই আটটি খাতকে নির্দিষ্ট করে দেয়ার কারণে যাকাত বণ্টন ও যাকাত ব্যবস্থাপনায় অনিয়মের আশংকা অনেকাংশে কমে যায়।

যাকাত বণ্টনের উপরোক্ত আটটি খাতের বর্ণনায় প্রথম চারটির ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ (ل) বর্ণ ব্যবহার করেছেন (للفقراء...), আর এই (ل) বর্ণটি (تمليك) তথা মালিক বানানো অর্থে প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে শেষোক্ত চারটি খাতের বর্ণনায় মহান আল্লাহ (فى) শব্দটি ব্যবহার করেছেন (وفى الرقاب والغارمين...) যা দ্বারা তিনি পাত্র কিংবা ক্ষেত্র অর্থ বুঝিয়েছেন। এর অর্থ হল– প্রথম চার প্রকারের ক্ষেত্রে যাকাতের সম্পদ ব্যক্তি মালিকানায় যাবে। আর শেষোক্ত চার প্রকারের ক্ষেত্রে তা সরাসরি ব্যক্তি মালিকানায় না গিয়ে সংশ্লিষ্ট খাতে ব্যয় করলেও চলবে।[১৯]

যাকাত বণ্টনের উক্ত খাতসমূহ পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, যাকাত ব্যবস্থায় মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের প্রতিই অধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সম্পদ কেবল ধনীদের মধ্যেই আবর্তিত হবে এটি ইসলামের উদ্দেশ্য নয়। বরং ধনীদের কাছ থেকে যাকাত সংগ্রহের মাধ্যমে সমাজ হতে দারিদ্র্য বিমোচনের কেটসই কর্মপন্থা গ্রহণই ইসলামের উদ্দেশ্য। আর এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। ১. শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের সহায়তা দান, পঙ্গু, দুঃস্থ ও বিধবাদের পুনর্বাসন, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের মাসাহারা প্রদান, কন্যাদায়গ্রস্তদের আর্থিক সহযোগিতা প্রদান, ঋণগ্রস্ত কৃষকদের জমি অবমুক্তি, দরিদ্র শিশুদের পুষ্টি সাহায্য প্রদান, দরিদ্র নারীদের নারীদের প্রসবকালীন ও মাতৃকালীন সাহায্য প্রদান, ইয়াতীম প্রতিপালন ও তাদের শিক্ষা-প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা কর, গরীব-অসহায়দের চিকিৎসা সুবিধা প্রদান, মরণোত্তর ঋণ পরিশোধ, শরণার্থী সহায়তা ও উদ্বাস্তু পুনর্বাসন, নও মুসসিমদের পুনর্বাসন, মৌলিক পারিবারিক সাহায্য, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, গরীব ছাত্রদের বৃত্তি প্রদান, গৃহায়ণ কর্মসূচী এবং ইসলামের প্রচারও ইসলাম বিরোধী তৎপরতা বন্ধকল্পে প্রকল্প গ্রহণ ইত্যাদি।

---

১৮. সূরা আত তাওবা : ৬০।

১৯. আল্লামা আবুল কাসেম জারুল্লাহ যামাখশারী, (বৈরূত : দার আল মাআরিফ) ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৮-১৫৯)।

www.bjilibrary.com

যাকাতও অর্থনৈতিক ভারসাম্য

ইসলাম বিশ্বাসের ধর্ম, ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা, এতে উন্নত নৈতিক শিক্ষা ও বিধিমালার পাশাপাশি সমাজ, রাষ্ট্র ও সরকার গঠন ও পরিচালনার বিধি-বিধান বিদ্যমান। ইসলাম মানব জীবনকে খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্নভাবে দেখে না। একে অবিভাজ্য সমগ্ররূপে গণ্য করে, যা আসমানী বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই বিধানের মূল লক্ষ্য ব্যক্তির মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং মানব জীবনের সামগ্রিক কল্যাণ ও উন্নয়ন যা তাকে চিরন্তন কল্যাণের দিকে পরিচালিত করে।

ইসলাম বৈধ পন্থায় উপার্জিত সম্পদে ব্যক্তি মালিকানা স্বীকার করে। তবে লাগামহীন আয়-উপার্জন, সঞ্চয়, ব্যয়-বিনিয়োগ ইত্যাদি অনুমোদন করে না। ফলে পুঁজিবাদের ধ্বংসাত্মক প্রভাবে সমাজের অর্থব্যবস্থাকে একচেটিয়া ধনিক শ্রেণীর অনুকূলে নিয়ে যাওয়া কিংবা সমাজতন্ত্রের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত করে অসংখ্য বনী আদমকে অধিকার বঞ্চিত করে রাষ্ট্রের নামে গুটি কয়েক ব্যক্তি হাতে সম্পদ কুক্ষিগত করার সুযোগ ইসলামে নেই। বরং হালাল-হারামের অনুসরণপূর্বক সম্পদের বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থা এবং সম্পদ উপার্জন ও বণ্টনের ক্ষেত্রে বিরাজমান পার্থক্য নিরসনকল্পে যাকাত ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য দূর করে পারস্পরিক সম্প্রীতি-সদ্ভাবের সেতু বন্ধন রচনা করে ভারসাম্যপূর্ণ, সুবিচারমূলক ও জনকল্যাণের অর্থব্যবস্থা প্রবর্তন ইসলামের মূল লক্ষ্য।

অর্থনৈতিক ভারসাম্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে যাকাত হল প্রথম আইনানুগ ব্যবস্থা। কারো প্রতি অতিরিক্ত দয়া-পরবশ হয়ে নয়, কোন আন্দোলন-সংগ্রাম কিংবা দাবী-দাওয়ার কাছে নতি স্বীকার করে নয়, বরং অত্যাবশ্যকীয় দীনী বিধানের আওতায় এটি ফরয করা হয়েছে। এটি কোন প্রকার অনুদান নয়, কোন প্রকার দয়া কিংবা অনুকম্পাও নয়, বরং ধনীদের সম্পদে গরীবদের ন্যায্য পাওনা, এক কথায় এটি তাদের অধিকার।[২০]

যাকাতের হার নির্ধারণে ইসলাম ন্যায়সঙ্গত পন্থা অনুসরণ করেছে। এতে একদিকে যেমন ধনীর শ্রম, মেধা ও পুঁজির মূল্যায়ন করে মালিকের স্বার্থ সংরক্ষণ করা হয়েছে অপরদিকে দরিদ্রের স্বার্থকেও সমুন্নত রাখা হয়েছে। যাকাত নির্ধারণে সম্পদের ধরন ও সম্পদ আহরণে কষ্টের পরিমাণ ইত্যাদি বিবেচনায় আনা হয়েছে। আর তা বণ্টনের ক্ষেত্রেও ইসলামের নীতি অত্যন্ত প্রাজ্ঞ ও ইনসাফপূর্ণ। যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে যেমন কোন প্রকার যুল্‌ম কিংবা হয়রানির সুযোগ ইসলাম রাখেনি তেমনিভাবে তা বিলি-বণ্টনের ক্ষেত্রেও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দারিদ্র্য বিমোচনের প্রতি অধিক নজর দিয়েছে। হযরত মু'আয ইবন জাবাল (রা)-কে ইয়ামানের গভর্ণর হিসাবে প্রেরণকালে মহানবী (সা) তাঁকে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করেন।[২১]

---

২০. وفى اموالهم حق للسائل والمحروم, আল কুরআন সূরা আয যারিয়াত : ১৯)।

২১. ইমাম মুহাম্মাদ ইবন ইসমাইল আল বুখারী, সহীহ আল বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০২-২০৩।

www.bjilibrary.com

যাকাত গ্রহীতা হয়ত ফকীর, নতুবা মিসকীন অথবা ঋণগ্রস্ত অথবা জিন্দাখানায় বন্দী কিংবা দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে মনুষ্যত্বের মর্যাদা হতে বঞ্চিত অথবা নিঃস্ব পথিক, মুসাফির। যাকাত ব্যবস্থা এইসব ব্যক্তির অভাবগ্রস্ততা, দারিদ্র্যের যাতনা, সামাজিক পশ্চাদপদতা ও লাঞ্ছনা-গঞ্জনা দূর করে তাদের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য ফিরিয়ে আনে, যা তাদের পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে মানসিক স্বস্তি প্রদান করে। এই শ্রেণীর জনগোষ্ঠী তাদের বস্তুগত প্রয়োজন পূরণ করার মত আর্থিক সংগতি ফিরে পেয়ে নিজেদেরকে সমাজের মূল ধারার অংশ মনে করে সামাজিক উন্নয়নের গতিধারায় অনবদ্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়। ফলে তারা পরনির্ভরশীল ব্যক্তির পর্যায় হতে আত্মনির্ভরশীল ব্যক্তির পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার প্রেরণা লাভ করে।

ইসলাম মানুষকে আত্মনির্ভরশীল হতে শেখায়, তাদেরকে কর্মক্ষম ব্যক্তিতে পরিণত হওয়ার অনুপ্রেরণা যোগায়। তাই ইসলাম ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিয়ে সাহায্যের জন্য দ্বারে দ্বারে গিয়ে হাত প্রসারিত করার পবির্তে তাদের হাতকে কর্মীর হাতে পরিণত করার দিক নির্দেশনা প্রদান করে। এজন্য ইসলাম সুস্থ দেহ ও সুস্থ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অধিকারী ব্যক্তিবর্গকে যাকাত-সাদাকা গ্রহণে নিরুৎসাহিত করেছে। মহানবী (সা) ইরশাদ করেন-[২২] لا تحل الصدقة ولا لذى مرة سوى - অর্থাৎ "যাকাত কোন ধনী কিংবা সুস্থ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পন্ন ব্যক্তির জন্য বৈধ নয়।" কারণ, সুস্থ দেহের অধিকারী উপার্জনক্ষম ব্যক্তি তার কর্মচাঞ্চল্য দ্বারা অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখতে সক্ষম হবে এটিই স্বাভাবিক। সুতরাং এ ধরনের ব্যক্তির যাকাত গ্রহণ যাকাতের মূল দর্শনের বিপরীত।

সমাজের অর্থনৈতিক ভারসাম্যের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে ইসলাম স্থিতিশীল মূলধনের উপর কোন যাকাত আরোপ করেনি। তাই নিত্যপ্রয়োজনীয় ব্যবহার্য-সামগ্রী, বসবাসের গৃহ, কল-কারখানা, পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পদে যাকাত নির্ধারণ করা হলে মূলধন নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার আশংকা থেকে যায়।[২৩] কিন্তু যেই সব সম্পদে বর্ধনশীলতার উপাদান বিদ্যমান, যার হার ও পরিমাণ সুস্পষ্টভাবে নির্ণয় করা সম্ভব, যার মূল্যের তারতম্য নির্ণয় করা সহজসাধ্য এবং যাকাত আদায়ের কারণে যার মূলধন নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে না কেবল সেই ধরনের সম্পদের যাকাতের বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ একদল মানুষকে সম্পদ ও প্রাচুর্য দ্বারা সমৃদ্ধ করেছেন আর আরেক দলকে অভাব অনটনের মধ্য দিয়ে জীবন যাপনে অভ্যস্ত করেছেন। আর এ দু'য়ের মধ্যে সমন্বয় ও ভারসাম্য রক্ষার জন্য যাকাত ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছেন। এই যাকাত ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজের নিঃস্ব-দরিদ্র অসহায় যাকাত পাওয়ার হকদার ব্যক্তিবর্গের

---

২২. ইমাম আবু দাউদ, সুনানু আবী দাউদ, (কলিকাতা : ১৪০০ হি.) ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩১।

২৩. আবদুর রহমান আল জাযিরী, কিতাব আল ফিকহ আলা আল মাযাহির আল আরবাআহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৯৫।

www.bjilibrary.com

আর্থিক সহযোগিতার সুযোগ সৃষ্টি হয়। এর মাধ্যমে ধনিক শ্রেণী অসহায়-দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামাজিক দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকেন। এতে করে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের সামাজিক স্তরগত ব্যবধান হ্রাস পায়।[২৪]

সাধারণতঃ দেখা যায়, ধনিক শ্রেণীর সম্পদের প্রতি অসহায়-দরিদ্র শ্রেণীর অপরাধী চক্রের লোভাতুর দৃষ্টি পড়ে। যদি ধনিক শ্রেণীর সম্পদ হতে এই শ্রেণীর লোকজন যাকাত হিসাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কিছু অর্জন করে তাহলে ধনীর সম্পদের প্রতি দরিদ্র শ্রেণীর অন্যায়ভাবে হাত বাড়ানোর ক্ষেত্রে এদের বিবেক বাধা দেবে। ফলে ধনীর সম্পদ নিরাপদ থাকবে।[২৫] অপরদিকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যাকাত প্রদানের কারণে ধনীগণও দরিদ্রদের সম্পদ আত্মসাৎ করা হতে নিজেদেরকে মুক্ত রাখবে।

যাকাত ব্যবস্থা কেবল দরিদ্র জনগোষ্ঠীন নয় ধনিক শ্রেণীর জন্যও অনেক কল্যাণ বয়ে আনে। ধনিক শ্রেণী প্রতি বছর শরীআহ নির্ধারিত হারে যাকাত প্রদানের কারণে সমাজের অভাবী লোকদের হাতে সম্পদ পৌঁছে যায়। ফলে যাকাত গ্রহীতাগণ আর্থিক সংগতি ফিরে পাওয়ার কারণে তাদের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এতে করে চাহিদা, উৎপাদন, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃত্তি সাধিত হয়।[২৬] ফলে জাতীয় অর্থনীতির ভিত্ মজবুত হয়। আর এই অর্থ পুনরায় মুনাফাসহ যাকাত দাতার হাতে ফিরে আসে। আর অর্থের অধিক হাত বদল হওয়ার কারণে বাজারে অর্থনৈতিক গতি সঞ্চারিত হয়।[২৭] আর এভাবে সামষ্টিক সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে প্রাকারান্তরে যাকাত ধনীর সম্পদেই প্রবৃদ্ধি সাধন করে। এজন্য ইসলাম নগদ অর্থ সঞ্চয়ের বিষয়ে নিরুৎসাহিত করেছে। কারণ, নগদ অর্থ সঞ্চয়ের কারণে সম্পদের আবর্তন ও প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয় এবং উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়।

যাকাত মানবাত্মাকে লোভ, মোহ, স্বার্থপরতা, কার্পণ্য, সংকীর্ণতা প্রভৃতি মৌলিক মানবীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে মুক্ত করে যাকাতদাতাকে দান-দক্ষিণা ও অন্যের প্রতি সহযোগিতার হাত প্রসারিত করতে উদ্বুদ্ধ করে। যাকাতের মাধ্যমে ধনীগণ জনকল্যাণমূলক ও জনস্বার্থ সংরক্ষণমূলক কাজে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহ বোধ করে। সম্পদ কেবল ধনীদের মধ্যেই আবর্তিত হবে না–[২৮] আল কুরআনের এই বিধান অনুসরণ করে যাকাত প্রদানের লক্ষ্যে ধনীগণ যদি প্রতি বছর তাঁদের বিদ্যমান সম্পদের হিসাব বিবরণী প্রস্তুত করেন তাহলে অতি সহজেই তাঁরা তাঁদের সম্পদের

---

২৪. ড. ওহবাত আল যুহাইলী, আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৭০।

২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭০।

২৬. ইমাম আল যুরকানী, শরহ আল যুরকানী আলা মুয়াত্তা আল ইমাম মালিক। (বৈরূত : দারুল মারিফাহ, ১৯৮৯), ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৩।

২৭. ড. ওহবাত আল যুহাইলী, আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৯৭১।

২৮. كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ, সূরা আল হাশর : ৭।

www.bjilibrary.com

গতি প্রবাহ ঊর্ধ্বমুখী তা মূল্যায়ন করতে সক্ষম হন। সুতরাং বলা যায়, ইসলামে যাকাত ব্যবস্থা সম্পদশালীর সম্পদের তুলনামূলক হিসাব বিবরণী প্রস্তুতকরণের সুবর্ণ সুযোগ সৃষ্টি করে।

সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থা একটি স্বতন্ত্র বিপ্লবাত্মক মতবাদ। এটি সমাজের অবহেলিত-পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের এক বিশেষ পরিকল্পনা যা সরাসরি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় কার্যকর ও নিয়ন্ত্রিত হয়।[২৯] যাকাত প্রশাসনই মূলতঃ যাকাতের বাজেট, আয়-ব্যয়ের প্রাক্কলন ও পরিকল্পনা ইত্যাদি প্রণয়ন করে এবং এ সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয়ভার যাকাত খাত থেকেই বহন করা হয়।[৩০] যাকাত ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ও বাইতুল মাল গঠনের মাল গঠনের মৌল উপাদান। সমাজের অবহেলিত, বঞ্চিত ও অভাবগ্রস্ত লোকদের মৌলিক চাহিদা পূরণ এবং তাদের সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব মূলতঃ সরকারের উপর বর্তায়। এই শ্রেণীর লোকজন যদি সরাসরি যাকাত দাতাদের নিকট যাকাত গ্রহণের জন্য হাত পাতেন তাহলে তারা নানা ধরনের লাঞ্ছনা-গঞ্জনার শিকার হতে পারেন। আর সরকার কিংবা যাকাত প্রশাসন এ দায়িত্ব পালন করলে এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি এড়ানো সম্ভব হয়। অপরদিকে যাকাত ব্যক্তিগতভাবে আদায় করা হলে সমন্বয়হীনতার কারণে একই ব্যক্তি একাধিকবার যাকাতের অর্থ পাওয়ার এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পাওয়ার উপযোগী খাতগুলো বঞ্চিত হওয়ার আশংকা থেকে যায়, যা সম্পর্কে ব্যক্তি অবহিত নয়। অপরদিকে ব্যক্তিগতভাবে আদায় করা হলে বাইতুল মাল শূন্য হয়ে যেতে পারে। সামগ্রিক অর্থনীতির উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হওয়ার আশংকা থাকে। এজন্য যাকাত আদায়-বণ্টন ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে আল কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে।[৩১]

সমাজে অর্থের যথাযথ প্রবাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এবং কোনভাবেই যেন অর্থনৈতিক ভারসাম্য ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সে জন্য যাকাতের সংগৃহীত সম্পদ সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে বিলি-বণ্টনের পক্ষে ফকীহগণ মত ব্যক্ত করেন।[৩২] যদি সেই অঞ্চল দারিদ্র্য মুক্ত হয় অথবা সেখানকার জনগণ যাকাতের সম্পদের উপর সম্পূর্ণ কিংবা আংশিক নির্ভরশীলতা মুক্ত হয়, কিংবা প্রয়োজনের তুলনায় সেখানকার সম্পদের পরিমাণ অধিক হয় তবেই কেবল উক্ত অঞ্চলের যাকাতের সম্পদ অন্যত্র স্থানান্তর করা যাবে।[৩৩] হযরত ইমরান ইবন হুছাইন (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, মহানবীর (সা) যুগে যাকাতের

---

২৯. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, ইসলাম ও আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদ, (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৭৯), পৃ. ৯৪-৯৫)।

৩০. আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী, ইসলামের যাকাত বিধান, (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ২০০১), ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৮, (মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম অনূদিত)।

৩১. الذين ان مكنهم فى الارض الصلوة واتوا الزكوة وامروا بالمعروف..., সূরা আল হাজ্জ : ৪১।

৩২. আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী, ইসলামের যাকাত বিধান, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩১৫-৩১৮।

৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৯।

www.bjilibrary.com

সংগৃহীত সম্পদ সংশ্লিষ্ট অঞ্চলেই ব্যয় করা হতো।[৩৪] হযরত উমার (রা) তাঁর পরবর্তী খালীফাকে... প্রদত্ত উপদেশ নামায় বেদুইনদের কল্যাণ সাধন ও যাকাতের সংগৃহীত সম্পদ সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে বণ্টন করার নির্দেশ দেন।[৩৫]

উপসংহার

ইসলামের যাকাত ব্যবস্থা একটি গতিশীল অর্থব্যবস্থার নাম। এর খাতসমূহ ও হার আল কুরআন ও হাদীস কর্তৃক নির্ধারিত। ফলে সম্পদশালীদের উপর করের ন্যায় যাকাতের দুর্বহ বোঝা চাপানোর সুযোগ ইসলামে নেই। অপরদিকে এটি মওকুফ কিংবা হ্রাস-বৃদ্ধি করার অধিকারও কারো নেই। তাই যাকাত অর্থনীতির চাকাকে সচল ও ভারসাম্যপূর্ণ রাখতে সহায়তা করে। যাকাত সম্পদের মালিকের সমুদয় সম্পদ তথা মূলধন পরিচ্ছন্ন রাখে এবং তা বিনিয়োগ ও ভোগ-ব্যবহারের সুযোগ করে দেয়। অনেক সময় দেখা যায়, কালো টাকার মালিকগণ অধিক কর আরোপের আশংকায় তাদের সম্পদ প্রদর্শন করেন না। আর রাষ্ট্রীয় শাস্তির আশংকায় তা বিনিয়োগ করতেও ভয় পান। কিন্তু যাকাত প্রদানকারীরা হৃদয়ে সদা জবাবদিহিতার ভয় জাগরুক থাকার কারণে তাঁরা ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থ লগ্নি প্রভৃতিতে স্বচ্ছতা বজায় রাখেন। আর প্রতি বছর বাধ্যতামূলক যাকাত প্রদান করতে হবে বিধায় মূলধনে প্রবৃদ্ধি সাধনের লক্ষ্যে তাঁরা সমুদয় সম্পদ বিনিয়োগ করতে সচেষ্ট থাকেন। অপরদিকে যাকাত ব্যবস্থায় যেহেতু তাদের উপর অধিক করের বোঝা চাপানোর সুযোগ নেই, তাই তাঁরা অবৈধ পন্থায় অধিক মুনাফা অর্জনের মানসিকতা পোষণ করেন না। ফলে সামগ্রিক অর্থ ব্যবস্থায় ভারসাম্য বজায় থাকে। সুতরাং বলা যায়, অর্থনৈতিক ভারসাম্য সৃষ্টিতে যাকাতের ভূমিকা অপরিসীম। ■

---

৩৪. ইমাম আবূ দাউদ, সুনানু আবী দাউদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২৯।

৩৫. আবূ উবায়দ, কিতাব আল আমওয়াল, পৃ. ৫৯৫, উদ্ধৃত, ইসলামের যাকাত বিধান, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩১৬।

লেখক-পরিচিতি : ড. আ. ক. ম. আবদুল কাদের– অধ্যাপক এবং বিভাগীয় চেয়ারম্যান, আরবী বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

লেখা-পরিচিতি : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত ১০ই জুলাই, ২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সেমিনারে প্রবন্ধটি উপস্থাপন করা হয়।

www.bjilibrary.com

একটি মুসলিম দেশের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন কৌশল

মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম

■

ভূমিকা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে পাশ্চাত্যের অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধি এবং রাজনৈতিক কর্তৃত্বের ফলশ্রুতিতে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার পূর্বতন ঔপনিবেশিক দারিদ্র্যপীড়িত ও নব্য স্বাধীন দেশগুলো, যার মধ্যে মুসলিম বিশ্বের দেশগুলোও রয়েছে, পাশ্চাত্য মডেলের উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করে এগিয়ে যাবার কোশেশ করেছে। জার্মান পণ্ডিত উলফগাং সাকস অত্যন্ত সুন্দরভাবে বলেছেন, 'বিগত চল্লিশ বছরকে উন্নয়নের যুগ বলা যায়..... যেমন লাইট হাউজের উজ্জ্বলতা, নাবিককে তীরের দিকে পথ প্রদর্শনের মতো 'উন্নয়ন' এমন একটি ধারণা, যা নব প্রজন্মকে যুদ্ধোত্তর ইতিহাসের ভ্রমণ পথে নিয়ে যায়। গণতান্ত্রিক বা স্বৈরতান্ত্রিক যে দেশই হোক না কেন, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো উপনিবেশিক শোষণ থেকে মুক্ত হয়ে তাদের প্রাথমিক গর্বের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে পাশ্চাত্য নির্দেশিত উন্নয়ন মডেলকে জাহির করেছে।..... সমস্ত প্রচেষ্টাকে পাশ্চাত্য মডেলের উন্নয়ন লক্ষ্যে পৌছানোর জন্যই যুক্তিযুক্ত মনে করা হয়েছে।

www.bjilibrary.com

কিন্তু তা অন্ধকারেই রয়ে গেছে..... বিগত প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে এ দেশগুলো পাশ্চাত্য উন্নয়ন মডেলকে বন্ধুভাবাপন্ন হিসেবে গ্রহণ করেছে।'[১]

কিন্তু দৃশ্যপট পরিবর্তন হতে শুরু করেছে। উলফগাং সাকস আরো বলেছেন, 'আলোক স্তম্ভে ফাটল ধরেছে এবং তা চূর্ণ-বিচূর্ণ হতে শুরু করেছে। উন্নয়ন ধারণা এখন যেন বুদ্ধিবৃত্তিক ধ্বংসাবশেষের ছবি। সত্যিকার অর্থে এ যুগ শেষ হয়ে যাবে। এখন এর সমাধি রচনার সময়।'[২]

জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচীর (ইউএনডিপি) মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ১৯৯২[৩]-এ অনুতাপের সাথে স্বীকার করা হয় যে, 'উন্নয়ন প্রচেষ্টার ফসল সব জায়গায় সমভাবে পড়েনি এবং প্রায়ই তা হতাশাজনক।' এবং প্রতিবেদনটি সতর্ক করে দিয়ে উল্লেখ করেছে, 'বিশ্ব দারিদ্র্যের নিগূঢ় সমস্যাগুলো আরো বৃদ্ধি পেতে পারে ও তা বিশ্বে বৃহদাকার ছন্দপতন ঘটাতে পারে, যার ফলাফল থেকে শিল্পোন্নত ও ধনী দেশগুলোও রেহাই পাবে না। প্রতিবেদনটি পরামর্শ দিয়ে লিখেছে, 'বিশ্ব উন্নয়নের সমস্যাগুলো দূর করার জন্য ধনী দেশগুলোর নিজের স্বার্থেই একটা নতুন, শক্তিশালী এবং মৌলিকভাবে ভিন্ন কিছু কৌশল ও পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত।

মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ১৯৯২ এই স্পষ্ট বাস্তবতাকে তুলে ধরেছে যে, গত তিন শতাব্দীর তথাকথিত সার্বজনীন উন্নয়ন প্রচেষ্টায় ধনীরা আরো ধনী হয়েছে এবং দরিদ্ররা আরো দরিদ্র হয়েছে। উনিশশত ষাট দশকে, পাঁচ বিলিয়ন জনসখ্যার সবচেয়ে ধনী এক বিলিয়ন জনসংখ্যা সবচেয়ে গরীব এক বিলিয়ন জনসংখ্যার তুলনায় ত্রিশগুণ বেশি ভাল অবস্থানে ছিল। জাতিগত অভ্যন্তরীণ অসংগতি বিবেচনায় রেখে সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী বলা যায়, জনসংখ্যার প্রথম এক-পঞ্চমাংশ সম্ভবত অন্যদের তুলনায় একশত পঞ্চাশগুণ বেশি ভাল অবস্থানে আছে।[৪]

দি গার্ডিয়ান পত্রিকার সম্পাদক মন্তব্য করেছেন যে, উন্নয়নশীল দেশগুলো অসম অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে বাজারে প্রবেশ করেছে এবং অসম হিস্যার সাথে অবস্থান করছে।[৫]

এটাই হচ্ছে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিত, যেখানে মুসলিম গবেষকগণ পুরো উন্নয়ন মডেল এবং মুসলিম দেশের প্রেক্ষিতে কি কৌশল অবলম্বন করা যায় তা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে পারেন।

---

১. Wolfgang sachs, 'Introduction' in The Development Dictionary : A Guide to knowledge as power ed. wolfgang sachs, London, Zed books ltd. 1992, p. 1

২. Wolfgang sachs, পূর্বোক্ত, p.-1

৩. Human Development Report 1992, New York : United Nations Development Programme, 1992.

৪. The Economist, London, April 25, 1992.

৫. The Guardian, London, April 25, 1992.

www.bjilibrary.com

বিশ্ব মুসলিমের অবস্থান

- বর্তমান বিশ্বের জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশেরও বেশি মুসলিম।
- বর্তমান বিশ্বে মুসলিম জনসংখ্যা ১৪২ কোটি।
- ৫৭টি ওআইসি ভুক্ত দেশে মুসলিম জনসংখ্যা ১০০ কোটি।
- বিশ্বের বাকী দেশগুলোতে মুসলিম জনসংখ্যা ৪২ কোটি।
- ইউরোপে মুসলিম জনসংখ্যা ৩ কোটি।
- উত্তর আমেরিকায় মুসলিম জনসংখ্যা ১ কোটি।
- ইউরোপ ও আমেরিকায় ইসলাম দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্ম।
- ৫৭টি মুসলিম দেশ পৃথিবীর ২৩% ভূমির অধিকারী।
- ভূ-রাজনৈতিক (Geo-Political) কৌশলগত স্থানে মুসলিম দেশগুলো অবস্থিত।
- মুসলিম দেশগুলি মিলিতভাবে শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, রাজনৈতিক দিক দিয়েও বিশ্ব শক্তি হতে পারে।

অর্থনৈতিক অবস্থান

- ১৩% আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য (নিজেদের মধ্যে)।
- ৮৭% বাণিজ্য বহির্বিশ্বের সাথে।
- বিশ্ব অর্থনীতিতে মুসলিম বিশ্বের শক্তিশালী অবস্থান।
- সকল মুসলিম দেশই উন্নয়নশীল দেশের অন্তর্ভুক্ত।
- ৫টি মুসলিম দেশ উচ্চ মানব উন্নয়ন ভুক্ত।
- ২৫টি মুসলিম দেশ মধ্য মানব উন্নয়ন ভুক্ত।
- ২৭টি মুসলিম দেশ নিম্ন মানব উন্নয়ন ভুক্ত।[৬]
- মুসলিম বিশ্ব বেশ কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত বিশ্ব অর্থনৈতিক পরাশক্তি ছিল।
- বিগত ৩০০ বছর ধরে পশ্চাদপদ।
- আবারো শক্তিশালী রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে পুনর্জাগরণের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে।
- পশ্চাদপদতার কারণ এবং ভুল ভ্রান্তি চিহ্নিত করণে প্রচুর চিন্তা-ভাবনা হচ্ছে।
- নৈতিক এবং আদর্শিক চিন্তাধারার পুনরুদ্ধার করাটাই সবচেয়ে কঠিন বলে মনে হচ্ছে।

সকল মুসলিম দেশ উন্নয়নশীল দেশগুলোর অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে কিছু মধ্য অবস্থান, কিছু নিম্ন অবস্থান এবং বেশিরভাগই একেবারে নিম্ন পর্যায়ে অবস্থান করছে। এসবই

৬. UNDP Reopot 2000 p-156-160.

www.bjilibrary.com

বেশি উন্নত। যেমন- বৃহত্তম মুসলিম দেশ ইন্দোনেশিয়াতে তেল উৎপাদন সাব সেক্টরের পর্যাপ্ত গুরুত্বসহ, কৃষি ও শিল্পকারখানা যথাক্রমে মোট আভ্যন্তরীণ আয়ের বিশ ও নয় শতাংশের যোগান দেয়া সত্ত্বেও খনিজ সেক্টর দেশের মোট আভ্যন্তরীণ আয়ের শতকরা ২০ ভাগ যোগান দিয়ে থাকে। এ ধরনের দেশগুলোতে উন্নয়নের জন্য সম্পদের ভারসাম্য অবস্থা বিরাজ করছে। তাদের মূল প্রয়োজন হলো- প্রযুক্তি এবং অন্যান্য মুসলিম দেশের সাথে বাণিজ্য সম্প্রসারণ।

তৃতীয় ধরনের কিছু দেশ রয়েছে, যাদের বাণিজ্য বিভাগ তুলনামূলকভাবে কম তাৎপর্যপূর্ণ এবং যারা কৃষিভিত্তিক প্রাথমিক উৎপাদনে বড় ধরনের রপ্তানীকারক, কিন্তু রপ্তানী ও আভ্যন্তরীণ বাজারের জন্য ম্যানুফ্যাকচারিং এ সমৃদ্ধির বিভিন্ন পর্যায়ে অবস্থান করছে। কৃষিজ প্রাথমিক উৎপাদন ও সীমিত পর্যায়ের ম্যানুফ্যাকচারিং এর উপর নির্ভরশীল দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে– চাদ, মালি, তিউনিসিয়া, সোমালিয়া, সুদান, উগান্ডা, বুরকিনাফাসো, নাইজার এবং ইয়েমেন। এ ধরনের আরো কিছু দেশ আছে যারা কৃষিজ প্রাথমিক উৎপাদনের রপ্তানীকারক হিসাবে বিরাজমান, কিন্তু তুলনামূলকভাবে রপ্তানীতে ম্যানুফ্যাচারিং সেক্টরে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে পেরেছে। এ পর্যায়ের দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে- মিশর, সিয়েরালিওন, লেবানন, তুরস্ক, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, উযবেকিস্তান, কাজাকস্তান ও মালয়েশিয়া। এসব দেশের মূল সম্পদ হলো বৃহত্তর আভ্যন্তরীণ বাজারসহ জনশক্তি ও দক্ষতা এবং উন্নয়ন সহায়ক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো। এদের মূল সীমাবদ্ধতা হলো মূলধন স্বল্পতা এবং নিম্নমানের আভ্যন্তরীণ মাথাপিছু আয় থেকে উন্নয়নের জন্য সঞ্চয় গড়ে তোলা।

মুসলিম বিশ্ব তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ব্লক ইউরোপ, উত্তর আফ্রিকা ও ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে অবস্থান করছে, যার সিংহভাগ ঘনীভূত আফ্রিকা ও এশিয়ার কেন্দ্রস্থলে এবং অল্পসংখ্যক ইউরোপ, মধ্য, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। ভাষাগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও জাতিগত প্রাপ্তি (racial stock) এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন পর্যায়ে মুসলিম বিশ্ব একটি সমজাতীয় একক, যাদের সাধারণ বিশ্বাস, সংস্কৃতি এবং আচরণগত বৈশিষ্ট্য ইসলামী পরম্পরা (Islamic traditions) থেকে নিঃসৃত।

মুসলিম বিশ্ব এ কারণে গুরুত্বপূর্ণ যে, এটি এশিয়া, আফ্রিকা এবং ইউরোপে একটি কৌশলগত অবস্থান অধিকার করে আছে। মুসলিম বিশ্ব একদিকে রাশিয়ান ফেডারেশন ও পশ্চিম ইউরোপের মধ্যে এবং অন্যদিকে প্রশান্ত মহাসাগর ও ভূ-মধ্যসাগরের মধ্যে বিশাল ভূ-তাত্ত্বিক অর্থনৈতিক গোষ্ঠী গঠন করেছে। ভূ-মধ্যসাগরের উত্তর প্রবেশ দ্বার তুরস্ক দ্বারা এবং পূর্ব প্রবেশ দ্বার- সুয়েজ এবং পোর্ট সৈয়দের মাধ্যমে মিশর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ভূ-মধ্যসাগরের শতকরা ৬০ ভাগ এবং উপসাগরের ঐকশ ভাগ মুসলিমদের নিয়ন্ত্রণে। লোহিত সাগরের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা।

www.bjilibrary.com

হচ্ছে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী বিজয় ও তাদের অবাধ লুণ্ঠন-শোষণের কারণে। স্বাধীনতা লাভের পরও এসব মুসলিম দেশ স্বাধীনভাবে নিজেদের আর্থ-সামাজিক সমৃদ্ধির জন্য কাজ করতে পারেনি নব্য উপনিবেশবাদী ষড়যন্ত্র ও বহুবিধ বাধা বিপত্তির কারণে যদিও ভূ-অর্থনৈতিক বিবেচনায় মুসলিম দেশগুলো অত্যন্ত সম্ভাবনাময়ী।

আঞ্চলিক সম্পদ ভিত্তির (Region's resources base) মধ্যে আছে উচ্চ কৃষি উৎপাদনের জন্য ঘণীভূত এলাকা, খনিজসম্পদ, শক্তির বিভিন্নমুখী উৎসের বৃহৎ ভান্ডার, যাতে তৈল সম্পদ ও গ্যাস ছাড়াও কয়লা ও প্রচ্ছন্ন জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সুযোগ। মানব সম্পদের ভিত্তি শুধুমাত্র সংখ্যাগত দিকেই খুব বৃহৎ নয়, গুণগত দিক দিয়েও খুব পরিপক্ক, যেখানে উন্নয়নশীল মুসলিম দেশগুলো থেকে বড় ধরনের মেধা পাচার হচ্ছে এবং উল্টোদিকে উন্নত দেশগুলো থেকে উন্নয়নশীল মুসলিম বিশ্বে প্রযুক্তি স্থানান্তরের ফলে কিছু সংখ্যক মুসলিম দেশ প্রযুক্তির প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি এত পরিমাণ সম্প্রসারণ করেছে যে, তা তাদেরকে বেশিরভাগ আধুনিক ক্ষেত্র যেমন পারমাণবিক শক্তি, ইলেকট্রনিকস ও বায়ুগতিবিদ্যায় (Aerodynamics) প্রবেশ করার সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে বর্তমান বাণিজ্য কিছুটা সীমিত হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন দেশের মধ্যে সম্পদের ভিত্তি এতটাই বিস্তৃত যে, প্রাকৃতিক পরিপূরক সমূহ (Natural Complementaries) উজ্জ্বলভাবে দৃশ্যমান। ২০০৬ সালে এ ধরনের বাণিজ্যে এসব দেশ রপ্তানির মাত্র ১৫ ভাগ বৃদ্ধি করতে পেরেছে।

প্রথমত: কিছু কিছু দেশ যেমন-সৌদী আরব, সংযুক্ত আরব আমীরাত, কাতার, কুয়েত, ওমান, আলজেরিয়া, লিবিয়া ইত্যাদির সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো অতি উচ্চ মানের তেল উৎপাদন, রপ্তানি বাণিজ্য এবং কিছু প্রাথমিক প্রচেষ্টার সাথে শিল্পের বহুমুখীকরণ। তবে কৃষি সেক্টর দুর্বল। এসব দেশের মূল সম্পদ দৃশ্যমান হতে শুরু করে ১৯৭০-৮০ এর দশকে তেলের মূল্যের একটি বাস্তব পর্যায়ে সমন্বয় সাধনের পর থেকে, যেহেতু ঐ সময় নিজস্ব দেশের সীমা ও দেশের বাইরে বিনিয়োগের জন্য উদ্বৃত্ত মূলধন জমা হয়। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, এই সব বৃহদাকার বিনিয়োজিত মূলধন পাশ্চাত্যের শিল্পোন্নত দেশেই তার মূলধনী বাজার (Capital Market) খুঁজে পায়, সাধারণভাবে তৃতীয় বিশ্বের কোন দেশ, বিশেষত মুসলিম কোন দেশে সরাসরি বিনিয়োজিত হতে পারেনি।

দ্বিতীয় ধরনের দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে অনেকগুলো তেল রপ্তানীকারক মুসলিম দেশ, যেখানে বৃহৎ তেল উত্তোলনসহ খনিজ নির্ভর শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে প্রধান রপ্তানীকারক সেক্টর হিসেবে। কিন্তু কৃষি এবং ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টর তুলনামূলকভাবে

www.bjilibrary.com

পূর্বেই বলা হয়েছে মুসলিম বিশ্ব প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনশক্তিতে সমৃদ্ধ। বিশ্বের খনিজ তেলের (Petroleum) প্রায় ষাট শতাংশ মুসলিম দেশগুলোতে মজুদ রয়েছে। লোহা, ফসফেট, কপার, স্বর্ণ, তামা, ম্যাগনেট, টিন, রাবার, পাট, পামতেল, কোপেকসহ কৃষি এবং পশুসম্পদ এসব দেশগুলোতে রয়েছে।

মুসলিম দেশগুলোকে তিনটি প্রধান ক্যাটাগরিতে ভাগ করা যায়। যেমন–

এক. তেল উৎপাদনকারী ধনী দেশসমূহ।

দুই. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য অত্যাবশ্যকীয় প্রাকৃতিক ও মানবীয় অবকাঠামোসহ তুলনামূলকভাবে উচ্চতর শিল্পায়ন সমৃদ্ধ ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা।

তিন. বাকীগুলো হলো বিভিন্ন পর্যায়ে শিল্পায়নসহ কম ঘন বসতিপূর্ণ এলাকা, যদিও এদের সমৃদ্ধি অর্জনের বড় সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রায় ডজন খানেক মুসলিম দেশ তুলনামূলকভাবে শিল্পায়নে উচ্চতর অবস্থা এবং প্রযুক্তিতে নিজস্ব স্থায়িত্বশীল আধিপত্য (Self sustaining command) অর্জন করেছে, যারা বাকী মুসলিম দেশগুলোতে শিল্প ও প্রযুক্তি স্থানান্তরে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। এ ক্যাটাগরির মধ্যে তুরস্ক, পাকিস্তান, ইরান, বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, কাজাকস্তান, মিশর এবং আলজেরিয়া লক্ষ্যণীয় ভূমিকা পালন করতে পারে।

যখন মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য খুব তাৎপর্যপূর্ণ তখন গত তিন দশকে মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে মূলধন ও জনশক্তি স্থানান্তরের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। মূলধন ও জনশক্তির এই সচলতা অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও সমন্বয়ের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। অধিকন্তু, এ দেশগুলোর মধ্যে শক্তিশালী বাণিজ্যের সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক পটভূমিও রয়েছে।

বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে তেলের বৈপ্লবিক মূল্যের সময়ে কিছু মুসলিম দেশ অসাধারণ অর্থনৈতিক ক্ষমতাধর হিসাবে আবির্ভূত হয়, যার ফলশ্রুতিতে বিশ্বের অর্থনৈতিক ক্ষমতার ভারসাম্য মুসলিম দেশগুলোর অনুকূলে চলে যায়। কিছু মুসলিম দেশের তহবিলে বৃহৎ পরিমাণ সঞ্চয় (Reserve) জমা হয় এবং প্রচুর মূলধনী সম্পদ সহজলভ্য হয়।

উন্নয়ন (Development)

উন্নয়ন শব্দটির ধারণা ব্যাপক। এটি একটি তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ। উন্নয়ন শব্দটির সমার্থক শব্দ উন্নতি, অগ্রগতি তথা পরিবর্তন। দুনিয়ার কোন জাতি কোথাও থেমে নেই। কোন জাতির অগ্রগতি থেমে গেলে সে জাতি স্থবির হয়ে পড়ে, তার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। বিশ্বের সর্বস্তরের মানুষই নিজেদের উন্নয়ন চায়। উন্নয়ন বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়।

www.bjilibrary.com

সাধারণত উন্নয়ন বলতে কোন দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও কৃষ্টিগত উন্নয়নকে বুঝায়। এগুলোর কোন একটিকে উপেক্ষা করে উন্নয়নকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। আর অর্থনৈতিক উন্নয়ন হল উন্নয়নের একটি শাখা মাত্র। বর্তমানে উন্নয়ন কেবল দেশীয় অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অন্যান্য চলক (Variables) ছাড়াও আন্তর্জাতিক নানা চলক দিয়ে প্রভাবান্বিত ও পরিচালিত হচ্ছে। উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশ্বায়নের (Globalization) ধারণা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অনেকে বিশ্বায়নকে উপনিবেশবাদের নয়া সংস্করণ হিসেবেও বিবেচনা করছেন। অতি সম্প্রতি উন্নয়নের ক্ষেত্রে আর একটি নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে– ধারণযোগ্য উন্নয়ন তথা টেকসই উন্নয়ন (Sustainable development)।

উন্নয়নের বহুবিধ সংজ্ঞা আছে। বিশেষজ্ঞদের মধ্যে যথেষ্ট মত পার্থক্যও রয়েছে। কেউ বলেন, উন্নয়ন হচ্ছে পরিবর্তন। অন্যদের মতে, এটা বস্তুর প্রবৃদ্ধি। কেউ কেউ বলেন, উন্নয়ন হচ্ছে একই সাথে পরিবর্তন ও প্রবৃদ্ধি। কিন্তু উন্নয়নশীল বিশ্বের প্রেক্ষাপটে উন্নয়ন হচ্ছে "সমাজ ব্যবস্থায় অনুন্নত অবস্থা সৃষ্টিকারী বহু সংখ্যক অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ (Upliftment of overall social structure)।"[৭]

এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার বহু সংখ্যক দেশে জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ অংশ ক্ষুধা, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, বেকারত্ব ও রোগে শোকে জর্জরিত। এগুলি হচ্ছে সেসব দেশের জন্য অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি যা থেকে তারা পরিত্রাণ লাভে সদা সচেষ্ট। তাই উন্নয়ন বলতে শুধু বস্তুর প্রবৃদ্ধি অথবা মুষ্টিমেয় লোকের উপকার বুঝায় না, বরং এটা হচ্ছে অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন মেটানোর লক্ষ্যে একটা বহমান প্রক্রিয়া।[৮] জনগণই এখানে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মূল জ্যোতিকেন্দ্র (Focus)।

সমসাময়িক অর্থনৈতিক উন্নয়ন তত্ত্বে বহুল ব্যবহৃত এবং প্রচারিত একটি শব্দ (term) হচ্ছে 'ধারণযোগ্য উন্নয়ন', ইংরেজিতে যাকে বলা হয় sustainable development। উন্নয়ন দর্শনে ধারণযোগ্য শব্দের সংযোজন ঘটে মূলত আশির দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে। এর আগ পর্যন্ত উন্নয়ন চিন্তার দুটি বিপরীতধর্মী দর্শন গত পঞ্চাশ বছর ধরে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। এর একটি হলো ভোগবাদী দর্শন। এই দর্শনের 'উন্নয়ন' অর্থই হলো ভোগসামগ্রীর প্রবাহ বৃদ্ধি। এই দর্শন অনুযায়ী মানুষকে প্রধানত ভোগীরূপে ধরে নেয়া হয়েছে। কিছুকাল বণ্টন নির্বিশেষে ভোগসামগ্রীর

---

৭. Gunner Myrdal, Asian Drama : An Inquiry into the Poverty of Nations, Abridged (London : Allen Lane Penguine Press, 1972) p. 50 গুনার মিরডাল নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ।

৮. Ann Mattis(ed) A society for International Development : Perspectives 1984 (Durhan : Duke University Press. 1983) P.XIII.

www.bjilibrary.com

ক্রমোন্নত বৃদ্ধির জন্য মোট জাতীয় উৎপাদনের ক্রমাগত বৃদ্ধি হলেই উন্নয়ন হচ্ছে বলে ধরে নেয়া হতো। কিন্তু ক্রমে বণ্টনের প্রশ্নটি সামনে চলে আসে। ভোগী হিসেবে কারা এই উন্নয়ন থেকে লাভবান হয় এ প্রশ্ন থেকেই জন্ম নেয় উন্নয়ন চিন্তার দ্বিতীয় দর্শন, যাকে বলা হয় 'উদারনৈতিক' উন্নয়ন দর্শন।[৯]

উদারনৈতিক দর্শন থেকে উন্নয়নের যে বিতর্ক শুরু হয় তা হলো উৎপাদন বৃদ্ধি আর বণ্টন যুগপৎ হতে পারে কি না, সকলের জন্য ভোগসামগ্রীর অধিকার নিশ্চিত করা যায় কি না ইত্যাদি। এই বিতর্ক আজও চলছে। উন্নয়ন সম্পর্কিত উদারনৈতিক দর্শনের বিতর্ক শেষ হতে না হতেই অর্থনীতিবিদরা মেতে ওঠেন 'ধারণযোগ্য উন্নয়ন' দর্শনের ধারণা নিয়ে। কিন্তু দেখা গেল এই নতুন ধারণা পরিপক্বতা লাভ করার আগেই বিতর্ক শুরু হয়েছে পরিবেশ এবং মানুষের ক্ষতিসাধন ব্যতিরেকে উন্নয়ন সম্ভব কি না, অর্থাৎ প্রকৃতি এবং মানুষের জন্য সুষম ভারসাম্য বজায় রেখে উন্নয়নকে বংশ পরম্পরায় ধরে রাখা যাবে কি না সেই বিষয়কে কেন্দ্র করে। যেহেতু উন্নয়নের কিছু ব্যয়ভার আছে, যা চূড়ান্তরূপে প্রকৃতি এবং মানুষকেই বহন করতে হয়, সেজন্য প্রশ্ন সৃষ্টি হয়, সত্যিকার অর্থে উন্নয়ন ধারণযোগ্য কি না।

উন্নয়ন : সংজ্ঞাগত বিতর্ক

উন্নয়নের ব্যাপারে অর্থশাস্ত্রে কোন গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা নেই।[১০] গত পঞ্চাশ বছর ধরে উন্নয়নের সংজ্ঞা নিয়ে যে বিতর্ক চলছে তার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, 'উন্নয়ন' হলো একটি বিভ্রান্তিকর, অস্বাভাবিক ও অহেতুক ভয়ভীতিপূর্ণ শব্দ।[১১] ধ্রুপদি অর্থনীতিবিদরা উন্নয়নের অর্থ করেছিলেন, 'আয় বৃদ্ধি' এবং এই সংজ্ঞার উপর ভিত্তি করে সারা দুনিয়া অর্থনৈতিক উন্নয়নের নামে আয় বৃদ্ধির উপায়ের পেছনে ছুটেছে। পরবর্তীকালে অনেক অর্থনীতিবিদ মনে করেছেন যে, আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে আয় পূনর্বণ্টনের উপর দৃষ্টি দেয়া দরকার। তা না হলে ধনী-নির্ধনের পার্থক্য ও দারিদ্র্যের সমস্যা বেড়েই চলবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে উন্নয়নের একটি নতুন সংজ্ঞা সমাজবিজ্ঞানীরা হাজির করেছেন– উন্নয়ন মানে জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধি। কিন্তু জীনযাত্রার মানের মূল্যায়নের কিংবা পরিমাপনের যথাযথ উপায় না থাকার দরুণ সংজ্ঞাটি পণ্ডিত মহলে ততবেশি গ্রহণযোগ্য হতে পারেনি। এই পরিপ্রেক্ষিতে অতঃপর উন্নয়নের সংজ্ঞা নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী পরস্পর বিরোধী মূল্যবোধসম্পন্ন দুটি ধারা। একটি ধারা মনে করে, জীনযাত্রার মান উন্নয়ন করতে গিয়ে কোনভাবেই ব্যক্তির মালিকানার স্বাধীনতা, বিনিময়ের স্বাধীনতা, আয়-ব্যয়ের ও ভোগের স্বাধীনতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা

৯. আনিসুর রহমান, উন্নয়ন জিজ্ঞাসা, ঢাকা, ব্রাক প্রকাশনা, ১৯৯২।
১০. ড. আবু মাহমুদ, উন্নয়ন উচ্ছ্বাস ও তৃতীয় বিশ্ব, ঢাকা, মুক্তধারা, ১৯৮৪।
১১. ড. আবু মাহমুদ, পূর্বোক্ত।

www.bjilibrary.com

ইত্যাদিকে খর্ব করা চলবে না। অন্য ধারাটি 'সামাজিক স্বার্থকেই' মনে করে অত্যন্ত মূল্যবান। এই ধারা অনুযায়ী জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন বলতে বুঝানো হয়েছে সংখ্যাগরিষ্ঠের সামাজিক উন্নয়ন। উন্নয়ন সম্পর্কে 'প্রবৃদ্ধি' অথবা 'সমতাসহ প্রবৃদ্ধি' কিংবা 'সমতা, প্রবৃদ্ধি ও গণ অংশগ্রহণের' যুগপৎ উপস্থিতি ইত্যাদি যে সংজ্ঞাতেই যিনি আজ বিশ্বাস করুন না কেন, সকলেই বর্তমান দুনিয়ার ধীরে উন্নয়নের প্রাথমিক লক্ষ্য সম্পর্কে কতগুলি ন্যূনতম বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছাচ্ছেন।[১২]

এই ন্যূনতম প্রাথমিক ঐকমত্যগুলিকে বিশ্বখ্যাত উন্নয়নবিদ এ.কে. সেন চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে উন্নয়নের অত্যন্ত প্রাথমিক ও সার্বজনীন এই লক্ষ্যগুলি হচ্ছে : (১) ক্ষুধা থেকে মুক্তি, (২) দীর্ঘ আয়ু প্রত্যাশা, (৩) চিকিৎসা ও হাসপাতালের সেবা পাবার অধিকার এবং (৪) ন্যূনতম শিক্ষা।[১৩]

উন্নত সমাজের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতিবিদ আবু আবদুল্লাহ মোট এগারোটি বিষয়ের প্রস্তাব করেছেন। আবদুল্লাহর প্রস্তাব অনুযায়ী একটি উন্নত সমাজে পৌঁছানোর জন্য দরকার সকল নাগরিকের জন্য যথাসম্ভব কম সময়ে : (১) পর্যাপ্ত পুষ্টিসম্পন্ন খাদ্যের ব্যবস্থা করা, (২) পর্যাপ্ত বাসস্থানের ব্যবস্থা করা, (৩) উপযুক্ত পয়ঃপ্রণালী ও বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করা, (৪) পর্যাপ্ত বস্ত্রের ব্যবস্থা করা, (৫) ন্যূনতম শিক্ষার ব্যবস্থা করা, (৬) স্বাস্থ্য সুবিধার নিশ্চয়তা বিধান, (৭) নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা, (৮) জাতীয় সকল পর্যায়ে জনগণের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা, (৯) পরিবেশ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা, (১০) স্থবিরতাহীন সুশৃঙ্খল পরিবর্তনের ব্যবস্থা করা, (১১) এমন একটি পরিবার কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা যেখানে পারিবারিক ঐক্যের ভিত্তি হবে মানবিক আবেগ, অর্থনৈতিক বা সামাজিক বাধ্যতা নয় এবং পিতৃতান্ত্রিকতার স্থলে সেখানে লিঙ্গভিত্তিক সমতা প্রতিষ্ঠিত হবে।[১৪]

কিছুদিন পূর্বে তৃতীয় বিশ্বের একজন অর্থনীতিবিদ[১৫] Development শব্দটিকে কত রকম অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, তার একটি তালিকা প্রকাশ করেছেন। তালিকাটি নিচের ছকে উপস্থাপন করা হলো। ছকটি দেখলেই বুঝা যায় যে, এ সকল বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ 'উন্নয়ন' সম্পর্কে কি সাংঘাতিক এক বিভ্রান্তির আবর্তে পড়ে রয়েছেন। ছকের সর্বশেষ সংজ্ঞাটি থেকে যে বিষয়টি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় তা হলো, অর্থনীতিবিদরা উন্নয়নের এমন কোন সংজ্ঞা দিতে নারাজ, যাতে তারা তাদের সমাজে

---

১২. এম. এম. আকাশ, 'বাংলাদেশে গণতন্ত্র এবং রাজনৈতিক অর্থনীতির বিবর্তন ও ভবিষ্যত', বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, ১০ খণ্ড, ঢাকা : বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ, ১৯৯৩।

১৩. এ. কে. সেন ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট : সাম স্ট্রাটেজিক ইসুজ, ১৯৮৪ অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, অক্সফোর্ড।

১৪. এম. এম. আকাশ, পূর্বোক্ত।

১৫. ড. আবু মাহমুদ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৭

www.bjilibrary.com

গ্রহণের অযোগ্য হয়ে পড়েন। আর সে কারণেই বোধ হয় 'উন্নয়ন' সংক্রান্ত লেখার সঠিক তাৎপর্য কারোরই মনে একটি সঠিক অর্থ বহন করে না।

ছক : 'উন্নয়ন' শব্দটির বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার

DEFINATION	AUTHOR
1. Sustained increase in per capita income : উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া যার দ্বারা দীর্ঘকাল একটি দেশের মানুষের প্রকৃত মাথাপিছু জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়।	Boldwin & Meir
2. A feature of poverty while growth is a feature of the rich :	Hirschman
3. Expansion of production potential : উন্নয়ন হলো প্রচ্ছন্ন উৎপাদনের একটি প্রসারণ।	Nutter
4. A reaction to the exogenous stimuli : উন্নয়ন হলো বাহ্যিক উদ্দীপনার ফলশ্রুতি।	Schumpeter
5. A stage in the growth process :	Adelmen
6. Structural change plus increase in output : উন্নয়ন হচ্ছে কাঠামোগত পরিবর্তনের সংঙ্গে উৎপাদন বৃদ্ধি।	Kinderberger
7. Widening of choice : উন্নয়ন হচ্ছে জীবন যাত্রার সুযোগ সুবিধার পছন্দগত সম্প্রসারণ।	Bauer & Yamey
8. A change in income distribution :	Morgan
9. Qualitative change vis-a-vis quantitative change or growth :	Flemming
10. Not prove to definition, can only be described & nargebt :	Youtopolous

উৎস : ড. আবু মাহমুদ, উন্নয়ন উচ্ছ্বাস ও তৃতীয় বিশ্ব, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ-১৭

ILO, World Employment Conference (1976) এ সত্তর-এর দশকের মৌলিক চাহিদাতত্ত্বের সঙ্গে আরো কিছু মাত্রা যোগ করে নতুন তত্ত্বের সন্ধান দেন। এই তত্ত্ব Basic Human Need Approace নামে পরিচিত। এই তত্ত্ব অনুসারে মানুষের জন্য খাদ্য ও পুষ্টি, মৌলিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, স্যানিটেশন, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, গৃহায়ন ইত্যাদি সুবিধা সৃষ্টি করাই উন্নয়ন।

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনুস-এর মতে, উন্নয়ন মানে দেশের নিচের অর্ধেকাংশ (অর্থাৎ আয় বিন্যাসে যারা মধ্যম আয়ের নিচে অবস্থান করেন) মানুষের জীবনে অর্থনৈতিক

www.bjilibrary.com

উন্নতি। উন্নয়ন মাপার জন্য ড. ইউনুস যে সূচকের কথা বলেছেন তা হচ্ছে দেশের নিচের অর্ধেকাংশ মানুষের মাথাপিছু আয়। যে কর্মসূচি বা কর্মোদ্যোগ নিচের অর্ধেকাংশ মানুষের মাথাপিছু আয় বাড়াতে সহায়ক হবে তাকেই শুধু উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বলা যাবে। অন্যকথায় উন্নয়ন অর্থ দেশের নিচের অর্ধাংশ মানুষের আয় অথবা সম্পদ বৃদ্ধির প্রক্রিয়া মাপার জন্য যদি কোন সূচক দরকার হয়, তবে আমি নিচের শতকরা পঞ্চাশভাগ মানুষের মাথাপিছু প্রকৃত আয়কে সূচক হিসেবে গ্রহণ করবো, দেশের সকল মানুষের মাথাপিছু প্রকৃত আয়কে নয়।

ড. ইউনুস মনে করেন অর্থনৈতিক দিক থেকে সমাজের সর্বনিম্ন অবস্থানে যারা জীবন যাপন করে তাদের অবস্থার উন্নতি না হলে দেশের সার্বিক উন্নয়ন হয়েছে বলা যায় না। তাঁর মতে ধনী-দরিদ্রের একটা নির্দিষ্ট বিভাজন থাকা দরকার। সমাজের শতকরা ৫০ ভাগ জনগণকে দরিদ্র ধরা যেতে পারে। তিনি মনে করেন উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হলে ৫০ ভাগ জনগোষ্ঠীকে বিবেচনায় আনতে হবে। এই ৫০ ভাগ জনগণের মধ্যে যারা অর্থনৈতিকভাবে নিম্ন অবস্থানে আছে, তাদেরকে টার্গেট ধরে কাজ করতে হবে। সার্বিকভাবে দরিদ্রদের জন্য কোন উন্নয়ন পরিকল্পনা নিলে গরিবদের মধ্যে যারা একটু ভালো অবস্থায় আছে তারাই বেশি লাভবান হয়। সুতরাং উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা নিলে প্রফেসর ইউনুস এর মতে পরিকল্পনা নিতে হবে সমাজের সবচেয়ে নিম্ন অর্থনৈতিক স্তরে অবস্থানকারী জনগণের জন্য অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে।

সাম্প্রতিককালে তথা একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে এসে উন্নয়ন ধারণা আরো সম্প্রসারিত রূপ নিয়ে মানব উন্নয়নে পর্যবসিত হয়েছে। উন্নয়ন বলতে বর্তমানে এমন একটি প্রক্রিয়াকে বুঝায় যা মানুষকে তার পছন্দমতো জীবনযাত্রার সুবিধা ও মান বেছে নেবার সুযোগ বুঝায়– "A process of enlarging peoples' choices"[১৬] প্রকৃত মানব উন্নয়ন স্বাধীনতা – ঘনিষ্ঠ প্রক্রিয়া, যার মধ্যে রয়েছে রাজনৈতিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, সামাজিক স্বাধীনতা, স্বচ্ছতার স্বাধীনতা এবং সার্বিক নিরাপত্তা। কেউ কেউ উন্নয়নকে চেতনায়ন এর সাথে সম্পৃক্ত করে বলেছেন, 'চেতনাই উন্নয়ন'।[১৭]

অতএব উপরোক্ত সংজ্ঞা ও আলোচনার আলোকে বলা যায় যে, জাতির উন্নয়ন হচ্ছে একটি অব্যাহত পরিবর্তন প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি ঘটবে, সঞ্চয় বাড়বে, সম্পদের সুষম বণ্টনের দ্বারা বৃহত্তর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হবে। জনগণের পছন্দমতো জীবনযাত্রার সুযোগ-সুবিধা বাছাই করার ক্ষমতা বাড়বে।

বিশ্বের অধিকাংশ দেশ আজ তাদের নিজস্ব ভূ-খণ্ডে স্বাধীনভাবে বসবাস করছে। আজ তারা স্বাধীনচেতা, গণতন্ত্রমনা। রাজনীতিবিদগণ চান দেশে রাজনীতি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ

---

১৬. Human Development Report, 2003, UNDP

১৭. ড. আবুল বারাকাত, পূর্বোক্ত, পৃ-৪।

www.bjilibrary.com

লাভ করুক। শিল্পপতি, কৃষিবিদ তাদের শিল্পের উন্নয়নের মধ্য দিয়ে দেশকে উন্নত দেখতে চায়। সর্বোপরি মানুষ চায় নিরাপদ সমাজ, শান্তিময় সহাবস্থান। প্রক্রিয়া এবং উপায় ভিন্ন হলেও সবার লক্ষ্য উন্নয়ন। তাই জাতীয় উন্নয়ন বলতে ব্যাপক অর্থে একটি জাতির সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অগ্রগতিকে বুঝায়। বিশ্বের সব দেশ আজ পাল্লা দিয়ে উন্নয়নের দিকে অগ্রসর হচ্ছে তবে সবাই এ কাঙ্ক্ষিত বস্তুটিকে সমভাবে অর্জন করতে পারছে না। কেউ পা পা করে উন্নয়নের দিকে এগুচ্ছে কেউবা উন্নয়নের শৃঙ্গে পৌঁছে গেছে।

উন্নয়নকে সংজ্ঞায়িত করা আসলে কোন সরলরৈখিক কাজ নয়। আগেই বলা হয়েছে উন্নয়নের বহুবিধ-বহুমাত্রিক সংজ্ঞা রয়েছে। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে সংজ্ঞার পরিবর্তনও একটি চলমান প্রক্রিয়া। তাই এ নিয়ে বিতর্কেরও অন্ত নেই । তারপরও জোর দিয়ে বলা যায়, উন্নয়ন একটি সাংবিধানিক এবং ন্যায়ভিত্তিক (Constitutional and justiciable rights)। উন্নয়ন বহুমাত্রিক বিষয়, যার মধ্যে আছে :

১. মানব উন্নয়ন ও মানবিক উন্নয়ন,
২. মানুষের পছন্দের বিস্তৃতি ঘটিয়ে মানুষ নিজের জন্য যে জীবন মূল্যবান মনে করে সেই জীবন যাপন করার সুযোগ বৃদ্ধি,
৩. স্বাধীনতা – মধ্যস্থতাকারী প্রক্রিয়া,
৪. বঞ্চণা থেকে উন্নয়ন,
৫. বাদ পড়াদের অন্তর্ভুক্তিকরন,
৬. দারিদ্র্যের নানান স্বরূপ লক্ষ্য করে কাজ, যেমন যেসব কারণে দারিদ্র্যের সৃষ্টি হয়; আয়ের অভাব, ক্ষুধা, কম মজুরী, বেকারত্ব, অশ্রয়ের অভাব, রাষ্ট্রিয় সম্পদে অভিগম্যতার অভাব (যেমন; খাস জলা-জমি), অস্বাস্থ্য, শিক্ষা বঞ্চণা, পরিবেশ বিপর্যয়, রাজনৈতিক সমতার অভাব, জবাবদিহিতার অভাব, প্রান্তিকায়ন (যেমন, ধর্মীয় সংখ্যালঘু, আদিবাসী জনগোষ্ঠী, বয়োবৃদ্ধ, প্রতিবন্ধি, দরিদ্র নারী, বস্তিবাসী, চরের মানুষ, রিকশা-ভ্যান চালক ইত্যাদি মানুষ) এবং মননের দারিদ্র্য,
৭. বাদ পড়াদের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে পূর্ণ জীবন যাপনের সুযোগ বিস্তৃতি।[১৮]

উন্নয়ন হলো একটি দেশজ প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একটি জাতির আত্মবিকাশ ঘটে এবং জাতি আত্মমর্যাদা লাভ করে। অর্থনীতিবিদ মাইকেল পি টোডারা উন্নয়নের নিম্নলিখিত তিনটি মৌলিক উপাদানের কথা উল্লেখ করেছেন ঃ

উন্নয়ন = আত্ম-জীবিকা নির্বাহ (মৌলিক চাহিদা পূরণের সামর্থ্য) + আত্ম-সম্মান + অধীনতা থেকে মুক্তি।

---

১৮. আবুল বারাকাত, 'চেতনায়নেই উন্নয়ন, বাংলাদেশে নিজেরা করি'র অভিজ্ঞতা' শীর্ষক গবেষণা গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসব উপলক্ষ্যে রচিত পুস্তিকা, পাঠক সমাবেশ ও নিজেরা করি, ৭ অগাস্ট ২০০৮, পৃ-৩।

www.bjilibrary.com

উন্নয়নের ইসলামী ধারণা (Islamic Concept of Development)

সনাতন অর্থনীতিতে উন্নয়ন বলতে মানুষের বস্তুগত উন্নয়নকেই বুঝানো হয়ে থাকে। ইসলামের দৃষ্টিতে উন্নয়ন একটি বহুমাত্রিক ধারণা। ইসলামে উন্নয়ন বলতে শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়নকেই বুঝায় না। এখানে মানুষের সামগ্রিক উন্নয়নকেই বিবেচনা করা হয়।

Islamic concept of development is multidimensional, focusing on the development of man in his total relationship with economic, social, moral and spiritual variables and the natural, physical environment both natural and institutional.

ইসলামে উন্নয়ন হচ্ছে ব্যাপক, সমন্বিত, পরিকল্পিত। তা একাধারে মানুষ, সমাজ ও পরিবেশের সমন্বিত উন্নয়ন। আর্থ-সামাজিক-নৈতিক-আধ্যাত্মিক ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়ন। একই সাথে এ উন্নয়ন দেশের সকল মানুষ এবং সকল অঞ্চলের জন্য। অন্যকথায় এখানে মানুষের সামগ্রিক উন্নয়নকেই বিবেচনা করা হয়। ইসলামে ইহকাল ও পরকালের জীবন উভয়ই গুরুত্বের সাথে বিবেচিত। এজন্য এর উন্নয়ন ধারণাতেও তাই প্রতিফলিত হয়েছে।

ইসলাম অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমস্যা নিয়ে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন, কিন্তু এ সমস্যাকে জীবনের বৃহত্তম সমস্যা অর্থাৎ মানবীয় সমন্বিত উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে আলোচনা করে। ইসলামের প্রধান কাজ হলো মানবিক উন্নয়নকে সঠিক পথ ও দিক নির্দেশনার নিমিত্তে ব্যক্তির মূল্যবোধের ধরন বদলানো এবং তার সামাজিক পরিবেশকে পুনর্গঠন করা। ইসলাম মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের সকল দিককে সমগ্র মানব উন্নয়নের কাঠামোর মধ্যে পর্যালোচনা করে। এ কারণে ইসলামের মূল বিষয় এমনকি অর্থনৈতিক সেক্টরেও এর মূল বিষয় হলো নৈতিক ও সমন্বিত মানবিক উন্নয়ন। কারণ ব্যক্তি ও মানব সমাজের নৈতিক ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অপরিহার্য অংশই হলো অর্থনৈতিক উন্নয়ন।

উপরের আলোচনা থেকে এটি সুস্পষ্ট যে উন্নয়ন সম্পর্কে ইসলামের ধারণা বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে খুবই ব্যাপক যাতে নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও বস্তুগত দিক অন্তর্ভুক্ত। উন্নয়নের বিষয়টি বর্তমানে লক্ষ্য ও মূল্যবোধ সর্বস্ব হয়ে গেছে এবং সকল ক্ষেত্রেই তা মানুষের সমৃদ্ধির জন্য উৎসর্গীকৃত। নৈতিক ও বস্তুতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক ও পার্থিব বিষয়গুলি এখন আর পৃথক করা যায় না। অথচ সমাজের কিছু ব্যক্তি বা কোন বিশেষ দলের সমৃদ্ধি ঘটানোই ইসলামের লক্ষ্য নয় বরং সমাজের মানুষের কল্যাণ সাধনই ইসলামের কাজ। অধিকন্তু শুধু ইহকালের নয় বরং পরকালীন কল্যাণও ইসলামের লক্ষ্য এবং উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। পাশ্চাত্যের সমসাময়িক উন্নয়ন ধারণায় এই দিকটি অনুপস্থিত।

উন্নয়ন প্রচেষ্টার কেন্দ্রবিন্দু এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অন্ত:স্থল হচ্ছে মানুষ। সুতরাং উন্নয়ন

www.bjilibrary.com

অর্থ হলো মানুষের উন্নয়ন-তার মনোভংগি, তার আকাংখা, তার আচরণ, তার জীবন যাপন পদ্ধতি এবং তার ভৌত ও সামাজিক পরিবেশের উন্নয়ন। সমকালীন ধারণা অনুযায়ী উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার মূল কেন্দ্রই হলো ভৌত পরিবেশ যাতে প্রাকৃতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ অন্তর্ভুক্ত। ইসলাম সকল কার্যক্রমের মূল বিন্দু হিসেবে মানুষকেই গুরুত্বারোপ করে, যার কল্যাণই সফলতার পরিমাপক। এর অর্থ হচ্ছে মানুষ যান্ত্রিক অনুভূতি নিয়ে নয়, কাজ করে তার প্রচ্ছন্ন মানবিক শক্তি দিয়ে। কাজেই ইসলামী জীবনাদর্শের বাস্তবায়নে ভেতর ও বাইরের পরিবর্তনটা প্রাসঙ্গিক।[১৯] তাই ইসলামের উন্নয়ন নীতি সংক্রান্ত কৌশল পত্রের জন্য যতটা প্রয়োজন ভৌত সম্পদ, মূলধন, শ্রমশক্তি, শিক্ষা, দক্ষতা ও সংগঠন ঠিক ততটাই প্রয়োজন মানুষের আদর্শ, মনোভংগি, রুচি, অভিপ্রায় ও আকাংখা। এভাবে ইসলাম একদিকে তার প্রচেষ্টার দৃষ্টিকে ভৌত পরিবেশ থেকে আর্থ-সামাজিক সেটিং এর মধ্য দিয়ে মানুষের দিকে স্থাপন করে, অন্যদিকে অর্থনীতির যে কোন মডেলের মধ্যে তার লক্ষ্য ও কৌশলের চলকগুলোর সম্প্রসারণের ফলস্বরূপ উন্নয়ন নীতির সুযোগ সমূহকে সম্প্রসারিত করে। এই স্থানান্তরের জোরাল প্রভাব হচ্ছে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায়। জনগণের সর্বোচ্চ অংশগ্রহণ এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত করে তা বাস্তবায়ন।

ইসলামে সকল মনোযোগ ফোকাস করা হয় মানুষের উপর। মানুষের মৌল প্রয়োজন আগে পূরণ করতে হবে তারপর অন্য কিছু। মৌল প্রয়োজনের (Basic needs) গতানুগতিক ধারণা থেকে এ ধারণা পৃথক ও বিস্তৃত। ইমাম শাতিবী (রহ) তাঁর বিখ্যাত "আল মুয়াফাকাত" গ্রন্থে এবং ইমাম গাযালী (রহ) তাঁর বিখ্যাত "আল মুসতাসফা" গ্রন্থে মানুষের জরুরীয়াত (Basic needs) গুলোকে চিহ্নিত করেছেন। এগুলো হচ্ছে : ১. দীন/আকীদা, ২. নফস, ৩. নসল (পরিবার গঠন), ৪. মাল (ধন-সম্পদ), ৫. আকল, ৬. হুররিয়াত (স্বাধীনতা)। ইমাম গাযালী (রহ) নফস-জান-প্রাণ রক্ষা পর্যায়ে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, যানবাহন, পরিবেশ, অবসর, কর্মসংস্থান ইত্যাদিকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

তাই ইসলামের দৃষ্টিতে উন্নয়ন নেক মানুষ চালিত একটি প্রক্রিয়া যা দেশের সর্বস্তরের জনগণের মৌলিক প্রয়োজন/জরুরীয়াত পূরণের নিশ্চয়তা বিধানসহ দেশের সার্বিক অগ্রগতিতে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করবে। সংজ্ঞাটি তিনটি বিষয় সুস্পষ্ট করে। বিষয়গুলো হলো :

১. সর্বস্তরের জনগণের জরুরীয়াত পূরণ।

২. দেশের সার্বিক অগ্রগতিতে বলিষ্ঠ ভূমিকা।

৩. নেক মানুষ চালিত একটি প্রক্রিয়া।

---

১৯. 'আল্লাহ, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা তাদের নিজেদের গুণাবলী ও অবস্থার পরিবর্তন করে' (১৩ : সূরা আর রাদ : ১১)।

www.bjilibrary.com

গতানুগতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নসল বা পরিবার গঠনকে তেমন গুরুত্বই দেয়া হয় না। পরিবার বহির্ভূত হয়েও/বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হয়েও একত্রে থাকা, সন্তান ধারণ পাশ্চাত্য ব্যবস্থায় অন্যায় কিছু নয়। অথচ ইসলাম পরিবার গঠনকে জরুরীয়াত বলেছে, বিবাহ না করাকে সমর্থন করেনি এবং পরিবারকে দুর্বল করে/ধ্বংস করে এমন কাজকে কঠোরভাবে দমন করেছে। অথচ পাশ্চাত্য উন্নয়ন মডেলে কর্মরত সেকুল্যার এনজিও চক্র অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে নারীদেরকে অর্থ দিয়ে রাস্তায় নামিয়ে চিকনাই সমৃদ্ধ খোলা শরীর দেখিয়ে শ্লোগানের কসরত করেছে- নারী নারী নারী, সবই করতে পারি; আমার শরীর আমার না, এমন কথা মানব না; একটি কথা সোজাসুজি, নিজের শরীর নিজে বুঝি; আমার শরীর আমার মন, তথায় কেন আরেক জন; শরীর আমার সিদ্ধান্ত আমার; কিসের ঘর কিসের বর ইত্যাদি। উন্নয়নের এ আজব নমুনা দেখলেই ইসলামী উন্নয়ন ধারণার বিষয়টি নিয়ে না ভেবে পারা যায় না।

সংজ্ঞাটির মর্মার্থ অনুযায়ী জরুরীয়াত পূরণের ক্ষেত্রে বিশেষ কোন জনগোষ্ঠীর কথা নয় বরং সর্বস্তরের জনগণের কথা বিবেচনায় আনা হয়েছে। অন্য কথায় জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর সকল অঞ্চলের মানুষের কথা বলা হয়েছে। এখানে যে বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তা হচ্ছে সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধ। আল্লাহ বলেন : যাবতীয় সম্পদ যেন কেবল তোমাদের ধনীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়।[২০] তবে স্মরণ রাখতে হবে, সর্বস্তরের জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে "সবার আয় সমান হবে" এমনটি বুঝায় না। যেমন আল্লাহ বলেন, জীবনোপকরণের ক্ষেত্রে তোমাদের একজনকে অন্যজনের চাইতে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে।[২১] এ থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, ধনী-দরিদ্রের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য থাকতে পারে, কিন্তু তা হতে পারে জরুরীয়াত পূরণের পরের স্তরে, আগের স্তরে নয়।

উন্নয়নের ইসলামী মডেল দেশের সার্বিক অগ্রগতিতে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করবে। দেশের অর্থনীতির সকল খাতের উপর পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও ভারসাম্য বজায় রাখার মাধ্যমেই এ সার্বিক অগ্রগতি সাধিত হবে। সর্বশেষে সংজ্ঞাটিতে উন্নয়নকে নেক মানুষ/ইসলামিক মানুষ (Islamic Man) চালিত একটি প্রক্রিয়া হিসাবে চিত্রায়িত করা হয়েছে। ইসলামী উন্নয়ন তত্ত্বে মানুষকে সবচাইতে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয় এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় কর্মরত মানুষকে 'নেক মানুষ' হিসেবে গণ্য করা যায়। নেক মানুষের কতকগুলো গুণ থাকতে হবে। যেমন-

১. তাকে শিক্ষিত ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হতে হবে।

২. তাকে উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হতে হবে।

৩. তাকে উদ্যমী হতে হবে।

---

২০. ৫৯ : সূরা আল হাশর-৭

২১. ৭৩ : সূরা আন নাহল : ৭১

www.bjilibrary.com

তার থাকবে সাহস, আত্মবিশ্বাস, সাফল্যের তীব্র আকাংখা, কঠোর পরিশ্রমের মানসিকতা, অধ্যবসায়, গতিশীলতা ইত্যাদি। সম্ভাব্য সব রকমের কর্মকাণ্ডে তাকে উদ্যোগী ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

সমাজের সকল মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করা

সমাজের সকল মানুষের জরুরীয়াত বা মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করা এবং সবার জন্য আয় উপার্জনের সম্মানজনক ব্যবস্থা করা ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং-এর অন্যতম উদ্দেশ্য। ন্যূনতম মৌলিক প্রয়োজন পূরণের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে যেন দরিদ্র ও অভাবীরা উৎপাদনক্ষম হতে পারে এবং তারা নিজেদের চেষ্টায় ন্যূনতম জীবন যাপনের মান অর্জনে সক্ষম হয়। ইমাম শাতিবী (রহ)[২২] ও ইমাম গাযালী (রহ)[২৩] মানুষের মৌলিক প্রয়োজনগুলোকে তিনটি ক্রমিক স্তরে বিন্যস্ত করেছেন। এগুলো হচ্ছে :

১. জরুরীয়াত/Zaruriat-(Basic Needs/Necessities)- আবশ্যকীয়- যা একান্তই অপরিহার্য, যা না হলে মানুষের চলেই না, বস্তু জগতের সামগ্রিক অগ্রগতিতে যা একান্তই অপরিহার্য।

২. হাজিয়াত/ Hajiat-(Requirement/Comforts)- প্রয়োজনীয়- যা মানুষের জীবনকে সহজ ও আরামদায়ক করে এবং কষ্ট ও ক্ষতি থেকে রক্ষা করে।

৩. তাহসিনিয়াত (Beautification)- সৌন্দর্যবর্ধক- যা মানবজীবনকে সুন্দর, পরিপাটি ও কল্যাণময় করে।

তাঁদের মতে জরুরীয়াত বা মৌলিক প্রয়োজন হচ্ছে ৬টি। যেমন-

১. দীন/আকীদা/Protection of faith, Deen, Ideology : ঈমান, দীন, আদর্শ।

২. নফস/Nafs (Life itself/Protection of life) : ত্বয়ামুন-খাদ্য, লিবাসুন-বস্ত্র, মাকানুন-বাসস্থান, মুয়ালিয-চিকিৎসা, নাক্বলুন-পরিবহন, মুহিতুন-পরিবেশ, ইসতিরাহাতুন-বিশ্রাম, অবসর, বিশুদ্ধ পানীয়, যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ পাওয়া, শান্তি-স্বস্তি-নিরাপত্তা ইত্যাদি সব মানুষের জীবন ধারনের সাথে সম্পৃক্ত।

৩. নসল/Nasl/Family formation/Protection of Posterity: পরিবার গঠনের ক্ষমতা, বংশধারা সংরক্ষণ করা।

৪. আকল/Aql-Intellect/Reason : শিক্ষা, বুদ্ধিমত্তা।

৫. মাল/Mal (Property, Wealth) : ন্যূনতম পরিমাণ সম্পদ থাকা এবং তা সংরক্ষণ করা।

৬. হুররিয়াত/Hurriat/Freedom : স্বাধীনতা।

---

২২. ইমাম শাতিবী, Al Muwafaqat Fi Usul al Shariah, Vol-2, P.177.

২৩. আল গাযালী, আল মুসতাসফা (১৯৩৭) প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৩৯-৪০।

www.bjilibrary.com

অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ইসলাম বিভিন্নমুখী কার্যক্রম হিসেবে বিবেচনা করে। এর জন্য একই সাথে বিভিন্ন দিকে প্রচেষ্টা চালাতে হয়। কোন একটি উপাদানের উপর কাজ করার এবং সঠিকভাবে ঐ উপাদানের উপর মনোনিবেশ করার পদ্ধতি ফলপ্রসূ হবে না। ইসলাম উন্নয়নের সকল উপাদান ও শক্তির মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়, যাতে সব উপাদানই একযোগে সচল ও কার্যে লিপ্ত হয়। বিভিন্ন উপাদান ও শক্তির মধ্যে ভারসাম্য ও সমতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেও এটা প্রয়োজন।[২৪]

সামাজিক জীবনের গতিময় মৌলনীতি সম্পর্কে ইসলাম বিশেষভাবে দুটি বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে। যেমন-

১. আল্লাহ মানুষকে যে সম্পদের অধিকারী করেছেন সেই সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার।
২. সকল মানবীয় সম্পর্কের মধ্যে ন্যায়বিচার বৃদ্ধির লক্ষ্যে সম্পদের সুষম বণ্টন ও ব্যবহার।

ইসলাম শোকর (আল্লাহর রহমতের প্রতি কৃতজ্ঞতা) ও আদল (ন্যায় বিচার) এর পক্ষে এবং কুফর (আল্লাহ ও তার রাহমাতকে অস্বীকার করা) ও যুল্‌ম (অন্যায্যতা) এর বিপক্ষে অবস্থান করে। এই বিশ্লেষণের আলোকেই শোকর ও আদল বাস্তবায়ন এবং কুফর ও যুল্‌ম মূলোৎপাটনের মধ্য দিয়ে উন্নয়ন প্রক্রিয়া কার্যে পরিণত ও সমাবেশিত হয়। এভাবেই ইসলামী উন্নয়ন প্রচেষ্টায় শোকর শক্তিশালী করণ ও আদল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজ থেকে কুফর ও যুল্‌ম নির্মূল করা সম্ভব হবে।

মোটকথা উন্নয়ন হচ্ছে ব্যক্তির নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও পার্থিব উন্নয়ন এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজের সর্বোচ্চ আর্থ-সামাজিক কল্যাণ সাধন, ইহকাল ও পরকালে মানবজাতি যার ফলাফল ভোগ করতে পারবে।

পাশ্চাত্য আদলে গৃহীত উন্নয়ন মডেলে মুসলিম বিশ্বের মোহমুক্তি

পাশ্চাত্য মডেলে তৈরি করা সমস্ত উন্নয়ন প্রচেষ্টা ও গৃহীত উন্নয়ন কৌশলে মুসলিমরা বর্তমানে অসন্তুষ্ট। উন্নয়ন সমৃদ্ধির যে দর্শন, যা পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও এর ধর্ম বিষয়ক উদারনীতির চারিত্রিক গঠনে গড়া, যার অনৈতিক বৈশিষ্ট্যের জন্য মুসলিমরা অনেকটাই বিরক্ত। পাশ্চাত্য উন্নয়ন কৌশলের পরিপূর্ণ বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিভংগি ইসলামী জীবন ব্যবস্থা এবং ঐতিহাসিক পরম্পরায় মুসলিম জনগোষ্ঠীর সম্পূর্ণ বিরোধী। ইসলাম আসলে মানব সমাজকে পরিবর্তন করতে চায় এবং সম্পূর্ণ ন্যায়বিচার ও ন্যায্য ব্যবহারের মূলনীতির ভিত্তিতে এর আর্থ-সামাজিক জীবনকে পুনর্গঠন করতে চায়। ইসলাম মানবিক ও বস্তুতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে একত্রে সংযুক্ত করে জীবন ও জীবনের সকল সমস্যার এক ও অখণ্ড ধরন অনুসন্ধান করে। যে কোন দৃষ্টিভঙ্গী, যা জীবনকে ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্ম এই দুই আকৃতিতে বিভক্ত করে যা ইসলামের জন্য অভিসম্পাত।[২৫]

---

২৪. প্রফেসর ডঃ খুরশিদ আহমদ, উন্নয়ন ও ইসলাম, মাসুমা বেগম অনূদিত, বিআইআইটি, ২০০৭, পৃ-১৯

২৫. প্রফেসর ডঃ খুরশিদ আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃ-১২.

www.bjilibrary.com

মুসলিমরা পাশ্চাত্য মডেলের উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে মুসলিম দেশসমূহের জন্য সাংস্কৃতিক সম্রাজ্যবাদের একটি অদ্ভুত প্রচেষ্টা হিসাবে বিবেচনা করছে। পাশ্চাত্য মডেলের উন্নয়ন কৌশলের ব্যাপারে মুসলিম চিন্তাবিদদের আপত্তিসমূহ নিম্নরূপ :

১. **মুসলিম সমাজে অনুকরণ প্রবণ মানসিকতা বৃদ্ধি :** বস্তুতান্ত্রিক সমৃদ্ধির জন্য পাশ্চাত্য অনুপ্রাণিত উন্নয়ন কৌশল মুসলিম সমাজে অনুকরণপ্রবণ মানসিকতা বৃদ্ধি করেছে, যা সৃজনশীলতা ও মৌলিকত্বকে ধ্বংস করার জন্য যথেষ্ট। এটা সমাজে শুধুমাত্র নৈতিক মূল্যবোধ নষ্ট হয়ে যাওয়ার ধারাকে বৃদ্ধি করেনি বরং মুসলিম বিশ্বে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির কর্তৃত্বকে চিরস্থায়ী করেছে।

২. **বিভেদ সৃষ্টি :** পাশ্চাত্য উন্নয়ন কৌশলের সুবিন্যস্ত কার্যপদ্ধতি মুসলিম বিশ্বে ব্যাপক বিভেদের কারণ হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে। যেমন- আধুনিক-গতানুগতিক, উদার ও রক্ষণশীল, শহুরে ও গ্রামীণ, ধনী ও দরিদ্র ইত্যাদি। এটি উপনিবেশিক ঐতিহ্যকে দীর্ঘস্থায়ী করেছে ও ভোগবাদকে উৎসাহিত করেছে যা আধুনিক অবস্থা থেকে পুরো সমাজকে বিচ্ছিন্ন করেছে এবং পাশ্চাত্য বিশ্বের পরিপূরক অংশের সাথে সংযুক্ত করেছে। পাশ্চাত্য উন্নয়ন কৌশলের অনুসৃতি মুসলিম দেশসমূহের বিশেষ সুবিধাগ্রস্ত মুসলিম শ্রেণীকে আরো সমৃদ্ধ করেছে এবং সাধারণ জনসাধারণকে করেছে আরো দুর্বল। শুধু তাই নয় এটা অর্থনৈতিক ও সামাজিক দ্বৈততা এবং সমাজে নতুন অস্থিরতা ও বিরোধের জন্ম দিয়েছে।

৩. **অপচয়-অপব্যয় :** পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পুরো প্রক্রিয়াই ইসরাফ (অপচয়-over use) তাবজীর ((অপব্যয়-Misuse) প্রবণতা পুষ্ট এবং খুবই ব্যয় সাপেক্ষ। অর্থনীতির প্রকৃত প্রযুক্তিগত সামর্থের প্রসার ঘটাতে আমদানি বিকল্পায়ন কৌশল ব্যর্থ হয়েছে, যদিও এটা বিরাট জনগোষ্ঠীকে নতুন বিলাসিতা ও এমন জীবন যাপনের প্রতি মোহগ্রস্ত করে তুলেছে, যার যোগান দেয়ার সামর্থ মুসলিম সমাজের নেই এবং যা উচিতও নয়। মুসলিম দেশসমূহে একটি উচ্চ ভোগবাদী গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছে, যেখানে ভোগ করার মত সম্পদের যথেষ্ট অভাব রয়েছে।

৪. **আত্মস্বার্থ প্রণোদিত ভোগসুখবাদী আচরণ সৃষ্টি হয়েছে :** মুসলিম দেশসমূহে এক ধরনের আত্মস্বার্থ প্রণোদিত বস্তুতান্ত্রিক ভোগসুখবাদী আচরণের দিকে মানুষের মনোভাব পরিবর্তিত হয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে শক্তিশালী করার চেয়ে ব্যক্তিগত ভোগবিলাস অগ্রাধিকার পাচ্ছে। অত্যধিক লোভ ও দুর্নীতি দ্বারা অনেকের কুৎসিত মস্তিষ্কগুলো পরিপূর্ণ হয়েছে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের এ ধরনের অনুকরণমূলক ও সম্পূর্ণ বস্তুতান্ত্রিক কৌশল ইসলামের দৃষ্টিতে অপ্রীতিকর। ইসলাম কোন সীমাবদ্ধ ধর্ম মাত্র নয় বরং ইসলামের নিজস্ব আর্থ-সামাজিক কাঠামো রয়েছে। আছে এক গুচ্ছ নীতিমালা ও নৈতিক মূল্যবোধ। উন্নয়নের

www.bjilibrary.com

নামে পাশ্চাত্য মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি স্থানান্তরের প্রচেষ্টা ইসলামী উম্মাহর কাছে counter productive হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের পরীক্ষা-নিরীক্ষা মুসলিম উম্মাহর কেবল প্রান্তিক অংশকেই স্পর্শ করতে পেরেছে, মুসলিম উম্মাহর মূলস্রোতধারাকে স্পর্শ করতে পারেনি।

অধিকন্তু, অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর যে অবস্থায়, উন্নয়ন প্রচেষ্টা পাশ্চাত্যে স্থান করে নিয়েছিল এবং সমসাময়িক যে অবস্থায় মুসলিম দেশসমূহে সেসব চালু হয়েছিল তা ছিল খুবই কঠিন সময়ে। এটা ধারণা করা সহজাত যে, ইতিহাসের কোন এক মুহূর্তে পাশ্চাত্যে যা ঘটেছে তা সমভাবে মুসলিম উম্মাহর মধ্যেও ঘটানো হয়েছে। কিন্তু এটিও সত্যি, পাশ্চাত্যের উন্নয়ন-আধুনিকায়ন দর্শনের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যে অনেক প্রতিক্রিয়া হয়েছে বিশেষত: নতুন প্রজন্মের কাছে।[২৬] এই দৃশ্যপট বদলে গেছে, আজকের মুসলিমগণ বিশেষত যুব সমাজ, পাশ্চাত্য কর্তৃত্বের উন্নয়ন কৌশল ও দর্শনের কাছে নিজেদের বিকিয়ে দিতে চায় না। মুসলিম মন ও চেতনা নতুন উন্নয়ন কৌশল উদ্ভাবনের জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে।

একটি মুসলিম দেশের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন কৌশল

একটি মুসলিম দেশের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন নীতির সাধারণ লক্ষ্যসমূহ নির্ধারণ এবং মুসলিম নাগরিকদের উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য কিছু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করা যেতে পারে। যেমন-

১. মানব সম্পদ উন্নয়ন (Human Resource Development)

একটি মুসলিম দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার এক নম্বর উদ্দেশ্য হবে মানব সম্পদ উন্নয়ন। একটি মুসলিম জনমানুষের মনোভংগি (Attitudes) ও আকাঙ্ক্ষা (aspirations) পুন:পুন: সংশোধন, ব্যক্তিত্ব ও চারিত্রিক উন্নয়ন, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, বিভিন্ন কাজের জন্য দক্ষতা অর্জন, জ্ঞান-গবেষণার উন্নতি, মূল উন্নয়ন কার্যক্রম ও সকল প্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় (Decision making process) সাধারণ জনগণের দায়িত্বশীল এবং সক্রিয় ও সৃষ্টিধর্মী অংশগ্রহণের (Proactive and creative participation) জন্য পদ্ধতি উদ্ভাবন এবং সর্বোপরি উন্নয়নের ফলভোগ অংশীদারিত্বের বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে। এটি শিক্ষার সম্প্রসারণ ও ইসলামীকরণ (Islamization), জনগণের সার্বিক নৈতিক প্রশিক্ষণ ও সহযোগিতা, অংশীদারিত্ব ও সহমর্মিতার ভিত্তিতে উদ্ভাবিত সম্পর্কের নতুন কাঠামোর গুরুত্বারোপের দাবি করে। মানব-সম্পদ সমাবেশকরণ ও পুন:পুন: আত্মত্যাগের উৎসাহ অর্জনের জন্য অবশ্য সুউচ্চ দক্ষতা সম্পন্ন কলা-কৌশল অপরিহার্য।

---

২৬. Paul Streeton, Alternatives in Development in World Development, vol.2, No-2l, February 1974, p-6.

www.bjilibrary.com

২. প্রয়োজনীয় উৎপাদন সম্প্রসারণ (Expansion of useful production)

একটি মুসলিম দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হবে নিয়মিত ও স্থায়িত্বশীল জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি। মুসলিম দেশের উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণকারীদের দুটি বিষয় নিয়ে ভাবতে হবে, একদিকে প্রয়োজনীয় পরিমাণ ও দক্ষতাপূর্ণ উৎপাদন এবং অন্যদিকে সঠিক উৎপাদন মিশ্রণ অর্জন নিয়ে। ইসলামী উন্নয়ন কাঠামোতে উৎপাদনের অর্থ, যে কোন ধরনের উৎপাদনকে বুঝায় না, যার চাহিদা আছে এবং যা শুধু বিত্তবানরা ক্রয় করতে সমর্থ এবং উৎপাদন হবে ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে এবং মানবজাতির সাধারণ প্রয়োজনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। ইসলামী অর্থনীতিতে হালাল (অনুমোদিত) এবং হারাম (অননুমোদিত) স্পষ্টভাবে বর্ণিত এবং এর সীমারেখা নির্ধারিত, যার মধ্যেই উৎপাদন ভোগের মিশ্রণ পরিকল্পনা করা হয়। যে সকল পণ্যের ব্যবহার ইসলামে নিষিদ্ধ, তা উৎপাদনেও অনুৎসাহিত এবং যে সকল পণ্য জীবন-ধারণের জন্য অপরিহার্য তা উৎপাদনে গুরুত্বারোপ এবং সবাইকে উৎসাহিত করতে হবে। এই নীতির আলোকে উৎপাদন ও বিনিয়োগ ব্যবস্থা সংগঠিত করতে হবে। ইসলামের অগ্রাধিকার ইসলামী উম্মাহর প্রয়োজনের ভিত্তিতে। কুরআন বলছে, 'বলে দিন, অপবিত্র ও পবিত্র সব জিনিস সমান নয়, যদিও অপবিত্রের জৌলুস তোমাদের বিস্মিত করে' (সূরা আল মায়িদা ঃ ১০০)। ইসলামী উম্মাহর প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে তিনটি অগ্রাধিকারের বিষয় হচ্ছে–

ক) প্রচুর ও সর্বাধিক উৎপাদন (Optimum Level of Production) এবং যুক্তি সংগত সস্তা দামে খাদ্য, রাস্তাঘাট ও বাড়ি নির্মাণ সামগ্রীসহ ন্যায্যমূল্যে সকল প্রয়োজনীয় উৎপাদন সামগ্রীর পর্যাপ্ত উৎপাদন ও যোগান দান।

খ) মুসলিম দেশ ও মুসলিম বিশ্বের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ়করণ এবং এ সম্পর্কিত উৎপাদন।

গ) ভারী যন্ত্রাংশ ও যৌথ মূলধন সামগ্রীর স্বয়ংসম্পূর্ণ পরিমাণ উৎপাদন। অন্যকথায় মূলধনী পণ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন।

৩. মুসলিম দেশের নাগরিকদের জীবনের গুণগত দিকের উন্নতি (Improvement of the quality of life of the citizens of a Muslim country)

একটি মুসলিম দেশের অর্থনৈতিক নীতিনির্ধারকদেরকে শুধু মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের কিছু চলকের দিকে নজর না দিয়ে জনগণের নৈতিক ও উন্নত সামাজিক জীবনমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এ জন্য যে সব বিষয়ে অগ্রাধিকার দিতে হবে তা নিম্নরূপ–

ক) নৈতিক উন্নয়ন, গুণগত শিক্ষা এবং সর্বোচ্চ নিরাপত্তা, সম্মান ও সম্পদসহ সামাজিক মিথস্ক্রিয়া।

খ) পর্যায়ক্রমিক গঠনগত, প্রযুক্তিগত ও শিক্ষাগত সমন্বয়সাধনসহ কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

www.bjilibrary.com

গ) সমাজে যারা সুবিধাজনক কর্মসংস্থান যোগাড় করতে পারেনি অথবা যারা সামাজিক সহযোগিতা পাওয়ার উপযুক্ত তাদের জন্য জীবনের মৌলিক চাহিদাসহ একটি দক্ষ ও সমন্বিত সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা (Social security System) গড়ে তুলতে হবে। যাকাত এবং ইসলামের অন্যান্য ট্রান্সফার/ গ্রান্ট ম্যাকানিজম সমূহ এক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করতে পারে।

ঘ) আয় ও সম্পদের সুষম বণ্টন : এর মানে হচ্ছে নিম্ন আয় শ্রেণীর জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধি, বঞ্চনা দূরীকরণ ও দারিদ্র্য বিমোচনের প্রতি অগ্রাধিকার প্রদান, সমাজে সম্পদ সমাবেশ করণ এবং অসমতা-বৈষম্যের মাত্রা হ্রাস। সমাজের সকল পর্যায়ে সম্পদ ও ক্ষমতার প্রসারণের লক্ষ্যে মুসলিম দেশে অবশ্যই একটি সক্রিয় অংশ ও মজুরী নীতিমালা (Active Income and Wage Policy) প্রণয়ন করতে হবে। সুনির্দিষ্ট পরিমাণে সার্বিক দারিদ্র্য বা প্রকট দারিদ্র্য (Absolute Poverty) কমানোর পদক্ষেপ নিতে হবে। এসব লক্ষ্য হাসিলের জন্য কর ব্যবস্থা (Tax System) পুনর্গঠন করতে হবে।

ঙ. স্বল্প আয়ের লোকদের জন্য কম মূল্যের বাসস্থানের নিশ্চয়তা দিতে হবে।

চ. সহজ যাতায়াত ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

ছ. শিক্ষা ও কারিগরী শিক্ষার (Vocational Training) প্রতি অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং গবেষণা ও উদ্ভাবনের দিকে মনোনিবেশ করতে হবে।

৪. ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়ন (Balanced Development)

ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়ন কৌশলের উৎস আল কুরআন। আল্লাহ বলেন, 'আমি ভূ-পৃষ্ঠকে বিস্তৃত করেছি এবং তার উপর পর্বতমালা স্থাপন করেছি এবং তাতে প্রত্যেকটি বস্তু সুপরিমিতভাবে উৎপন্ন করেছি।'[২৭] এই কৌশল দেশের অর্থনীতির ও সমাজের বিভিন্ন খাতের এবং দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন এলাকার সুষম ও সমন্বয়ধর্মী উন্নয়নকেই নির্দেশ করে। ন্যায়-নীতির দাবীই হলো অর্থনীতির বিকেন্দ্রায়ন এবং দেশের সকল এলাকার ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়ন। দেশের সার্বিক ও দ্রুত উন্নয়নের স্বার্থে এটা অপরিহার্যও বটে। একটি মুসলিম দেশের বিভিন্ন অঞ্চল, প্রদেশ ও বিভাগের মধ্যে সম ও সমন্বিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিকেন্দ্রীকরণ, বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন, দেশের বিভিন্ন অংশ ও বিভাগের মধ্যে যথাযথ উন্নয়ন চাহিদা পরিপূরণ শুধু ন্যায়-ইনসাফের স্বার্থেই নয়, দেশের সর্বোচ্চ সমৃদ্ধির জন্যও প্রয়োজন। এটি একটি মুসলিম দেশের ভেতরে বৃহত্তর সমন্বয় সাধন এবং অর্থনৈতিক দ্বৈতনীতির প্রতিকার হিসাবেও কাজ করবে; যার জন্য বেশির ভাগ মুসলিম দেশ রাজনৈতিক অস্থিরতা মুকাবিলা করছে।

ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়নের এটি এমন একটি ক্ষেত্র, যার সাথে যথোপযুক্ত পরিবর্তনের ঐসব চলকগুলো সমন্বয় করতে প্রচুর মূলনীতি, অর্থনৈতিক কৌশল, ইনপুট আউটপুট

২৭. ১৫ : সূরা আল হিজর : ১৯।

www.bjilibrary.com

পদ্ধতি ব্যবহারের দাবি করবে যা ইসলামী আর্থ-সামাজিক কাঠামো উন্নয়নের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। এই কৌশল বাস্তবায়িত হলে মুসলিম দেশ যে অর্থনৈতিক দ্বৈততার শিকার তা দূর হবে, দেশের বিভিন্ন অঞ্চল, জনগোষ্ঠী, জাতিসত্তার সাথে অধিকতর সমঝোতা ও সমন্বয়ের পথ প্রশস্ত হবে।

৫. নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার (Use of new technology)

নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার অর্থ একটি মুসলিম দেশের কাঙ্ক্ষিত (aspiration), প্রয়োজনীয় ও মানানসই দেশীয় প্রযুক্তি (Indigenous technology) উদ্ভাবন করতে হবে। একটি মুসলিম দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়া তখনই স্থায়ী হবে যখন এ দেশ শুধু বৈদেশিক সাহায্যের (Foreign Aid) উপর নির্ভরশীল হবে না বরং বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে প্রযুক্তির সমৃদ্ধি ঘটবে, মুসলিম দেশ প্রযুক্তিগত সৃজনশীলতার পদ্ধতিকে আত্মস্থ করতে সমর্থ হবে এবং নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন শুরু হবে, যা মুসলিমদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের পরিচয় বহন করবে। এর জন্য গবেষণাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার এবং সময়ের চ্যালেঞ্জ মুকাবিলার জন্য নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে।

৬. বিদেশের উপর নির্ভরশীলতা কমানো এবং মুসলিম বিশ্বের সাথে বৃহত্তর সমন্বয় সাধন (Reduction of foreign dependence and wider coordination with the Muslim World)

এটি একটি মুসলিম দেশের জন্য এবং একই সাথে মুসলিম উম্মাহর জন্য এত বেশি প্রয়োজনীয় যে, এটা অমুসলিম বিশ্বের উপর মুসলিম বিশ্বের সকল ধরনের নির্ভরশীলতাকে পরিবর্তন করে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা, অত্মসম্মান, পর্যায়ক্রমিকভাবে শক্তি ও ক্ষমতা তৈরির পর্যায়ে নিয়ে যাবে।[২৮] নিজদেশ সহ গোটা মুসলিম বিশ্বের স্বাধীনতা বজায় রাখা এবং ইসলামী উম্মাহর শান্তি ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি দক্ষ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ো তোলা, একটি মুসলিম দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনায় অবশ্যই প্রাধান্য পেতে হবে।

কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের জন্য আত্মনির্ভরশীলতার কৌশল

প্রতিটি মুসলিম রাষ্ট্র এবং সামগ্রিকভাবে মুসলিম জাতির আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন করা দরকার। আত্মনির্ভরশীলতার অর্থ প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রাকৃতিক উপায়-উপকরণ বণ্টন ও যোগ্যতার বহুমুখী ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যহীন স্বয়ংসম্পূর্ণতা নয়। আর আত্মনির্ভরশীলতার অর্থ দুনিয়া বিমুখ হওয়া এবং বাণিজ্য, জীবনোপকরণ, অর্থনীতি, সংস্কৃতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করাও নয়। আত্মনির্ভরশীলতার

---

২৮. তাদের (সাথে যুদ্ধের) জন্য তোমরা যথাসাধ্য সাজ-সরঞ্জাম, শক্তি ও ঘোড়া প্রস্তুত রাখবে এবং এ দিয়ে, তোমরা আল্লাহর দুশমন ও তোমাদের দুশমনদের ভীত-সন্ত্রস্ত করে দেবে এবং অন্য এমন সব শত্রুদেরকে যাদেরকে তোমরা চেননা। (৮ : সূরা আল আনফাল : ৬০)

www.bjilibrary.com

প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, একটি জাতি তার বুনিয়াদি, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সিদ্ধান্ত কোন চাপের ও নিরূপায় অবস্থার মুখে নয় বরং নিজেদের চিন্তাধারা, মূল্যবোধ, নীতিমালা ও ন্যায়ানুগ স্বার্থের ভিত্তিতে গ্রহণ করবে এবং নিজের ভেতর এমন চৈন্তিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি রাখবে যার দরুন অন্যরা তার সিদ্ধান্তসমূহের উপর অবৈধ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। পরিস্থিতি আমাদেরকে এ স্থানে নিয়ে এসেছে যে, মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে অর্থনৈতিক, ধনগত, শিক্ষাগত, বৈজ্ঞানিক, সামরিক মোটকথা এ সমুদয় ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমন্বয়ের (Co-operation & Co-ordination) মাধ্যমে শুরু করে একতা, অবিচ্ছেদ্যতা ও আত্মনির্ভরশীলতার দিকে যাত্রা করতে হবে। এক কথায় আত্মনির্ভরশীলতা বলতে আত্মবিশ্বাস, স্বশাসিত গন্তব্য স্থাপনের (Autonomous goal settings) সামর্থ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা এবং আমন্ত্রিত ও আরোপিত সব ধরনের নির্ভরশীলতা প্রত্যাখ্যান করাকে বুঝায়। আত্মনির্ভরশীল উন্নয়ন কৌশলের মধ্যে এটি অবশ্যই থাকতে হবে যে, অনুদান ভিত্তিক উন্নয়নের বর্তমান অভ্যাস (aid based development practice) থেকে মুসলিম দেশকে বেরিয়ে আসতে হবে। এ প্রসঙ্গে প্রফেসর ড. খুরশিদ আহমদ বলেছেন, বিদেশী সাহায্য ও অনুদানের সাময়িক স্থগিতকরণ মুসলিম দেশের জন্য আশীর্বাদ ছাড়া অন্য কিছু বয়ে আনবে না। এটি স্বীকৃত সত্য যে বিগত পাঁচ দশকে বিদেশী সাহায্য ভিত্তিক উন্নয়ন প্রচেষ্টা আশানুরূপ ফল দিতে ব্যর্থ হয়েছে। বিজ্ঞানসম্মত ও অত্যন্ত নিখুঁতভাবে এটি মূল্যায়ন করা জরুরী হয়ে পড়েছে যে, সাহায্যের নামে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো বিশেষত একটি মুসলিম দেশ কি অর্জন করেছে।[২৯]

'এইড' (Aid) একটি ভুল প্রয়োগকৃত বিশেষ্য। প্রচলিত এই 'এইড' বা অনুদানের মধ্যে অনুদানের (Grant) একটা ছোট অংশ থাকে, যাকে 'এইড' বা সাহায্য বলে অভিহিত করা যায়। বাকী অংশ বিবেচনা প্রসূত ঋণ (Concessional loan) যা বাজার থেকে কিছুটা কম বা বেশি মূল্যে প্রাপ্ত ঋণ সুবিধা। 'এইড' বা অনুদানের ক্ষেত্রে শেষোক্ত ধরনের ঋণের অনুপাত বৃদ্ধি পায় বিশ্বব্যাংকের বাজার অগ্রাধিকার নীতির (Market preferences policies) ভিত্তিতে এবং অন্যান্য ঋণ দেয়া হয় এজেন্সির মাধ্যমে। এটি মুসলিম দেশের নীতিনির্ধাকরদেরকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে, অনুদানের বৃহদাকার অংশই উন্মুক্ত নয়। এই অনুদান না নিজস্ব অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ব্যবহার করা যায়, না এটা দিয়ে আন্তর্জাতিক বাজার থেকে নিম্নতম দামে কোন পণ্য/সেবা ক্রয় করা যায়। তৎপরিবর্তে দাতা দেশ সমূহের পণ্য বা সেবা সামগ্রী তাদের নির্ধারিত মূল্যে ক্রয় করতে হয়। সাধারণত এসব পণ্য বা সেবা সামগ্রীর মূল্য ও বাজার মূল্যের পার্থক্য এত বেশি হয় যে, শুধু দাতা দেশ থেকে ক্রয়ের জন্যই উন্নয়নশীল মুসলিম দেশগুলোকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে শতকরা ৩০ ভাগ বেশি মূল্য প্রদান করতে হয়। এ ধরনের অনুদান উন্নয়নশীল মুসলিম দেশগুলোর তুলনায় দাতা দেশগুলোর রপ্তানীতে

---

২৯. প্রফেসর ড. খুরশিদ আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭

www.bjilibrary.com

বড় ধরনের অবদান রেখে থাকে। এছাড়াও এর সাথে আরও বহুবিধ খরচ যেমন– যাতায়াত, ইন্স্যুরেন্স এবং কারিগরি জ্ঞান (Technical knowledge) অন্তর্ভুক্ত হয়। এসব বিষয় বিবেচনায় আনা হলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, এসব অনুদানের অবদান খুবই সামান্য। প্রাপ্ত অনুদানের প্রায় ৭০% সমসাময়িককালে সুদভিত্তিক ঋণ হিসাবে পরিবর্তন করা হয়েছে, যার নীট অবদান খুবই কম।

উপরোক্ত পটভূমিতে মুসলিম দেশের আত্মনির্ভরশীল হওয়া ছাড়া বিকল্প কোন পথ নেই। সন্দেহ নেই বিশ্বের সকল দেশের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা উচিত, তথাপিও একটি মুসলিম দেশ অবশ্যই অনুদানের উপর নির্ভরশীল থাকবে না। নীতিগতভাবে এটিও মেনে চলতে হবে যে, ইসলাম মুসলিম উম্মাহর আত্মনির্ভরশীলতা, স্বাধীনতা, সম্মান এবং আত্মসম্মানের বিষয়ে খুবই সংবেদনশীল। মুসলিম উম্মাহ হচ্ছে 'শুহাদা আলান নাস' অর্থাৎ 'মানুষের উপর সত্যের সাক্ষী' এবং এই মুসলিম উম্মাহ বিশ্বের বুকে ইসলামের সাক্ষী হতে পারবে না, যদি সে পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী নব্য উপনিবেশবাদীদের উপর বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে, প্রযুক্তিগতভাবে, বৈজ্ঞানিকভাবে এবং আর্থিকভাবে নির্ভরশীল হয়। সুতরাং আত্মনির্ভরশীলতাই একমাত্র পথ।

আত্মনির্ভরশীলতা বলতে এমন এক অবস্থাকে বুঝায়, যা একটি জাতিকে তার সম্পদ ও উৎপাদন বন্দোবস্তের স্বেচ্ছা পছন্দ এবং তার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অগ্রাধিকার স্থাপনে স্বাধীন করে। আত্মনির্ভরশীলতা বলতে একটি মুসলিম দেশ বা কিছু সংখ্যক মুসলিম দেশের আন্তঃশক্তির ভিত্তিতে কোন দুর্যোগ মুকাবিলার সামর্থ ও ধারণ ক্ষমতাকে বুঝায়। এটা কেবল তখনই সম্ভব যখন বাণিজ্য ও মূলধন চলাচলসহ বাণিজ্যিক লেনদেনের উপর ভিত্তি করে একটি দেশের অর্থনীতি ভারসাম্য অবস্থায় বিরাজমান থাকবে।

আত্মনির্ভরশীলতা মানে স্বয়ংসম্পূর্ণতা নয়। কোন দেশই পুরোপুরি স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় এবং একটি মুসলিম দেশের আত্মনির্ভরশীলতাকে স্বয়ংসম্পূর্ণতার সমপর্যায়ের মনে করা ঠিক হবে না। যদিও একজোট হলে সমস্ত মুসলিম উম্মাহর স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার সামর্থ আছে। তথাপিও এটি মনে করা যায় যে ভবিষ্যত উন্নয়ন ও বিশ্বের অন্যান্য কিছু বিবেচনায় বিশ্বের বাকী দেশগুলোর সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বজায় রাখা আত্মনির্ভরশীলতার যে কোন ধারণার সঙ্গে অঙ্গীভূত।

সে কারণেই আত্মনির্ভরশীলতা অর্থ রাষ্ট্রের বিচ্ছিন্ন নীতি (Isolationism) বা অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা (Autarky) নয়। একটি মুসলিম দেশ পৃথিবীর অখণ্ড অংশ এবং মুসলিম দেশ বাণিজ্য ও মূলধন চলাচলসহ সকল পর্যায়ে সম্পর্ক বজায় রাখবে।

অধিকন্তু আত্মনির্ভরশীলতা কোন স্থির ধারণা নয়। এটা হচ্ছে সমৃদ্ধিমূলক এবং গতিশীল। তারপরও এটা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, আত্মনির্ভরশীলতা মুসলিম দেশের জাতীয় উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের কর্মসূচী হতে হবে বিভিন্নমুখী। তার একটি দিক হলো– সরকারকে বিলাসবহুল খরচ (Conspicuous Consumption) কর্তন এবং

www.bjilibrary.com

অনুন্নয়নশীল খরচ নিয়ন্ত্রণমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। ঘাটতি ও ঘাটতি বাজেটে ভর্তুকি, উভয়ের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ আইন কার্যকর করা উচিত।

প্রস্তাবিত আত্ম-নির্ভরশীলতা কৌশলের গুরুত্বপূর্ণ উপাদানসমূহ হতে পারে নিম্নরূপ:

১. **নৈতিক উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ :** একটি মুসলিম দেশের উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হবে জীবনের বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক প্রেক্ষিতের সমন্বয় সাধন। এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য মানুষের নৈতিক উন্নয়ন এবং যে সমাজ ও রাষ্ট্রে সে বসবাস করে তারও উন্নয়ন। 'তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভোগ করো না' (সূরা আল বাকারা ঃ ১৮৮)। 'হালাল উপায়ে জীবিকা অর্জন প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরয' (আল হাদীস)। বস্তুত ইসলাম জীবনের বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক এই দুই প্রেক্ষিতের মধ্যে কোন পার্থক্য করে না। ইসলামে সকল পার্থিব কাজই -তা যত তুচ্ছই হোক না কেন - যদি যথাবিহিত বিধি-বিধান অনুসারে করা হয় তাহলে তা থেকে আপনা আপনিই জান্নাতী বিনিময় পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে ড. উমর চাপরা বলেন, 'মানুষের সকল প্রয়াস - তা অর্থনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষামূলক বা বৈজ্ঞানিক যা-ই হোক না কেন তার প্রকৃতি ও লক্ষ্য আধ্যাত্মিকই হবে যতক্ষণ তা ইসলামের মূল্যবোধের সাথে সামঞ্জস্যশীল থাকবে। যদি আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ দ্বারা বস্তুগত প্রয়াস নিয়ন্ত্রিত বা পরিচালিত হয় তাহলে ব্যক্তির নিজের, তার পরিবারের ও সমাজের বস্তুগত বা ভৌত উন্নয়নের জন্য কঠোর শ্রম দান করা ততটাই আধ্যাত্মিক হবে যতটা আধ্যাত্মিক নামায পড়া।[৩০]

২. **সার্বিক মানব উন্নয়নের উপর গুরুত্বারোপ করা :** ইসলাম সামগ্রিক মানব উন্নয়নের উপরেই জোর দেয়। তাই শুধু বস্তুগত উন্নয়ন নয় একই সাথে মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নের উপরও ইসলাম বিশেষ গুরুত্বারোপ করে থাকে। ইসলামে মানব উন্নয়নের পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া মানব মূলধনের যথার্থ বিনিয়োগের ব্যাপ্তির উপর নির্ভরশীল। ডঃ এম এ মান্নানের মতে, শিক্ষার ফল এক জটিল সামাজিক পণ্য। একে বিনিয়োগ বলা যেতে পারে যেসব বিষয়ের প্রেক্ষিতে তা নিম্নরূপ :

i. শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি;
ii. পিতা-মাতা ও সন্তানদের প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত সন্তুষ্টি ও তৃপ্তি অর্জন;
iii. জাতি সত্বার উন্নয়ন ও সচেতন ভোটার সৃষ্টি;
iv. গ্রামীণ সমাজকে একটা মর্যাদাপূর্ণ ও রুচিশীল সমাজে রূপান্তর; এবং
v. নাগরিকদের অর্থনৈতিক আচরণ, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ ইত্যাদির পরিবর্তন।

---

৩০. ড. এম উমর চাপরা, Towards A Just Monetary System, leicester, The Islamic Foundation, P-46

www.bjilibrary.com

মুসলিম দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতির জন্য সামগ্রিক মানব উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষার সামগ্রিক চিত্র প্রতিফলিত হয়নি। ডঃ এম এ মান্নানের মতে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্কুল হয়ে দাঁড়িয়েছে অপ্রাসঙ্গিক যেহেতু তা ভিন্ন সংহতির এবং ইসলাম বিরোধিতায় উৎসাহিত করে। ফলশ্রুতিতে একজন তার নিজের দেশেই নিজের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের ক্ষেত্রে হয়ে দাঁড়ায় ভিন্ন দেশী। সুতরাং মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন ও সংস্কার প্রয়োজন। এজন্য যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে তা নিম্নরূপ ঃ

i. শিক্ষা সম্পদের সুষম বণ্টন হতে হবে। মুসলিম দেশের এজন্য গণস্বাক্ষরতা, প্রাথমিক শিক্ষা এবং বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচিতে অধিক পরিমাণ সম্পদ বরাদ্দ করতে হবে।
ii. উপ আনুষ্ঠানিক শিক্ষার উপর জোর দিতে হবে।
iii. শিক্ষার সকল স্তরে পাঠ্যক্রমের পুনর্গঠন ও সংস্কার এখন সময়ের দাবী। এই সঙ্গে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সাথে গ্রামীণ উন্নয়ন ও স্বউদ্যোগ কর্মসংস্থানের যোগসাধনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।
iv. শ্রম বাজারের পুনর্বিন্যাস করতে হবে যেন উপ আনুষ্ঠানিক শিক্ষার এবং কর্মস্থলেই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা যায়। ফলে নিশ্চিতভাবেই উচ্চশিক্ষার উপর অহেতুক নির্ভরশীলতা হ্রাস পাবে। এর ফলে বেকারত্ব কমে যাবে।
v. শিক্ষার আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে ইসলামী প্রেক্ষিতেই পুনর্মূল্যায়ন করা একান্ত জরুরী। এই লক্ষ্য সামনে রেখে শিক্ষার সকল প্রসঙ্গকেই (পাঠ্য সূচিসহ) প্রয়োজনীয় সংস্কার ও পুনর্গঠন করতে হবে।

৩. **সরকারের আকার ছোট করা :** একটি মুসলিম দেশের সরকারের আকার ছোট করতে হবে। আর এটা করতে হবে ৪টি কারণে। যেমন–

i. মতাদর্শ, স্বাধীনতা ও জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার্থে।
ii. সমাজের দুর্বল শ্রেণী ও বঞ্চিতদের অধিকার রক্ষার্থে।
iii. অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য একটি সহজাত (Congenial) সামাজিক ও প্রশাসনিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে।
iv. যেখানে প্রাইভেট সেকটর দেশের প্রয়োজন মেটাতে অক্ষম সেখানে কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের প্রতি সরকারের মনোনিবেশ করতে।

৪. **উন্নয়ন পরিকল্পনা পুনর্গঠন :** উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পূর্ণভাবে পুনর্গঠন (restructure) করতে হবে এবং অর্থনৈতিক অনেকগুলো খাত প্রাইভেট সেকটরে স্থানান্তর করার প্রয়োজন হবে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সামাজিক সেকটরই হবে সরকারী পরিকল্পনার প্রাথমিক বিষয়।

৫. **কর প্রদান পদ্ধতি পুনর্গঠন :** কর প্রদান পদ্ধতি সম্পূর্ণ পুনর্গঠন প্রয়োজন হবে, কারণ কর প্রদান পদ্ধতির মৌলিক পরিবর্তন ছাড়া সম্পদ সমাবেশ সম্ভব নয়।

www.bjilibrary.com

৬. **পাবলিক ইউটিলিটি কমিশন গঠন :** ভোক্তাদের স্বার্থ সংরক্ষণে সংসদীয় আইনের আওতায় পাবলিক ইউটিলিটি কমিশন গঠন করা যেতে পারে। এটি একচেটিয়ামূলক মূল্য পরিবর্তনের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ হতে পারে।

৭. **দীর্ঘমেয়াদী শুল্ক নীতিমালা প্রণয়ন :** দীর্ঘমেয়াদী শুল্ক নীতিমালা প্রয়োজন হবে। আত্মনির্ভরশীল উন্নয়ন নিশ্চিত করতে প্রাতিষ্ঠানিক শুল্ক কমিশনকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।

৮. **সুদের মূলোৎপাটন :** আত্মনির্ভরশীল উন্নয়ন কৌশলের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ দিক হবে সুদভিত্তিক ঋণ পদ্ধতিকে ন্যায়ভিত্তিক ইসলামী বিনিয়োগ পদ্ধতিতে রূপান্তর। সুদের মূলোৎপাটন ছাড়া একটি মুসলিম দেশের আত্মনির্ভরশীলতার দিকে অভিগমন অসম্ভব বলেই মনে হয়। সত্যিকার অর্থে প্রথমে অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি থেকে এবং পরে সরকারের বহি:লেনদেন হতে সুদের উৎপাটনের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করতে হবে। ড. মহসিন খান লিখেছেন, ব্যাংকিং সংকট (Banking crisis) ও পরিশোধ পদ্ধতির বিচ্ছিন্নকরণের (disruption on the payment mechanism) ফলে সৃষ্ট প্রচণ্ড আঘাত মুকাবিলায় ইসলামী ব্যাংকিং বেশি উপযোগী প্রমাণিত হতে পারে।[৩১]

৯. **ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিংকে জনপ্রিয় করা :** ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে আরো জোরদার করতে হবে। এতে ইসলামের pluralism জনসমক্ষে জনপ্রিয় হয়ে উঠবে। একজন নেতৃস্থানীয় জার্মান অর্থনীতিবিদ প্রফেসর হেউজ আলবাক বলেছেন যে, ইসলামী ব্যাংক হচ্ছে অংশীদারীত্বমূলক ব্যাংকগুলোর অন্তর্ভুক্ত। প্রথমত: ব্যাংক তাদের ইক্যুইটি, ভেনচার ক্যাপিটালের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের মূলধন যোগান দেয়, যেখানে বিনিয়োগে তাদের অংশীদারিত্ব হচ্ছে শ্রম ও উদ্ভাবনী শক্তি। দ্বিতীয়ত: যেসব প্রকল্পে অনেক অংশীদার (shareholder) থাকে, সেখানে ব্যাংক ইক্যুইটি, ইক্যুইটি ক্যাপিটাল হিসাবে যোগান দেয়। উন্নয়নশীল মুসলিম দেশ, যেখানে সাধারণত বাণিজ্যিক ঝুঁকি অনেক বেশি এবং শিল্পোন্নত দেশ, যেখানে নতুন পদ্ধতির উন্নয়ন ও নতুন প্রকল্পের ঝুঁকির পরিমাণ বেশি থাকে ও বৃহদাকার ভেচনার ক্যাপিটালের প্রয়োজন হয়, সেখানে ইসলামী ব্যাংকগুলো ইক্যুইটি ক্যাপিটালের প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি উপযোগী হতে পারে।[৩২] সুদমুক্ত ব্যাংকগুলো সম্পর্কে অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন সংস্থা (ও.ই.সি.ডি)[৩৩] এর প্রফেসর ট্রাউটি ওহলারস স্মারক এর পর্যবেক্ষণ হলো,

---

৩১. Mohsin Khan, Islamic Interest Free Banking, Staff paper, vol.33, No-1, March 1986, p. 19

৩২. Ialamic Banking, Proceedings of the Badan-Baden Seminar, London.

৩৩. ওইসিডি OECD পুঁজিবাদী বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশ সমূহের একটি সহযোগিতা সংস্থা। এর সদস্য সংখ্যা ২৩। সংস্থার সচিবালয় প্যারিসে অবস্থিত।

www.bjilibrary.com

ইসলামী ব্যাংকগুলো একদিকে অর্থায়ন ও অন্যদিকে শিল্প ও বাণিজ্যের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টা চালাচ্ছে। এই নতুন সম্পর্কই ইসলামী অর্থনৈতিক পদ্ধতির ভিত্তি। যদিও আন্তর্জাতিক অর্থায়নের প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে ইসলামী মূলনীতিগুলো এখনও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়নি তথা এই দুই পদ্ধতির সাদৃশ্য হলো উভয়ই অর্থায়ন মধ্যস্থতাকরণ (Financial Intermediation) ও অর্থনৈতিক সম্পদ সৃষ্টির মধ্যকার দূরত্ব কমিয়ে আনার চেষ্টা করছে। ইসলামী ব্যাংকগুলো অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষত অর্থনৈতিক মন্দা, মুদ্রাস্ফীতির স্থবিরতা ও নিম্ন পদ্ধতির মুকাবিলায় বিশেষ অবদান রাখতে পারে। উত্তর ও দক্ষিণের প্রায় সকল দেশেগুলোরই আরো বেশি ভেনচার ক্যাপিটালের প্রয়োজন। বিশেষত শিল্পোন্নত দেশগুলো থেকে উচ্চ সুদের হারে ঋণ মূলধন (Loan capital) সহজলভ্য। কিন্তু মাঝারি শিল্প কারখানার জন্য, তাদের সম্প্রসারণ ও উদ্ভাবনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ মূলধন বাড়ানো খুবই কঠিন। উত্তরে এ ধরনের পদক্ষেপ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও উৎপাদনশীলতাকে থামিয়ে দিয়েছে। এভাবে বিশ্বব্যাপী ইসলামী ব্যাংক ও এন্টারপ্রাইজগুলোর মধ্যে বাস্তবধর্মী ও প্রাথমিক সহযোগিতার ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। এই মধ্যস্থতাকরণ প্রক্রিয়া পুরোপুরি উন্নত হওয়া প্রয়োজন।[৩৪]

১০. **শিক্ষা ও প্রযুক্তি :** শিক্ষা, গবেষণা, আবিষ্কার-উদ্ভাবন এবং বৈষয়িক উপায়-উপকরণ ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে কেবল উন্নয়নই নয় বরং প্রতিযোগিতামূলক উন্নয়ন একান্ত প্রয়োজন।

১১. **গ্রান্ট বা ট্রান্সফার ম্যাকানিজমের যথাযথ ব্যবহার :** সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরির জন্য ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। এ ব্যাপারে ইসলামের ট্রান্সফার ম্যাকানিজমগুলোকে কাজে লাগাতে হবে। ভোগ কমাতে হবে। ট্রান্সফার বেশি করতে হবে।

১২. **সকলকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা :** জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করতে হবে। তাত্ত্বিক ও নীতিগত ভিত্তিতে একটি মজবুত অর্থনীতি গঠন ও বৈষয়িক উপায় উপকরণ লাভ করার জন্য চেষ্টিত হতে হবে।

১৩. **বণ্টন :** আয় ও সম্পদের সুষম বণ্টনের ব্যবস্থা নিতে হবে। এমন কার্যকর আয়নীতি থাকা বাঞ্ছনীয় যার ফলে নীচু আয়ের লোকদের আয়ের স্তর বৃদ্ধি পাবে এবং পরিণতিতে সমাজ হতে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য হ্রাস পাবে।

১৪. **মূলধনী বাজার উন্নয়ন :** একটি মুসলিম দেশে কার্যকর মূলধনী বাজারের উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

---

৩৪. Professor Trauti Wohlers Scharf, Arab and Islamic Banks, OECD, Paris, 1983.

www.bjilibrary.com

১৫. **ক্ষুদ্র ও মাইক্রো উদ্যোগ উৎসাহিতকরণ :** একটি মুসলিম দেশকে গ্রাম ও শহরাঞ্চলে ক্ষুদ্র ও মাইক্রো উদ্যোগকে উৎসাহিত করতে হবে। এ ধরনের উদ্যোগের উপর বিশেষ গুরুত্ব ইসলামী মূল্যবোধে খুবই অর্থবহ। এ পদক্ষেপ সম্পদ সংহতকরণ হ্রাস করা ছাড়াও সমাজ ব্যবস্থা উন্নয়ন করবে। কেননা ক্ষুদ্র উদ্যোগ ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিকানা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের স্বাধীনতা, মর্যাদা এবং আত্মসম্মান বৃদ্ধি করে। এটি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের উদ্ভাবনী শক্তি বৃদ্ধি করতে এবং ব্যবসায়ে সফলতা আনয়নে কঠোর পরিশ্রমে অনুপ্রাণিত করবে। এর ফলে অধিকতর দক্ষতাও অর্জিত হবে। গরীব জনগণকে তাদের সৃজনশীল ও শৈল্পিক সামর্থের পরিপূর্ণ ব্যবহারের সুযোগ না দেয়া পর্যন্ত কার্যকরভাবে মানব কল্যাণের উন্নয়ন সম্ভবপর নয়। এটি তখনই সম্ভব যখন জনগণকে আত্মকার্যে নিয়োজিত হওয়ার সুযোগ দেয়া হবে। আত্মকর্মে নিয়োগের জন্য প্রয়োজন ক্ষুদ্র ও মাইক্রো উদ্যোগের বিকাশ সাধন। এ জন্য মুসলিম দেশ কয়েকটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে যা নিম্নরূপ :

i. গ্রামীণ উদ্যোক্তাদের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং মাইক্রো উদ্যোগ গ্রহণে প্রয়োজনীয় উপকরণাদি সংগ্রহে সাহায্য করতে হবে।

ii. ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং এর নিয়মানুযায়ী তাদেরকে অবশ্যই প্রয়োজনীয় ফাইনান্সিয়াল সহযোগিতা প্রদান করতে হবে।

iii. প্রশিক্ষণ ও পুনঃপ্রশিক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ করে দিতে হবে।

এ জন্য লাগসই প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং প্রশিক্ষণ মডিউল প্রস্তুত করতে হবে।

iv. পল্লী কৃষক ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের প্রতি দাপ্তরিক দৃষ্টিভংগি এবং নীতির পরিবর্তন ঘটাতে হবে। তাদের স্বার্থের পরিপন্থী ক্ষতিকর নীতির পুনর্বিন্যাস করতে হবে।

১৬. **রপ্তানী বিকল্পের উপর জোর :** রপ্তানী বিকল্প শিল্প প্রতিষ্ঠিত হওয়া মানে আরও বেশি কৃষি ও কৃষিজাত পণ্য উৎপন্ন হওয়া। ফলে গ্রামীণ এলাকায় লোকের কর্মসংস্থান ও আয় দুই-ই বৃদ্ধি পাবে। পরিণামে শহুরে ও গ্রামীণ এলাকার মধ্যে যে আয় বৈষম্য রয়েছে তা হ্রাস পেতে শুরু করবে।

১৭. **ইসলামী প্রযুক্তির উপর জোর :** উন্নয়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো প্রযুক্তি। উৎপাদন প্রযুক্তির উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। প্রযুক্তির সার্থক বিকাশই একটি দেশের দারিদ্র্য বিমোচন ও দ্রুত আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের চাবিকাঠি। প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রক্রিয়াসমূহ অনুধাবনের পদ্ধতিকে বলা হয় বিজ্ঞান আবার পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার পদ্ধতিকে বলা হয় প্রযুক্তি।

www.bjilibrary.com

কাজেই বস্তুজগত সম্পর্কে তথ্য আহরণ, উৎঘাটন এবং সেগুলোকে মানব কল্যাণে নিয়োজিত করাই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সমন্বিত প্রয়াস।[৩৫] প্রযুক্তি মানুষের সৃষ্টি। এটি মানুষের শারীরিক ও মানসিক যোগ্যতা এবং জীবনের মান উন্নয়নের উপায়। প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্যগুলি হচ্ছে ঃ ১. প্রাকৃতিক সম্পদকে ভোগ ব্যবহার উপযোগী দ্রব্য সামগ্রীতে রূপান্তরিত করার যন্ত্র, ২. প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার যন্ত্র, ৩. অধিক সম্পদ সৃষ্টি করার সম্পদ, ৪. সামাজিক পরিবর্তন সাধন করার এজেন্ট, ৫. উন্নয়নকে চূড়ান্তভাবে প্রভাবিত করার উপাদান, ৬. বাজারে বেচা কেনার পণ্যদ্রব্য।[৩৬] মুসলিমদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতিসম্পন্ন সরঞ্জামকে ইসলামী প্রযুক্তি বলা হয়। প্রযুক্তির উন্নয়ন, এর ব্যবহার এবং হস্তান্তর মূল্যবোধ নিরপেক্ষ বিবেচনা করে মানুষ প্রায়ই ভুল করে থাকে। সাধারণত সরঞ্জাম বা যন্ত্রপাতির মানবীয় চরিত্র নেই বলে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু এ ধারণা আদৌ সত্য নয়। আর্থ-সামাজিক অবস্থা, মূল্যবোধ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য থেকে সরঞ্জামকে আদৌ বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়। ইসলামী প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্যসমূহ হচ্ছে :

i. প্রযুক্তিটি হতে হবে স্থানীয় জনসাধারণের উপযোগী,

ii. স্থানীয় জনশক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার ক্ষমতাসম্পন্ন,

iii. প্রযুক্তিটি হবে ইসলামী মূল্যবোধ ও নীতি-নৈতিকতার পরিচায়ক। স্থানীয় পরিবেশ ও প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্যশীল প্রযুক্তির বিকাশ ইসলামী প্রযুক্তির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। প্রফেসর ড. খুরশীদ আহমদ বলেন, 'উন্নয়ন প্রক্রিয়া তখনই স্বনির্ভর হবে যখন মুসলিমরা শুধু বৈদেশিক সাহায্য থেকে মুক্ত হবে তাই না বরং ভিন্ন অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিমণ্ডলে বিকশিত প্রযুক্তিকে আয়ত্ব করে প্রযুক্তির সৃজনশীলতা আত্মস্থ করতে সমর্থ হবে এবং মুসলিমদের স্বকীয়তার চিহ্নবাহী প্রযুক্তি নির্মাণে সক্ষম হবে।[৩৭] এ জন্য অবশ্যই গবেষণা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে উচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে।

১৮. **গ্রুপের উপরে জোর :** আল্লাহর নির্দেশ– সৎকর্ম ও আল্লাহভীতিতে একে অন্যের সাহায্য করো।[৩৮] আল কুরআনের এই নির্দেশের অর্থনৈতিক তাৎপর্য

---

৩৫. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনীতি, পৃ-১।

৩৬. M. Nazmul Islam, The Process of Technology Assessment and Technology iffusions (Dhaka Institute of Appropriats Technology, BUET, May 1986।

৩৭. প্রফেসর ড. খুরশীদ আহমদ, Economic Development in an Islamic Framework in Studies in Islamic Economics, IRTI, Jeddah and the Islamic Foundation, UK. P-182.

৩৮. ৫ : সূরা আল মায়েদা : ২

www.bjilibrary.com

হলো 'অর্থ-নীতির বিভিন্ন খাতের মধ্যে ভারসাম্য অর্জনের উদ্দেশ্যে অন্যান্য সকল কিছুর মধ্যে সমবায় শক্তি ও কৌশলের উপরই সমধিক গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।'[৩৯] কথাটা অন্যভাবেও বলা যায়। সমবায় বা গ্রুপ এপ্রোচকে ইসলামী সমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে।

পল্লী উন্নয়নে জোর : একটি মুসলিম দেশের জন্য উন্নয়নের অন্যতম ইসলামী দৃষ্টিকোণ হবে গ্রামীণ এলাকায় প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর বিকাশ এবং কৃষিভিত্তিক শিক্ষা গড়ে তোলা। যেন গ্রাম হতে লোক শহরে না এসে শহর হতেই লোক গ্রামে যেতে শুরু করে। মুসলিম দেশের সরকারকে অর্থ বরাদ্দ প্রদানের সময় কৃষি খাতেই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। ইসলাম আয় ও সম্পদের সুষম বণ্টনের উপর যে বিশেষ জোর দেয় তার প্রেক্ষিতেই পল্লী উন্নয়ন ও কৃণি খাতের জন্য অর্থ বরাদ্দ বাড়িয়ে দিতে হবে।

নারীদের উপর গুরুত্বারোপ : ইসলাম পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে নারীর ভূমিকাকে খুবই গুরুত্ব দেয়। আল কুরআনে বলা হয়েছে, 'পুরুষ যা অর্জন করে সেটা তার অংশ এবং নারী যা অর্জস করে সেটা তার অংশ.....'। এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হলো পুরুষদের মতো মহিলারাও তাদের কৃত-কর্মের জন্য জওয়াবদিহি করতে বাধ্য। সুতরাং একটি মুসলিম দেশের উন্নয়নে নারীদের যদি অবদান রাখতে হয় তাহলে তাদের উঁচুমানের শিক্ষা লাভের সুযোগ থাকতে হবে। এই জন্যই দেশের উন্নয়নের কৌশল হবে ছেলেদের ক্ষেত্রে বর্তমান বিদ্যমান গুরুত্বের সাথে সাথে মেয়েদের শিক্ষায় অংশগ্রহণ ও মান উন্নয়নের জন্য আরো বেশি পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা। আনন্দের বিষয় কোন কোন মুসলিম দেশের সরকার এই প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অনুধাবন করেছেন এবং দেশের নারী সমাজের উন্নয়নের জন্য শিক্ষা খাতে ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধিসহ অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে প্রকৃত উৎসাহ-উদ্দীপনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। ■

লেখক-পরিচিতি : মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম- বিশিষ্ট ব্যাংকার, অর্থনীতিবিদ এবং প্রাবন্ধিক।

লেখা-পরিচিতি : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত ২ অগাস্ট, ২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সেমিনারে প্রবন্ধটি উপস্থাপিত হয়।

---

৩৯. প্রফেসর ড. খুরশীদ আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃ-৩৬.

www.bjilibrary.com

নারীর উত্তরাধিকার ও অর্থনৈতিক মুক্তি

খোন্দকার রোকনুজ্জামান

■

শুরুর কথা : "আল্লাহ্ তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে তোমাদের আদেশ করেন; এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান। তবে যদি শুধু কন্যা থাকে দুজনের অধিক তাহলে তাদের জন্য ছেড়ে যাওয়া সম্পত্তির তিন ভাগের দুই ভাগ, আর যদি কন্যা একজন থাকে তবে তার জন্য অর্ধেক।" --আল কুরআন[১]

উপরের আয়াতটি নিয়ে প্রায় শতাব্দীকাল ব্যাপী ব্যাপক আলোচনা, পর্যালোচনা এবং সমালোচনা হয়ে আসছে। নারীবাদীরা এটাকে নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক নীতি হিসাবে নিন্দা করে আসছেন। তাদের বক্তব্য অনুসারে এই বৈষম্যের অবসান হওয়া আশু প্রয়োজন। পৃথিবীর সভ্য এবং উন্নত দেশসমূহে এই বৈষম্য নেই। তাছাড়া, তারা মনে করেন, সভ্যতার চাকা পিছনদিকে ঘুরিয়ে দেড় হাজার বছর অতীতে নিয়ে যাওয়া চরম মূর্খতা। পক্ষান্তরে, ইসলামি চিন্তাবিদগণ উত্তরাধিকারের এই আইনটিকে ঐশী বিচক্ষণতা ও ইনসাফের নিদর্শন মনে করেন। তাঁরা বলেন, আল্লাহ্ নারীকে ভিন্ন ধরণের দায়িত্ব এবং যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। আর তাকে যে উত্তরাধিকার দেওয়া হয়েছে, তা তার দায়িত্বের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। নারী-পুরুষ সম-মর্যাদাপূর্ণ, তবে সব দিক দিয়ে একই রকম নয়। তাদের প্রকৃতিগত পার্থক্যকেঅগ্রাহ্য করা চরম গোয়ার্তুমি।

www.bjilibrary.com

যাহোক, সাম্প্রতিক কালে বিষয়টি আলোচনার ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি করেছে। আর একজন সচেতন মানুষ হিসাবে আমি বিষয়টির উপর আলোকপাত করা জরুরি মনে করছি।

অতীত যা বলে : আলোচনার শুরুতে অতীতের দিকে এক পলক দৃষ্টি দেওয়া দরকার। নারীর উত্তরাধিকার কোন সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না। প্রাচীন আরবসহ পৃথিবীর অনেক দেশে নারীর সম্পদের মালিক হবার কোন অধিকার ছিল না। বরং আরবের অবস্থা এতটাই শোচনীয় ছিল যে, নারীকে নিতান্ত অস্থাবর সম্পত্তি মনে করা হত এবং পিতার মৃত্যুতে ছেলেরা তাদের সৎমাদেরকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিত।[ii] মহাচীনের আধ্যাত্মিক নেতা কনফুসিয়াসের দর্শন অনুযায়ী পিতার মৃত্যুতে তার জেষ্ঠ্য পুত্র সমুদয় সম্পত্তির মালিক হবে। এই নীতি ইউরোপসহ পৃথিবীর অনেক অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। 'ইংলিশ কমন ল' অনুসারে নারীর অর্জিত বা উপার্জিত সকল সম্পত্তি বিয়ের পর তার স্বামীর মালিকানায় চলে যেত। ইংরেজ নারীরা সর্বপ্রথম ১৮৭০ সালে সম্পত্তির অধিকার লাভ করে।[iii] এরও অনেক পরে অন্যান্য ইউরোপীয় দেশে নারীদেরকে এই অধিকার প্রদান করা হয়। ফ্রান্সের নারীরা সম্পত্তির মালিকানা লাভ করে ১৯৩৮ সালে। নারী-অধিকারের এই ইতিহাসকে সামনে রেখে এ-ক্ষেত্রে ইসলামের ভূমিকা মূল্যায়ন করতে গিয়ে অনেক পশ্চিমা পণ্ডিত বিস্ময় প্রকাশ করেন। ইউরোপের প্রায় এক হাজার তিনশ বছর আগে ইসলাম নারীকে মৃত আত্মীয়ের সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার দান করেছে।

ইসলামী উত্তরাধিকার আইনের যৌক্তিকতা : উত্তরাধিকারসূত্রে পুরুষ নারীর চেয়ে দ্বিগুণ সম্পত্তি পায়— এটি সাধারণ নিয়ম, তবে এর ব্যতিক্রমও রয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্র এমনও আছে, যেখানে নারী-পুরুষ সমান উত্তরাধিকার পেয়ে থাকে। যেমন, মৃত পুত্রের সম্পদে তার পিতা এবং মাতা উভয়ে সমান অংশ (প্রত্যেকে ছয় ভাগের এক ভাগ) পেয়ে থাকে। আরো মজার ব্যাপার, যে ১২ প্রকার স্বজনকে কুরআনে উত্তরাধিকারী ঘোষণা করা হয়েছে, তাদের মধ্যে ৪ প্রকার ব্যক্তি হল পুরুষ এবং এর দ্বিগুণ সংখ্যক অর্থাৎ ৮ প্রকার ব্যক্তি নারী।[iv] কাজেই দেখা যাচ্ছে, সম্পত্তিতে নারীর অধিকার পুরুষের অর্ধেক— কথাটি সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

এ-কথা সত্য যে, উপরের পরিস্থিতিগুলি ব্যতিক্রমী ধরণের। সচরাচর যা ঘটে তা হল, পিতা-মাতা তাদের সম্পত্তি রেখে মারা যায় এবং তা থেকে পুত্র পায় কন্যার দ্বিগুণ। আর এখানেই নারীবাদীদের আপত্তি। মানুষ হিসাবে নারী-পুরুষ যেখানে সমান, সেখানে কেন এই বৈষম্য? বলা হয়ে থাকে, ইসলামে নারীকে পুরুষের সমান মর্যাদা দেওয়া হয়েছে ; উত্তরাধিকারের নীতি কি এই দাবীকে অসার প্রমাণ করে না?

আপাতদৃষ্টিতে বিষয়টিকে আপত্তিকর মনে হচ্ছে বটে। তবে ইসলাম নারী-পুরুষের উপর যে-সব দায়িত্ব অর্পন করেছে, সে-গুলি বিবেচনায় রাখলে এই ব্যবস্থাকে সুবিচার এবং সুবিবেচনাপ্রসূত বলে স্বীকার করতেই হবে। প্রথমেই একটি বিষয় বুঝে নেওয়া দরকার। তা হল, দায়িত্বের প্রকৃতি অনুসারে সুযোগ- সুবিধা প্রদান করাই ইনসাফের দাবী। যাকে

www.bjilibrary.com

ডাকাত ধরতে পাঠানো হচ্ছে, তার হাতে চায়ের কেটলি তুলে দেওয়া আর চা করতে যাওয়া লোকটির হাতে রাইফেল তুলে দেওয়াকে পৃথিবীর সবচেয়ে নির্বোধ লোকও সঠিক কাজ বলবে না। প্রতিটি দেশের গণকর্মচারীদেরকে ভিন্ন ভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয় তাদের কাজের প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য রেখে। একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর পুলিশ অফিসারকেও একটি দামী মোটর-সাইকেল, একটি রিভলভার দেওয়া হয়। প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা হওয়া সত্ত্বেও একজন ডাক বিভাগের কর্মকর্তাকে কিংবা একজন কলেজ শিক্ষককে এ-সব দেওয়া হয় না। তাদের জন্য কোন দেহরক্ষী নেই; অথচ তাদের সমমর্যাদা-সম্পন্ন একজন বিচারককে তা দেওয়া হয়। এ-জন্য ডাক-কর্মকর্তা বা শিক্ষক যদি ক্ষোভ প্রকাশ করেন, কিংবা সমমর্যাদার আওয়াজ তুলে উপরের সুযোগগুলি দাবী করেন, তবে তা হবে অযৌক্তিক। কারণ, তাদেরকে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে না জীবনের ঝুঁকি নিতে হয়, না স্থান থেকে স্থানান্তরে ছুটে বেড়াতে হয়।

তেমনিভাবে, ইসলাম নারী-পুরুষকে পৃথক পৃথক দায়িত্ব প্রদান করেছে আর এই পার্থক্যকে বিবেচনায় রেখে উপায়-উপকরণের ভিন্নতা এনেছে। যাবতীয় অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব ইসলাম অর্পণ করেছে পুরুষের উপর। পরিবারের সদস্যদের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা গ্রহণ, বাসগৃহ নির্মাণ বা মেরামত, শিক্ষা খাতে ব্যয়, চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন, পরিজনদের উপর ধার্যকৃত ফিৎরা প্রদান, নবজাতকের আকিকা প্রদান, ধর্মীয় বা সামাজিক উৎসবের ব্যয় নির্বাহ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যয়ভার বহন। সকল দায়িত্ব ইসলাম অর্পন করেছে পুরুষের উপর। নারীকে এ-সব দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। স্ত্রী যতই বিত্তশালিনী হোক, পরিবারের জন্য একটি পয়সাও ব্যয় করতে তাকে বাধ্য করা যাবে না। স্বামীর যত অভাব-অনটনই থাক, সে স্ত্রীর অর্থ তার অমতে পরিবারের প্রয়োজনে ব্যয় করার অধিকার রাখে না। দায়িত্বের এই ভিন্নতাই হল উত্তরাধিকারের ভিন্নতার মূল কারণ।

ইসলামে মাতা-পিতার প্রতি কর্তব্যের গুরুত্ব অপরিসীম। পবিত্র কুরআনে পিতা-মাতার প্রতি কর্তব্যকে আল্লাহর প্রতি কর্তব্যের পরেই স্থান দেওয়া হয়েছে। এ-সম্পর্কে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেনঃ

"আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরিক করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে অবশ্যই ভাল ব্যবহার করবে।"[v]

আল্লাহ্ তা'লা আরো ঘোষণা করেনঃ

"হে রাসূল, লোকেরা তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে, তারা কোথায় ধন-সম্পদ ব্যয় করবে। তুমি তাদের বলে দাও, তোমরা যা কিছু খরচ করবে, তা করবে পিতা-মাতার জন্য, নিকটাত্মীয়দের জন্য, ইয়াতিম-মিসকিন ও সম্বলহীন পথিকদের জন্য।"[vi]

মহানবী (সা) এ-প্রসঙ্গে বলেন-

www.bjilibrary.com

"সন্তান হল পিতার অতি উত্তম উপার্জন বিশেষ। অতএব তোমরা [পিতা-মাতারা] সন্তানদের ধনসম্পদ থেকে পূর্ণ স্বাদ গ্রহণ সহকারে পানাহার কর।"[vii]

রাসূল (সা) আরো ইরশাদ করেন-

"যে লোক তার পিতা-মাতা দু'জনকেই কিংবা একজনকে বৃদ্ধ অবস্থায় পেল অথচ খিদমত করে জান্নাতবাসী হবার অধিকারী হল না, তার মত হতভাগ্য আর কেউ নেই।"[viii]

স্বামীরা তাদের স্ত্রীদের জন্য নিজের সামর্থ অনুযায়ী ব্যয় করবে। তাদের মানসম্মত খাবার, পোষাক এবং জীবনোপকরণ দেওয়া স্বামীর অবশ্য কর্তব্য। এ-ব্যাপারে আল্লাহ স্বামীদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেনঃ

"যে লোককে অর্থ-সম্পদে স্বচ্ছলতা দান করা হয়েছে, তার কর্তব্য সেই হিসাবেই (তার স্ত্রী-পরিজনের জন্য) ব্যয় করা। আর যার আয়-উৎপাদন স্বল্প পরিসর ও পরিমিত, তার সে-ভাবেই আল্লাহর দান থেকে খরচ করা কর্তব্য। আল্লাহ প্রত্যেকের উপর তার সামর্থ্য অনুসারেই দায়িত্ব অর্পণ করে থাকেন।"[ix]

মহানবী (সা) এ-প্রসঙ্গে নির্দেশ দেনঃ

'স্ত্রীদের খাবার ও পরার ব্যবস্থা করার ব্যাপারে তোমরা অবশ্যই তাদের প্রতি ভাল ব্যবহার করবে।'[x]

অনেক সময় পিতার মৃত্যু বা অক্ষমতার কারণে বোন ভায়ের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। আবার কখনো-বা স্বামীকর্তৃক তালাকপ্রাপ্তা হয়ে তাকে ভায়ের পরিবারে আশ্রয় নিতে হয়। তখন ভায়ের দায়িত্ব অনেক বেড়ে যায়। সে-সময় ভাই যেন বোনকে গলগ্রহ মনে না করে বরং অনন্ত জীবনে মুক্তির মাধ্যম ভাবতে পারে, সে-জন্য রাসূল (সা) বলেনঃ

"যে ব্যক্তির তিনটি কন্যা সন্তান বা তিনটি বোন আছে এবং সে তাদের সাথে উত্তম আচরণ করে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" [বর্ণনাকারীঃ হযরত আবু সাঈদ আল খুদরী (রা)।][xi]

পিতা-মাতা, ভাই-বোন বা আত্মীয়-অনাত্মীয় কোন অনাথ পালনে কেউ যেন কার্পণ্য বা অবহেলা না করে সে-জন্য মহানবী (সা) সতর্ক করে দেন-

"যাদের খাওয়া-পরার দায়িত্ব একজনের হাতে, সে যদি তা বন্ধ করে দেয়, তবে এ-কাজই তার মহাপাপী হবার জন্য যথেষ্ট।"[xii]

উপরের আলোচনা থেকে বুঝা যাচ্ছে, দারুণ ব্যয়বহুল একটি দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে পুরুষের কাঁধে। অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান মোটেই কোন তুচ্ছ ব্যাপার নয়।

www.bjilibrary.com

অনেকে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে তবেই দু'মুঠো ভাত জুটাতে পারে। বাসস্থান তৈরি বা মেরামতে এককালীন বড় অঙ্কের টাকা ব্যয় হয়ে যায়। চিকিৎসার ক্ষেত্রেও কখনো কখনো প্রচুর টাকা ব্যয় করতে হয়। আর শিক্ষা-ব্যয় তো বিশাল। মাত্র দু'টি ছেলে-মেয়েকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করতে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করতে হয়। এত যে দায়িত্বের বোঝা, তা সবই পুরুষের কাঁধে তুলে দিয়েছে ইসলাম।

নারীর উপর ইসলাম কোন আর্থিক দায়িত্ব অর্পণ করেনি। নিজের পিতা-মাতা, স্বামী-সন্তানের দেখা-শোনা, খোর-পোষের কোন দায়িত্ব ইসলাম নারীকে দেয়নি। স্ত্রীর যত সম্পদই থাক, সংসার চালানোর জন্য স্বামী তা দাবী করতে পারে না। এ-সম্পদ একান্তই তার। তার বিনাঅনুমতিতে এর এক কপর্দকও ব্যবহার করার অধিকার স্বামীর নেই। পক্ষান্তরে, স্বামী যদি স্ত্রীর ভরণ-পোষণ করতে কোন প্রকার কার্পণ্য করে, তবে স্বামীর অনুমতি ছাড়াই স্ত্রী নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে নিতে পারে। এ-প্রসঙ্গে হযরত আয়িশা (রা) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আবু সুফিয়ানের স্ত্রী উৎবার কন্যা একবার রাসূল (সা)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলেনঃ 'হে আল্লাহর রাসূল, আমার স্বামী আবু সুফিয়ান কৃপণ লোক। সে আমার এবং সন্তানদের প্রয়োজনীয় পরিমাণ ভরণ-পোষণ দেয় না। তবে আমি তাকে না জানিয়ে প্রয়োজন মত গ্রহণ করে থাকি। এ-কাজ কি জায়েয?' তখন নবী করীম (সা) তাঁকে বললেনঃ 'সাধারণ প্রচলন অনুযায়ী তোমার ও তোমার সন্তানাদির প্রয়োজনীয় পরিমাণ ভরণ-পোষণ তুমি গ্রহণ করতে পার।'[xiii]

অতএব দেখা যাচ্ছে, নারী উত্তরাধিকারসূত্রে পুরুষের অর্ধেক সম্পত্তি পেলেও তা অটুট থাকছে। পক্ষান্তরে, পুরুষের সম্পত্তি থেকে ব্যয়িত হচ্ছে নানা খাতে। এখন প্রশ্ন, যার উপর যাবতীয় আর্থিক দায়িত্ব চাপানো হল, আর যাকে তা দেওয়া হল না, তাদেরকে সমান সুযোগ-সুবিধা দেওয়া কি সুবিচার হতে পারে? একটি উদাহরণ নিন। পিতা তার কন্যার হাতে একশ' টাকা দিয়ে বললেন, 'এর পুরোটাই তোমার।' পুত্রের হাতে একশ' টাকা দিয়ে বললেন, 'এর থেকে এক কেজি লবন, এক পণ পান আর এক হালি ডিম কিনবে। বাকি যা থাকবে তা তোমার।' এ-ক্ষেত্রে পিতা কি পুত্রের প্রতি অবিচার করলেন না?

মিঃ র‍্যামসে ইসলামি উত্তরাধিকার সম্পর্কে যথার্থই বলেছেনঃ 'সভ্য জগত উত্তরাধিকার আইন সম্পর্কে এ যাবত যা কিছু জানতে পেরেছে, তার মধ্যে ইসলামি উত্তরাধিকার আইনই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি যুক্তিসম্মত এবং পূর্ণাঙ্গ।'[xiv]

ইসলাম-প্রদত্ত নারীর বাড়তি সুযোগ : উপরের আলোচনায় এটি পরিস্কার হয়ে গেছে যে, তামাম পৃথিবীতে যখন নারীকে নিতান্ত অস্থাবর সম্পত্তির মত ব্যবহার করা হত, তখন ইসলাম নারীকে পিতা-মাতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ঘোষণা করেছে। এখানেই শেষ নয়, তাকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করার জন্য কিছু বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। নারীর অর্থায়নের তেমন দু'টি প্রধান ক্ষেত্র এখানে উল্লেখ করা হল।

www.bjilibrary.com

ক. দেনমোহর : বিয়ের সময় বর তার নববধূকে নগদ অর্থ বা সম্পত্তি প্রদান করে। একেই বলে দেনমোহর। এটি দয়ার দান নয়, বরং স্ত্রীর অধিকার যা প্রদান করতে স্বয়ং আল্লাহ স্বামীদের নির্দেশ প্রদান করেছেন। তাই দেনমোহর প্রদান করা স্বামীর জন্য বাধ্যতামূলক। এটি প্রদান না করলে বিয়ে বৈধ হয় না। আল্লাহ তা'লা নির্দেশ দেন-

"স্ত্রীদের প্রাপ্য মোহরানা তাদেরকে প্রদান কর আন্তরিক খুশির সাথে এবং তাদের অধিকার মনে করে।" -- আল কুরআন।

মহানবী (সা) ইরশাদ করেন--

"যে লোক কোন মেয়েকে কম বেশি পরিমাণের মোহরানা দেবার ওয়াদায় বিয়ে করে অথচ তার মনে স্ত্রীর সে হক আদায় করবার ইচ্ছা থাকে না, সে কিয়ামাতের দিন আল্লাহর সম্মুখে ব্যভিচারী রূপে দাঁড়াতে বাধ্য হবে।"

দেনমোহরের পরিমাণ নিতান্ত তুচ্ছ হওয়া উচিত নয়। বরের আর্থিক অবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে আকর্ষণীয় পরিমাণ মোহর নির্ধারণ করা উচিত। স্বয়ং আল্লাহ বেশি মোহর প্রদানকে উৎসাহিত করেছেন। এ-প্রসঙ্গে হাদীস গ্রন্থে একটি ঘটনার উল্লেখ আছে।

একদিন হযরত উমার (রা) মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে মোহরানা সম্পর্কে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। তিনি বলছিলেনঃ 'সাবধান হে লোকেরা, স্ত্রীদের মোহরানা বাঁধতে গিয়ে কিছুমাত্র বাড়াবাড়ি কর না। মনে রেখ, মোহরানা যদি দুনিয়ায় মান-সম্মান বাড়াতো কিংবা আল্লাহর নিকট তাকওয়ার প্রমাণ হত, তাহলে অতিরিক্ত মোহরানা বাঁধার ক্ষেত্রে রাসূলে করীম (সা)ই ছিলেন তোমাদের অপেক্ষা বেশি অধিকারী ও যোগ্য। অথচ তিনি তাঁর স্ত্রীদের ও কন্যাদের মধ্যে কারো মোহরানাই বারো 'আউকিয়া'র (৪৮০ দিরহাম) বেশি ধার্য করেননি। মনে রাখা আবশ্যক যে, এক-একজন লোক তার স্ত্রীকে দেয় মোহরানার দরুন বড় বিপদে পড়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত সে নিজের স্ত্রীকে শত্রু বলে মনে করতে শুরু করে।' তাঁর এ-ভাষণ শুনে মহিলাদের মধ্য থেকে একজন উঠে দাঁড়িয়ে বললেনঃ 'আল্লাহ তো আমাদের দিচ্ছেন, আর তুমি হারাম করে দিচ্ছ? তুমি লোকদেরকে মেয়েদের মোহরানার পরিমাণ চারশ' দিরহামের বেশি বাঁধতে নিষেধ করছ? . . . তুমি কি শোননি, আল্লাহ তা'লা বলেছেনঃ 'তোমরা তোমাদের এক এক স্ত্রীকে মোহরানা দিচ্ছ বিপুল পরিমাণে'? তখন হযরত উমার (রা) বললেনঃ 'একজন নারী ঠিক বলতে পারল; কিন্তু ভুল করল একজন রাষ্ট্রনেতা।'

যে মহানবীর (সা) প্রতিটি কথা, কাজ এমনকি অনুমোদনও একজন মুসলিমের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ, তিনি উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা (রা), সাওদা (রা), হাফসা (রা), যায়নব (রা) এবং জুওয়াইরিয়া (রা) প্রত্যেককে চারশ' দিরহাম করে দেন মোহর দিয়েছিলেন। মাইমুনা (রা)-এর মোহর ছিল পাঁচশ' দিরহাম এবং উম্মু হাবিবা (রা)-কে দিয়েছিলেন চারশ' দিনার (স্বর্ণমুদ্রা)।[xv]

মহানবী (সা) বলেনঃ 'দশ দিরহামের কম মোহর হতে পারে না।'[xvi]

www.bjilibrary.com

প্রায় দেড় হাজার বছর আগের দশ দিরহাম এখনকার কত টাকার সমান তা গবেষণার বিষয়। তবে আমরা এটি জানি, মাত্র ৩৫০ বছর আগে আমাদের দেশে এক টাকায় আট মণ চাউল পাওয়া যেত। এ-থেকে অন্ততঃ এ-টুকু অনুমান করা যায়, সে-কালের দশ দিরহাম এখনকার হিসাবে বেশ বড় অংকের টাকা।

দেনমোহর এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, স্বামী যদি তা পরিশোধ না করে মারা যায়, তবে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে সর্বপ্রথম স্ত্রীর মোহরানা পরিশোধ করা হবে। এরপর অন্যান্য ঋণ পরিশোধ করতে হবে। তারপর কার্যকর হবে ওয়াসিয়াত বা উইল (মোট সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশের বেশি নয়)। এরপর যদি সম্পত্তি অবশিষ্ট থাকে, তবে তা উত্তরাধিকারীদেও মধ্যে বন্টিত হবে। যদি এমন হয়, স্ত্রীকে দেনমোহর পরিশোধ করার পর কোন সম্পত্তি অবশিষ্ট থাকছে না, সে-ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারীরা কিছুই পাবে না।[xvii]

খ. স্বামীর সম্পত্তিতে অংশ : নারীর অর্থ-সম্পত্তি লাভের আরেকটি উৎস হল স্বামীর উত্তরাধিকার। এটি কুরআনে সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। স্বামীর সন্তান-সন্ততি থাকলে স্ত্রী তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির আট ভাগের এক ভাগ পাবে। আর যদি সন্ত ানাদি না থাকে, তবে স্ত্রী পাবে চার ভাগের এক ভাগ।

প্রশ্ন উঠতে পারে, স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রী যেমন উত্তরাধিকারী হয়, তেমনি স্ত্রীর মৃত্যুতেও তো স্বামী তার সম্পত্তির অংশ পেয়ে থাকে। তাহলে এটি কিভাবে স্ত্রীর বিশেষ সুবিধা হল? এর জবাব হল, স্বামী জীবিত রেখে স্ত্রীর মৃত্যুবরণ বিরল ঘটনা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে যা ঘটে তা হল, স্ত্রীর আগে স্বামী ইন্তেকাল করে এবং স্ত্রী তার উত্তরাধিকারী হয়। পৃথিবীর সকল দেশের সকল সমাজে বিপত্নীকের চেয়ে বিধবা দেখা যায় অনেক বেশি। এর কারণ হল, পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে নারীর গড় আয়ু পুরুষের তুলনায় বেশি।[xviii] এ-সম্পর্কে বিশিষ্ট নারীবাদী গবেষক হিলারি এম, লিপস বলেন-

"এক গুচ্ছ জটিল কারণে, নারীরা সংখ্যায় পুরুষকে ছাড়িয়ে যায়। এটা (অর্থাৎ নারীর সংখ্যাধিক্য) শুরু হয় তারুণ্যের প্রথম ভাগে আর বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে এই ব্যবধান বাড়তে থাকে। বয়স্ক লোকদের মধ্যে পুরুষের তুলনায় নারী বহুগুণ বেশি।"[xix]

অতএব দেখা যাচ্ছে, ইসলাম নারীকে পিতা-মাতার সম্পত্তিতে অংশ দিয়েছে, স্বামীর নিকট থেকে আকর্ষণীয় অঙ্কের দেনমোহরের ব্যবস্থা করেছে আবার স্বামীর সম্পত্তি থেকেও অংশ প্রদান করেছে। এ-ভাবে বেশ কয়েকটি উৎস থেকে তার প্রাপ্তিযোগ ঘটছে। কিন্তু তার উপরে কোন ব্যয়ভার অর্পণ করা হয়নি। এটিই হল ইসলামের ইনসাফপূর্ণ ব্যবস্থা।

নারীবাদীর পাল্টা যুক্তি– পেশা গ্রহণের প্রত্যয় : এতক্ষণের আলোচনা অনেক নারীকে সন্তুষ্ট করলেও সকলকে করতে পারবে এতটা আশা করা যায় না। কারণ, আরো এক ধাপ আগে বাড়বার মত নারীবাদী আমাদের সমাজে বিরল নয়। তারা হয়ত বলে বসবেন, যে শর্তে পুরুষ নারীর দ্বিগুণ সম্পত্তি পাচ্ছে (অর্থাৎ আর্থিক দায়িত্ব পালন), সে-

www.bjilibrary.com

শর্ত নারীও মেনে নেবে। পুরুষের মত নারীও পারিবারিক ব্যয় নির্বাহে অংশ নেবে। এতে অন্ততঃ পরিবারে মর্যাদা তো বাড়বে। তাকে অবহেলার পাত্রী হয়ে থাকতে হবে না। স্বামী এবং তার স্বজনদের দুর্ব্যবহার তাকে সইতে হবে না। বিভিন্ন পারিবারিক ব্যাপারে মতামত দেবার অধিকার সে লাভ করবে। তাকে স্বামীর কৃপার পাত্রী হয়ে থাকতে হবে না।

মুক্তিকামী নারী প্রত্যয় ব্যক্ত করে, তারা সবাই পুরুষের মত কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবে। তারা রোজগার করবে এবং তার একটা অংশ পরিবারের জন্য ব্যয় করবে। এভাবে পুরুষের সমান উত্তরাধিকার লাভের জন্য (এবং সমাজে মর্যাদা ও মুক্তি লাভের জন্য) তারা এক গুরুতর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

নারীর পেশাগ্রহণে সৃষ্ট সমস্যাবলীঃ নারীর পেশাগ্রহণের প্রত্যয়কে গুরুতর এই জন্য বলছি যে, এই সিদ্ধান্ত সাধারণভাবে সমাজের জন্য এবং বিশেষভাবে তাদের নিজেদের জন্য চরম বিপর্যয় ডেকে আনে। নারী কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করলে অর্থাৎ উপার্জনের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিলে তার আত্মা শৃংখলিত হয়, পরিবার নামক অতিগুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানটি ব্যর্থ হয়ে যায় এবং নানা সঙ্কটে সমাজ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। নারী ব্যাপকভাবে পেশা গ্রহণ করলে যে-সব সমস্যার উদ্ভব হয়, সে-গুলো এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

ক. অনাত্মীয় লোকের শাসনের অধীন : ইসলাম স্বামীকে পরিবারের কর্তা তথা প্রধান বলে ঘোষণা করেছে। এতে নারীবাদীরা নাখোশ, বরং বলা যায়, দারুণ ক্ষুব্ধ। তারা বুঝতে চেষ্টা করেন না, পরিবার একটি প্রতিষ্ঠান; আর কোন প্রতিষ্ঠানই একজন কর্তার নিয়ন্ত্রণ ছাড়া চলতে পারে না। যাহোক, স্বামীর কর্তৃত্ব নারীর অহমিকায় আঘাত করে। তারা এই কর্তৃত্বে সমঅংশীদার হতে চান। আর সে-জন্যই তারা পেশা গ্রহণ করেন। কিন্তু পরিহাসের বিষয় হল, একটি কর্তৃত্ব নস্যাৎ করতে তারা আরেকটিকে বরণ করে নেন। পরিবারের কর্তা হলেন আত্মার আত্মীয়, অতি আপনজন। পক্ষান্তরে, অফিসের কর্তা নিতান্তই বাইরের মানুষ। পরিবারের কর্তা যদি-বা কখনো তিরস্কার করেন, পরে অনুতপ্তও হন; আপ্রাণ প্রয়াসে অভিমানী স্ত্রীর মান ভাঙান। অথচ, অফিসের কর্তা যখন তিরস্কার করেন, তখন তিনি এই ভেবে আত্মতৃপ্তি বোধ করেন যে, মেয়েটির এ-শিক্ষার প্রয়োজন ছিল। কোন কাজে এক-আধ ঘণ্টা বিলম্ব হলে কিংবা কোন ত্রুটি হয়ে গেলে স্বামী সাধারণতঃ তা উপেক্ষা করে থাকেন। কিন্তু এ-সব ক্ষেত্রে অফিসের কর্তা কঠোর, ক্ষমাহীন। স্বামী অনেক সময় স্ত্রীর অনুযোগ, অভিযোগ এমনকি তিরস্কার হাসিমুখে সয়ে যান। অপরপক্ষে, অফিসের কর্মকর্তার সাথে সামান্যতম অসৌজন্যমূলক আচরণও গুরুতর অপরাধ বলে বিবেচিত হয়। নারী এ-ভাবে স্বাধীনতার চকচকে মোড়কে অবমাননাকর পরাধীনতা কিনে নেয়। স্বজনের দশ কথাও সয়; অপরের একটাও নয়— এই সোজা কথাটি নারীবাদীরা কেন যেন বুঝতে চান না।

www.bjilibrary.com

খ. কর্মস্থলে যৌন নিপীড়ন : বিশিষ্ট নারীবাদী এলিজাবেথ স্ট্যানকো যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলীয় একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নবীন শিক্ষিকা ছিলেন। সে-সময় তিনি এবং আরো অনেক নারী উর্ধ্বতন কর্মকর্তার যৌন হয়রানির শিকার হন। প্রায় ছয় মাসকাল তাঁকে অফিসে চুম্বন করা হত, তাঁর পোষাক নিয়ে মন্তব্য করা হত এবং যৌন ইঙ্গিতমূলক কথা বলা হত। তিনি লক্ষ্য করতেন, তাঁর অন্যান্য নারী সহকর্মীও একই ধরনের হয়রানির শিকার হচ্ছেন। এতে তিনি অসাচ্ছন্দ বোধ করতেন, বিব্রত এবং অপমাণিত বোধ করতেন। নিজেকে খুব অসহায় মনে হত তাঁর। তাঁদের বিভাগের আটজন কর্মকর্তার মধ্যে তিনজন ছিলেন নারী। তাঁদের প্রত্যেকেরই একই রকম তিক্ত অভিজ্ঞতা ছিল যা তাঁরা পরস্পরকে জানাতেন। যে লোকটিকে তিনি খুব সম্মান করতেন, তাঁর কাছ থেকে এ-ধরণের আচরণ পেয়ে প্রথমে তিনি অবাক হয়েছিলেন। সেই ঘটনার পরে অনেক দিন অতিক্রান্ত হয়েছে। এখনও তিনি সেই বিভাগীয় প্রধানের নাম নিতে ভয় পান পাছে আরো দুর্ব্যবহার পেতে হয়।[xx]

এ কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বরং পেশাজীবী নারীদেরকে অহরহ এ-ধরণের তিক্ত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়। অফিসে নারীর মান-ইজ্জতের কোন নিরাপত্তা থাকে না। পুরুষ সহকর্মীদের লোভাতুর দৃষ্টি আর আগ্রাসী হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাকে সদা সতর্ক থাকতে হয়, সংকুচিত হয়ে চলতে হয়। এরপরও তারা সহকর্মীদের হাতে অশেষ লাঞ্ছনার শিকার হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে Liz Kelly বলেনঃ

অর্থৎ- "যে-সব কর্মে নারীদেরকে পুরুষের সাথে লেন দেন করতে হয়, সে-সব ক্ষেত্রে যৌন নিপীড়ন ব্যাপক, উদাহরণস্বরূপ বারের কাজ, ক্যানটিনের কাজ, শিশুদের দেখাশোনা, ধোয়ামোছার কাজ, সরকারি চাকরী, জনসেবার কাজ, হাসপাতালের কাজ, পাঠাগারের কাজ, দোকানের কাজ, সমাজকর্ম, শিক্ষকতা ও পরিবহণের কাজ।"[xxi]

যৌন নিপীড়নের উপর জরিপ চালিয়ে Stanko বলেন যে, পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজ করেন এমন নারীদের প্রতি দুই জনের একজন তাদের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন। বাকি ৫০% এর কি এরূপ অভিজ্ঞতা নেই? আসলে এই অর্ধাংশ যৌন হয়রানিকে প্রশ্রয়ের দৃষ্টিতে দেখেন। তারা এহেন আচরণকে পুরুষের তোষামোদ বা চাটুকারিতা ভেবে সয়ে যান।[xxii]

কর্মস্থলে যৌন নিপীড়নের ঘটনা খুব দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। ১৯৯০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) নামক প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানির অভিযোগ করেছিলেন ৬,০০০ জন। পাঁচ বছর পরে ১৯৯৬ সালে অভিযোগের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৫,০০০।[xxiii]

সবচেয়ে সুশৃংখল এবং কঠোর অনুশাসনের অধীন একটি বিভাগ হল সামরিক বিভাগ।এখানে পান থেকে চুন খসলেও একজন সৈনিককে কঠোর শাস্তি পেতে হয়। অথচ বিস্ময়ের ব্যাপার হল, এই বিভাগে যৌন হয়রানি তো বটেই, ধর্ষণের ঘটনাও ঘটে

www.bjilibrary.com

থাকে আর এই হার অবিশ্বাস্য রকমের বেশি। সম্প্রতি হেরাল্ড ট্রিবিউনে এ-বিষয়ের উপর একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। তাতে ইরাক ও আফগান রণাঙ্গনে যুদ্ধরত মার্কিন নারী সৈনিকদের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা বলা হয়েছে। এই প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, শতকরা ৩৩ ভাগ নারী সৈনিক ধর্ষিতা হয়েছে এবং ৭০ থেকে ৯০ ভাগ হয়েছে যৌন হয়রানির শিকার। তারা করুণ কণ্ঠে জানিয়েছে, শত্রুদের দ্বারা তারা যতটা আক্রান্ত হয়, সহযোদ্ধাদের দ্বারা আক্রান্ত হয় তার চেয়ে বহুগুণ বেশি।[xxiv] কী করুণ এই নারীদের জীবন!

উপরের আলোচনা কারো মধ্যে এ-ধারণার জন্ম দিতে পারে যে, এটা বোধহয় কেবল যুক্তরাষ্ট্রের সমস্যা। ব্যাপারটা কিন্তু মোটেই তেমন নয়। পাশ্চাত্যে তো বটেই, পাশ্চাত্যের ভাবাদর্শে গঠিত প্রাচ্যের অনেক দেশেও এটা এক বড় সমস্যা। কর্মস্থলে যৌন হয়রানি জাপানে ব্যাপক। সে দেশের নারীকর্মীদের বক্ষসম্পদ সম্পর্কে অশ্লীল মন্তব্য করা হয়। একা পেলেই তাদেরকে জাপটে ধরা হয়, শরীরের গোপন অঙ্গসমূহে হস্তচালনা করা হয়। নারীকে চাকরি বাঁচানোর জন্য মুখ বুজে 'শোকুবা নো হানা' অর্থাৎ 'অফিসের ফুল' এর ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করে যেতে হয়।[xxv]

কী করুণ এই নারীদের জীবন! তারা একটু মর্যাদা লাভের আশায় কত অমর্যাদাকর জীবন বেছে নিয়েছে! পরিবারে স্বামীর অন্যায়ের অন্ততঃ প্রতিবাদ করা যায়, অনেক সময় বিদ্রোহও করা যায়। এখানে সে সুযোগও নেই। সাধারণতঃ এই হেনস্তাকারীরা উর্ধ্বতন কর্মকর্তা হয়ে থাকে। তারা চাকরিতে অসুবিধা সৃষ্টির ভয় দেখিয়ে (quid pro quo) তাদের দাবী আদায় করে থাকে । দাবী অগ্রাহ্য করলে কিংবা অভিযোগ করলে তার পরিণতি ভোগ করতে হয়ঃ কাজের বোঝা বেড়ে যায়, বেতনবৃদ্ধি এবং পদোন্নতি থেমে যায়, অনুবেদন (Reference /ACR) হয়ে যায় সমস্যাপূর্ণ।[xxvi]

গ. ব্যভিচারের বিস্তার ঃ বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ সমগ্র জীবজগতের এক অতি সাধারণ বাস্তবতা। মানব জাতিতে এ-আকর্ষণ ইতর প্রাণীদের তুলনায় বহুগুণ বেশি। কারণ মানুষের মধ্যে জৈবিক আকর্ষণ তো আছেই, সেই সাথে আছে প্রবল মানসিক আকর্ষণ। সুরূপ, সুকণ্ঠ, সুঘ্রাণ— অনেক কিছুই মানুষের মনকে আকৃষ্ট করে। এই আকর্ষণ যেমন কল্যাণকর হতে পারে, তেমনি বিপর্যয়েরও কারণ হতে পারে। এই আকর্ষণে মানুষ ঘর বাঁধে, আবার এতেই ঘর ভাঙে।

নারী কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করলে অবাধ মেলামেশার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তাকে পুরুষ-সহকর্মীর পাশে থাকতে হয়। দিনের বেশিরভাগ সময় নারীকে তাদের সান্নিধ্যে কাটাতে হয়। দিনের পর দিন এ-ভাবে চলতে থাকলে তারা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে। এ থেকে পরকীয় তথা অবৈধ যৌন সম্পর্ক গড়ে ওঠে।[xxvii] আর এ-ভাবে পারিবারিক জীবনে অবিশ্বাস, অশান্তি, এমনকি ভাঙনও ধরে থাকে। কারণ, স্বামী-স্ত্রী কেউ-ই তাদের সম্পর্কের মধ্যে তৃতীয় কাউকে বরদাশত করে

www.bjilibrary.com

না। এমনকি অবাধ যৌনতার স্বর্গরাজ্য পাশ্চাত্যেও কেউ পরকীয় সম্পর্ক মেনে নিতে চায় না। এ-সম্পর্কে মার্কিন সমাজ বিজ্ঞানী ই, এম, ডুভাল বলেনঃ

"সাক্ষ্য-প্রমাণ রয়েছে যে, অধিকাংশ স্বামী এবং স্ত্রী দাম্পত্য বিশ্বাস ভঙ্গের প্রতি এমন আবেগীয় প্রতিক্রিয়া দেখায় যে, তাতে বৈবাহিক সম্পর্কহানি ঘটে।"[xxviii] পাশ্চাত্যে বিবাহ-বিচ্ছেদের হার অস্বাভাবিক রকম বেশি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বছর গড়ে ২.৪ মিলিয়ন বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। আর এক বছর সময়কালে ১.২ মিলিয়ন বিয়ে ভেঙে যায়। এই যে শতকরা ৫০ ভাগ বিবাহ-বিচ্ছেদ— এগুলো ঘটে বিয়ের দুই থেকে ছয় বছরের মধ্যে।[xxix] তাছাড়া, অবাধ মেলামেশার পথ ধরে আরো অনেক মারাত্মক সামাজিক সমস্যা মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়ে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, কুমারী অবস্থায় মাতৃত্ব, গর্ভপাত, অবৈধ সন্তান প্রসব এবং যৌনরোগ। যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিদিন গড়ে ২,৭৪০ জন অবিবাহিতা নারী গর্ভবতী হয়ে পড়ে।[xxx] এই হিসাবে বছরে দশ লক্ষেরও বেশি কুমারী গর্ভবতী হয়। ডুভাল এটাকে মহামারী (epidemic) বলে উল্লেখ করেছেন। এ-সব ঘটনার বেশিরভাগই শেষ হয় গর্ভপাত তথা ভ্রূণহত্যার মধ্য দিয়ে। তারপরও এই দেশটিতে প্রতি বছর যত শিশু জন্মগ্রহণ করে, তার ৩২.৮% হল বিবাহ-বহির্ভূত। অর্থাৎ প্রায় তিন জনের মধ্যে একজনই জারজ সন্তান।[xxxi] এরপর আসে যৌনরোগের কথা। যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ২ কোটি ৭০ লক্ষ লোক যৌনরোগে ভুগছে। এই সংখ্যার সাথে প্রতি বছর ৫ লক্ষ নতুন রোগী যুক্ত হয়। এর মধ্যে দুটি রোগ হল ভাইরাস জনিত এবং এদের কোন চিকিৎসা নেই— একটি হল জেনিটাল হার্পিস, অপরটি এইডস।[xxxii]

অতএব দেখা যাচ্ছে, অবাধ মেলামেশা সমাজ-জীবনে চরম বিপর্যয় সৃষ্টি করে। নারী পেশাজগতে প্রবেশ করলে অবাধ মেলামেশার ব্যাপকতা অনেক বেড়ে যাবে আর সেই সাথে বেড়ে যাবে নানা রকম সামাজিক ব্যাধি।

ঘ. দ্বিগুণ কাজের বোঝা: পুরুষের তুলনায় নারী অন্ততঃ শারীরিকভাবে দুর্বল— এটা এমন এক সত্য যা ব্যাখ্যা করার অবকাশ রাখে না। এ প্রসঙ্গে অনেকে বলে থাকেন, নারী যুদ্ধ করছে, ভারোত্তোলন করছে, বিমান চালাচ্ছে— এক কথায় পুরুষ যা যা করতে পারে, নারীও সে-সব করে তার যোগ্যতার প্রমাণ রাখছে। প্রসঙ্গ কিন্তু কোন কাজ করা বা না-করা নয়। বরং সাধারণভাবে পুরুষের শারীরিক যোগ্যতা নারীর তুলনায় বেশি— এটাই কথা। নারীবাদীরা আরেকটা ভুল করেন, তারা কোন একটি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নারীকে সাধারণ পুরুষের সাথে তুলনা করেন। দক্ষতাসম্পন্ন নারীর তুলনা দক্ষ পুরুষের সাথেই হওয়া উচিত। একজন কুস্তিবিদ নারীকে পুরুষ কুস্তিবিদের সাথে, নারী এ্যাথলিটকে পুরুষ এ্যাথলিটের সাথে তুলনা করলে এই দুই শ্রেণীর শারীরিক যোগ্যতার পার্থক্য সহজেই উপলব্ধি করা যাবে।

যাহোক, শারীরীকভাবে দুর্বল এই শ্রেণীটির প্রতি সুবিচার করতে হলে তাদের উপর অপেক্ষাকৃত লঘু দায়িত্ব অর্পণ করতে হবে। এটিই প্রকৃতির দাবী; বিবেকের দাবীও বটে।

www.bjilibrary.com

অথচ নারীবাদীদের উপরোক্ত ব্যবস্থাপত্রে এ-দাবী শুধু উপেক্ষিতই হয় না, পদদলিতও হয়। কোমলাঙ্গী, কোমলস্বভাবা নারীকে তার প্রকৃতিঅনুগ সহজসাধ্য কাজে উৎসাহিত না করে তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে পুরুষের দ্বিগুণ কাজের এক দুঃসহ বোঝা। এ-বোঝার ভাবে নারী যখন ন্যুব্জ হয়ে পড়ে, তখন তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয় 'তুমি অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন করেছ'। অথচ এর জন্য তাকে কতটা মূল্য দিতে হয় তা অনেকেই অনুধাবন করেন না।

একজন পেশাজীবী নারীর পেশার সাথে সংশ্লিষ্ট কাজই সব নয়, যেটা একজন পুরুষের ক্ষেত্রে সত্য। ঘুম থেকে উঠেই নারী তার স্বাভাবিক কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে। প্রায় তিন ঘন্টা গৃহকর্ম এবং সন্তানের যত্ন-আত্তিতেই কেটে যায়। এরপর তাকে ঝটপট্ তৈরি হয়ে নিয়ে ছুটতে হয় বাইরের কর্মক্ষেত্রে। এখানে তার জন্য অপেক্ষা করে পুরুষের সমপরিমাণ কাজের বোঝা। দিনের শেষে শ্রান্ত নারী গৃহে ফেরে। সেখানে তার জন্য পড়ে আছে এক দঙ্গল কাজ। আবার তাকে নিয়োজিত হতে হয় গৃহকর্মে এবং সন্তান পালনে। স্বামীটি কিন্ত এতসব ঝামেলার ধার দিয়েও যান না। তিনি বড়জোর অফিস থেকে ফেরার পথে কিছু সংক্ষিপ্ত বাজার করে আনেন। ব্যস, তার দায়িত্ব শেষ। এরপর তিনি চলেন বন্ধু-বান্ধবের সাথে আড্ডা দিতে কোন ক্লাবে কিংবা কফি হাউসে। বেচারী বৌটাকে হয়ত তখনো হাঁড়ি ঠেলতে হচ্ছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে একজন নারীকে বাইরের কর্মক্ষেত্রে পুরুষের সমপরিমাণ কাজ তো করতেই হচ্ছে, সেই সঙ্গে তাকে করতে হচ্ছে পাঁচ থেকে ছয় ঘন্টার গৃহকর্ম ও সন্তান পালন— যেটা পুরুষকে করতে হচ্ছে না। এ-ভাবে একজন পেশাজীবী নারীকে পুরুষের প্রায় দ্বিগুণ কাজ করতে হয়।

বলা হতে পারে, গৃহকর্মও নারী-পুরুষ সমান ভাগ করে নেবে। নারী যখন পরিবারের জন্য বাড়তি আয় করবে, তখন পুরুষই-বা গৃহকর্মে সাহায্য করবে না কেন? এর উত্তরে বলতে হয়, বাস্তবে কিন্তু পুরুষ তা করে না। শুধু আমাদের দেশেই নয়, যারা নারীদের প্রতি সবচেয়ে সহানুভূতিশীল এবং উদার দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী বলে দাবী করে, সেই ইউরোপ-আমেরিকার দেশগুলোতেও পুরুষেরা গৃহকর্মে সাহায্য করে না। মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী E.M. Duvall তাঁর নিজ দেশের চিত্র তুলে ধরেছেন এ-ভাবে ঃ

"পেশাজীবী মায়েদের এখনো সারাটা দিনের পেশাগত কর্মের শেষে পাঁচ থেকে ছয় ঘন্টাব্যাপী গৃহকর্ম ও সন্তান পালন করতে হয়। সম্ভবতঃ পেশাজীবী এবং অপেশাজীবী উভয় প্রকার স্ত্রীরা সমপরিমাণ গৃহস্থালির কাজকর্ম করে থাকে। স্বামীদের খুব কমই এমনতরো সমস্যায় পড়তে হয়। কারণ, 'দিনের পরিশ্রম' শেষে তারা সাধারণতঃ গৃহকর্মকে তাদের দায়িত্ব বলে মনে করে না।"[xxxiii]

এ হল এমন এক সমাজের খন্ডচিত্র যে-সমাজে নারী শতাব্দীকাল পূর্বেই মুক্তিপ্রাপ্ত। এ চিত্র এঁকেছেন যিনি, তিনি মুক্তিপ্রাপ্ত নারীসমাজেরই এক সচেতন প্রতিনিধি। আর অভিযুক্ত পুরুষ সমাজের এক খ্যাতিমান প্রতিনিধি মনোবিজ্ঞানী James C. Coleman এ চিত্রের সত্যায়ন করেছেনঃ

www.bjilibrary.com

"অদ্যাবধি গৃহকর্ম এবং শিশু পালনের দায়িত্বের অধিকাংশই স্ত্রীরা পালন করে থাকে। এ-সব মহিলারা অধিকাংশই আবার বাইরের পেশার সাথে সংশ্লিষ্ট। ফলে, স্ত্রী, মা এবং পেশাজীবী হিসাবে দায়িত্বপালন করতে গিয়ে তারা প্রচন্ড চাপের সম্মুখীন হয়— যেটা অসম্ভব না হলেও প্রায়ই কঠিন হয়ে থাকে।"[xxxiv]

আজ পশ্চিমের নারীসমাজ বুঝে গেছে, যুগ যুগ ধরে যে-সব কাজ পুরুষের বলে বিবেচিত হয়ে আসছে, তা নারীদের দিয়ে করিয়ে নিলেও, পুরুষেরা সে-সব কাজে তাদেরকে সাহায্য করছে না, যা বিশেষভাবে নারীর কাজ বলে মনে করা হয়। আর এই প্রতারণার উপলব্ধি তাদেরকে ক্ষুব্ধ করছে, তারা আক্রোশে ফুঁসে উঠছে। সমাজবিজ্ঞানী Jeff Grabmeier বলেনঃ

"অর্ধেকেরও বেশি নারী তাদের স্বামী বা সঙ্গীর প্রতি রাগ, শত্রুতা ও আক্রোশ প্রকাশ করেছে সন্তান পালন ও গৃহকর্মে অংশ না নেবার জন্য।"[xxxv]

যে সমাজ 'নারীমুক্তি' আন্দোলনের সুতিকাগার সেই সমাজে নারীর অবস্থা এই। সেখানে গৃহউদ্ধার করতে গিয়ে, দেশোদ্ধার করতে গিয়ে অসহায়া নারীর নাভিশ্বাস ওঠে। অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন করতে গিয়ে তারা হয়ে গেছে বিরামহীন মেশিন। পুরুষ তাকে সান্তনার বাণী শুনায় 'নারী তুমি মুক্ত; পুরুষের সমমর্যাদায় আসীন'। এই যদি মুক্তি আর মর্যাদা হয়, তাহলে নির্যাতন আর কাকে বলে?

ঙ. অবহেলিত দাম্পত্য জীবনঃ যে পরিবারে স্বামী-স্ত্রী দু'জনই চাকুরিজীবী, সে-পরিবারে সমৃদ্ধি থাকলেও সুখ থাকে না। নারীকে পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বীর ভূমিকায় অবতীর্ণ করে তার উপর দুর্বহ বোঝা চাপিয়ে দেবার বিষময় ফল প্রথমেই প্রকাশ পায় দাম্পত্য জীবনে। একঘেঁয়ে কর্মক্লান্ত দিনের শেষে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই ফেরে পরিশ্রান্ত, বিধ্বস্ত অবস্থায়। দু'দন্ডের আবেগঘন সান্নিধ্য তাদের জন্য বড় দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়ে। মার্কিন সমাজ বিজ্ঞানী ডায়ার যথার্থই বলেছেনঃ

"আজ অধিক সংখ্যক স্ত্রী তাদের বৈবাহিক ও সাংসারিক ভূমিকার সাথে পেশাগত ভূমিকা জুড়ে নিয়েছে। যার ফলে দিনের শেষে অবসন্ন হয়ে পড়াটা বিরল ঘটনা নয়— আর ক্লান্তি যৌন আকাঙ্খার জন্য অনুকূল নয়।"[xxxvi]

এ-প্রসঙ্গে অন্যত্র বলা হয়েছে—

"আমাদের বর্তমান ধর্মনিরপেক্ষ, শহুরে সমাজে বাইরের জগত এবং পরিবারের মধ্যে অধিকতর প্রতিযোগিতা চলছে। সমানাধিকার এবং নারীবাদ বিবাহিতা নারীর সম্মুখে বাইরের জগতকে উন্মুক্ত করে দিয়েছে এবং পেশাসহ পরিবার বহির্ভূত ক্রিয়াকর্মে অংশগ্রহণের তাকিদ দিচ্ছে। এই সংকটাবস্থা অনেক দ্বিমুখী কর্মগ্রহণকারী পরিবারেই আজ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এ-ধরণের দম্পতির জন্য বিবাহোত্তর সুসমন্বিত সম্পর্ক স্থাপন ১৯ শতকের ঐতিহ্যবাহী গ্রাম্য বৈবাহিক জীবনের তুলনায় সুদূর পরাহত।"[xxxvii]

www.bjilibrary.com

পশ্চিমা জগতের মানুষের কাছে আজ আর 'জীবনের জন্য অর্থ নয়, বরং অর্থের জন্য জীবন' হয়ে দাঁড়িয়েছে। অর্থ-সম্পদ এমনই এক বস্তু, যার জন্য তারা প্রেম-প্রীতি, পরিবার, শান্তি-স্বস্তি, সম্মান-সম্ভ্রম — সবকিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়ে গেছে। অর্থ আজ তাদের উপাস্য, শ্রম তাদের উপাসনা আর অফিস হল উপাসনালয়।

চ. শারীরিক নির্যাতন : যে মর্যাদা লাভের আশায় পুরুষের দ্বিগুণ কাজের দুর্বহ বোঝা মাথায় তুলে নেয় নারী, সেটাও যদি সে লাভ করত, তাহলেও অন্ততঃ এই ভেবে সে আত্মতৃপ্তি লাভ করতে পারত যে, তার অমানুষিক পরিশ্রম সার্থক হয়েছে। নারীর দুর্ভাগ্য, নিজের জীবনসঙ্গীর নিকট থেকে সে কাঙ্খিত সম্মান অর্জন করতে পারে না। পরিবারে তাকে স্বামীর নির্যাতনের শিকার হতে হয়। ১৯৯৯ সালে কানাডায় এক সাধারণ সামাজিক জরিপ পরিচালনা করা হয় সেই সব লোকের উপর যারা কোন না কোনভাবে আক্রমণের শিকার। এই জরিপ থেকে জানা যায়, ৪৬১,০০০ পরিবারের শিশুরা তাদের পিতা-মাতাকে মার-ধর করতে দেখেছে বা শুনেছে। উল্লেখ্য, অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্যাতনকারী হয় পিতা আর নির্যাতিত হয় মা।[xxxviii] জাতিসঙ্ঘের তত্ত্বাবধানে কলম্বিয়া, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্রসহ ১০টি দেশে ব্যাপক জরিপ পরিচালনা করে দেখা গেছে, প্রতি তিনজন নারীর মধ্যে একজন ঘনিষ্ঠ কোন পুরুষের দ্বারা শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই ঘনিষ্ঠজন হল স্বামী।[xxxix] জাপানেও স্ত্রী নির্যাতনের ঘটনা ব্যাপক। টোকিওতে পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায়, এক-তৃতীয়াংশ নারী তার স্বামী বা সঙ্গীর (লিভ টুগেদারের ক্ষেত্রে) নির্যাতনের শিকার হয়েছে।[xl]

পারিবারিক মারপিটের অস্বাভাবিক ব্যাপ্তি সম্পর্কে সমাজ বিজ্ঞানী Erich Goode বলেন-

"পরিবারের সদস্যদের মধ্যকার সহিংসতা অচেনা লোকদের সৃষ্ট সহিংসতার তুলনায় শত-সহস্র গুণ বেশি।. . . পুলিশ এবং সামরিক বিভাগ বাদ দিলে পরিবার হল সমাজের সবচেয়ে সহিংস প্রতিষ্ঠান।"[xli]

এ-কথা ভাববার অবকাশ নেই যে, এ-সব নির্যাতন নিতান্ত মামুলি ধরণের। বরং অনেক সময় প্রহারের ঘটনা মারাত্মক হয়ে থাকে। কখনো কখনো নির্যাতন সীমা ছাড়িয়ে যায় এবং স্ত্রীকে পালিয়ে বাঁচতে হয়। ১ এপ্রিল, ১৯৯৯ থেকে শুরু করে ৩১ মার্চ, ২০০০— এই এক বছর সময়কালে কানাডার ৫৭,২০০ নারী এবং ৩৯,২০০ শিশুকে ৪৪৮টি আশ্রয় কেন্দ্রে ভর্তি করা হয়। এদের অধিকাংশই পরিবারের সহিংসতা থেকে রক্ষা পাবার জন্য পালিয়ে আসে।[xlii] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পরিচালিত জরিপে দেখা যায়, গড়ে প্রতি ছয় দম্পতির মধ্যে এক দম্পতি জরিপের বছরটিতে হানাহানি করেছিল। এ-সব ঘটনার মধ্যে ৪০% ছিল মারাত্মক ধরণের।[xliii]

এই হল নারীর ব্যক্তিগত অর্জন! এই হল তার বাঞ্ছিত সম্মান! এটা পাবার জন্যই তার এত সংগ্রাম-সাধনা। এরই জন্য স্বামী-সন্তানকে দূরে ঠেলে দেওয়া, দ্বিগুণ কাজের দুর্বহ

www.bjilibrary.com

বোঝা কাঁধে তুলে নেওয়া, অপরের আজ্ঞাবহ হওয়া আর নিজের ইজ্জত-আব্রুকে ঝুঁকির মুখে ঠেলে দেওয়া।

ছ. অবহেলিত প্রজন্ম: নারীবাদীরা বড় যে ভুল করেন তা হল, সম-মর্যাদা আর সম-প্রকৃতি— বিষয় দু'টি একাকার করে ফেলেন। দু'জন মানুষ সমান, তার অর্থ এ নয় যে, তারা সর্ব বিষয়ে একই রকম। তাদের ঝোঁক প্রবণতা, চাহিদা, যোগ্যতা প্রভৃতিতে ভিন্নতা থাকতে পারে। এ-সব পার্থক্যের দিকে লক্ষ্য রেখে তাদের উপর দায়িত্ব অর্পণ করাই বিচক্ষণতা। একজনের ঝোঁক বৈজ্ঞানিক গবেষণায়; তাকে ল্যাবরেটরি থেকে উঠিয়ে এনে সাহিত্য-সমালোচনায় নিয়োজিত করা বিজ্ঞজনোচিত নয়। আরেকজন অবলীলায় কাব্য করতে পারেন; তাকে প্রকৃতির কোল থেকে টেনে হিঁচড়ে গবেষণাগারে পুরে দেওয়াটাও সুবিবেচনাপ্রসূত নয়।

নারী-পুরুষের স্বতন্ত্র শারীরিক এবং মানসিক বৈশিষ্ট্যই তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের স্মারক। অনাগত মানব-সন্তানকে ধারণের জন্যই নারীর মাতৃজঠর। সেখানে দীর্ঘ নয়মাস ধরে তিল তিল করে পূর্ণাঙ্গ মানব-শিশু হিসাবে গড়ে ওঠার জন্য রয়েছে অনুপম ব্যবস্থাপনা (supreme mechanism), গর্ভস্থ শিশুর পুষ্টিরও চমৎকার ব্যবস্থা রয়েছে তার মাতৃজঠরে। শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পর কঠিন খাদ্য গ্রহণে অক্ষম থাকে। তার জন্য পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট খাদ্যের ব্যবস্থা করা হয়েছে তার মায়ের বুকে। সন্তান ধারণ ও পালনের এ শারীরিক বৈশিষ্ট্যগুলি দিয়েই নারীকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এগুলি সুস্পষ্ট নির্দেশ করে সংসারে তার ভূমিকা কি হবে।

দৈহিক গঠনের ন্যায় নারীর মানসিক গঠনও তার সামাজিক ভূমিকার ইঙ্গিতবহ। তার স্নেহ-করুণা, কোমলতা-সহিষ্ণুতা তাকে সন্তান পালনের জন্য করেছে সম্পূর্ণ উপযোগী। তার স্নেহে-আদরে, শাসনে-সহিষ্ণুতায় দিনে দিনে বেড়ে ওঠে মানব-শিশু; গড়ে ওঠে ভাল মানুষ হয়ে, ভাল নাগরিক হয়ে। আর এভাবে একজন আদর্শ নাগরিক তৈরি করতে গিয়ে নারী সংসারের বড় অংকের খরচও বাঁচিয়ে দেয়, যেটা খরচ করার পরও প্রাপ্ত ফল মায়ের অবদানের কাছে তুচ্ছই থেকে যেত। মায়ের অবর্তমানে দুর্মূল্য বেবিফুড দিয়ে কাজ চালিয়ে নেওয়া যায় বটে, তাতে ইপ্সিত ফল লাভ হয় না। বেবিফুড দুর্মূল্য হলেও মায়ের দুধের বিকল্প নয়— এটা আজ সর্বজন স্বীকৃত। অর্থব্যয়ে সার্বক্ষণিক পরিচারিকা রেখে শিশুর দেখাশোনার ব্যবস্থা করা যায় বটে, তবে এতে করে শিশুর অকল্যানের মাত্রাবৃদ্ধিই ঘটে। আর পরোক্ষভাবে হলেও এর মাধ্যমে জাতীয় অকল্যাণের বীজ উপ্ত হয়। অবহেলিত, স্নেহবঞ্চিত শৈশব জাতীয় অস্তিত্বের জন্য মারাত্মক প্রমাণিত হয়। শিশুর শিক্ষার জন্য অর্থব্যয়ে সার্বক্ষণিক গৃহশিক্ষক রাখা সম্ভব। তবে, অকৃত্রিম স্নেহ-শাসনের অপূর্ব সমন্বয় সেখানে না থাকায় তা-ও হয়ে পড়ে ত্রুটিযুক্ত।

উপরোক্ত আলোচনায় দুটো বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এক. মা হল তার সন্তানের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট খাদ্যভাণ্ডার, শ্রেষ্ঠ পরিচারিকা এবং সার্বক্ষণিক আদর্শ গৃহশিক্ষিকা। দুই.

www.bjilibrary.com

বিকল্প পন্থায় এগুলি করিয়ে নিতে গেলে প্রচুর অর্থ ব্যয় করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তিন. প্রচুর অর্থ ব্যয়ের পরেও কাঙ্খিত ফল লাভ হয় না। অকৃত্রিম ছেড়ে কৃত্রিম, বিশুদ্ধ ছেড়ে ভেজাল গ্রহণে আর যা-ই থাক বিজ্ঞতা থাকতে পারে না।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, নারীর গৃহকর্মের অর্থনৈতিক মূল্য অপরিসীম। নারীর উদ্দেশ্যে একথা বলা অর্থহীন যে, দেশের অর্ধেক জনশক্তি বেকার। একজন গৃহবধু তার সংসারের জন্য, তার জাতির জন্য যে দায়িত্ব আঞ্জাম দেয় তা তুলনাবিহীন। আপন সংসার গঠনের মহান দায়িত্ব সে-ই পালন করে থাকে। তার সন্তানকে আচার-আচরণে, স্বভাব-চরিত্রে, শিক্ষা-দীক্ষায় সর্বাঙ্গ সুন্দর করে গড়ে তোলার দায়িত্ব পালন করে থাকে নারী। আপন গৃহ ছিমছাম, বাসোপযোগী করে রাখার দায়িত্বও তারই। এ দায়িত্ব পালিত না হলে, সন্তানাদি উচ্ছৃংখল অনাচারী হলে, বাসগৃহ নোংরা-অস্বাস্থ্যকর হলে সাংসারিক শান্তি উধাও হতে বাধ্য। মাতৃস্নেহ-বঞ্চিত শিশু নাগরিক হিসাবে হয় অযোগ্য। যে শিশুর প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা হল অনাদর, অবহেলা— সে পূর্ণাঙ্গ মানুষ হতে পারে না কোন দিনই। সে-ও কাউকে স্নেহ-ভালবাসা দিতে জানে না। তার শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশ ভারসাম্যপূর্ণ হয় না। তার মধ্যে গড়ে ওঠে মানসিক কাঠিন্য যা তাকে হিংস্র সন্ত্রাসী করে তোলে।

নারীদের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের হার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আজ আমেরিকায় যত শিশু আছে, তাদের অর্ধেকেরই মা পেশাজীবী। এই মায়েদেরকে শিশুর দেখা-শোনার জন্য ডে-কেয়ার, বেবি সীটার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সাহায্য নিতে হয়।[xliv]

এই শিশুদের দিনের উল্লেখযোগ্য সময় কাটে সম্পূর্ণ কৃত্রিমতাপূর্ণ পরিবেশে। পিতা-মাতা নিজেদের অফিসে ব্যস্ত সময় কাটান। তারা যখন ফিরে আসেন, তখন ক্লান্ত হয়ে পড়েন। সন্তানদের দিকে লক্ষ্য দেবার সময়-সুযোগ হয় না। সন্তানেরা স্নেহ-মমতা থেকে প্রতিদিন বঞ্চিত হয়। এ-প্রসঙ্গে সমাজবিজ্ঞানী David Popenoe বলেন-

"দুর্ভাগ্যবশতঃ, শিশুরা বয়স্কদের সাথে, বিশেষকরে, তাদের পিতা-মাতার সাথে যে পরিমাণ সময় কাটায়, তা নাটকীয়ভাবে কমে যাচ্ছে। অনুপস্থিত পিতা, পেশাজীবী মা, দূরে অবস্থানকারী দাদা-দাদী, বেনামী বিদ্যালয়, ক্ষণস্থায়ী সম্প্রদায়— এগুলোই হল আমাদের জামানার উৎকর্ষের ছাপ।"[xlv]

Brian Vaughn ও তাঁর সহযোগীদের গবেষণায় যে তথ্য বেরিয়ে আসে, তা শাশ্বত বিশ্বাসের খুবই অনুকূল। তাঁরা ১০০ টি পরিবারের এক থেকে দেড় বছর বয়সী শিশুদের নিয়ে গবেষণা করেন। তাঁরা দেখতে পান, যে-সব শিশু একেবারেই পারিবারিক পরিবেশে লালিত হয়, তারা মায়ের সাথে আবেগের বাঁধনে বাঁধা থাকে।[xlvi] ডে-কেয়ার সেন্টারে লালিত শিশুদের অবস্থা কেমন হয়? এ-সম্পর্কে Brian Vaughn বলেন-

"যে-সব শিশুকে এক বছর বয়সের আগে দিবা পরিচর্যা কেন্দ্রে (day care centre) রাখা হয়, তারা বিশেষ করে চাপের মুখে পড়লে তাদের মায়েদের থেকে দূরে থাকে।

www.bjilibrary.com

এইন্স ওয়ার্থের মতে এ-ধরণের অবস্থা তখন সৃষ্টি হয়, যখন মা তার শিশুর কাছে দুর্লভ হয়ে পড়ে। এই ধরণের অবস্থা থেকে পরবর্তীতে বাল্যকালে সৃষ্টি হয় সামাজিক ও আবেগীয় সমণ্বয়হীনতা।"[xlvii]

পরবর্তীতে সান্ড্রা স্কার ও তাঁর সহযাগীরা বারমুডা দ্বীপের ডে-কেয়ার এর উপর ছয় বছর গবেষণা করেন। এখানকার শতকরা ৯০ ভাগ শিশু যাদের বয়স দুই বছর, তারা মায়ের কাছে পালিত হবার পরিবর্তে অন্য কোথাও পালিত হয়। স্কার ও তাঁর সহযোগীরা দশটি ডে-কেয়ার সেন্টারকে সতর্কভাবে পর্যবেক্ষণ করেন এবং কমপক্ষে ৬ মাস যে-সব শিশু সেখানে পালিত হয়েছে, তাদের আচরণ মূল্যায়ন করেন। এই গবেষণার ফলাফল সম্পর্কে স্কার বলেনঃ

"যে-সব শিশুর শৈশবের অভিজ্ঞতা হল মায়ের কাছ থেকে দূরে থাকা এবং অপেক্ষাকৃত নিম্ন মানের পরিচর্যা, তাদের মধ্যে অন্যান্য বিদ্যালয়পূর্ব বয়সী শিশুর তুলনায় বেশি উদ্বিগ্নতা, শত্রুতা এবং অস্থিরতা দেখা যায়।"[xlviii]

David Popenoe বলেন-

"পরিবারসমূহের ভূমিকায় অবনতি ঘটার সবচেয়ে মারাত্মক প্রভাব পড়ে শিশুদের উপর। প্রমাণ থেকে বুঝা যায় যে, আমাদের জাতীয় ইতিহাসে শিশুদের বর্তমান প্রজন্মই হল প্রথম যারা মনস্তাত্বিক ও সামাজিকভাবে তাদের পিতা-মাতার চেয়ে খারাপ অবস্থায় আছে যখন তারা শিশু ছিলেন। যে-সব সামাজিক ব্যাধির আতংকজনক বৃদ্ধি ঘটেছে তা হল, কিশোর অপরাধ, সন্ত্রাস, আত্মহত্যা, মাদকাসক্তি, খাদ্যে অরুচি, কুমারী অবস্থায় মাতৃত্ব, মানসিক পীড়ন, উদ্বেগ এবং সার্বক্ষণিক বিমর্ষতা।"[xlix]

এই যে ব্যাপক এবং ব্যয়বহুল অপরাধ, এর সিংহভাগই হল কিশোর অপরাধ। এ সম্পর্কে বলা হচ্ছেঃ

"এসব মারাত্মক অপরাধের প্রায় অর্ধেকই সংঘটিত হয় ১৮ বছরের চেয়ে কম বয়স্ক লোকের দ্বারা; প্রায় ৭৫ শতাংশ সংঘটিত হয় ২৫ বছরের কম বয়স্ক লোকের দ্বারা।"[l]

সন্ত্রাস-সহিংসতার সয়লাব যুক্তরাষ্ট্রকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এক অন্ধকার অনিশ্চয়তার পথে। এর কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে এর পেছনে রয়েছে অনাদর-অবহেলার বিধ্বংসী ভূমিকা। অবহেলিত, অনাদৃত সন্তান আজ রুখে দাঁড়িয়েছে সেই সমাজের বিরুদ্ধে যে সমাজ তার এই বঞ্চনার কারণ। হিউস্টনের রাইস বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানী স্টিফেন ক্লিনবার্গ যথার্থই বলেছেনঃ

"আমরা গড়ে তুলেছি বাচ্চাদের এমন একটি প্রজন্ম যার গোটাটাই ভুগছে অবহেলায়। স্কুল থেকে বাসায় ফিরে তারা কাউকে পায় না। এই ধরণের অবহেলা ও বিচ্ছিন্নতার মধ্য দিয়ে জন্ম নিতে পারে এক ধরণের মানসিক কাঠিন্য যা তাকে সহজেই বানিয়ে তুলতে পারে হিংস্র ও সন্ত্রাসী।"[li]

www.bjilibrary.com

এ-ধরণের সামাজিক ব্যাধি বেড়ে যাওয়াকে পোপনো খুবই দুঃশ্চিন্তার কারণ বলে মনে করেন। কারণ, পঞ্চাশ বছর আগের তুলনায় এখনকার শিশুরা অনেক বেশি সুযোগ পাচ্ছে। শারীরিক বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য সুষম খাদ্য পাচ্ছে, শিক্ষার সুযোগ-সুবিধাও আগের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। যৌথ পরিবারের তুলনায় একক পরিবারে শিশুর সংখ্যা কম আর তাই বড়দের মনোযোগ পাবার সুযোগ বেড়েছে। শিশুদের প্রতি রাষ্ট্রীয় মনোযোগও বৃদ্ধি পেয়েছে। শিশুশ্রম নিষিদ্ধ হয়েছে, শিশুনির্যাতনের প্রতি সরকার এবং মানবাধিকার কর্মীরা সজাগ দৃষ্টি রাখে। পরিস্থিতি এত অনুকূলে আসার পরও বিপুল সংখ্যক শিশু নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এর মূলে রয়েছে অনাদর, অবহেলা আর বঞ্চনা।

কাজেই পরিবারের সুখের নীড় রচনা করতে হলে, রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ শৃংখলা, নিরাপত্তা ও উন্নয়ণ নিশ্চিত করতে হলে আর দেরি নয়, এখনই সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। সন্তানকে তার প্রাকৃতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত না করে মাতৃস্নেহে লালিত-পালিত হবার সুযোগ দিতে হবে। তবেই তারা সুসন্তান হিসাবে, সুনাগরিক হিসাবে গড়ে উঠবে। প্রকৃতির স্বাভাবিক গতিপথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির ফল সব সময়ই মারাত্মক হয়ে থাকে।

জ) বেকারত্ব ও সামাজিক সমস্যা বৃদ্ধিঃ নারীকে পেশা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে গিয়ে বলা হয়, কোন জাতি তার অর্ধেক জনশক্তিকে বেকার বসিয়ে রেখে কিভাবে উন্নতি করতে পারে? অতএব, জাতীয় উন্নয়নের স্বার্থে নারীকেও বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসতে হবে, কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে হবে। এই যুক্তি দেবার সময় একটা বিষয় লক্ষ্য করা হয় না যে, পৃথিবীতে খুব কম দেশই আছে যারা তাদের সকল কর্মক্ষম পুরুষ জনশক্তিকে কাজ দিতে সক্ষম। বরং অধিকাংশ দেশে কর্মসংস্থানের অভাবে অসংখ্য পুরুষ বেকার থেকে যায়। এরপর যদি নারী সমান উত্তরাধিকার অর্জন এবং অর্থনৈতিক মুক্তি লাভের আশায় ব্যাপকভাবে পেশা গ্রহণ শুরু করে, তবে পুরুষের বেকারত্ব বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যাবে। নারী যদি গৃহিনী হয়, তবে ঘর-গেরস্থালি নিয়ে, সন্তানাদি নিয়ে সহজেই সময় কাটিয়ে দিতে পারে। পুরুষ বেকার হলেই বিপদ। তারা নানা রকম সামাজিক সমস্যার জন্ম দিয়ে থাকে। মাদকাসক্তি, চুরি, ডাকাতি, সন্ত্রাস প্রভৃতির মাত্রাবৃদ্ধির জন্য যুবকদের বেকারত্ব বহুলাংশে দায়ী।

ইসলাম-নির্দেশিত সীমারেখাঃ প্রসঙ্গত: এটা মনে রাখা দরকার যে, ইসলামে নারীর পেশা গ্রহণ নিষিদ্ধ নয়। তবে ইসলাম এটাকে সাধারণভাবে নিরুৎসাহিত করে। নারীরা ব্যাপকভাবে পেশাজগতে প্রবেশ করে নিজের ইজ্জত, পরিবারের শান্তি, সন্তানের ভবিষ্যত এবং সমাজের স্থিতিশীলতাকে সংকটের আবর্তে নিক্ষেপ করবে— এটা ইসলাম সমর্থন করে না। তবে এই আসমানি জীবন-ব্যবস্থার এক অনন্য বৈশিষ্ট্য হল, বিকল্প পথ কখনো রুদ্ধ রাখা হয় না। জরুরি প্রয়োজন দেখা দিলে তথা বড় কোন সংকট মুকাবিলার জন্য নিষিদ্ধ কাজও সাময়িকভাবে বৈধতা পায়। মহানবী (সা)-এর গড়া মদীনার সোনালী সমাজে অনেক নারী বাণিজ্য পরিচালনা করতেন। তাঁরা সমাজকল্যাণমূলক কাজ করতেন, প্রয়োজনে যুদ্ধও করতেন। এ-প্রসঙ্গে সহীহ্ বুখারী ও

www.bjilibrary.com

মুসলিম শরিফের দু'টি হাদীস উল্লেখযোগ্য। হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, উম্মু সুলাইম ও কয়েকজন আনসার মহিলা মহানবী (সা)-এর সাথে জিহাদে অংশ গ্রহণ করেছেন।[iii] বুখারী শরিফের হাদীসটি বর্ণনা করেছেন রুবাইঈ বিনতে মু'আউবিয। তিনি বলেনঃ আমরা নবী (সা)-এর সাথে লড়াইতে অংশ নিতাম। আমরা মুজাহিদদের পানি পান করাতাম, তাদের সেবা-সুশ্রূষা করতাম। নিহত ও আহতদেরকে মদীনায় পাঠাতাম।[iii]

এ ছিল জাতির সংকটকালে সচেতন নারীদের স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসার দৃষ্টান্ত। তাঁদেরকে কখনোই নিয়মিত সেনাদলের সদস্য করা হয়নি। মহানবী (সা) কখনো নারীদেরকে যুদ্ধে অংশগ্রহণের নির্দেশ দেননি; এমনকি উৎসাহিতও করেননি। প্রয়োজনে তিনি পুরুষ সাহাবীদেরকে যুদ্ধে অংশ গ্রহণের জোর তাকিদ প্রদান করেছেন। যেমন, আল্লাহর নির্দেশক্রমে রাসূল (সা) প্রত্যেক সক্ষম পুরুষকে তাবুকের যুদ্ধে যোগ দেবার নির্দেশ জারি করেন। তবে নারীরা এই নির্দেশের বাইরে ছিলেন। তাইতো দেখা যায়, তাবুক অভিযান থেকে ফিরে মহানবী (সা) কা'ব ইবনে মালিক (রা), হিলাল ইবনে উমাইয়া (রা) এবং মুরারাহ ইবনে রুবাই (রা)-কে যুদ্ধে যোগদান না করার অপরাধে ৫০ দিন পর্যন্ত বয়কট করে রাখেন। অথচ তিনি কোন মহিলা সাহাবীকে যুদ্ধে যোগদান না করার জন্য অভিযুক্ত করেননি বা শাস্তি প্রদান করেননি।[iv]

জরুরি প্রয়োজন মিটাতে গৃহকর্মের বাইরে নারী অর্থ উপার্জন করেছে-- এরকম দৃষ্টান্তও মহানবী (সা)-এর গড়া মদীনার সমাজে বিরল নয়। হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) নিজের সহধর্মিনী যায়নবের কাছে এসে দেখলেন, তিনি চামড়া পাকা করার কাজ করছেন।[v] হযরত আয়িশা (রা) জানান, যায়নব (রা) এই কাজ করে যে অর্থ উপার্জন করতেন, তা আল্লাহর পথে ব্যয় করতেন।[vi] নারীর কৃষিকাজে অংশগ্রহণের দৃষ্টান্তও আমাদের সামনে মজুদ রয়েছে। জাবির (রা) বলেনঃ আমার খালাকে তালাক দেওয়া হলে তিনি ইদ্দতের মধ্যে গাছ থেকে খেজুর কাটতে চাইলেন। কিন্তু একটি লোক তাকে ঘর থেকে বের হতে নিষেধ করলেন। তিনি রাসূল (সা)-এর কাছে এসে অভিযোগ করলেন। তিনি (অর্থাৎ মহানবী) বললেন, 'হ্যাঁ, তুমি তোমার খেজুর কাটতে পার। তুমি তো ঐগুলো অবশ্যই দান করবে অথবা ভাল কাজে ব্যবহার করবে।' [vii] আসমা বিনতে আবিবকর (রা) বাগানে কাজ করেছেন। আসমা বিনতে মুহাররমা (রা) আতর বিক্রয় করে অর্থোপার্জন করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর স্ত্রী হাতে তৈরি করা শিল্পদ্রব্য বিক্রয় করে অর্থোপার্জন করতেন।[viii]

উপরের হাদীসগুলি বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই, সোনালী যুগের সচেতন নারীরা সমাজের বা পরিবারের দুর্দিনে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তবে পরিবারকেই তারা সাধারণভাবে আপন কর্মক্ষেত্র বলে মনে করতেন। পুরুষরা নারীদেরকে ঘরের রাণী করে রাখতেন। তাঁরা রাসূল (সা)-এর সকল বাণী যেমন প্রাণ দিয়ে পালন করতেন, তেমনিভাবে এ-বাণীকেও সমুন্নত রাখতেন-

www.bjilibrary.com

'তোমাদের মধ্যে সে-ই উত্তম, যে তার পরিজনের নিকট উত্তম।'

শেষ কথাঃ নারীকে পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বীর ভূমিকায় অবতীর্ণ করে তার মুক্তি অর্জন করা যাবে না। নারী-পুরুষ একে অপরের সহযোগী, প্রতিযোগী নয়। একে অপরের সহকর্মী, পরিপূরক। দু'জনের দু'টি কর্মধারার মিলনস্থল হল জীবন নামের মোহনা।

ইসলাম হল স্বভাব-ধর্ম (ফিৎরাত)। তাই ইসলামের বিধানগুলো মানব প্রকৃতির সাথে সাংঘর্ষিক নয়। মানুষের দেহমনের গঠন প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য রেখে ইসলাম তার দায়িত্ব ও কর্তব্য বাতলে দিয়েছে। পুরুষের উপর অর্পণ করেছে বাইরের শ্রমসাধ্য কর্মজগত। তার মনোদৈহিক গঠন এর সম্পূর্ণ উপযোগী। তার উপর অর্পণ করেছে পিতা-মাতা, স্ত্রী-পরিজনের ভরণ-পোষণ তথা যাবতীয় ব্যয়ভার। পুরুষ যেন তার উপর আরোপিত আর্থিক দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারে, সেজন্য তাকে নারীর দ্বিগুণ উত্তরাধিকার দেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে, ইসলাম নারীর উপর অর্পণ করেছে সন্তান পালন ও গৃহকর্মের দায়িত্ব। এটি তার মাতৃত্বের দাবী, তার নারীত্বের দাবী। এই দাবী যেন সে নিষ্ঠার সাথে আদায় করতে পারে, সে-জন্য তাকে অন্যান্য দায়িত্বের বোঝা থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে। আর এজন্যই তাকে সম্পত্তির অংশও দেওয়া হয়েছে কম। আল কুরআন নারীদের উদ্দেশ্যে বলেছেঃ 'তোমরা আপনাপন গৃহে শান্তির সাথে অবস্থান করো'। মহাজ্ঞানী আল্লাহ্ মানুষের স্রষ্টা। মানুষের যোগ্যতা, প্রবণতা তথা সকল বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একমাত্র তিনিই প্রকৃত ওয়াকিফহাল। তাই, মানুষের পূর্ণাঙ্গ চিত্র সামনে রেখে তিনি যে বিধান প্রণয়ন করেছেন তা হতে পেরেছে অভ্রান্ত, চিরন্তন। যোগ্যতা-প্রবণতার ভিত্তিতে কর্ম বিভাজনের এই একমাত্র যুক্তিসিদ্ধ নীতিকে গ্রহণ করার মধ্যেই কেবল নারীর মুক্তি এবং কল্যাণ নিহিত রয়েছে। ■

তথ্যপঞ্জী

i. সূরা আন নিসা, আয়াত-১১
ii. বাদাবী, ডঃ জামাল। ইসলামের সামাজিক সুবিচার। অনুঃ আবু খলদুন আল মাহমুদ, শারমিন ইসলাম। পৃ-৬০। দি পাইওনিয়ার, ঢাকা।
iii. আহমদ, ডঃ খুরশিদ। ইসলামের আহ্বান। অনুঃ মুহাম্মাদ নূরুল আমীন জওহর। পৃ-১৩১। ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ।
iv. দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম। ২য় সংস্করণ। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ। পৃ-৬৭৬।
v. সূরাঃ আল আনআম। আয়াতঃ ১৫১।
vi. আল কুরআন। সূরাঃ আল বাকারা; আয়াত-২১৫।
vii. মুসনাদে আহমাদ।। উদ্ধৃতঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম। পরিবার ও পারিবারিক জীবন। পৃ-৩৬৭।
viii. সহীহ্ মুসলিম। এছাড়াও দ্রষ্টব্যঃ আল আদাবুল মুফরাদ। অনুচ্ছেদঃ পিতা-মাতার খিদমত।
ix. আল কুরআন। সূরা- তালাক; আয়াত-৭

www.bjilibrary.com

x. সহীহ তিরমিযী।। উদ্ধৃতঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম। পরিবার ও পারিবারিক জীবন। পৃ-১৯০।
xi. বুখারী, ঈমাম। আল আদাবুল মুফরাদ। ৩য় সংস্করণ। অনুচ্ছেদ- তিনটি বোন প্রতিপালনকারী। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।
xii. সহীহ মুসলিম। উদ্ধৃত- পরিবার ও পারিবারিক জীবন। মাও. আব্দুর রহীম। খায়রুন প্রকাশনী। পৃ-৩৩৫। নাসায়ী শরীফেও অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে।
xiii. হাদিসটি সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম উভয় গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। উদ্ধৃতঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম। পরিবার ও পারিবারিক জীবন। পৃ-১৮৮।
xiv. ইউসুফুদ্দীন, ডঃ মুহাম্মদ। ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ। অনুঃ মুহাম্মাদ আব্দুল মতীন জালালাবাদী। ৩য় সংস্করণ। পৃ- ২০৭। ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ।
xv. দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম। পৃ-৪০৫। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।
xvi. দারু কুতনী। উদ্ধৃত-দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম। ২য় সংস্করণ। পৃ-৪০১। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।
xvii. তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন, ২য় খণ্ড। সূরা-নিসার ১২তম আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।
xviii. Lips, Hilary M. A New Psychology of Women. 2nd ed. P-294. McGraw Hill. Newyork.
xix. A New Psychology of Women. P-293.
xx. Stanko, Elizabeth A. Reading Danger: Sexual Harassment, Anticipation and Self-Protection. Compilation: Women, Violence and Male Power. Pp-51. Open University Press, USA.
xxi. Hester, Kelly, Radford. Women, Violence and Male-Power. p-25.
xxii. Sexual Harassment, Anticipation and Self-Protection . p-57
xxiii. Microsoft Reference Encarta Encyclopaedia. USA.
xxiv. দৈনিক ইত্তেফাক, বিশ্বসংবাদ, ২৮ মে, ২০০৮খৃঃ
xxv. Lips Hilari M. A New Psychology of Women. 2nd ed. Pp-274. Mcgrawhill, USA.
xxvi. Ibid. Pp-274.
xxvii. Duvall, Evelyn Millis. Marriage and Family Development. 5th ed. Pp-36. J.B. Lippincott Company. U.S.A. Also in `Abnormal Psychology and Modern Life' . James C. Coleman. 5th ed. Pp-585. Scott Foresman and Co. USA.
xxviii. Marriage and Family Development. pp-36.
xxix. Baron, Robert A. & Byrne, Donn. Social Psychology: Understanding Human Interaction. 7th ed. Pp-342. Prentice Hall. U.S.A.
xxx. Ibid. Pp-328.
xxxi. The World Almanac. 2001. Pp-873.
xxxii. Social Psychology: Understanding Human Interaction. Pp-329.
xxxiii. Marriage and Family Development. Pp-74.
xxxiv. Coleman, Morris, Glaros. Contemporary Psychology and Effective Behaviour. 6th ed. Pp-382.
xxxv. Grabmeier, Jeff. The Burden Women Bear: Why They Suffer More Distress Than Men. Taking Sides.12th ed. pp-67.

www.bjilibrary.com

xxxvi. Dyer, Everett D.. Courtship, Marriage and Family: American Style. Pp-184. The Dorsey Press. U.S.A.
xxxvii. Ibid. Pp-157.
xxxviii. Dauvergne, Mia & Johnson, Holly. Statistics Canada – Catalogue no. 85-002, Vol. 21, No. 6
xxxix. Social Problems. Annual Edition-02/03. p-92. McGraw-Hill
xl. A New Psychology of Women. pp-426.
xli. Goode, Erich. Deviant Behaviour. 3rd ed. Pp-215. Prentice Hall. USA.
xlii. Statistics Canada – Catalogue no. 85-002, Vol. 21, No. 6
xliii. Adler, Mueller, Laufer. Criminology. 3rd ed. P-299. Msgrawhill. USA.
xliv. Wortman, Loftus, Weaver. Psychology. 5th ed. P-357-358. McGraw-Hill College.
xlv. Popenoe, David. The American Family Crisis. Taking Sides. Pp-116
xlvi. Psychology. Pp-357-358
xlvii. Ibid. Pp-357-358
xlviii. Ibid. Pp-358
xlix. The American Family Crisis. Taking Sides. Pp-114
l. Abnormal Psychology and Modern Life. Pp-396.
li. হোসেন, দাউদ। সন্ত্রাসের কবলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (টাইম ম্যাগাজিন থেকে উদ্ধৃত)। সাপ্তাহিক রোববার। ২৯ আগস্ট, ১৯৯৩।
lii. সহীহ্ মুসলিম। অধ্যায়ঃ জিহাদ ও অভিযান। অনুচ্ছেদঃ পুরুষদের সাথে মেয়েদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ।উদ্ধৃতঃ অব্দুল হালিম আবু শুক্কাহ।রাসুলের যুগে নারী স্বাধীনতা। ৩য় খণ্ড; পৃ-৪৬।
liii. Sahih Al-Bukhari (Summarized). The Book of Jihad. Chapter: The Treatment of the Wounded by the Women during Holy Battles. Dar-us-Salam Publications. Riyadh, KSA.
liv. পুরুষ ও মহিলাদের স্বাভাবিক কর্মক্ষেত্র, এ.কে.এম. নাজির আহমদ, পৃ-৪৯। বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার , ঢাকা।
lv. সহীহ্ মুসলিম। বিবাহ অধ্যায়। উদ্ধৃতঃ অব্দুল হালিম আবু শুক্কাহ। রাসুলের যুগে নারী স্বাধীনতা। ১ম খণ্ড; পৃ-২২৪।
lvi. সহীহ্ মুসলিম। অধ্যায়ঃ সাহাবীদেও মর্যাদা। উদ্ধৃতঃ অব্দুল হালিম আবু শুক্কাহ। রাসুলের যুগে নারী স্বাধীনতা। ১ম খণ্ড; পৃ-২২৪।
lvii. সহীহ মুসলিম। তালাক অধ্যায়। উদ্ধৃতঃ অব্দুল হালিম আবু শুক্কাহ। রাসুলের যুগে নারী স্বাধীনতা। ১ম খণ্ড; পৃ-১৫৮।
lviii. পুরুষ ও মহিলাদের স্বাভাবিক কর্মক্ষেত্র, এ.কে.এম. নাজির আহমদ, পৃ-৬০। বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা।

লেখক-পরিচিতি : খোন্দকার রোকনুজ্জামান-সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, মেহেরপুর সরকারি কলেজ।

লেখা-পরিচিতি : প্রবন্ধটি অগাস্ট ২১, ২০০৮ তারিখে বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে উপস্থাপিত হয়।

www.bjilibrary.com

ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিক

শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির

■

শুরুর কথা : ইসলামে অমুসলিম

খালাকাল ইনসান। আল্লামাহুল বায়ান : তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে ভাব প্রকাশ করতে শিখিয়েছেন (সূরা আর রাহমান : ২-৩)। পৃথিবীর সব মানুষকে তিনিই সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষের মুখের হাজারো ভাষা তাঁরই সৃষ্টি। মানুষ আল্লাহর এক অনন্য সৃষ্টি। অতুলনীয় মর্যাদার অধিকারী। পৃথিবীর বুকে আল্লাহর প্রতিনিধি। আল্লাহ বলেন, তিনিই তোমাদেরকে দুনিয়ায় প্রতিনিধি করেছেন (সূরা আল আনআম : ১৬৫)। এ মর্যাদা আর কোন সৃষ্টির নেই। এত উঁচু মর্যাদা দিয়ে আল্লাহ তা আবার নিশ্চিত করেছেন এ কথা বলে, "হুয়াল্লাজি খালাকালাকুম মা ফীল আরদি জামিআ - 'তিনিই সে সত্তা যিনি মানুষের কল্যাণের জন্য পৃথিবীর সব কিছু তৈরি করেছেন' (সূরা আল বাকারা : ২৯)।" মানুষের হুকুম তামিল করার জন্য পৃথিবীর সবকিছুকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ। আর মানুষেকে সৃষ্টি করা হয়েছে শুধু আল্লাহর হুকুম পরিপালনের জন্য। পৃথিবীর সবকিছু মানুষের কল্যাণের জন্য, মানুষের হুকুম তামিল করার জন্য আর মানুষ তামিল করবে শুধু আল্লাহর হুকুম। অন্য কোন শক্তির নয়। মানুষ, আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদাত করবে না। আল্লাহ অভিভাবকসুলভ ভংগিতে মানুষের কাছে বিষয়টি তুলে ধরেছেন।

www.bjilibrary.com

আল্লাহ বলছেন- "কেমন করে তোমরা আল্লাহকে অস্বীকার করছো, অথচ তোমরা ছিলে নিস্প্রাণ। অতঃপর তিনিই তোমাদেরকে প্রাণদান করেছেন, আবার মৃত্যু দান করবেন। পুনরায় তোমাদেরকে জীবন দান করবেন। অত:পর তাঁরই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে" (সূরা আল বাকারা : ২৮)। মহান স্রষ্টা হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ মানুষকে তাঁর নিজের দেয়া মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে যে আহ্বান করেছেন তার প্রতি অবজ্ঞা, তাচ্ছিল্য, কপট বা দুমুখো আরচণ অথবা অস্বীকার করার মাধ্যমে মানুষ প্রকৃত সত্য বিচ্যুত হয়। সত্য হতে বিচ্যুত হলেও মানুষের অবয়বে কোনো পরিবর্তন ঘটেনা। পরিবর্তন ঘটে জীবনাচরনে, সংস্কৃতিতে, Lifestyle -এ। বিশ্বাসের পার্থক্যের কারণে এই পরিবর্তন হয়ে দাঁড়ায় অনিবার্য। আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাসী বা কপট বিশ্বাসী মানুষ যতই চেষ্টা করুক না কেন তার জীবনাচরণের পরিবর্তনকে কোনভাবেই রোধ করতে পারে না। আর এজন্যই মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জীবনাচরণের কিছু Benchmark দিয়ে দিয়েছেন যা দিয়ে একজন বিশ্বাসী মানুষকে অবিশ্বাসী বা কপট বিশ্বাসী মানুষ হতে পৃথক করা যায় সহজে। বিশ্বাসের পার্থক্যের কারণে মানুষের জীবনাচরণের এই পার্থক্য মানুষকে প্রধানত : তিনটে ভাগে বিভক্ত করে– ১. মুসলিম ২. মুনাফিক ৩. অমুসলিম।

সাধারণভাবে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস বা ঈমানের দাবীদার মুসলিম এবং আল্লাহকে অস্বীকার কারীরা অমুসলিম হিসেবে বিবেচিত। অমুসলিমদের ধরণ অসংখ্য। কিন্তু ঈমানের দাবীদারদের মধ্যে তিনটে সুস্পষ্ট ধরণ রয়েছে : ১। দৃঢ়চেতা তথা শক্তিশালী মুমিন ২। দুর্বল মুমিন এবং ৩। কপট মুমিন বা মুনাফিক।

অনন্ত জীবন তথা আখিরাতের জীবনে পরিণতি বিবেচনায় সব ধরনের অমুসলিমের পরিনতি একই। এ বিষয়ে আল্লাহ কঠোর সতর্কবাণী নাযিল করেছেন। আল্লাহ সূরা আল আরাফের ৩৭ ও ৪১নং আয়াতে বলছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে কিংবা তাঁর নিদর্শনকে অস্বীকার করে সে ব্যক্তি অপেক্ষা বড় যালিম আর কে? এ সমস্ত লোকদের জন্য যে হিস্সা লিপিবদ্ধ রয়েছে তা তাদের নিকট পৌছুবে। যতক্ষণ না আমার ফেরেশতাগণ জান কবজের জন্য তাদের নিকট আসবে ও জিজ্ঞেস করবে, 'আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে তোমরা ডাকতে তারা কোথায়?' তারা বলবে, 'তারা অন্তর্হিত হয়েছে' এবং তারা স্বীকার করবে যে, তারা কাফির ছিল। .... তাদের শয্যা হবে জাহান্নামের এবং তাদের উপরের আচ্ছাদনও ; এভাবে আমি যালিমদেরকে প্রতিফল দেব" (সূরা আল আরাফ ৩৭ ও ৪১নং আয়াত)। কিন্তু লক্ষ্যনীয় বিষয় হলো ঈমানের দাবীদারদের মধ্যে কপট মুসলিম বা মুনাফিকদের ব্যাপারে আল্লাহ অমুসলিমদের চেয়েও কঠোর পরিণতির কথা উল্লেখ করেছেন পবিত্র কুরআনে। আখিরাতের কঠোর পরিণতির বিবেচনায় মুনাফিকরা আল্লাহর দৃষ্টিতে কাফিরদের চেয়েও নিকৃষ্ট। যদিও তাদের সামাজিক বসবাস মুসলিম সমাজের মধ্যেই এবং তারা ঈমানের দাবীদারও এবং মুসলিম সমাজের সকল সুযোগ-সুবিধাও তারা ভোগ করে থাকে। এ বিষয়ে আল্লাহ মুনাফিকদের অবস্থান কাফির হিসেবেই বিবেচনা করেছেন, যদিও তারা মুসলিম সমাজে নামধারী মুসলিম হয়ে বসবাস করে। আল্লাহ সূরা আল মুনাফিকূন এর ১ম,

www.bjilibrary.com

২য় ও ৩য় আয়াতে বলছেন-

১. যখন মুনাফিকরা তোমার নিকট আসে তারা বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ জানেন যে, তুমি নিশ্চয়ই তাঁর রাসূল এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকগণ অবশ্যই মিথ্যাবাদী।
২. এরা (মুনাফিকরা) তাদের শপথগুলোকে ঢালরূপে ব্যবহার করে আর এরা আল্লাহর পথ হতে মানুষকে নিবৃত্ত করে। এরা যা করছে তা কত মন্দ!
৩. এটা এজন্য যে, এরা (মুনাফিকরা) ঈমান আনবার পর কুফরী করেছে। ফলে তাদের হৃদয় মোহর করে দেয়া হয়েছে; পরিণামে তারা হৃদয়ংগম করতে সমর্থ হয় না (সূরা আল মুনাফিকূন/ ৬৩ : ১- ৩নং আয়াত)।

আল্লাহ আরো বলছেন, "নিশ্চয়ই মুনাফিকগণ আল্লাহর সাথে ধোঁকাবাজি করে; ...আর যখন তারা সালাতে দাঁড়ায় শৈথিল্যের সাথে দাঁড়ায়, কেবল লোক দেখানোর জন্য এবং আল্লাহকে তারা অল্পই স্মরণ করে; দোটানায় দোদুল্যমান; .....না এদের দিকে, না ওদের দিকে (সূরা আন নিসা : ১৪২-১৪৩নং আয়াত)"।

আয়াতগুলো পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে, মুনাফিকদেরকে আল্লাহ চিহ্নিত করেছেন চারটে বৈশিষ্ট্যে। প্রথমত : এরা মিথ্যাবাদী ও দোদুল্যমান। ঈমানের দাবীতে একনিষ্ঠ ও দৃঢ় নয়। দ্বিতীয়ত : এরা কার্যতঃ কাফির। তৃতীয়তঃ এরা নির্বোধ; সত্যকে হৃদয়ংগম করার সামর্থ্য হারা এবং চতুর্থতঃ এরা মানুষকে পরোক্ষে আল্লাহর পথ হতে নিবৃত্ত করার চেষ্টা চালায়।

পরিণামের দিক বিবেচনায় দেখা যাক আল্লাহ কাফির ও মুনাফিকদের জন্য কি বলেছেন। মুনাফিকদের বিষয়ে আল্লাহ বলছেন, "নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের সবচেয়ে নিচুস্তরে অবস্থান করবে" (সূরা আন নিসা : ১৪৫নং আয়াত)। আর কাফিরদের তথা সকল ধরনের অমুসলিমদের পরিণাম সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, "যারা আল্লাহকে অস্বীকার করে ও তাঁর রাসূলদেরকেও এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মধ্যে ঈমানের ব্যাপারে তারতম্য করতে চায় এবং বলে, 'আমরা কতককে বিশ্বাস করি ও কতককে অবিশ্বাস করি' আর এ দুয়ের মাঝখানে কোন পথ অবলম্বন করতে চায়, এরাই প্রকৃত কাফির এবং কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি" (সূরা আন নিসা : ১৫০-১৫১নং আয়াত)। আল্লাহ আরো বলেন, 'মুনাফিক ও কাফির সকলকেই আল্লাহ জাহান্নামে একত্র করবেন' (সূরা আন নিসা : ১৪০নং আয়াত)।

আয়াতগুলোতে আখিরাতে কাফির ও মুনাফিকদের চূড়ান্ত পরিণতির কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়ে মুনাফিক ও মুমিনদের মধ্যে ভিন্ন এক চিত্র আল্লাহ তুলে ধরেছেন। সূরা আল হাদীদে আল্লাহ বলছেন : "মুনাফিকরা মু'মিনদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করবে, 'আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না? তারা বলবে : হাঁ, কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে বিপদগ্রস্ত করেছ। তোমরা প্রতীক্ষা করেছিলে (মুমিনদের অমঙ্গলের), সন্দেহ পোষণ করেছিলে এবং অলীক আকাংখা তোমাদেরকে

www.bjilibrary.com

মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছিল, অবশেষে আল্লাহর হুকুম আসল। আর মহাপ্রতারক (শয়তান) তোমাদেরকে প্রতারিত করেছিল আল্লাহ সম্পর্কে। আজ তোমাদের নিকট হতে কোন মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না এবং যারা কুফরী করেছিল তাদের নিকট হতেও নয়। জাহান্নামই তোমাদের আবাসস্থল, এটাই তোমাদের জন্য যথার্থ, কত নিকৃষ্ট এই পরিণাম (সূরা আল হাদীদ : ১৪-১৫নং আয়াত)"।

সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে মুনাফিকরা মুসলিম সমাজের অন্তর্ভুক্ত মনে হলেও কার্যতঃ কাফির বা অমুসলিম সম্প্রদায়েরই অংশ। কিন্তু আইনতঃ মুনাফিকদের অমুসলিম হিসেবে চিহ্নিত করা দুরূহ। তাই ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের অধিকার বলতে মূলতঃ সকল ধরনের কাফির সম্প্রদায়ের অধিকারকেই বুঝায়। মুনাফিকরা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। মুনাফিকরা তো মুসলিমদের অধিকারই ভোগ করছে। তাদের বরং একটিই করণীয় আছে। আর তা আল্লাহ সূরা আন নিসায় তুলে ধরেছেন এভাবে, "যারা তাওবা করে, নিজদেরকে সংশোধন করে, আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করে এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে তাদের দীনে একনিষ্ঠ থাকে, তারা মুমিনদের সঙ্গে থাকবে (আখিরাতে) এবং মুমিনগণকে আল্লাহ মহা পুরস্কার দেবেন (সূরা আন নিসা : ১৪৬নং আয়াত)।

পর্যালোচনায় এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হলো যে, ঈমানের দাবীদার হলেও মুনাফিকরা কাফির সম্প্রদায়ভুক্ত। সেক্ষেত্রে ঈমানের দাবীদারদের দুটো শ্রেণীই অবশিষ্ট থাকে : এক. শক্তিশালী মুমিন, দুই. দুর্বল মুমিন।

ঈমানের দাবীদার হলেও মুনাফিকরা কাফির বা অমুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত - এ বিষয়ে অত্যন্ত কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কারণ, প্রকৃতপক্ষে ঈমানের দাবীদার কাউকে মুমিন কিংবা মুমিন নয় বলে ফায়সালা করা কোন মানুষের কাজ নয়। এ ব্যাপার, সরাসরি আল্লাহর সাথে সম্পর্কশীল। তিনিই এর ফায়সালা কিয়ামাতের দিন করবেন। তবে একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক ইসলামের পরিচয়বহনকারী যে সমস্ত চিহ্নসমূহ বলে দেয়া আছে, তা দিয়ে কে ইসলামের সীমারেখার ভেতরে আছে এবং কে বেরিয়ে গেছে তা নির্ধারণ করা যেতে পারে। এ উদ্দেশ্যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে সীমারেখা বলে দিয়েছেন তা হল ঃ "ইসলাম হল, তুমি সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল, নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে, রমযানের রোযা রাখবে এবং বাইতুল্লাহর হজ্জ করবে যদি তোমার সামর্থ থাকে (মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী)। এ হল ইসলামী সমাজের সীমানার চিহ্নসমূহ। যারা এ সীমানাগুলোর ভেতরে আছে, তাদের সাথে মুসলিমের মতই ব্যবহার করতে হবে। তাদেরকে মিল্লাতে ইসলাম থেকে বের করার অধিকার কারো নেই। আর যারা এ সীমানাগুলোর বাইরে বেরিয়ে গেছে তাদের সাথে এমন ব্যবহারই করা উচিত যা ইসলামের হক অনুযায়ী ওয়াজিব। কোন অবস্থায়ই আমরা অন্তরের

www.bjilibrary.com

হিসাব নিকাশের অনুমতি প্রাপ্ত নই। আমাদের কাজ শুধু বাহ্যিক দিক দেখা। স্বয়ং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ ব্যাপারে বাহ্যিক দিক দেখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এটা কত বড় বাড়াবাড়ির কথা যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশিত বিশ্বাস্য বিষয়সমূহকে স্বীকার করে এবং উল্লেখিত বিশ্লেষণানুযায়ী ইসলামের সীমারেখার ভেতরে থাকে অথচ কেউ তাকে মিল্লাতে ইসলাম থেকে বের করে বসে। আসলে এ দুঃসাহস কোন বান্দার বিপক্ষে নয় বরং আল্লাহতায়ালার বিপক্ষে। কেননা আল্লাহর আইন যাকে মুসলিম বলে ফায়সালা দেয় তাকেই আল্লাহর এক বান্দাহ কাফির বলে ফায়সালা আরোপ করে বসে। এ কারণেই নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কাউকে কাফির ও ফাসিক বলতে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় নিষেধ করেছেন এবং একথাও বলে দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি কাউকে কাফির বলবে যদি বাস্তবে সে কাফির না হয় তাহলে কুফরীর ঐ ফতোয়া ঐ ব্যক্তির উপরই ফিরে আসবে যে ব্যক্তি কাফির বলে থাকবে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, যে ব্যক্তি কাউকে কাফির কিংবা আল্লাহর দুশমন বলে গালি দেবে অথচ ঐ ব্যক্তি বাস্তবে এমন নয়, তাহলে এ কথাটি স্বয়ং বক্তার উপরই ফিরে আসবে। (সহীহ মুসলিম)

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো বলেন, "যে ব্যক্তি কোন মুমিনের উপর অভিসম্পাত করল সে যেন তাকে হত্যা করে ফেলল, আর যে ব্যক্তি কোন মুমিনের উপর কুফরীর অপবাদ দিল সে যেন তাকে হত্যা করে দিল" (সহীহ আল বুখারী)।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো বলেন, "যে ব্যক্তি তার কোন মুসলিম ভাইকে কাফির বলবে, নিশ্চয়ই তার একথা তাদের দুজনের মধ্য থেকে কোন একজনের উপর বর্তিয়ে থাকবে" (সহীহ আল বুখারী)।

অন্যদিকে শক্তিশালী মুমিন হচ্ছে তারাই যারা বলে, "আল্লাহ আমাদের রব" এবং এই কথার ওপর অটল থাকে (সূরা হামীমুস সাজদাহ ঃ ৩০নং আয়াত) যারা বলে, 'আমার সালাত, আমার ইবাদাত, আমার জীবন ও আমার মরণ জগত সমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই উদ্দেশ্যে (সূরা আল আনআম ঃ ১৬২নং আয়াত)"। শক্তিশালী মুমিন তারাই যারা শত বাধা এবং জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষতি দ্বারা পরীক্ষায়ও সবর করে, অটল থাকে এবং বলে, "ইন্নালিল্লাহি.....রাজিউন - আমরাতো আল্লারই জন্য এবং নিশ্চিতভাবে আমরা আল্লাহর দিকেই ফিরে যাবো"। (সূরা আল বাকারা ঃ ১৫৬নং আয়াত)। শক্তিশালী মুমিন হচ্ছে তারাই, যারা লোকদেরকে আল্লাহর দিকে ডাকে, আমলে সালেহ করে এবং বলে ঃ "নিশ্চয়ই আমি মুসলিমদের একজন" (সূরা হামীমুস সাজদাহ ঃ ৩৩নং আয়াত)। আর দুর্বল মুমিন তারাই যাদেরকে মহান আল্লাহ সতর্ক করেছেন এই বলে, "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় কর এবং দেখো তোমরা 'মুসলিম' না হয়ে যেন মরোনা" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১০২)। দুর্বল মুমিন তারাই যাদেরকে আল্লাহ সতর্ক করেছেন এই বলে, 'হে মুমিনগণ! তোমাদের ঐশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণে উদাসীন না করে, যারা উদাসীন হবে

www.bjilibrary.com

তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আমি তোমাদেরকে যে রিয্ক দিয়েছি তোমরা তা হতে ব্যয় কর তোমাদের কারও মৃত্যু আসার পূর্বে। অন্যথায় মৃত্যু আসলে সে বলবে, 'হে আমার রব! আমাকে আরও কিছু কালের জন্য অবকাশ দিলে আমি সাদাকা দিতাম এবং সৎকর্ম পরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। কিন্তু যখন কারও নির্ধারিত কাল উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ তাকে কিছুতেই অবকাশ দেবেন না" (সূরা আল মুনাফিকুন / ৬৩ ঃ ৯ - ১১নং আয়াত)।

কালেমা : একটি আর্দশবাদী রাষ্ট্রের অংকুর

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ - আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর প্রেরিত রাসূল।

উপাস্য বা ইবাদাত পাবার যোগ্য সত্তা, আইন ও বিধান দাতা, প্রয়োজনপূরণকারী সত্তা হচ্ছেন "ইলাহ"। যিনি মুসলিম হিসেবে কালেমার ঘোষণা দিচ্ছেন তিনি কার্যতঃ একথা পরিস্কারভাবে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে তিনি প্রয়োজন পূরণকারী, আইন ও বিধান প্রদানকারী এবং ইবাদাত পাবার যোগ্য সত্তা হিসেবে স্বীকার করেন না। অর্থাৎ কালেমার ঘোষণাকারী ব্যক্তি প্রকৃত পক্ষে প্রয়োজন পূরণের জন্য চাইবেন শুধু আল্লাহর কাছে, কৃতজ্ঞতাবোধের গভীর অনুভুতি নিয়ে সিজদাবনত হবেন শুধু আল্লাহর কাছে, শুধু আল্লাহই তার সিজদা পাবার মত সত্তা বলে তিনি মনে করেন, আর আল্লাহ ছাড়া আর কারো আইন তিনি মেনে চলবেন না। আল্লাহ ছাড়া আর কারো আইন মেনে চলবো না' - এ ঘোষণা কার্যতঃ এমন এক রাষ্ট্র কাঠামো প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকারের ঘোষণা, যেখানে আল্লাহর আইন সকল কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু বিবেচিত হবে। যেখানে আল্লাহর আইন জারী করার কর্তৃপক্ষ থাকবে এবং আল্লাহর আইন লংঘনের শাস্তি নিশ্চিত করবে। কারণ, এ যদি শুধুই একটি ঘোষণা হয় তাহলে এতে কারও কিছু যায় আসে না। কিন্তু এ ঘোষণা যদি প্রকৃত অর্থে তাই-ই বুঝিয়ে থাকে যা ঘোষণা করা হয় (আল্লাহ ছাড়া আর কারো আইন মেনে চলবো না), তাহলে আল্লাহর আইন মেনে চলার মত একটি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাঠামো ছাড়া, এ ঘোষণা বাস্তবে রূপলাভ করা মোটেই সম্ভব নয়। তাই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ- আল্লাহ ছাড়া আর কারো আইন মেনে চলবো না' এর ঘোষণা কার্যতঃ আল্লাহর আইনের ভিত্তিতে একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ঘোষণাকেই প্রতিফলিত করে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নেতৃত্বে সর্বপ্রথম তেমন একটি রাষ্ট্র কাঠামো গড়ে উঠেছিল মদীনায়। পরবর্তীতে গোটা আরবে এবং তারও পরে অর্ধপৃথিবীতে। সুতরাং বিষয়টি স্পষ্টভাবেই বুঝা যাচ্ছে যে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এ ঘোষণার মধ্যেই ইসলামী রাষ্ট্র কাঠামোর অংকুর রয়েছে। যা মানব জাতিকে এক অতুলনীয় সভ্যতার উপহার দিয়েছিল।

এ প্রসঙ্গে আল কুরআনের সূরা আস্সাফ এর ৯নং আয়াতের প্রতি বিজ্ঞ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ঃ

আল্লাহ বলছেন ঃ "হুয়াল্লাজি আরসালা রাসূলাহু বিলহুদা.....মুশরিকুন (৬১ ঃ ৯) –

www.bjilibrary.com

তিনিই (আল্লাহতায়ালা) সেই সত্তা যিনি তাঁর রাসূলকে হিদায়াত এবং সত্য জীবন বিধান সহ পাঠিয়েছেন, যেনো অন্যান্য সকল জীবন বিধানের উপর সত্য জীবনবিধানকে বিজয়ী করেন। যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।"

আয়াতটিতে ইসলামী জীবন বিধানকে অন্যান্য সকল জীবন বিধানের উপর বিজয়ী করার দায়িত্ব দিয়ে রাসূল প্রেরণ করেছেন বলে আল্লাহ উল্লেখ করেছেন। প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে, এ জীবন বিধান যদি শুধু ব্যক্তিগত পর্যায়ে পালনই আল্লাহর অভিপ্রায় হয়ে থাকতো তাহলে অন্যান্য জীবন বিধানের উপর একে বিজয়ী করার প্রয়োজন কি ছিল? অন্যান্য জীবন বিধানের উপর ইসলামী জীবন বিধানকে বিজয়ী করার দায়িত্ব অর্পণই সুস্পষ্ট করে দিচ্ছে এমন এক রাষ্ট্র কাঠামো নির্মাণের, যেখানে আল্লাহর আইনের নিরংকুশ সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। যারা লা ইলাহা ইল্লালাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ-ঘোষণা দিয়েছেন আন্তরিকভাবে, তারা আল্লাহর আইনের ভিত্তিতে রাষ্ট্র কাঠামো নির্মাণের কাজে অবদান রাখেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে। এরাই প্রকৃত মুমিন/ মুসলিম। যারা লা ইলাহা ইল্লালাহু, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ-এ ঘোষণা কপট বিশ্বাসের সাথে উচ্চারণ করেন, তারা মুমিন দাবী করলেও কার্যতঃ মুনাফিক। আর যারা সজ্ঞানে কালেমার ঘোষণা দিতে অস্বীকার করেন তারাই অস্বীকারকারী, প্রত্যাখ্যানকারী কাফির বা অমুসলিম। ইসলামী জীবন বিধান অন্যান্য জীবন বিধানের উপর বিজয়ী হলেই কেবল ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আল্লাহর আইনের সার্বভৌমত্ব নিরংকুশ হয় এবং আল্লাহর আইন ছাড়া আর কারো আইন মেনে চলবো না, এ ঘোষণা অনুযায়ী জীবন যাপন সম্ভব হয়। সুতরাং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ-এ ঘোষণা অনুযায়ী জীবন যাপনের জন্য একটি ইসলামী রাষ্ট্রীয় কাঠামোর প্রয়োজন অনস্বীকার্য। এমন একটি রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে অমুসলিমদের সাথে আচরণের নীতিমালা কি ? নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্র বা আদর্শবাদী রাষ্ট্র কর্তৃক পরবর্তীতে অমুসলিমদের প্রতি আচরণের ঐতিহাসিক বাস্তবতা কী ছিল? অমুসলিমদের প্রতি ইসলামের দৃষ্টিভংগি কী? এ বিষয়গুলো এ নিয়েই প্রবন্ধের পরবর্তী আলোচনা। তবে তার আগে আদর্শবাদী ইসলামী রাষ্ট্র এবং জাতীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মৌলিক ও সুস্পষ্ট পার্থক্যগুলো একবার দেখে নেয়া দরকার:

আদর্শবাদী রাষ্ট্র : (Ideological State)

১. যে আদর্শ ও মূলনীতির ওপর আদর্শবাদী ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত , তা কে মানে আর কে মানেনা, সে হিসেবেই ইসলামী রাষ্ট্র স্বীয় নাগরিকদের চিহ্নিত করে থাকে। সাধারণভাবে উক্ত দুই ধরনের জনগোষ্ঠীকে যথাক্রমে মুসলিম ও অমুসলিম নাগরিক হিসেবে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

২. ইসলামের আদর্শ ও মূলনীতিতে যারা বিশ্বাসী ইসলামী রাষ্ট্র চালানো তাদের কাজ। নীতি নির্ধারক ও প্রশাসনে নীতি বাস্তবায়নের পদ ব্যতীত, অমুসলিমদের সেবা গ্রহণ করা যেতে পারে।

www.bjilibrary.com

৩. ইসলামী রাষ্ট্রের প্রকৃতিই এমন যে, অমুসলিমদের কি কি অধিকার দিতে পারবে তা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেয়া তার পক্ষে অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়।

৪. ইসলামী রাষ্ট্র স্বীয় প্রশাসনে নিজেদের নীতিনির্ধারণী ব্যবস্থাপনায় অমুসলিমদেরকে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত রাখে এবং তাদের জন্য সবসময় এ ব্যাপারে দরজা খোলা রাখে যে, ইসলামী আদর্শ যদি তাদের ভালো লেগে যায় তাহলে তারা তা গ্রহণ করে শাসক দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতে পারে।

৫. ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার স্বীকৃত এবং অমুসলিম নাগরিকদেরকে শরীয়ত প্রদত্ত অধিকার প্রদানে উদার এবং আন্তরিকভাবে সচেষ্ট। মৌলিক মানবাধিকারসহ এসব অধিকার কেড়ে নেয়া বা কমবেশি করার ইখতিয়ার কারো নেই।

ইসলামী রাষ্ট্র রক্ত, বর্ণ, গোত্র, লিঙ্গ, জাতীয়তার ভিত্তিতে মানুষের মাঝে বৈষম্যকে স্বীকার করে না। মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলকে আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে বিবেচনা করে। রাষ্ট্রের জনগোষ্ঠীকে সংখ্যাগুরু এবং সংখ্যালঘু নামক গোষ্টিতে বিভক্ত করে না।

জাতীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র : (National Democratic State)

১. যে জাতি মূলতঃ জাতীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক, তারা, কারা সেই জতির বংশোদ্ভূত আর কারা নয়, এই ভিত্তিতে রাষ্ট্রের স্বীয় নাগরিকদের বিভক্ত করে ফেলে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পরিভাষায় উক্ত দু'ধরনের জনগোষ্ঠীকে যথাক্রমে সংখ্যাগুরু এবং সংখ্যালঘু বলা হয়ে থাকে।

২. জাতীয় রাষ্ট্র, স্বীয় নীতি নির্ধারণ ও প্রশাসনের কাজে জাতীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে শুধু আপন জাতির লোকদের উপরই নির্ভর করে। অন্যান্য সংখ্যালঘু নাগরিকদেরকে এ ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য মনে করা হয়না। সংখ্যালঘুদের কোন ব্যক্তিকে যদি কখনো কোন শীর্ষ স্থানীয় পদ দেয়াও হয় তবে তা নিছক লোক দেখানো ব্যাপার হয়ে থাকে। রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণে তার কোন ভূমিকাই থাকেনা।

৩. জাতীয় রাষ্ট্র, কার্যতঃ সংখ্যাগুরু আর সংখ্যালঘুর ভেদাভেদ পুরাপুরি বহাল রাখে এবং সংখ্যালঘুদেরকে বাস্তবিক পক্ষে কোন কোন ক্ষেত্রে মৌলিক অধিকার থেকেও বঞ্চিত রাখে। পাশ্চাত্য দর্শন প্রভাবিত সকল রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সংখ্যাগুরু আর সংখ্যালঘুর ভেদাভেদ একটি অনিবার্য পরিণতি।

৪. একটি জাতীয় রাষ্ট্র, স্বীয় রাষ্ট্র কাঠামোতে বিজাতীয় লোকদের উপস্থিতিজনিত জটিলতার সমাধান তিন উপায়ে করেঃ প্রথমতঃ তাদের স্বতন্ত্র জাতি সত্তাকে ক্রমান্বয়ে বিলুপ্ত করে নিয়ে নিজেদের জাতি সত্তায় বিলীন করে নেয়। দ্বিতীয়তঃ তাদের জাতিসত্তাকে নির্মূল করার জন্য হত্যা, লুটতরাজ ও দেশান্তরকরণের

www.bjilibrary.com

মাধ্যমে নিপীড়নমূলক কর্মপন্থা অবলম্বন করে। তৃতীয়তঃ তাদেরকে নিজেদের ভেতরে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক বানিয়ে রেখে দেয়। দুনিয়ার জাতীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে এই তিনটে কর্মপন্থা ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছে এবং এখনও গৃহীত হয়ে চলেছে।

৫. আজকের জাতীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুর আলাদাভাবে কোন অধিকার চিহ্নিত করা নেই, যেমন আদর্শবাদী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের জন্য রয়েছে। সংখ্যালঘুদেরকে যে অধিকারই দেয়া হয় তা মূলতঃ সংখ্যাগুরুর অধিকার। সংখ্যাগুরুরা ওসব অধিকার যেমন দিতে পারে তেমনি তাতে কমবেশি করা বা একেবারে ছিনিয়ে নেয়ারও অধিকারও সংরক্ষণ করে। এধরণের রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুরা পুরোপুরিভাবে সংখ্যাগুরুর করুণার ওপর বেঁচে থাকে। তাদের জন্য মৌলিক মানবাধিকারেরও কোন স্থায়ী নিশ্চয়তা থাকেনা।

পার্থক্যগুলো থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে মানবিক জীবনবিধান হিসেবে ইসলামের কোন বিকল্প হতে পারেনা। আর তাই মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে বিবেকবান ও মানবাধিকার সচেতন মানুষের কাছে ইসলাম এক অনন্য জীবনাদর্শ। প্রবন্ধের পরবর্তী আলোচনায়, বিবেকবান ও মানবাধিকার সচেতন মানুষের একজন প্রতীক হিসেবে ভারতের মানবতাবাদী আন্দোলনের পুরোধা এবং রেনেসার প্রবক্তা এম. এন. রায় (মানবেন্দ্রনাথ রায়) এবং তাঁর 'ইসলামের ঐতিহাসিক ভূমিকা' গ্রন্থ-কে বিবেচনা করা হয়েছে।

মানুষ এক আল্লাহর সৃষ্টি

ইসলামে যেহেতু ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপনে কোন জোর-জবরদস্তি নেই (লা ইকরাহা ফীদ্ দীন-সূরা আল বাকারা), মানুষের স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অধিকারকে যেহেতু ইসলাম অস্বীকার করে না (লাকুম দ্বীনুকুম ওয়ালিয়া দীন), তাই আদর্শবাদী ইসলামী রাষ্ট্র মূলতঃ Multi Cultural হয় । ইসলামী রাষ্ট্রে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের বসবাস বা নাগরিকত্ব এক স্বাভাবিক বিষয়। ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম সম্প্রদায়ের অধিকারও তাই স্বাভাবিক বলে স্বীকৃত ও অনুসৃত। অমুসলিমদের প্রতি ইসলামের এই স্বাভাবিক দৃষ্টিভংগিকে নিপুণভাবে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন ভারতের মানবতাবাদী আন্দোলন এবং রেনেসার প্রবক্তা এম. এন. রায় তার 'ইসলামের ঐতিহাসিক ভূমিকা' গ্রন্থে। জনাব এম.এন.রায়-এর কিছু ফিলিংস প্রসঙ্গতঃ তুলে ধরছি ঃ "এক আল্লাহ ছাড়া দ্বিতীয় নেই" ইসলামের এই মর্মবাণীই ইসলামকে সহিষ্ণু করেছে। ইসলাম বিশ্বাস করে যে, দোষ-ত্রুটি নিয়ে সমগ্র জগৎ এবং নির্বুদ্ধিতা ও অসম্পূর্ণতা নিয়ে সকল মানুষ এক আল্লাহর সৃষ্টি। যারা এই আদর্শে বিশ্বাসী তারা অপরের অবাধ্যতা, অবিশ্বাস এবং মূর্খতাকে করুণার চোখে দেখতে পারে। কিন্তু তাদের এই ধর্মমত কোনোদিন একথা শেখায় না যে ঐ দুর্বল ভ্রান্ত মানুষগুলো কোনো খারাপ ঈশ্বরের সৃষ্টি এবং সেজন্য তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। যারা

www.bjilibrary.com

অন্যভাবে উপাসনা করে, মুসলমানের দৃষ্টিতে তারা ভ্রান্ত এবং বিপথগামী , তবে তারা একই আল্লাহ-র সৃষ্টি। সেজন্য তারাও ভাইয়ের সমান। তাদের সৎ পথে আনা মুসলমানের কর্তব্য। কিন্তু তারা যতদিন স্বেচ্ছায় মুক্তির পথে না আসে ততদিন তাদেরকে সহজভাবেই মেনে নিতে হবে"। (এম.এন.রায়, ইসলামের ঐতিহাসিক ভূমিকাঃ পৃষ্ঠা-৩৩)' জনাব এম. এন. রায়ের এই ফিলিংস ঐতিহাসিকভাবেও প্রমাণিত।

ঐতিহাসিক বাস্তবতা

ইসলামী সভ্যতা অমুসলিম অধিবাসীদের মধ্যে এমন ধর্মীয় স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা, বাক স্বাধীনতা ও আত্মমর্যাদা বোধের সঞ্চার করেছিল যে, মানবেতিহাসে তার নজির অভূতপূর্ব। 'জেরুসালেম যখন খালিফা উমারের কাছে আত্মসমর্পন করে, তখন এই বিজিত নগরীর অধিবাসীদের ধর্ম ও সম্পদ তাদের হাতেই ছিল এবং তাদের উপাসনার স্বাধীনতাও অক্ষুন্ন ছিল। খ্রিস্টানদের এবং তাদের প্রধান যাজক ও তার অনুচরসহ বসবাসের জন্য নগরের ভিন্ন এলাকা ছেড়ে দেয়া হল। এই আশ্রয়ের বিনিময়ে সমগ্র খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের উপর নামমাত্র দুই স্বর্ণমুদ্রা কর ধার্য করা হয়। বিজয়ী মুসলিমরা এই পবিত্র নগরীতে তাদের তীর্থ যাত্রার অধিকার খর্ব তো করলই না বরং উৎসাহিতই করল। ৪৬০ (চারশত ষাট) বছর পর জেরুসালেম ইউরোপের খ্রিস্টীয় ধর্মযোদ্ধাদের অধীন খ্রীস্ট শাসনে চলে গেলে 'প্রাচ্যের খ্রীস্টানেরা সদাশয় খালীফাদের শাসনের অবসানে অনুশোচনাই করেছিল'। (Gibdon : Rise and Fall of the Roman Empire)।

"গ্রীস থেকে ওক্সাস পর্যন্ত বিশাল ভূখণ্ডের অধিবাসী পার্সীরা আশ্চর্য তৎপরতায় বিনা দ্বিধায় যেভাবে তাদের আবহমান কালের ধর্ম বিশ্বাস ছেড়ে মুসলিম বিজয়ীদের ধর্ম গ্রহণ করেছিল, তা বল প্রয়োগ করে সম্ভব হতো না। পুরোনো বিশ্বাস ক্ষয়ে যাচ্ছিল। একটা সুসংস্কৃত জাতির আধ্যাত্মিক প্রয়োজনীয়তা তারা মেটাতে পারছিলো না। পারস্যের জনগণ অনন্ত অকল্যাণকারী নীতির অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি পেতে মুহাম্মাদের সহজ একেশ্বরবাদকে গ্রহণ করে। ... উত্তর আফ্রিকার কেবলমাত্র আলেকজান্দ্রিয়া থেকে কার্থেজ পর্যন্ত অঞ্চলে ইসলাম প্রসারের সাথে সাথে খ্রিস্টানধর্ম একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কিন্তু সেখানেও এই ধর্ম বিপ্লবের কারণ, নতুন ধর্মে সহনশীলনতার অভাব নয়, পুরাতন ধর্মবিশ্বাসের জীর্ণদশা আর চরম বিশৃংখলার পরিণতি। অগাস্টিন, এথানসিয়াস এবং সাইপ্রিয়ানদের দক্ষতা, সাধুতা এবং প্রতিভার বলে এখানে প্রতিষ্ঠিত খ্রিস্টীয় মতবাদ এরিয়ান ও দেনতীয় বিরুদ্ধতায় ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এদের নেতৃত্বে গরীব জনগণ ধর্মের বাতাবরণে যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল ক্যাথলিকরা তা প্রচণ্ড রোষে দমন করল। যার ফলে ধ্বংস হল সম্পদশালী প্রদেশ গুলো। এরপর ভ্যান্ডাল এবং মুরেরা এমন নির্দয়ভাবে ধ্বংসাবশেষের ওপর আঘাত হানলো যার ফলে তাদের সামাজিক অবস্থা হলো শোচনীয় এবং আধ্যাত্মিক অবস্থার প্রায় মৃত্যু ঘটল। এমন সংকটাপন্ন অবস্থায় মিথ্যা শান্তির মোহে নিমজ্জিত মানুষের

www.bjilibrary.com

মতো অবাস্তব সন্ন্যাস ধর্মের মধ্যে মানুষ আশ্রয় চাইল। গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত সামাজিক প্রতিবেশ এবং আধ্যাত্মিক পরিস্থিতির মধ্যে ইসলামের নবীর বলিষ্ঠ অভয়বাণী বিদ্যুৎ ঝলকের মত আশার আলো দেখালো। নতুন ধর্মের ইহকালের সুখ এবং পরকালের শান্তির বাণী সাধারণ মানুষকে এই ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। হতাশার অতলে তলিয়ে যাওয়া মানুষের চোখের সামনে ইসলাম এক নতুন আশার আলো দেখায়। এতে সমাজে যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয় তাতে সমাজের প্রতিটি মানুষ তার নিজস্ব স্বাভাবিক সাহস ও কর্মক্ষমতা ফিরে পায়। ইসলামের জীবন সঞ্চারী অনুপ্রেরণায় উত্তর আফ্রিকার উর্বর মাটি আর পরিশ্রমী মানুষ অল্প সময়েই ফললাভ করে এবং সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠে।" (এম. এন.রায়, ইসলামের ঐতিহাসিক ভূমিকা, পৃষ্ঠা : ৩৫-৩৬)

"এ সম্পূর্ণ ভূল ধারণা যে, কেবল তলোয়ার দিয়েই মুসলিমদের (আরবদের) অগ্রাভিযান। তলোয়ার কোন জাতির জীবনের স্বীকৃত মতবাদ পাল্টে দিতে পারে কিন্তু তা কোন দিন মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে প্রভাবিত করতে পারে না। এই যুক্তি গভীর তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু কেন এশিয়া ও আফ্রিকার সমাজ ও পারিবারিক জীবনে মুহাম্মাদের ধর্ম বিদ্যুৎ গতিতে ছড়িয়ে পড়ল, তার কারণ আরও গভীর। .....বিজিতদেশগুলোর সামাজিক প্রতিবেশের মধ্যেই এই রাজনৈতিক পরিস্থিতির ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যাবে। তাদের ওপর থেকে ধর্মের প্রভাব অনেক আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল, বাকী ছিল কেবল তত্ত্ব। .....অশিক্ষিত মানুষ, সাধারণ বিষয়গুলোই যাদের বুঝানো কঠিন, তারা ধর্মতত্ত্বের গভীর রহস্য বুঝবে কি করে? তবুও তাদের শেখানো হতো ওই মতবাদেই মানুষের মুক্তি কিংবা অধঃপাত নির্ভর করে। তারা দেখল.... ব্যক্তিগত পাপ-পুণ্যের বিচার হয় না। অসৎ কাজের জন্য নয়, পাপের মান মাপা হয় ধর্মীয় নির্দেশ পালন না করার মাপকাঠিতে। ধর্মযাজকরা কিভাবে নরহত্যা, বিষ প্রয়োগ, ব্যভিচার, চক্ষু তুলে নেয়া, দাঙ্গা, রাজদ্রোহিতা এবং গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল এসব ঘটনা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। শাসনকর্তা বা দলপতিরা ক্ষমতা দখলের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরস্পরের মূলোৎপাটন করতো এবং পরস্পরকে অভিশাপ দিতো। তারাই খোজাদের সোনা ঘুষ দিত । রাজ পরিবারের নারী ও সহচরীদের মন ভুলাতো স্বর্গীয় প্রেম বিতরণের প্রলোভন দেখিয়ে। আর নানা অসদুপায়ে ধর্ম পরিষদের সিদ্ধান্তের ওপর প্রভাব বিস্তার করত সস্তা বুলির কপচানিতে, যেমনি বক্তারা জনতাকে চঞ্চল করে তোলে, ঠিক তেমনি। তাদের মূলে কোনদিন মানুষের চিন্তা শক্তির স্বাধীনতা কিংবা সাধারণ মানুষের অধিকারের কথা শোনা যায়নি। বরং যে মঠাধ্যক্ষরা রাজসৈনিকদের মধ্যে ভীতির সৃষ্টি করত, বড়ো বড়ো নগরে দাঙ্গা বাধাতেও দ্বিধা করত না, তারাই আবার ধর্মতত্ত্বের নিয়ম-নিষ্ঠার কথা চেচিয়ে বেড়াত। এরকম অবস্থায় সাধারণ মানুষের মধ্যে ধর্মের প্রতি উদাসীনতা এবং বিতৃষ্ণা ছাড়া আর কী আশা করা যায়? যে আচার, মানুষের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলে, তাকে সাহায্য করার কথা আশা করা যায় না। তাই যখন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বাকবিতণ্ডা এবং বিভিন্ন দলের

www.bjilibrary.com

কলহ-কোন্দলের অরাজকতার মধ্যে সারাবিশ্বে 'এক আল্লাহ ছাড়া দুই নাই' 'রণনিনাদ ঘোষিত হল তখন যে সকল গোলযোগ থেমে যাবে তাতে আশ্চর্যের কী? আর সমস্ত এশিয়া ও আফ্রিকা যে পদানত হবে তাও আশ্চর্য নয়।" (J.W. Draper, History of the Intellectual Development of Europe, Vol.- 1, p : 332-333)

"ইসলামের অভূতপূর্ব বিজয় যতোটা তলোয়ারের জোরে, তার থেকে অনেক বেশি ইসলামের মূলমন্ত্র সাম্য ও মৈত্রীর নীতিতে। যা সে সময়ে শ্রেণী ও জাতিভেদে জর্জরিত রোমান, বাইজেনটাইন, পারস্য এবং পরে ভারতবর্ষের সমাজ যে দমনমূলক আইন কানুনে শাসিত হতো তার সঙ্গে সাংঘর্ষিক ছিল। ইসলাম দেখা দিল জীর্ণপ্রায় প্রাচীন সভ্যতা থেকে বিদায় নেয়া সাম্য ও স্বাধীনতার প্রতীক হয়ে। অসহায়দের এ জগতের দু:খকষ্ট লাঘবের কোন চেষ্টাই খ্রীস্টধর্ম করল না। বরং অশেষ দুধ-মধুর নহর বয়ে যাওয়া পরকালের মোহে তাদের মন ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করল। বলা হলো স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের অধিকার কেবল মাত্র ধৈর্য্যশীলদের অর্থাৎ যারা দুনিয়ার শাসকদের যুলমের কাছে আত্মসমর্পণ করবে। অন্যদিকে ইসলাম তার অনুসারীদেরকে কেবল বেহেশতের প্রেরণাই দেখায়নি। পার্থিব জগতের বিজয়ের জন্যও তাদের অনুপ্রেরণা দিল। প্রকৃত পক্ষে এই জগতে কীভাবে আসল সুখ-শান্তি পাওয়া যায়, তারই ইংগিত দিয়েছে আরবের নবী। মোহাম্মদ শুধু তার অনুসারীদের একটা জাতীয় জীবনের একতার ভিত্তিতে গড়ে তুললেন না; সমগ্র আরব জাতিকে এমন এক বৈপ্লবিক ঘোষণা দিয়ে দাঁড় করালেন যা পাশের দেশগুলোর নিপীড়িত অসহায় মানুষদের কাছে ব্যাপক সাড়া পেল। ইসলামের বিস্ময়কর সাফল্যের কারণ যেমন আধ্যাত্মিক তেমনি সামাজিক ও রাজনৈতিকও । মুক্তি ও সাম্যের বাণীই ইসলামের অভিনব অভ্যুত্থান প্রসারের শক্তির মূল উৎস।" (এম.এন.রায়, ইসলামের ঐতিহাসিক ভূমিকা, পৃষ্ঠা : ৩৮)।

ঐতিহাসিক Finlay বলেন, "যেখানেই আরবরা কোনো খ্রিস্টান দেশ জয় করেছে সব ক্ষেত্রে ইতিহাস প্রমাণ করে যে, বিজিত দেশের জনগণ ইসলামের দ্রুত প্রসারের প্রতি সমর্থন জানিয়েছে। দু:খজনক যে, অধিকাংশ খ্রিস্টান সরকারের শাসনব্যবস্থা বিজয়ী আরবদের চেয়ে দুর্বিসহ ছিল। সিরিয়ার জনগণ মোহাম্মদের অনুসারীদের স্বাগত জানালো। মিশরীয় খ্রিস্টানগন তাদের দেশ আরবদের অধীনে নিয়ে যেতে যথেষ্ট সাহায্য করল। আর খ্রিস্টান বেরবেররা তো মুসলমানদের আফ্রিকা বিজয়ে অংশগ্রহণ করেছিল। কনস্টানটিনোপল সরকারের বিরুদ্ধে এই দেশগুলোর তীব্র ঘৃণার জন্যই তারা মুসলমান শাসককে বরণ করে নিল"। (Finlay: History of the Byzantine Empire)।

ঐতিহাসিক এইসব বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে মানবতাবাদী মানবেন্দ্রনাথ রায়ের নিম্নলিখিত বক্তব্যে, ইসলামী রাষ্ট্রে সকল ধর্মের মানুষের অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিত করার যে মূল্যায়ন করা হয়েছে তা সত্যের এক সহজ স্বীকৃতি হিসেবেই বিবেচিত । জনাব এম. এন. রায় বলেন, 'ইসলামের ইতিহাসের কদর্থ ব্যাখ্যাকারীরা হয় প্রশংসার জন্য না হয়

www.bjilibrary.com

ইসলামের সুদূর প্রসারী বৈপ্লবিক গুরুত্বকে অস্বীকার করার জন্য ইসলামের সামরিক অভিযানকে বেশি গুরুত্ব দিতে চান। যদি আরব মুসলমানদের নিশ্চিত দিগ্বিজয়ী সামরিক শক্তির বিজয়ই ইসলামের ঐতিহাসিক ভূমিকার একমাত্র মাপকাঠি হয়, তাহলে তা ইতিহাসে অনন্য সাধারণ বিষয় হয়ে উঠত না। তাতার এবং সিথিয়ার (গথ, হুণ, ভ্যান্ডাল, অভর, মঙ্গোল ইত্যাদি) অসভ্যদের লুটতরাজ এবং সামরিক দুর্ধর্ষতা তাদের (ইসলামের) সমান বা বেশি না হলেও কম নয়। কিন্তু জোয়ারের জলোচ্ছ্বাসের মতো ইউরোপ ও এশিয়ার প্রান্ত সীমানা থেকে পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব ভূখণ্ডে (ঐ অসভ্যদের) যে প্লাবন, তার সঙ্গে আরব মুসলমানদের ধর্মীয় আবেগের অনেক ফারাক। প্রথমোক্তর (তাতার) একটা দুষ্ট গ্রহের মত দিগ্বিদিক ধ্বংস ও মৃত্যুর তান্ডব চালিয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই ধুমকেতুর মতো অদৃশ্য হয়ে গেছে। অন্যদিকে পরের শক্তি (ইসলাম) মানব-সভ্যতা সংস্কৃতি ও ইতিহাসের পাতায় চিরস্থায়ী বৈশিষ্ট্যের ছাপ রেখে গেছে। এদের অগ্রাভিযানে ধ্বংস ছিল কেবল একটা সম্পূরক অংশ মাত্র। নতুন নির্মাণের প্রয়োজনে এরা জরাজীর্ণ পুরাতনকে উপড়ে ফেলেছে। মানব সভ্যতার যুগযুগ সঞ্চিত জ্ঞান ভান্ডারকে অনিবার্য ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে, ভবিষ্যৎ বংশধরদের অসীম কল্যাণের জন্যই ধুলিসাৎ করে দিয়েছে সিজার এবং খসরুদের প্রাসাদ। আরবের ঘোড়সওয়ারদের বিস্ময়কর কীর্তিই ইসলামের একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়। তাদের কথা ভাবলে অবশ্য বিস্মিত হতে হয়। এমন এক গতিশীল ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যের কারণ অনুসন্ধান এবং তার প্রশংসা করতে আমাদের প্রণোদিত করে। 'আল্লাহর সেনাদের' অদ্ভুত কীর্তি প্রায়ই চোখ ঝলসে দেয়। আরবীয় নবীর অনুসারীদের সামরিক অভিযান সমাজ-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক কালজয়ী সম্ভাবনার সূত্রপাত করেছিল। তারা কেবল রাজনৈতিক ঐক্যের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করলেও তা আর্থিক সমৃদ্ধি এবং আত্মিক অগ্রগামিতার পথ খুলে দিয়েছিল। নতুন ধ্যান-ধারণার নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষকে তাদের সরিয়ে ফেলতে হয়েছিল। প্রাচীন পারসিক পুরোহিতদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাস এবং গ্রীক পুরোহিতদের হতশ্রী পরিবেশ পারস্য ও বাইজেনটাইন সাম্রাজ্যের প্রজাদের মানসিক ও নৈতিক বিকাশের পথ পুরোপুরি রুদ্ধ করে দিয়েছিল। মুহাম্মাদের সুকঠোর একেশ্বরবাদ, আরবীয় মুসলমানদের এমন ক্ষমতা দান করল যে, তা কেবল আরব উপজাতিগুলোর পৌত্তলিকতাই নষ্ট করল না; জরুথুস্টের অপপ্রচার থেকে আচারভ্রষ্ট খ্রীস্ট ধর্মের অঘটন ও অন্ধ বিশ্বাস থেকে এবং মঠ, মঠের পুরোহিত সন্ন্যাসী-সংক্রমিত কঠিন রোগের হাত থেকে অগণিত মানুষকে মুক্তি দিতে ইতিহাসের প্রধান ও একমাত্র অবলম্বন হয়ে রইল। আরবদের বিস্ময়কর সামরিক সফলতা প্রমাণ করে যে, মানবতার অগ্রগতির পথেই তাদের তলোয়ার চালিত হয়েছিল'। (এম.এন.রায়, ইসলামের ঐতিহাসিক ভূমিকা, পৃষ্ঠা : ১৮-১৯)

এম. এন. রায়ের এই ঐতিহাসিক মূল্যায়ন কার্যতঃ মুসলিম উম্মাহর উত্থান সম্পর্কে মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্বের মূল্যায়নের প্রতিফলন মাত্র। মুসলিম উম্মাহর

www.bjilibrary.com

উত্থান সম্পর্কে আল্লাহ বলেন : তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মাত, মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে; তোমরা সৎকার্যের নির্দেশ দান কর, অসৎকার্যে নিষেধ কর (প্রতিরোধ কর) এবং আল্লাহর প্রতি (দৃঢ়) ঈমান রাখো (সূরা আলে-ইমরান : ১১০নং আয়াত)। সৎকার্যের নির্দেশদানকারী এবং অন্যায়কার্যে বাধাদানকারী এই জাতি তাদের রাষ্ট্র ও প্রশাসন পরিচালনায় অমুসলিমদের অধিকার আদায়ে যে দৃঢ় ও উদারনীতি অনুসরণ করেছিলেন তা আজো যে কোন রাষ্ট্র ব্যবস্থায় অনুকরণীয় এবং অনুপ্রেরণার উৎস।

ইসলামে অমুসলিমদের অধিকার ঃ অনুপ্রেরণা, নীতিমালা ও কিছু অতুলনীয় দৃষ্টান্ত ঃ

(ক) অনুপ্রেরণা :

কুরআন ও সুন্নাহ-য় অমুসলিমদের অধিকারের ভিত্তি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে রয়েছে। মানবজাতির কাছে মুসলিম উম্মাহর পরিচয় দিতে গিয়ে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন ঃ "এইভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি; যাতে তোমরা মানবজাতির জন্য সাক্ষীস্বরূপ এবং রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হন (সূরা আল বাকারা : ১৪৩নং আয়াতের অংশ)। আল্লাহ আরো বলেন, "তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মাত, মানবজাতির জন্য তোমাদের উদ্ভব হয়েছে; তোমরা সৎকার্যে নির্দেশ দান কর, অসৎকার্যে নিষেধ কর এবং আল্লাহতে বিশ্বাস রাখো" (সূরা আলে ইমরান : ১১০নং আয়াতের অংশ)। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ আরো বলেন, "হে মানবজাতি, আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত করেছি, যেন তোমরা পরস্পর পরিচয়ের আদান-প্রদান করতে পার। আল্লাহর কাছে সেই ব্যক্তিই অধিক সম্মানার্হ, যে সর্বাধিক আল্লাহ ভীরু" (সূরা আল হুজুরাত : ১২-১৩)। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ধর্ম, বর্ণ ও বংশের ভেদাভেদকে মুছে দিয়ে সমগ্র মানবজাতিকে সম্মানের আসনে বসিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, "আমি আদমের বংশধরকে সম্মানিত করেছি" (সূরা বনী ইসরাইল ঃ ৭০)। বিদায় হজ্জের ভাষণে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, "সকল মানুষ আদমের বংশধর আর আদম মাটির তৈরি। তাকওয়া ছাড়া কোন অনারবের উপর আরবের এবং কালো মানুষের উপর সাদা মানুষের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই।" - ইসলামের এ ঘোষণা কোন দিবস পালন বা সভা-সমাবেশ ও সেমিনারের আনুষ্ঠানিক ঘোষণায় সীমাবদ্ধ ছিল না। যেমন পশ্চাত্য গণতন্ত্রের মানসপুত্রদের বেলায় হয়ে থাকে। বরং কার্যক্ষেত্রে অসংখ্য দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়ে আছে। ইসলাম পূর্ব জাহেলী সভ্যতায় কালো মানুষদের মানুষই ভাবা হতো না। তাদেরকে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের আসনে বসানো এবং বিদ্যা-বুদ্ধিতে ও মতামতে তাদেরকে উচ্চতর মর্যাদা দেয়ারতো প্রশ্নই উঠতোনা। ইসলাম আসার পর এইসব বাতিল মাপকাঠিকে নিশ্চিহ্ন করে দিল। বর্ণবৈষম্যবাদী চিন্তাধারাকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখলো এবং অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে,

www.bjilibrary.com

চ্যাপ্টা নাক, কোঁকড়ানো চুল, ঘোরতর কালো বর্ণের, খোঁড়া, আতা ইবনে আবি রাবাহ ছিলেন, উমাইয়া শাসক আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান-এর একমাত্র অনুমোদিত ফতোয়া দানকারী ব্যক্তি। তিনি যখন তাঁর হাজার হাজার সাদা রংয়ের শিষ্য শাগরিদকে হাদীস ও ফিকাহ পড়াতেন, তখন মনে হতো কার্পাসের ক্ষেতে একটা কালো কাক বসে আছে। এই ঘোর মিশমিশে কালো, চ্যাপ্টা নাক ওয়ালা ব্যক্তিকেই ইসলামী সভ্যতা একজন ইমামের মর্যাদা দান করেছিল। মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবকে যখন রাষ্ট্রীয় উচ্চপদে হিন্দু বা অমুসলিমদের নিয়োগ দানের বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তখন তার জবাবে তিনি বলেছিলেন, "ইসলামী শরীয়াহর নীতিমালার দাবী অনুযায়ী যোগ্য ব্যক্তিকে যথোপযুক্ত স্থানে নিয়োগ দেয়াই যথাযথ (Right man in the right place)।" সম্রাট আওরঙ্গজেবের ৫০ বছরের শাসনামলে বহু হিন্দু-অমুসলিম প্রশাসনের উচ্চপদে নিয়োজিত ছিল। যেমন জশবন্ত সিং, রাজা রাজরূপ, কবির সিং, অর্ঘ্যনাথ সিং, প্রেম দেব সিং, দিলীপ রায় এবং রসিকলাল। ভারতীয় ঐতিহাসিক বাবু নগেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর মতে, সম্রাট আওরঙ্গজেব ছিলেন এক সাধক, সহিষ্ণু, যোগ্য, দূরদৃষ্টি সম্পন্ন, নিরপেক্ষ এক মহানুভব ব্যক্তি। (Habib Siddiqui, Mughal Emperor Aurangazeb: Bad Ruler or Bad History, WWW. Sunniforum.com. PP-1)

ইসলামী সভ্যতাই প্রকৃত অর্থে সত্যিকার মানবিক সভ্যতা। ইসলামের দৃষ্টিতে মানবতার মর্যাদা সর্বোচ্চ। ইসলামের দৃষ্টিতে চরিত্র সাদা না কালো তাই দেখা হয়। চামড়া সাদা না কালো তা দেখা হয় না। এ প্রসঙ্গে মক্কা বিজয় কালের একটি দৃশ্য তুলে ধরছি : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মক্কা বিজয়ের সময় হাবশী বিলাল (রা)-কে কাবা শরীফের ছাদের উপর আরোহন করে আযান দেয়ার নির্দেশ দিলেন। ভাবনার বিষয় হলো আল্লাহর ঘর কাবা শরীফ জাহেলিয়াতের যুগেও পবিত্র স্থান হিসেবে গণ্য হতো এবং ইসলামেও অত্যন্ত সম্মানের অধিকারী। অথচ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নির্দেশে একজন নিগ্রো ক্রীতদাস তার উপর আরোহণ করল এবং এই পবিত্রতম স্থান তার পায়ের তলে থাকলো। এটা এমন এক দৃষ্টান্ত যা আমাদের কথিত সভ্য জগতেও দ্বিতীয়টি আর নেই। একমাত্র ইসলামই বাস্তব জীবনে প্রমাণ করেছে, "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই"। অন্যান্য সভ্যতায় শুধু কথার বাগাড়ম্বর, কথার ফুলঝুরিই প্রধান।

(খ) অমুসলিমদের সাথে আচরণের ভিত্তি বা নীতিমালা

১. সকল নবীর দীন একই উৎস থেকে উৎসারিত

সকল নবীর দীন একই উৎস থেকে অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে উৎসারিত। আল্লাহ বলেন, "আল্লাহ তোমাদের জন্য সেই দীনই মনোনীত করেছেন, যার আদেশ নূহকে দেয়া হয়েছে, তোমাকেও দেয়া হয়েছে, এবং যার আদেশ আমি ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকেও দিয়েছি। আমি বলেছিলাম যে, এই দীনকে তোমরা কায়েম কর এবং তাতে

www.bjilibrary.com

কোন মতভেদ করো না" (সূরা আশ্ শূরা : ১৩)। সকল মতভেদকে তুচ্ছ করে দীনকে কায়েম করা মূলতঃ বিশ্বাসী মানুষ মাত্রেরই দায়িত্ব। আর এ কাজ করতে হলে অমুসলিমদের সাথে সম্মানবোধের সাথে আচরণের মাধ্যমে করতে হবে।

২. সকল নবীর মর্যাদা সমান

যেহেতু আল্লাহই সকল নবীর মনোনয়নদাতা। তাই সকল নবীর প্রতি ঈমান আনা মুসলিম মাত্রই কর্তব্য। আল্লাহ বলেন, "বল, আমরা আল্লাহর উপর, আমাদের কাছে যা কিছু নাযিল হয়েছে তার উপর এবং ইবরাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তার বংশধরদের উপর যা-কিছু নাযিল হয়েছে তার উপর ঈমান এনেছি। আর মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীকে যা কিছু দেয়া হয়েছে, তার উপরও ঈমান এনেছি। আমরা নবীদের মধ্যে (মর্যাদা বিষয়ে) কোন ভেদাভেদ করিনা। আমরা আল্লাহর অনুগত।" (সূরা আল বাকারা : ১৩৬নং আয়াত)।

৩. ইসলামে স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার ও জবরদস্তি

ইসলাম গ্রহণে কোন জোর-জবরদস্তি নেই। বিবেকের ডাকে সাড়া দিয়ে মানুষ স্বতস্ফূর্তভাবে ইসলাম গ্রহণ করবে। এটাই ইসলামের রীতি। সূরা আল বাকারার ২৫৬নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, "দীনে কোন জোর জবরদস্তি নেই। কোনটা সৎপথ এবং কোনটা অসৎপথ, তা স্পষ্ট হয়ে গেছে"। সূরা ইউনুসের ৯৯ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, "তুমি কি তাদেরকে ঈমানদার হতে বাধ্য করতে চাও?" সূরা আল কাফিরুনে আল্লাহ বলছেন, "লাকুম দ্বীনুকুম ওয়ালিয়া দ্বীন- তোমাদের কর্ম ও কর্মফল তোমাদের জন্য, আমাদের কর্ম ও কর্মফল আমাদের জন্য"। এ প্রসঙ্গে ভারতীয় ঐতিহাসিক বাবু নগেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "India today there would not be nearly four times as many Hindus compared to Muslims, despite the fact that Muslims had ruled for nearly a thousand years" (Habib Siddiqui, History, WWW. Sunniforum.com. P-1)।

৪. সকল ধর্মের উপাসনালয় সম্মানার্হ

ইসলামে সকল ধর্মের উপসনালয় সম্মানার্হ। অন্যায়ভাবে কোন ধর্মের উপসনালয় ধ্বংস করা ইসলামে যেমন অনুমোদিত নয় তেমনি উদ্দেশ্যমূলকভাবে উপসনালয়কে ব্যবহার করাও ইসলামে অনুমোদিত নয়। সূরা আল হজ্জের ৪০নং আয়াতে আল্লাহ বলছেন, "আল্লাহ যদি মানুষকে মানুষ দিয়ে প্রতিহত না করতেন, তা হলে বহু উপসনালয় বিধ্বস্ত হয়ে যেত। বিধ্বস্ত হয়ে যেত আল্লাহর যিকরে সর্বক্ষণ মুখরিত মসজিদগুলো।"

৫. ধর্মীয় পার্থক্যের কারণে কোন অমুসলিমকে হত্যা করা নিষিদ্ধ

নিছক ধর্মীয় পার্থক্যের কারণে অমুসলিমদের হত্যা করা, আক্রমণ করা বৈধ নয়। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন অমুসলিমকে

www.bjilibrary.com

হত্যা করল সে জান্নাতের ঘ্রাণও ভোগ করতে পারবে না। অথচ জান্নাতের সুঘ্রাণ ৪০ বছরের দূরত্ব হতেও অনুভব করা যাবে।" আল্লাহ আরো বলেন, "তোমরা সৎকাজ ও তাকওয়ার প্রসারে সহযোগিতা কর। পাপাচার ও সীমা লংঘনের কাজে সহযোগিতা করোনা (সূরা আল মায়েদা : ২) ।

৬. আল্লাহর পরিবার

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, সমগ্র সৃষ্টিজগত আল্লাহর পরিবার স্বরূপ। যে ব্যক্তি আল্লাহর পরিবারের অধিকতর সেবা করে, সে আল্লাহর কাছে অধিকতর প্রিয়। অর্থাৎ মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকল সৃষ্টি জগতের যে যতটা পরোপকারী এবং যে যতটা সৎকর্মশীল তার উপরই নির্ভর করছে আল্লাহর প্রিয় হওয়া বা না হওয়া। ধর্মীয় মতভেদের কারণে পরোপকার, আর্তের সেবা, অতিথি সমাদর ইত্যাদি বাধাগ্রস্ত হওয়া ইসলামে কাম্য নয়।

৭. আহলে কিতাবের যবেহ করা জন্তু

সূরা আল মায়েদার ৫নং আয়াতে আল্লাহ ইহুদী ও খৃস্টানদের জবাই করা হালাল পশুর গোশত, তাদের তৈরি করা খাদ্যদ্রব্য খাওয়া, তাদের মধ্যকার সতী নারীদের বিয়ে করা মুসলিমদের জন্য হালাল এবং মুসলিমদের তৈরি করা খাদ্য তাদেরকে খাওয়ানো বৈধ বলে ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ বলেন, "আজ তোমাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করা হল। আহলে কিতাবীদের খাদ্য তোমাদের জন্য হালাল এবং তোমাদের খাদ্য তাদের জন্য হালাল। তোমাদের জন্য হালাল সতী-সাধ্বী মুসলিম নারী এবং তাদের সতী-সাধ্বী নারী, যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তোমাদের পূর্বে, যখন তোমরা তাদেরকে মোহরানা প্রদান কর তাদেরকে স্ত্রী করার জন্য, কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য কিংবা গুপ্ত প্রেমে লিপ্ত হওয়ার জন্য নয়। যে ব্যক্তি বিশ্বাসের বিষয় প্রত্যাখান করে, তার শ্রম বিফলে যাবে এবং পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্তদের একজন হবে। (সূরা আল মায়েদাহ : ৫ নং আয়াত)। ইসলাম আহলে কিতাবের সাথে যথাসম্ভব সহাবস্থানের নীতি অনুসরণ করছে। কারণ, ওহী, নবুওয়াত ও দীনের অন্যান্য মৌলিক নীতির দিক থেকে আহলে কিতাবের সাথে ইসলামের ঐকমত্য রয়েছে। খাওয়া-দাওয়ায় তাদের সাথে শরীক হওয়া, তাদের কন্যা বিয়ে করার মাধ্যমে আহলে কিতাবীরা ইসলামকে যথাযথরূপে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পাবে।

৮. ভদ্রজনোচিত পন্থায় বিতর্ক

অমুসলিমদের সাথে আলোচনা বা তর্ক-বিতর্ক অনুষ্ঠানে ইসলামের আপত্তি নেই। কিন্তু তা হতে হবে ভদ্রজনোচিত পন্থায়। পরস্পরের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে। হৃদয়গ্রাহী যুক্তি প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে। আল্লাহতায়ালা বলেন, "আহলে কিতাবের সাথে তর্ক-বির্তক করতে হলে একমাত্র ভদ্রজনোচিত পন্থায় তা কর"। (সূরা আল আনকাবুত : আয়াত ৪৬)। অমুসলিমদের সাথে অভদ্র ও অশোভন আচরণকে ইসলাম অনুমোদন

www.bjilibrary.com

দেয়নি। বৈধ করেনি। এমনকি ইসলামের পরিপন্থী আকীদা বিশ্বাস পোষণ করার জন্য তাদেরকে গালিগালাজ করারও অনুমতি দেয়নি। আল্লাহ বলেন, "যারা আল্লাহতায়ালাকে ছাড়া অন্যান্য উপাস্যের পূজা করে, তাদেরকে গালি দিও না। তাহলে তারা শত্রুতা ও অজ্ঞতা বশতঃ আল্লাহকে গালি দেবে। (সূরা আল আনআম ঃ ১০৮নং আয়াত)।

৯: প্রতিটি মানব শিশুই ইসলামের উপর জন্ম গ্রহণ করে

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, "বিশ্বের প্রতিটি মানব শিশুই ইসলাম বা প্রাকৃতিক ধর্মের উপর জন্ম গ্রহণ করে। পরবর্তী সময়ে তাদের পিতা-মাতা প্রমুখ তাকে ইহুদী, খৃস্টান , অগ্নিপূজক প্রভৃতিতে পরিণত করে।" যে শিশু মুসলিমের ঘরে জন্ম নিল এবং যে শিশু আহলে কিতাব বা মুশরিকের ঘরে জন্ম নিল, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বাণী বা হাদীস অনুযায়ী উভয়েই ইসলামের উপর জন্ম নিল। কিন্তু মুসলিম ঘরে জন্ম নেয়া শিশু যত সহজে ঈমানের পাঠ পায় তত সহজে একজন অমুসলিমের ঘরে জন্ম নেয়া শিশু ঈমানের পাঠ পায় না। আহলে কিতাব বা মুশরিকের ঘরে জন্ম নেয়া শিশুর সেই সুবিধাটাকু নেই, যা একজন মুসলিম ঘরে জন্ম নেয়া শিশুর রয়েছে। আল্লাহ যেমন একজন মুসলিমকে এই সহজতা দান করলেন সেই সাথে ইসলামকে অমুসলিমদের কাছে যথাযথ তুলে ধরার দায়িত্বও দিয়েছেন। মুসলিমদের কাছ থেকে ইসলামের যথাযথ দাওয়াত পাওয়া অমুসলিমদের অধিকারের শামিল। যেমন ধনীদের ধনে দরিদ্রদের অধিকারের কথা ইসলামে ঘোষিত হয়েছে।

১০. ভাষার মর্যাদা

বিদায় হজ্জের ভাষণে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঘোষণা করেছেন, "শুধু ভাষার কারণে একজনের উপর আরেকজনের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। অনারবের উপর আরবীয়ের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই।" বিভিন্ন বর্ণের মানুষ যিনি সৃষ্টি করেছেন সব ভাষাও তাঁরই সৃষ্টি। সূরা আর-রাহমানে আল্লাহ বলেন, "তিনিই মানুষকে বানিয়েছেন, তাকে ভাব প্রকাশ করতে শিখিয়েছেন" (সূরা আর রাহমান : আয়াত নং ৩-৪)। যিনি মানুষকে বানিয়েছেন, মাতৃভাষায় মনোভাব প্রকাশের সহজতা তিনিই দিয়েছেন। সব মানুষ যেমন তাঁরই সৃষ্টি তেমনি সব ভাষাও তাঁরই সৃষ্টি। তাই ভাষার ভিত্তিতে কোন বৈষম্য ইসলামে বৈধ নয়। ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমরা বিজিত হলেও তাদের ভাষার মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখতে হবে।

১১. শত্রুতা, প্রতিরোধ ও বন্ধুত্বের নীতি

শুধুমাত্র এক আল্লাহর উপর বিশ্বাসের কারণে মুসলিমদের উপর যখন অত্যাচার, নিপীড়ন ও আগ্রাসন চালানো হয়, তখন, শত্রুদের হাত থেকে মুসলিমদের অস্তিত্ব নিরাপদ করার জন্য ব্যবস্থা নেয়ার অনুমতি ইসলামে রয়েছে। আল্লাহ বলেন, "আল্লাহতায়ালা তোমদেরকে শুধু সেই সব লোকের সাথে সম্পর্ক ও মৈত্রী রাখতে

www.bjilibrary.com

নিষেধ করেন যারা তোমাদের সাথে ধর্মের ব্যাপারে যুদ্ধ করে, যারা তোমাদেরকে তোমাদের ঘরবাড়ি থেকে বহিস্কার করে এবং বহিস্কার করতে অন্যদেরকে উস্কে দেয়। (সূরা আল মুমতাহিনা : ৯)।

১২. অধিকার, দায়িত্ব ও জিযিয়া

মুসলিমদের সাথে লড়াই করে বিজিত অমুসলিমদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ, তাদের আকীদা ও ধর্ম বিশ্বাসের কারণে তাদের উপর নির্যাতন চালানো বা তাদের উপর এমন কোন চাপ প্রয়োগ করা যাতে তারা তাদের ধর্ম পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়, এমন আচরণ নিষিদ্ধ। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, "আমরা যে অধিকার ভোগ করি, তারাও তাই ভোগ করবে, আর আমাদের উপর যে দায়িত্ব, তাদের উপরও সে দায়িত্ব থাকবে।" ইসলামী রাষ্ট্রে তিন ধরনের অমুসলিম নাগরিক হতে পারে-

ক. যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রাণপণ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে এসেছে।

খ. যারা কোন সন্ধি বা চুক্তি বলে ইসলামী রাষ্ট্রের আওতাভুক্ত হয়েছে।

গ. যারা যুদ্ধ বা সন্ধি ব্যতীত অন্য কোন পন্থায় ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

ক. শুধু প্রথমোক্ত ধরনের অমুসলিমদেরকে "সংরক্ষিত নাগরিক" বা যিম্মি হিসাবে বিবেচিত করা হয় এবং বিনীতভাবে স্বহস্তে জিযিয়া দেয়ায় সম্মত হলে (সূরা আত্ তাওবা : ২৯নং আয়াত) তাদের জান মালের হিফাযত করা মুসলিমদের জন্য ফরয হয়ে যাবে। কেননা জিযিয়া গ্রহণ করা মাত্রই প্রমাণিত হয় যে, জান ও মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে (বাদায়েউস সানায়ে ৭ম খণ্ড, ১১১ পৃষ্ঠা)। এরপর মুসলিম সরকার বা মুসলিম জনসাধারণের এ অধিকার থাকে না যে তাদের সম্পত্তি হরণ/দখল করবে বা তাদেরকে দাসদাসী বানাবে। সংরক্ষিত নাগরিকে পরিণত হয়ে যাওয়ার পর তাদের জমির মালিক তারাই হবে। বেচা-কেনা, দান, বন্ধক রাখা ইত্যাদি সার্বিক ব্যাপারে তারা স্বাধীন থাকবে। জিযিয়ার পরিমাণ আর্থিক অবস্থার উপর নির্ধারিত হবে, জিযিয়া শুধুমাত্র যুদ্ধ করতে সক্ষম লোকদের উপর আরোপ করা হবে। যুদ্ধ করতে সমর্থ নয় এমন শিশু, নারী, পাগল, অন্ধ, পংগু, উপসনালয়ের সেবক, সন্ন্যাসী, ভিক্ষু, বৃদ্ধদের উপর এবং বছরের বেশির ভাগ সময় রোগাক্রান্ত থাকে এমন ব্যক্তি, দাস-দাসী'র কোন জিযিয়া নেই।

জিযিয়া ও কর আদায়ে অমুসলিম নাগরিকদের উপর কঠোরতা আরোপ করা নিষিদ্ধ। হযরত উমারের (রা) নির্দেশ ছিল, "যে পরিমাণ সম্পদ রাষ্ট্রকে প্রদান করা তাদের সামর্থের বাইরে তা দিতে তাদেরকে বাধ্য করা চলবে না (কিতাবুল খারাজ, পৃষ্ঠা : ৮, ৮২)। জিযিয়ার বদলায় তাদের ধন-সম্পদ নীলামে চড়ানো যাবে না। মুসলিম ফিকহ শাস্ত্রকারগণ প্রাপ্য জিযিয়া দিতে অস্বীকারকারীদের

www.bjilibrary.com

বিনাশ্রমে কারাদণ্ড দেয়ার অনুমতি দিয়েছেন। ইমাম আবু ইউসুফ বলেন, "তবে তাদের সাথে সদয় আচরণ করা হবে এবং প্রাপ্য জিযিয়া না দেয়া পর্যন্ত আটক করে রাখা হবে (কিতাবুল খারাজ পৃষ্ঠা-৭০)। যেসব অমুসলিম নাগরিক দারিদ্রের শিকার ও পরমুখাপেক্ষী হয়ে যায়, তাদের জিযিয়া তো মাফ করা হবেই, উপরন্তু ইসলামী কোষাগার থেকে তাদের জন্য নিয়মিত সাহায্যও বরাদ্দ করা হবে। দামেস্ক সফরের সময়ও হযরত উমার (রা) অক্ষম অমুসলিম নাগরিকদের জন্য বৃত্তি নির্ধারণের আদেশ জারী করেছিলেন (বালাজুরী, ফতুহুল বুলদান, পৃষ্ঠা-১২৯)।

কোন অমুসলিম নাগরিক মারা গেলে তার কাছে প্রাপ্য বকেয়া জিযিয়া তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে আদায় করা হবে না। এবং উত্তরাধিকারদের উপরও এর দায়ভার চাপানো হবে না। ইমাম আবু ইউসুফ বলেন, "কোন অমুসলিম নাগরিক তার কাছে প্রাপ্য জিযিয়া পুরো অথবা আংশিক দেয়ার আগেই মারা গেলে তা তার উত্তরাধিকারের কাছ থেকে বা তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে আদায় করা হবে না। (কিতাবুল খারাজ , পৃষ্ঠা- ৭০)।

খ. যারা যুদ্ধ ছাড়া বা যুদ্ধ চলাকালে বশ্যতা স্বীকার করে ইসলামী সরকারের সাথে সুনির্দিষ্ট শর্তাবলী স্থির করে সন্ধিবদ্ধ হয় তাদের সাথে সকল আচরণ সম্পাদিত চুক্তির শর্তানুযায়ী করা হবে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "সাবধান! যে ব্যক্তি কোন চুক্তিবদ্ধ নাগারিকের উপর যুল্‌ম করবে কিংবা তার প্রাপ্য অধিকার থেকে তাকে কম দেবে, তার সামর্থের চেয়ে বেশি বোঝা তার উপর চাপাবে, অথবা তার কাছ থেকে কোন জিনিস তার সম্মতি ছাড়া আদায় করবে, এমন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কিয়ামাতের দিন আমি নিজেই ফরিয়াদী হবো। (সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ)।"

গ. আর যুদ্ধ বা সন্ধি ব্যতীত অন্য যে কোন পন্থায় অমুসলিমরা ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হলে অমুসলিমদের জন্য নির্ধারিত সাধারণ অধিকারগুলোতে সমভাবে অংশীদার হবে।

ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকদের সাধারণ অধিকার

১. দাওয়াত পাবার অধিকার বা মুসলিম হবার অধিকার

আম্বিয়ায়ে কিরাম (আলাইহিমুস সালাম) প্রত্যেকের একই আহবান ছিল : "হে আমার জাতির লোকেরা, তোমরা আল্লাহর দাসত্ব করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই" (সূরা আল আরাফ : ৬৫নং আয়াত)। মুসলিমদের নিকট অমুসলিমদের দাওয়াত পাবার অধিকারটি আল্লাহ অনবদ্যভাবে আল কুরআনে তুলে ধরেছেন এভাবে, "তার চেয়ে উত্তম কথা আর কোন ব্যক্তির হতে পারে যে মানুষদেরকে আল্লাহতায়ালার দিকে ডাকে, নেক কাজ করে এবং বলে আমি মুসলিমদেরই একজন" (সূরা হামীম আস-সাজদা : ৩৩ নং আয়াত)।

www.bjilibrary.com

২. প্রতিবেশীর অধিকার

প্রতিবেশী হিসেবে একজন অমুসলিম, একজন মুসলিম প্রতিবেশীর নিকট থেকে প্রয়োজনীয় হকের দাবীদার। এ বিষয়ে ইসলামী রাষ্ট্র, মুসলিম নাগরিকদের উদ্বুদ্ধ করবে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, সে ব্যক্তি মুমিন নয় যে নিজে পেট পুরে খায়, কিন্তু তার প্রতিবেশী অভুক্ত থাকে। (আল বাইহাকী)

৩. প্রাণের নিরাপত্তা

ইসলামী রাষ্ট্রের নিকট অমুসলিম নাগরিকের রক্তমূল্য, মুসলিমের রক্ত মূল্যের সমান। কোন মুসলিম যদি কোন অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করে, তাহলে একজন মুসলিম নাগরিককে হত্যা করলে যেমন তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হতো ঠিক তেমনি মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর জীবদ্দশায় একজন মুসলিম, একজন অমুসলিমকে হত্যা করলে তিনি খুনীকে মৃত্যুদণ্ড দেন। তিনি বলেন, যে নাগরিকের নিরাপত্তার দায়িত্ব নেয়া হয়েছে তার রক্তের বদলা নেয়ার দায়িত্ব আমারই। (শরহে হিদায়া , ৮ম খণ্ড, ২৫৬ পৃষ্ঠা)

৪. শাস্তিযোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রে সমানাধিকার

অমুসলিমের জিনিস যদি কোন মুসলিম চুরি করে কিংবা মুসলিমের জিনিস যদি কোন অমুসলিম চুরি করে তাহলে উভয় ক্ষেত্রেই চোরের হাত কেটে ফেলা হবে। কারো উপর ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ আরোপ করলে অপবাদ আরোপকারী মুসলিমই হোক আর অমুসলিমই হোক উভয়কেই একই শাস্তি দেয়া হবে। ব্যভিচারের শাস্তিও মুসলিম ও অমুসলিমের জন্য একই রকম। তবে মদের বেলায় অমুসলিমদেরকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে (কিতাবুল খারাজ, পৃষ্ঠা : ২০৮-২০৯)।

৫. চুক্তির স্থায়িত্ব

অমুসলিমরা চুক্তি ভংগ না করা পর্যন্ত অমুসলিমদের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার চুক্তি, মুসলিমদের জন্য চিরস্থায়ীভাবে বাধ্যতামূলক। আল্লাহ বলেন, "তবে যে মুশরিকদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ, অতপরঃ যারা তোমাদের ব্যাপারে কোন ত্রুটি করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্যও করেনি, তাদের সাথে কৃত চুক্তিকে তাদের দেয়া মেয়াদ পর্যন্ত পূরণ কর। অবশ্যই আল্লাহ সাবধানীদের পছন্দ করেন (সূরা তাওবা : ৪)। "

৬. ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব

অমুসলিম নাগরিক যতো বড় অপরাধ করুক, তাদের রাষ্ট্রীয় রক্ষাকবচ সম্মলিত নাগরিকত্ব বাতিল হয় না। এমনকি জিযিয়া বন্ধ করে দিলে, কোনো মুসলিমকে হত্যা করলে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শানে বেয়াদবী করলে অথবা কোনো মুসলিম নারীকে ধর্ষণ করলেও তার নাগরিকত্ব বাতিল হবে না। তবে এসব

www.bjilibrary.com

অপরাধের জন্য তাকে অপরাধী হিসেবে শাস্তি দেয়া হবে। দুই অবস্থায় একজন অমুসলিম নাগরিকত্বহীন হয়ে যায় ঃ

ক. রাষ্ট্রের বাইরে গিয়ে শত্রুদের সাথে হাত মিলালে।

খ. ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহে লিপ্ত হয়ে অরাজকতার সৃষ্টি করলে।

৭. সামাজিক সুবিচার সংরক্ষণ

সামাজিক সুবিচার পাবার ক্ষেত্রে মুসলিম ও অমুসলিম নাগরিক উভয়ই সমান। আল্লাহ বলেন, "কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেনো তোমাদেরকে কখনও সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে। তোমরা সুবিচার করো, এটা তাকওয়ার নিকটতর। (সূরা আল মায়েদা : ৮)।

৮. ব্যক্তিগত আইনের অধিকার

অমুসলিমদের পারিবারিক বিষয় তাদের পারিবারিক আইন দ্বারা স্থির করা হবে। ইসলামী আইন কার্যকর করা হবে না।

৯. ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত না পাওয়ার অধিকার

অমুসলিমরা নিজস্ব জনপদে অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্র কর্তৃক যা বিধিবদ্ধ জনপদ নয়, এমন জনপদে তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি প্রকাশ্যে উদযাপন করতে পারবে। এজন্য তাদেরকে বা তাদের উপাস্যদেরকে গালাগালি কিংবা কটু বাক্য বলা যাবে না। যুক্তিপূর্ণ ভদ্র ভাষায় কথা বলা যাবে। আল্লাহ বলেন, "এসব লোক আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে মাবুদ বানিয়ে ডাকে তোমরা তাদেরকে গালাগালি করো না (সূরা আল আনআম : আয়াত ১০৮)।

১০. সম্পদের নিরাপত্তা

মুসলিমের সম্পত্তি যেভাবে হিফাযত করা হয় অমুসলিমের সম্পত্তির হিফাযতও সেভাবে করা হবে। এ প্রেক্ষিতে মুসলিমের উপর যে সব দায়-দায়িত্ব অর্পিত হয় অমুসলিমের উপরও তাই অর্পিত হবে। তাই ব্যবসায়ে নীতিগতভাবে যে সব কর্মকাণ্ড মুসলিমদের জন্য নিষিদ্ধ তা অমুসলিমদের জন্যও নিষিদ্ধ। তবে অমুসলিমরা চাইলে নিজস্ব জনপদে শুকর পালা, কেনাবেচা, খাওয়া, এবং মদ বানানো, পান করা ও কেনাবেচা করতে পারবে। কোন মুসলিম, কোন অমুসলিমের মদ ও শুকরের ক্ষতি করলে তাকে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে (দুররে মুখতার, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২৭৩)।

১১. উপাসনালয়ের অধিকার

মুসলিম বিধিবদ্ধ জনপদ ছাড়া অমুসলিম জনপদে অমুসলিমরা উপাসনালয় গড়তে পারবে।

www.bjilibrary.com

১২. অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও জীবিকা অর্জনের স্বাধীনতা

শিল্প, কারিগরি, বাণিজ্য, কৃষিসহ অন্যান্য পেশার মাধ্যমে জীবিকা অর্জনের স্বাধীনতা অমুসলিমদেরও মুসলিমদের ন্যায় থাকবে। এসব ক্ষেত্রে কোন বৈষম্য করা হবে না। মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিকের অর্থনৈতিক ময়দানে তৎপরতা চালানোর সমান অধিকার থাকবে। তবে ইসলামী রাষ্ট্র করারোপের ক্ষেত্রে ইনসাফমূলক যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে। জীবিকা অর্জনের জন্য চাকুরীর ক্ষেত্রে কিছু সংরক্ষিত পদ ছাড়া সকল চাকুরীতে অমুসলিমরা বিবেচিত হবে। এ ব্যাপারে কোন বৈষম্য গ্রহণযোগ্য হবে না। যোগ্য লোকদেরকে ধর্মীয় পরিচয় নির্বিশেষে নির্বাচন করা হবে।

১৩. ধর্মীয় শিক্ষার অধিকার

গোটা দেশের জন্য নির্ধারিত শিক্ষা ব্যবস্থায় অমুসলিমদের ইসলামের ধর্মীয় শিক্ষা অথবা তাদের নিজস্ব ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থাকবে। এক্ষেত্রে কোনভাবেই বাধ্য করা হবে না।

১৪. মত প্রকাশের অধিকার

যে কোন অমুসলিম তাদের নিজস্ব ধর্মীয় বিষয়ে মত প্রকাশের স্বাধীনতা ভোগ করবে। এমনকি মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সাধারণ অধিকারের এবং অমুসলিম হিসেবে ব্যতিক্রম অধিকারের বেলায় আইনসংগতভাবে তারা সরকার, সরকারী আমলা এবং সরকার প্রধানেরও সমালোচনা করতে পারবেন।

১৫. রাজনৈতিক অধিকার

নিজস্ব সমাজের জনপদে জনস্বার্থ নিশ্চিত করতে এবং ইসলামী রাষ্ট্রের, ইসলামী শরীয়া অনুযায়ী অমুসলিম নীতি সঠিকভাবে অনুসরণ নিশ্চিত করতে অমুসলিমরা রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করবে।

১৬. নারীর সম্ভ্রমের অধিকার

আল কুরআনের দৃষ্টিতে যে কোন নারীর সাথে ব্যভিচার হারাম। তা সে মুসলিম হোক বা অমুসলিম হোক। যে কোন অবস্থায় ধর্ম, বর্ণ, রক্ত, জাতি, সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল নারীর সতীত্ব, পবিত্রতা ও মান-সম্ভ্রম নিশ্চিত করার দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্রের।

১৭. মৌলিক মানবাধিকার

মুসলিমের মতই অমুসলিমদের মৌলিক মানবাধিকার তথা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসার অধিকার রয়েছে।

১৮. অক্ষম ও দুর্বলদের পুনর্বাসন ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা

মুসলিমদের মত অমুসলিম প্রতিবন্ধী, নারী, শিশু, বৃদ্ধ, রুগ্ন, সকল ধরনের অক্ষম ও অসহায় মানুষদের পুনর্বাসন ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা প্রদান ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

www.bjilibrary.com

১৯. গোপনীয়তার অধিকার

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণী অনুযায়ী "অন্যের ঘরে উঁকি মারার অধিকার কোনো ব্যক্তির নেই"। সূরা আল হুজুরাতে আল্লাহ বলেন, "গোয়েন্দাগিরি করো না" (আয়াত : ২৪)। ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে অমুসলিম নাগরিকদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকার রয়েছে। (প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য বর্তমান সময়ে অমুসলিম রাষ্ট্রগুলোতেই তাদের নাগরিকরা ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকার বিনষ্টকারী পাপ্পারাজির দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ।)

২০. একের অপরাধের জন্য অন্যকে দায়ী না করার অধিকার

ইসলামী রাষ্ট্রে কোন মুসলিমের অপরাধের জন্য কোন অমুসলিমকে দায়ী করা হবে না। কিংবা কোন অমুসলিমের অপরাধের জন্য কোন মুসলিমকে দায়ী করা হবে না।

২১. সন্দেহের ভিত্তিতে পদক্ষেপ গ্রহণ না করার অধিকার

ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিকের এ অধিকার রয়েছে যে, তদন্ত ও অনুসন্ধান ব্যতীত তার বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে না।

এই সব ভিত্তির উপর অধিকার নিশ্চিত করে ইসলামী সভ্যতা যখন গড়ে উঠল তখন বিশ্ব সর্বপ্রথম প্রত্যক্ষ করল যে, একটি ধর্ম, এমন একটি মানবিক সভ্যতার পত্তন করেছে অথচ যেখানে অন্যান্য ধর্মের প্রতি তার বিন্দু পরিমান বিদ্বেষ নেই। এ সভ্যতা অমুসলিমদেরকে কোনঠাসা করে না। সামষ্টিক তৎপরতা থেকে দূরে সরিয়ে দেয় না বা তাদের মান-মর্যাদা খাটো করে না। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক ইসলামী সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন থেকে এই অবস্থাই চলে আসছে। কিন্তু মুসলিমরা যখন এইসব নীতি বর্জন করেছে, আল্লাহ ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আদেশকে গৌণ মনে করতে শুরু করেছে, ইসলামের প্রতি উদাসীনতা দেখাতে শুরু করেছে তখন থেকেই মুসলিমদের শ্রেষ্ঠ উম্মাত বা মধ্যপন্থী উম্মাত হিসেবে পতন শুরু হয়েছে।

ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম : কিছু সত্য উক্তি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খ্যাতনামা লেখক মি. ড্রেপার বলেন, "খালিফাদের শাসনামলে খ্রীস্টান ও ইহুদী পন্ডিতদের শুধু মুখে মুখেই সম্মান করা হয়নি, তাদেরকে বড় বড় পদে অধিষ্ঠিত করা হয়েছে এবং বড় বড় সরকারী দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে।"

বিশিষ্ট ঐতিহাসিক মি. উইলস ইসলামী শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন, "ইসলামী শিক্ষা পৃথিবীতে ন্যায়বিচার ও ভদ্রজনোচিত কর্মপদ্ধতির অত্যন্ত চমকপ্রদ ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠা করেছে। সমাজে সদাচার ও উদারতার মনোভাব চালু করেছে। এ শিক্ষা অত্যন্ত উচ্চাংগের মানবতার কার্যোপযোগী শিক্ষা। এ শিক্ষা এমন সমাজ গড়ে

www.bjilibrary.com

তুলেছে, যেখানে তার পূর্ববর্তী যে কোন সমাজের তুলনায় নিষ্ঠুরতা ও যুল্‌ম ন্যূনতম মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়েছে। ইসলাম আসলে নম্রতা, সহনশীলতা, সুন্দর আচরণ ও সৌভ্রাতৃত্বের বলেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।"

স্যার মার্ক সাইস, খালীফা হারুনুর রশীদ এর শাসনকালীন সময়ের কথা লেখেন এভাবে, "খ্রীস্টান, পৌত্তলিক, ইহুদী ও মুসলমানরা ইসলামী সরকারের কর্মচারী হিসেবে সমান অধিকার নিয়ে কর্মরত ছিলেন।"

লেভী ব্রিন্টসেলী "দশম শতাব্দীর স্পেন" গ্রন্থে লিখেছেন, "খালিফাদের আমলে কয়েকজন ইহুদী কর্মকর্তা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রদূতের দায়িত্বও পালন করেছেন।"

বিশিষ্ট ঐতিহাসিক আর্নল্ড বলেছেন, "আমরা যখন প্রাথমিক যুগে খ্রীস্টান প্রজাদের প্রতি মুসলিম সরকারের এমন বিস্ময়কর ন্যায়বিচার ও ধর্মীয় উদারতা দেখতে পাই তখন দিনের আলোর মত স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তরবারীর জোরে ইসলামের প্রচার ও প্রসার সম্পর্কে যে প্রচারণা চালানো হয় তা আদৌ বিশ্বাস ও ভ্রুক্ষেপ করার যোগ্য নয়।"

বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ড্রেপার বলেন, "তিনি (মুহাম্মাদ) একমাত্র মানুষ যিনি মানবজাতির উপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করে গেছেন।" (Draper "Histry of the Intellectual Development of Europe Vol -1, P-329)

F.A Lange-এর ভাষায়, "মুহাম্মাদের একেশ্বরবাদ ছিল অবিমিশ্র এবং তুলনামূলকভাবে পৌরাণিক কল্পকথার ভেজালমুক্ত।" (F.A Lange : The History of Materialism, Vol-1, Page -184)।

মুসলিম তাত্ত্বিকরা খ্রিস্টীয় ত্রিত্ববাদকে ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বের বিকৃতি বলে মনে করল। মুসলিম তাত্ত্বিকরা ধর্মের মূল ধারণাকে প্রথমবারের মত মানুষের মনে একান্ত বিমূর্তভাবে উপস্থাপন করল। (Vide Renan , A Averroes et Averroeism, P-76)

শেষ কথা

Complete Code of life হিসেবে ইসলামী রাষ্ট্র কাঠামোয় অমুসলিম নাগরিকদের যে অধিকার দেয়া হয়েছে এবং ঐতিহাসিকভাবেই এর যে প্রমাণ রয়েছে তা এই মানবিক জীবন বিধানকে এতটা সৌন্দর্য্যমন্ডিত করেছে যে, যে কোন ধর্মের মানুষ ইসলামের এই মানবিকতায় মুগ্ধ না হয়ে পারেনি। যার কারণে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং ইসলামী জীবন বিধানের ব্যাপারে বিভিন্ন ভাষাভাষী ও ধর্মের মানুষের অসংখ্য প্রশংসা বাণী রয়েছে যা অন্য কোন জীবনবিধান বা ধর্মের ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না।

www.bjilibrary.com

এত বহুল প্রশংসিত একটি জীবন বিধান এবং তার অনুসারীরা আজ কেন এত নিগৃহীত এবং সারা বিশ্বে অমুসলিমগণ কর্তৃক সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে? এর পেছনে শুধুই কি তথ্য সন্ত্রাস? না ভিন্ন কোনো কারণও রয়েছে?

নিঃসন্দেহে তথ্য সন্ত্রাস একটি অন্যতম প্রধান কারণ। তবে সেই সাথে বর্তমানে মুসলিমদের ঈমানী দৃঢ়তা, ঐক্য এবং উদারতার দৃষ্টান্তের অভাবও প্রধান কারণ। আত্মঘাতি বোমা হামলা- কুরআন-হাদীস-ইজমা-কিয়াস কোন কিছু দিয়েই ইসলামে অনুমোদিত নয়। অথচ জিহাদের নামে কিছু সংখ্যক মুসলিম নামধারী, দাঁড়ি, টুপি, লেবাসধারী ব্যক্তি আত্মঘাতি বোমা হামলার কাজে অংশগ্রহণ করছেন অথবা মদদ দিচ্ছেন। এসব কর্মকাণ্ড ইসলামের কী পরিমাণ ক্ষতিকর এবং ইহুদী ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আধিপত্যবাদের সহায়ক তা উপলব্ধির ক্ষমতাও দুর্ভাগ্যজনকভাবে এদের নেই অথবা এরা সরাসরি লেবাসধারী হয়ে আধিপত্যবাদী শক্তির পক্ষে আর ইসলামের বিরুদ্ধে অত্যন্ত চতুরতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে।

বর্তমানে পাশ্চাত্য মিডিয়া এবং এদেশীয় পাশ্চাত্য অর্থপুষ্ট মিডিয়া গোষ্ঠী কিছুতেই ইসলামের সৌন্দর্য দেখতে পায় না। পরিকল্পিতভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে এরা তথ্য সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে একদিকে সাধারণ অমুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ইসলামের ব্যাপারে একটি অহেতুক ভুল ধারণা তৈরি হচ্ছে। অন্যদিকে মুসলিম সাধারণ্যে ব্যাপক বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়ছে। আর এভাবে পরিকল্পিতভাবে তৈরি ঘোলাটে পরিস্থিতিতে আধিপত্যবাদী, গণতন্ত্রের মুখোশধারী, মানবতা ধ্বংসকারী শক্তি তাদের লক্ষ্য হাসিল করে নিচ্ছে। মুসলিমদেরকে দিয়ে মুসলিমদের রক্ত ঝরাচ্ছে। কখনও কখনও সরাসরি নিজেরাই আগ্রাসন করছে মুসলিম জনপদে।

মুসলিম উম্মাহর এ অবস্থা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর তায়েফে নির্যাতিত হয়ে রক্তাক্ত হবার ঘটনার সাথে তুলনীয়। যেখানে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বিরুদ্ধে কাফির ও মুশরিক শক্তি কিছু নিরপরাধ মানুষকে উস্কানি দিয়ে লেলিয়ে দিয়েছিল। যারা উপর্যুপরি পাথর ছুড়ে নবী (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসল্লাম)-কে আপদমস্তক রক্তাক্ত করেছিল। তিনি বেহুশ হয়ে পড়েছিলেন। আজ তেমনি গোটা মুসলিম উম্মাহ যেন সারা বিশ্বে রক্তাক্ত হয়ে পড়েছে। এতটা নির্যাতনের পরও নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যেমন কাউকে অভিশাপ দেননি কিংবা ধৈর্য হারা হননি বরং আগামী বংশধরদের মধ্যে ইসলামের অনুসারীর স্বপ্ন দেখেছিলেন, দোয়া করেছিলেন, তেমনি বর্তমানে মুসলিম উম্মাহকেও একই নীতিতে ধৈর্য ধারণ করতে হবে এবং আগামী প্রজন্মের মধ্যে ইসলামের অনুসারী তথা ইসলামের বিজয়ের স্বপ্ন দেখতে হবে।

সবশেষে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এক অমোঘ হাদীসের প্রেক্ষাপটে নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, সকল ধরনের যুল্‌মতন্ত্রের অবসানের পর পৃথিবীতে

www.bjilibrary.com

ইসলামের বিজয় অনিবার্য। খিলাফাতের পদ্ধতিতে পুনরায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে। নবীর সুন্নাত অনুযায়ী তা মানুষের মধ্যে কাজ করে যাবে এবং ইসলাম পৃথিবীতে তার কদম শক্তিশালী করবে। সে সরকারের উপর আকাশবাসী ও দুনিয়াবাসী সবাই খুশি থাকবে। আকাশ মুক্ত হৃদয়ে তার বরকত বর্ষণ করবে এবং পৃথিবী তার পেটের সমস্ত গুপ্ত সম্পদ উদ্গীরণ করে দেবে।

এমন এক মানবিক সমাজ নির্মাণে যতই রক্ত ঝরে তাতে কেবল তার অনিবার্যতাই ত্বরান্বিত হয় - ইসলামের শত্রুদের এ বোধ কখনই হবে না। মুখের ফুৎকারে, শক্তির দাম্ভিকতায় যতই ইসলামকে নির্মূল করতে চাওয়া হোক না কেন, আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন তার নূরকে পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করবেনই (সূরা আস্ সাফ)। মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে গোটা মানবতার কল্যাণের জন্যই ইসলামের বিজয় এখন সময়ের দাবী। ■

তথ্যসূত্র

১. 'মানবতার কল্যাণে ইসলামী সভ্যতার অবিস্মরণীয় অবদান' –ড. মোস্তফা আস সিবায়ী, হাসনা প্রকাশনী, ২৩৪ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫, পৃষ্ঠা : ২০-৯৫।

২. 'ইসলামের ঐতিহাসিক ভূমিকা' –মানবেন্দ্রনাথ রায়, প্যাপিরাস প্রকাশনী, ১৮ আজিজ কো-অপারেটিভ মার্কেট, শাহাবাগ, ঢাকা-১০০০ এবং ৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০। পৃষ্ঠা : ১৮-৪৫ ।

৩. আবুল হোসেন ভট্টাচার্য্য, 'ইতিহাস কথা কয়', জাহানারা বেগম ৬নং সেন্ট্রাল রোড, লেকসাকার্স কলাবাগান, ঢাকা-১২০৫ হতে প্রকাশিত, জানুয়ারী-১৯৮১, পৃষ্ঠা ১৬৯।

৪. 'ফিতনায়ে তাকফীর' –সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, অনুবাদ : বশীরুজ্জামান, পৃষ্ঠা: ৪-১০।

৫. 'ইসলামী রাষ্ট্র ও সংবিধান' –সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, শতাব্দী প্রকাশনী, ৪৯১/১ মগবাজার রেলগেইট, ঢাকা। পৃষ্ঠা : ২৪১ -৪০০।

৬. 'রিয়াদুস সালেহীন-১ম খণ্ড' –ইমাম আন্ নববী, প্রকাশক এ কে এম নাজির আহমদ, পারিচালক, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫।

৭. 'কুরআন ও হাদীস সঞ্চয়ন' –মাওলানা আতিকুর রহমান ভূঁইয়া, ভূঁইয়া প্রকাশনী, পৃষ্ঠা: ১০৭-১১৬।

৮. 'অমুসলিমদের প্রতি ইসলামের উদারতা' –ইউসুফ আল কারযাভী, সেন্টার ফর দ্যা কুরআন এন্ড সুন্নাহ, ১৬৬/১৬৮ কলেজ রোড, চকবাজার, চট্টগ্রাম। পৃষ্ঠা : ১৯-৬৭।

৯. WWW. Islamonline.com

১০. WWW. Sunniforum.com

লেখক-পরিচিতি : শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির- বিশিষ্ট লেখক, প্রাবন্ধিক, ইসলামী চিন্তাবিদ এবং ব্যবস্থাপক (নিরীক্ষা ও পরিদর্শন), দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ লিঃ), গাজীপুর।

লেখা-পরিচিতি : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত ১৬ই অকটোবর, ২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সেমিনারে প্রবন্ধটি উপস্থাপিত হয়।

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ

যুবাইর মুহাম্মদ এহসানুল হক

■

ক. পূর্বকথা

আমরা যখন ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ নিয়ে আলোচনা করছি তখন ইউরোপে একটি মতবাদ হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ পরিত্যক্ত হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মূলনীতিসমূহ তারা পরিত্যাগ করেছে; বরং পরবর্তীতে ইউরোপীয় চিন্তায় এমন সব তত্ত্বের আগমন ঘটেছে যা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মূলনীতিসমূহকে ধারণ করে এই মতবাদকে ছাপিয়ে গেছে। অবশ্য বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ নিয়ে আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে; এদেশের কতিপয় রাজনৈতিক দল ও বুদ্ধিজীবী এখনো ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের ডঙ্কা বাজাচ্ছেন। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের রাজনৈতিক সমর্থন আদায়ের জন্য তারা ধর্মনিরপেক্ষতার আশ্রয় নেন। শুধু তাই নয়, ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ায় ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের বেশ কিছু মূলনীতিকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হয়। এই শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের যুগপৎ অনুশীলন সম্ভব বলেও দাবী করেন। এ প্রবন্ধে আমরা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সংজ্ঞা, মূলনীতি, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ নিয়ে আলোচনা করব। পাশাপাশি ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সম্পর্কের প্রকৃতি ওপর যৎসামান্য আলোপকপাত করব।

www.bjilibrary.com

'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ'কে উদ্দেশ্যমূলকভাবে নৈতিক (intentionally ethical) এবং নেতিবাচক দৃষ্টিতে ধর্মীয় আন্দোলন (negatively religious) বলা যায়। আবির্ভাবকালে এটির উদ্দেশ্য হিসেবে বলা হয়েছিল এটি জীবনযাপন প্রণালী ও আচরণগত তত্ত্ব। তবে, এটি যেহেতু ঈশ্বর বা পরকালীন জীবনের কথা স্বীকার করে না এবং ধর্মীয় কর্মকাণ্ডকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমাবদ্ধ রাখতে বলে সেহেতু এটিকে নেতিবাচক দৃষ্টিতে ধর্মীয় মতবাদও বলা চলে। সে যাই হোক, হঠাৎ করে এ মতবাদের উদ্ভব হয়নি।

একটি মতবাদ হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের আনুষ্ঠানিক যাত্রা ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে হলেও এর ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল বহু আগে। এ মতবাদের উৎপত্তির সাথে মধ্যযুগের ইউরোপীয় রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাস ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। ইউরোপীয় রাষ্ট্রচিন্তার ক্ষেত্রে মধ্যযুগ ধরা হয় খৃস্টিয় চার্চ প্রতিষ্টার সাথে সাথে। চার্চ ও চার্চ বিরোধীদের প্রভাব বিবেচনায় মধ্যযুগকে দু'ভাগে ভাগ করা যায় : পূর্ববর্তী মধ্যযুগ ও পরবর্তী মধ্যযুগ। পূর্ববর্তী মধ্যযুগে সেন্ট আম্ব্রোজ (৩৩৭/৩৪০-৩৯৭), সেন্ট অগাস্টিন (৩৫৪-৪৩০) ও সেন্ট গ্রেগরি (৫৪০-৬০৪) প্রমুখ ধর্মযাজক ইউরোপীয় রাষ্ট্রচিন্তাকে প্রভাবিত করেছেন। এ যুগকে চার্চের স্বর্ণযুগ বলা যায়। তখন পোপের মাথায় ছিল রাজমুকট, চার্চ ছিল দিগ্বীজয়ী এবং খৃস্টিয় নীতি ছিল সর্বাত্ম। এঁদের প্রভাবে মধ্যযুগের রাষ্ট্রচিন্তা খৃস্টিয় নীতি দ্বারা প্রভাবিত ছিল। রাষ্ট্রনীতি ছিল ধর্মতত্ত্বের গভীর গহ্বরে বন্দিনী। চার্চ ও রাষ্ট্র মিলে ছিল সমাজ এবং তা ছিল এক ও অভিন্ন। সে সমাজের সদস্য হতে হলে অবশ্যই খৃস্টান হতে হতো। ধর্মচ্যুত হলে মানুষ অধিকার বঞ্চিত হত। যাজকতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্র মিলে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করেছিল যেখানে মানুষ ছিল অধিকার বঞ্চিত। রাজনৈতিক স্বাধীনতা বলতে কিছুই ছিল না।[১] এমনকি ধর্মের দোহাই দিয়ে নিরেট বৈজ্ঞানিক সত্য অস্বীকার করা হত। চার্চের নির্দেশ অমান্য করে বিজ্ঞান চর্চা করার কারণে অনেক বিজ্ঞানীকে নির্যাতন করা হয়। উদাহরণস্বরূপ আমরা বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী গ্যালিলিও গ্যালিলির নাম উল্লেখ করতে পারি।[২]

---

১. এমাজউদ্দিন আহমদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা (ঢাকা: বাংলাদেশ বুক করপোরেশন লিঃ ১৯৯২), পৃ ১৩৪-১৩৬

২. পোলিশ বিজ্ঞানী নিকোলাস কোপার্নিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩) এই তত্ত্ব দেন যে, পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরে। কিন্তু তিনি এটি নির্ভুলভাবে প্রমাণ করতে পারেননি। পরবর্তীতে ইটালিয়ান বিজ্ঞানী গ্যালিলও গ্যালিলি (১৫৬৪-১৬৪২) টেলিস্কোপ আবিষ্কার করেন এবং সৌরজগত পর্যবেক্ষণ করে প্রমাণ করেন যে পৃথিবীসহ সৌরজগতের সকল গ্রহ সূর্যের চারদিকে ঘোরে। আলোড়ন সৃষ্টিকারী এইসব আবিষ্কারের জন্য বিখ্যাত হন গ্যালিলিও। কিন্তু এরপর প্রচন্ড বাধা আসে খৃস্টিয় গির্জা সঙ্ঘের তরফ থেকে। ১৬১৬ সালে গ্যালিলিওকে নির্দেশ দেয়া হয় কোপার্নিকাসের মতবাদ প্রচার না করতে। এর ফলে কয়েক বছর নিরুপায় হয়ে বসে থাকতে হয় তাকে। ১৬২৩ সালে পোপের মৃত্যু হলে তাঁর জায়গায় গ্যালিলিওর এক ভক্ত অষ্টম আরবান নতুন পোপ হিসেবে অভিষিক্ত হন। তিনি বিধিনিষেধ তুলে নেন। পরবর্তীতে গ্যালিলিও কোপার্নিকাসের মতবাদ প্রমাণ করতে 'ডায়ালগ কনসার্নিং দ্য টু চীফ ওয়ার্ল্ড সিস্টেমস' নামে

www.bjilibrary.com

পরবর্তী মধ্যযুগে ইউরোপীয় রাষ্ট্রচিন্তায় চার্চের পরাক্রম হ্রাস পায়। সম্রাটদের কাছে পোপ হীনবল হন এবং বিশ্বাসের স্থলে যুক্তি প্রাধান্য পায়। ধীরে ধীরে বিপ্লবাত্মক ও ধর্মনিরপেক্ষতার সূত্র দানা বাঁধতে থাকে। দান্তে (১২৬৫-১৩২১), মারসিলিও প্রমুখ দার্শনিক পোপের কর্তৃত্ব চ্যালেঞ্জ করেন।

উনবিংশ শতাব্দের প্রথমার্ধে ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক অঙ্গনে এমন কিছু ঘটনা সংঘটিত হয় যা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের প্লাটফর্ম তৈরি করে। ১৮৩২ সালে বৃটেনে রিফর্ম বিল পাশ হয়। তার পূর্বে যে ব্যাপক রাজনৈতিক ডামাডোল সৃষ্টি হয়েছিল ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের উদ্ভবে তার অবদান ছিল। এর ছাঁচ যোগান দিয়েছিল রবার্ট ওয়েন (১৭৭১-১৮৫৮) ও তাঁর অনুসারীদের অপরিপক্ক সমাজতন্ত্র ও হতভাগ্য চার্টিস্ট আন্দোলন।[৩] উগ্র চার্টিস্টদের কন্টিনেন্টাল রেভ্যুলেশন (১৮৪৮) এর পতনের অব্যবহিত পরে তত্ত্ব হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের আবির্ভাব।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ছিল একটি প্রতিবাদ আন্দোলন। গীর্জা ও সামন্তবাদের যৌথ শাসনে সৃষ্ট তীব্র সামাজিক বৈষম্য যে প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়েছিল তারই অন্যতম প্রোডাক্ট হল ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ। ধনিক ও প্রভাবশালী গোষ্ঠীর স্বার্থপরতা, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় স্বাধীনতার অযৌক্তিক বিরোধিতা ও ধর্মতত্ত্বের কঠোর বাড়াবাড়ি ছিল শক্তিশালী নিপীড়ক, যা শ্রমিক শ্রেণীর মাঝে রাজনৈতিক সচেতনতার পাশাপাশি ধর্ম বিরোধীতার বীজ বপন করে। আর তাই উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে ইউরোপে যেসব রাষ্ট্রচিন্তার উন্মেষ ঘটেছে তার সবগুলোতে আমরা কায়েমি স্বার্থ ও ধর্মবিরোধীতার সাধারণ বৈশিষ্ট্যদ্বয় লক্ষ্য করি। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদও এর ব্যতিক্রম ছিল না। তবে এ মতবাদে নাস্তিক্যবাদের ন্যায় ধর্মের সরাসরি বিরোধিতা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। যদিও সামাজিক ও রাষ্ট্রীক জীবনে ধর্মীয় বিধি-বিধান বাস্তবায়নের কঠোর

একটি গবেষণাধর্মী বই লিখেন। ১৬৩২ সালে গির্জার মুদ্রণ সংক্রান্ত অনুমতি নিয়ে সেটি প্রকাশ করেন। তারপরও বই প্রকাশ হওয়ার পর চার্চ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং এবং গ্যালিলিওকে ১৬১৬ সালের নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করার অপরাধে ধরে আনা হয় রোমে। কিছুদিন নিজ বাড়ীতে গৃহবন্দী হয়ে থাকতে হয় তাকে। পরবর্তীতে আরো একবার বিচারের মুখোমুখি করা হয় তাকে। ৬৯ বছরের বৃদ্ধ বিজ্ঞানীকে বলা হয়, পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে নয়, বরং সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে এই কথাটা তাঁকে বলতে হবে কোর্টে দাঁড়িয়ে। কিন্তু কোর্টভর্তি লোকের সামনে তিনি উল্টোটাই বলেছেন। (মাইকেল এইচ হার্ট (অনুবাদঃ আবু আজহার), সেরা ১০০ (ঢাকাঃ অনন্যা ২০০০), পৃ.৬৫-৬]

৩. ১৮৩৭ সালে ইংল্যান্ডে People's Charter-এর সমর্থকরা যে নৈরাজ্যকর আন্দোলন শুরু করেছিল তা 'চার্টিস্ট মুভমেন্ট' নামে পরিচিত। সার্বজনীন ভোটাধিকার (Universal Franchise) ও ব্যালটে ভোটপ্রদানসহ অন্যান্য কিছু দাবী নিয়ে তারা এমন আন্দোলন করেছিল যে রায়ট লেগে গিয়েছিল। বৃটিশ সরকার কঠোর হস্তে এই আন্দোলন দমন করেন। ১৮৪৮ সালে এই আন্দোলন চূড়ান্তরূপে দমন করা হয়; নেতৃস্থানীয় ৬০ আন্দোলনকারীকে অস্ট্রেলিয়ার নির্বাসন দেয়া হয়। (The Australian Encyclopeadia, Australian Geographic Pty Ltd., V.2, p.672

www.bjilibrary.com

বিরোধীতার কারণে এ চেষ্টা বিফল হয়েছে। প্রতিবাদ আন্দোলনসমূহের সকল উগ্র চরিত্র ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ধারণ করেছিল- গঠনমূলক কর্মকাণ্ডের বদলে ধংসাত্মক কাজের প্রতি ঝোঁক, জ্বলন্ত অনুভূতির বিকৃত প্রভাব ও সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদি।[৪]

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের দার্শনিক ভিত্তি

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের দার্শনিক ভিত্তি হল জেমস্ মিল (১৭৭৩-১৮৩৬) ও জেরেমি বেনথামের (১৭৪৮-১৮৩২)-এর 'এসোসিয়েসনিস্ট আন্দোলন'।[৫] পাশাপাশি এর নাস্তিক্যবাদী প্রবণতার উৎস হল থমাস পেইন (১৭৩৭-১৮০৯) ও রিচার্ড কার্লাইল। এই মতবাদে 'প্রত্যক্ষবাদে'র (Positivism)[৬] প্রভাবও লক্ষ্যণীয়; একে প্রত্যক্ষবাদের বৃটিশ প্রতিধ্বনিও বলা যায়। যদিও এই মতবাদ প্রত্যক্ষবাদী ধর্মকে এড়িয়ে চলে এবং 'মানবতা'কে ঈশ্বর হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করে, তবুও এটি জ্ঞান ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার যে তত্ত্ব দাঁড় করায় তা অনিবার্যভাবে প্রত্যক্ষবাদের সাথেই যায়। অবশ্য ধর্মনিরপেক্ষতাবাদে এই প্রভাব আমদানি করা হয়েছিল জি. এইচ. লুইস ও জে. এস. মিলের (১৮০৬-১৮৭৩) হাত ধরে। পরের জনের হাতে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মূলনীতিসমূহ সমর্পণ করা হয়েছিল এবং তিনি এইসব অনুমোদন করেছিলেন। ফলে বৃটিশ 'উপযোগবাদী'রা-ই হয়েছিলেন ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের দার্শনিক পৃষ্ঠপোষক।

যদিও এই আন্দোলনের মূল প্রণোদনা এসেছিল সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা হতে যা এর প্রতিষ্ঠাতাদেরকে জীবনের প্রচলিত ডকট্রিন ও সে'সময়ে প্রচলিত চিন্তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে উৎসাহ যুগিয়েছিল তবুও এর সহগামী প্রভাবক ছিল দার্শনিক ভাবনা। ধর্ম হতে দুরে থাকার যে বিঘোষিত নীতি এই আন্দোলন গ্রহণ করেছিল তা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের জন্য জীবন ও আচরণের একটি দর্শনাশ্রয়ী তত্ত্বে নিজের বক্তব্যকে সমৃদ্ধ করা আবশ্যকীয় করে তুলেছিল। প্রত্যক্ষবাদ দিল জ্ঞানভিত্তিক একটি ধারণা (কনসেপশন) যা একে এমন এমন ভিত্তি দিল যার সাহায্যে সে ধর্মীয় বিবেচনাকে

---

৪. Encyclopedia of Religion and Ethics, Newyork, Charles Scribner's Sons, entry: Secularism

৫. এসোসিয়েসনিজম্: সামাজিক মনোবিজ্ঞানের একটি তত্ত্ব। এ তত্ত্বের মূলকথা হলো: মানুষের মানসজগত নানা উপাদানের সহযোগে গঠিত; এসব উপাদানকে সাধারণত sensation ও idea বলে অভিহিত করা হয়।
http://webspae.ship.edu/cgboer/psychbeginnings. html

৬. প্রত্যক্ষবাদ হল দার্শনিক ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ সম্পর্কিত একটি মতবাদ। অঁগাস্ত কঁতে এর প্রবক্তা। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ও বিংশ মতকের প্রথম দশক পর্যন্ত এ মতবাদ দাপটের সাথে বিরাজিত ছিল। মূলনীতিসমূহ:
ক) বিজ্ঞানই হল একমাত্র অকাট্য জ্ঞানের উৎস; খ) দর্শনের কাজ হল কিছু সাধারণ নীতিমালা খুঁজে বের করা যা বিজ্ঞানের অনুগামী হবে এবং এগুলিকে মানব আচরণ ও সমাজ সংগঠনের ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করা। (বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন, The Encyclopedia of Philosophy, entry: Positivism)

www.bjilibrary.com

চূড়ান্তভাবে ছুড়ে ফেলল। আর উপযোগবাদীরা[৭] ধার দিল প্রেষণার ধর্মবিমুখ ব্যাখ্যা। এভাবে উপরোক্ত তত্ত্বগুলির ওপরই দাঁড়িয়েছিল ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ।[৮]

সংজ্ঞা

'Secularism is an ethical system founded on the principles of natural morality and independent of revealed religions or supernaturalism.'[৯]

'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ একটি নৈতিক ব্যবস্থা, যা কেবল প্রাকৃতিক নৈতিকতার মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং ঐশীসূত্রে প্রাপ্ত ধর্ম বা রহস্যবাদমুক্ত।'

Secularism: the belief that religion should not be involved in the organization of society, education etc.[১০]

সমাজ সংগঠন, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে ধর্ম সংশ্লিষ্ট হতে পারবে না, এমন বিশ্বাসই হল ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ।

A form of opinion which concerns itself only with questions, the issues of which can be tested by the experience of this life.[১১]

এক ধরণের মতামত যা এই জীবনের অভিজ্ঞতায় পরীক্ষাসম্ভব বিষয়গুলোকে স্পর্শ করে।

Secularism is a code of duty pertaining to this life founded on considerations purely human, and intended mainly for those who find theology indefinite, unreliable or unbelievable.[১২]

---

৭. Utilitarianism: উপযোগবাদ: ধনবাদী সমাজের নীতিশাস্ত্রের একটি তত্ত্ব হচ্ছে উপযোগবাদ। বেনথাম এর প্রতিষ্ঠাতা। এ মতবাদের মূলকথা হল: ভাল ও মন্দ, সঙ্গত ও অসঙ্গত কাজের মাপকাঠি ঐশ্বরিক বিধান নয়। বরং ন্যায়-অন্যায়ের মাপকাঠি হল সুখ ও দুঃখ। অর্থাৎ কোন আচরণে ব্যক্তি যদি সুখের চেয়ে অধিক দুঃখ ভোগ করে তবে সে আচরণ অসঙ্গত। আবার কোন আচরণে ব্যক্তির সুখের পরিমাণ যদি দুঃখের চেয়ে বেশী হয় সে আচরণ সঙ্গত, কাম্য। (বিস্তারিত জানতে দেখুন, The Encyclopedia of Philosophy, Collier Macmillan Publisher, v.7, p. 206-211; সরদার ফজলুল করিম, দর্শনকোষ (ঢাকা: বাংলা একাডেমী ১৯৭৩), পৃ. ৪১৭-১৮)

৮. Encyclopedia of Religion and Ethics

৯. Encyclopedia Americana, v.24, p.510

১০. Oxford Advanced Learners Dictionary

১১. Holyoake, English Secularism: A Confession of Belief (Chicago, 1896), p.60 quoted from-
http:// www.newadvent.org/cathen/13676a.html

১২. Holyoke, ibid, p. 35

www.bjilibrary.com

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ একটি কর্তব্য পালন পদ্ধতি যা এই জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট, কেবল মানবীয় বিবেচনার ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং যারা ধর্মতত্ত্বকে আস্থা ও বিশ্বাসযোগ্য মনে করে না তাদের জন্য প্রণীত।'

এখানে আরো সংজ্ঞা উল্লেখ করা যায়; সবগুলি কাছাকাছি অর্থের। মোটকথা হল ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ইহকালীন জীবন পরিচালনার সাথে সম্পর্কিত একটি মতবাদ। এটি প্রাকৃতিক নৈতিকতার ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং পার্থিব জীবন পরিচালনার সকল ক্ষেত্রে ধর্মের সম্পৃক্ততার বিরোধিতা করে।

খ. প্রতিষ্ঠাতাবৃন্দ

ধর্মনিরপেক্ষাতাবাদ, নিজের অস্তিত্ব ও সম্প্রসারণের জন্য জর্জ জ্যাকব হোলিয়ক[১৩]-এর জীবন ও পরিশ্রমের নিকট অনেকাংশে ঋণী। দীর্ঘ জীবনে হোলিয়ক তাদের সাথে ওঠবস করতেন যাদের খৃস্টবাদবিরোধী প্রচারণা ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর ঘূর্ণিকেন্দ্র। একই সাথে তিনি, বিশেষত জীবনের শেষ দিকে, তার সময়ের নামকরা খৃস্টবাদ-সমর্থকদের সাথেও সুসম্পর্ক বজায় রাখতেন। ডব্লু. ই. গ্লাডস্টোন (১৮০৯-১৮৯৮; বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী ১৮৬৮-৭৪, ১৮৮০-৮৫, ১৮৮৬ ও ১৮৯২-৯৪) একজন নামকরা খৃস্টবাদ সমর্থক ছিলেন; তিনি হোলিয়ককে একজন সৎ ও একনিষ্ঠ প্রতিদ্বন্দ্বি মনে করতেন এবং তাঁর সাথে হোলিয়কের সম্পর্কও ছিল খুবই চমৎকার।

---

১৩. ১৮১৭ সালে বার্মিংহামে হোলিয়ক জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতামাতা ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী কারিগর এবং হোলিয়ক ধর্মীয় পরিমন্ডলে বেড়ে ওঠেন। তার জন্ম শহর ও এর পরিপার্শ্ব তার মাঝে তীব্র সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রত্যয় সৃষ্টি করে, ১৮৩২ সালে বিল অফ রিফর্ম পাশ যাতে আগুনে ঘৃতাহুতি দেয়। সে সময় হোলিয়ক ছিলেন পনের বছরের কচি তরুণ। চার্চের সামাজিক কর্মসূচির অভাবে তিনি ধর্মালয় বিমুখ হন এবং রাজনৈতিক জীবনে তার পদার্পণ হয় 'ওয়েনাইট সোশ্যাল মিশনারী' হিসেবে। ফলশ্রুতিতে তিনি চার্টিস্ট আন্দোলনে সম্পৃক্ত হন। এবং আন্দোলনের পতনের পর তিনি পরবর্তী জীবনে তিনি একজন প্রাগ্রসর প্রগতিবাদী হন। ১৮৪১ সালে তিনি ঈশ্বরের ওপর আস্থা হারান এবং খৃস্টবাদের প্রতি তার চরম ঘৃণা বেড়ে যায় যখন তাকে ব্লাসফেমির অভিযোগে ক্যালটেনহামে কারারুদ্ধ করা হয়। একই সাথে তিনি তার সময়ের নাস্তিক্যবাদীদেরকে কখনো সমর্থন করেননি। তার atheism ছিল অজ্ঞেয়বাদ (agnosticism) (অজ্ঞেয়বাদীরা বিশ্বাস করে যে ঈশ্বর আছে কি নেই তা তাদের জানা নেই।) পাক্ষিক পত্রিকা The Reasoner-এ- যাতে তিনি নিয়মিত লিখতেন- একবার লেখেন, 'আমরা খৃস্টান ধর্মের সত্য অস্বীকারকারী নই; বরং আমরা খৃস্টানদের ভ্রান্তিগুলি প্রত্যাখ্যান করি।' বিশ্বাসী খৃস্টানদের মাঝে যারা তার সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মসূচি সমর্থন করতেন তাদের সাথে তিনি অবাধে মেলামেশা করতেন । অনেক দিন যাবৎ হোলিয়ক সমাজকল্যাণ ও সমবায় আন্দোলনের সাথে সম্মানজনকভাবে যুক্ত ছিলেন। মধ্য জীবনে তিনি লন্ডনে থিতু হন একজন বই বিক্রেতা হিসেবে এবং তাঁর নানা আগ্রহের মাঝে বিশেষভাবে উল্লেখ্য ছিল ইটালীর স্বাধীনতার সংগ্রাম। শেষ জীবনে তিনি ব্রাইটনে বসবাস করেন এবং শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের অল্পদিন আগে সাধারণ নির্বাচনে লিবারেল পার্টির বিজয়কে স্বাগত জানিয়ে ১৯০৬ সালে ইহধাম ত্যাগ করেন।

www.bjilibrary.com

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ প্রতিষ্ঠায় হোলিয়কের সাথে যারা কাজ করেছেন তাদের মাঝে চার্লস সাউথওয়েল, থমাস কুপার (পরবর্তীতে খৃস্টবাদ-এ দীক্ষিত হন), থমাস প্যাটারসন এবং উইলিয়াম চিলটনের নাম উল্লেখযোগ্য। আন্দোলনটির সূচনা হয় ১৮৪৯ সালে। হোলিয়ক বারবার নাস্তিক্যবাদের বিকল্প হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে চিত্রিত করতে চেয়েছেন। ১৮৫০ সালে হোলিয়ক, ব্রাডলাফের ((১৮৩৩-১৮৯১) নর্দাম্পট আসনের বৃটিশ কমন্স সভার সদস্য ১৮৮০-১৮৯১) সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং পরের বছর 'Secularism' পরিভাষাটি উদ্ভাবন করেন; অবশ্য তৎপূর্বে তিনি কিছুটা সন্দেহে ছিলেন; কারণ netheism ও limitationism শব্দ দু'টি নিয়েও তিনি ভেবেছিলেন। ধর্মনিরপেক্ষতবাদ, হোলিয়কের আস্তিকতা বিরোধী মতবাদ ও ব্রাডলাফের নাস্তিক্যবাদী মতবাদের পার্থক্যের সীমারেখা টানতে সর্বদা সচেষ্ট ছিল। যদিও ব্রাডলাফ, চার্লস ওয়াটস ও জি. ডব্লু. ফুট (১৮৫০-১৯১৫) -এর মত স্বঘোষিত নাস্তিকরা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সূচনালগ্ন থেকেই এ আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন তথাপি হোলিয়ক বারবার জোর দিয়ে বলতেন, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক লক্ষ্য নাস্তিক্যবাদী বিশ্বাস অপরিহার্য করে না। তার আশা ছিল উদারপন্থী আস্তি করা তাদের আস্তিকতার পূর্বসংস্কার এক পাশে রেখে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের লক্ষ্য বাস্ত বায়নের এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করবে। অবশ্য তার এ আশা খুব একটা পূরণ হয়নি।

মূলনীতিসমূহ

এ মতবাদের সবচাইতে বেশি উচ্চারিত মূলনীতি তিনটি :

ক) 'কেবল বস্তুগত উপায়ে মানব-উন্নতির চেষ্টা করা';

খ) পশ্চিমা বিজ্ঞান ও

গ) উদারপন্থী মতবাদ (Liberalism)

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি হল 'কেবল বস্তুগত উপায়ে মানব-উন্নতির চেষ্টা করা।' এটি মনে করে বস্তুগত উপায়-উপকরণই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এগুলি আমাদের নাগালে; এবং প্রত্যাশিত লক্ষ্যপূরণে এগুলিই যথেষ্ঠ। মানুষের উন্নতি-অগ্রগতিতে কোন অদৃশ্য বা ঐশ্বরিক শক্তির ভূমিকা নেই এবং তাদের সাহায্যের কোন প্রয়োজন নেই ।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ এমন এক সময়ে বিকশিত হয়েছিল যখন ধর্ম ও বিজ্ঞানের অবস্থান ছিল একেবারে বিপরীতে। এই জীবনের অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে ধর্মনিরপেক্ষ জ্ঞান গড়ে ওঠেছিল যা ইহজীবনে বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যাচাই করা সম্ভব। এটি মনে করত, গণিত, পদার্থ ও রসায়ন যেমন ধর্মনিরপেক্ষ তেমনিভাবে মানুষের জীবন চলার বিধান এবং মানব কল্যাণের বিধানও এমন উপায়ে প্রণয়ন সম্ভব যাতে অপার্থিব বা অদৃশ্য কোন শক্তির বা ঈশ্বরের কোন ভূমিকা থাকবে না।

www.bjilibrary.com

ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মাঝে এক ধরণের mutually exclusive (আপোষে পৃথক) সম্পর্ক আছে বলে দাবী করা হয়। বলা হয় এ'দুয়ের সম্পর্ক বৈরী নয়। ধর্মনিরপেক্ষ তাত্ত্বিকদের মতে, ধর্মতত্ত্ব অজানা জগত সম্পর্কে আলোচনা করে[১৪] আর ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ সেই জগতের বিষয়ে একবারে নীরব। এটি মানব অভিজ্ঞতায় অর্জিত জ্ঞাত পৃথিবী নিয়ে কাজ করে; পরজগত বা অজানা জগত সম্পর্কে এর কোন বক্তব্য নেই; সেই জগতকে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বিশ্বাসও করে না অবিশ্বাসও করে না। আস্তিকতা বা নাস্তিকতার কোন প্রবেশাধিকার নেই ধর্মনিরপেক্ষ স্কীমে; কারণ এর কোনটিই মানব অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত নয়। নৈতিক বিষয়ে খৃস্টবাদের সাথে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের অনেক মিল আছে; কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ধর্মীয় বিবেচনা বর্জিত নৈতিকতা প্রস্তাব করে। এটি মনে করে পূর্ণাঙ্গ নৈতিকতা শুধু ধর্মনিরপেক্ষ বিবেচনায় সম্ভব। একটি গৃহ যে স্থপতি নির্মাণ করেছে তার প্রতি কোন ইঙ্গিত না করে বা তার সম্পর্কে কোন আলোচনা না করে সে ঘর ব্যবহার করা সম্ভব তেমনি এ পৃথিবী যিনি সৃজন করেছেন তার কোন ভূমিকা ছাড়াই মানুষের পক্ষে শুধু তাদের অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে নৈতিকতা নির্মাণ সম্ভব। এ দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় না যে অন্য কোথাও কোন 'আলো' নেই। তবে মানুষের লক্ষ্য পূরণে বা কল্যাণ সাধনে সেই আলোর কোন ভূমিকা নেই। দেবতা যদি মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে হস্তক্ষেপ না করে তবে সে বিকশিত হল না ধ্বংস হল এ নিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের কোন মাথাব্যাথা নেই। ধর্মনিরপেক্ষ তাত্ত্বিকদের মানসজগতে ধর্ম সম্পর্কে এই নিরাসক্ত মনোভাব শেষ পর্যন্ত স্থায়ী হয়নি। ধর্ম সম্পর্কে হোলিয়ক ও ব্রাডলাফের মতবাদ পর্যালোচনাকালে আমরা দেখতে পাব ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, ধর্মহীনতা ও ধর্মবিরোধিতায় পর্যবসিত হয়েছিল।[১৫]

পশ্চিমা বিজ্ঞান স্বাভাবিক কার্যকারণকে (natural causation) সমর্থন করে এবং সত্য উদ্ধারে পদার্থবিদ্যায় ব্যবহৃত নিউটনীয় পদ্ধতির সর্বজনগ্রাহ্যতার ওপর জোর দেয়। যুক্তি, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নীরিক্ষা ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এজন্য যাতে ওহী বা ঐতিহ্যসূত্রে প্রাপ্ত জ্ঞান অস্বীকার করা যায়। হোলিয়ক মনে করতেন বিজ্ঞান যেমনিভাবে স্বাস্থ্যের মূলনীতি বলে দিতে পারে তেমনিভাবে মানসিক সুখ-শান্তির উপাদানও বাতলে দিতে পারে। মানসিক প্রশান্তির জন্য বিজ্ঞান ও যুক্তিবৃত্তি (reason) ভিন্ন অন্য কোন উৎসের দ্বারস্থ হওয়ার প্রয়োজন নেই।[১৬]

---

১৪. ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে একটু পরে আমরা যখন আলোচনা করব তখন আমরা দেখতে পাব যে এ বক্তব্য ইসলামের ব্যাপারে সত্য নয়।

১৫. Encyclopedia of Religion and Ethics

১৬. Abdul Rashid Moten, Political Science: An Islamic Perspective (Wiltshire: Antony Rowe Ltd 1996), p. 1-2

www.bjilibrary.com

উদারতাবাদ (Liberalism), মানবতাবাদ-এর (humanism) ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত, যা মুক্ত ও স্বাধীন মানুষের পবিত্রতা ও সাধুতায় বিশ্বাস করে। এ মতবাদ মানবাধিকার, অবাধ স্বাধীনতা ও অনিয়ন্ত্রিত সুখের সন্ধানকে সমর্থন করে।

উদারতাবাদের চূড়ান্ত দাবী ছিল ধর্মীয় বন্ধন থেকে মুক্তি; যে চূড়ান্ত স্বাধীনতার জন্য উদারতাবাদে জোর দেয়া হয়েছে তা হল ব্যক্তির মুক্তি যাতে সে মুক্তবুদ্ধির দাবী অনুসারে নিজ বিশ্বাসের ঘোষণা দিতে পারে। জন স্টুয়ার্ট মিল বলেন :

যেসব মহা মণীষীর কাছে শব্দটি ঋণী তারা সবাই জোর দিয়ে বলেছেন, চিন্তার স্বাধীনতা এমন জন্মগত অধিকার যা অবলোপ করা যায় না। ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে মানুষকে অন্য কারো কাছে দায়ী হতে হবে এ ধারণাকে তারা দৃঢ়তার সাথে প্রত্যাখ্যান করেছেন।[১৭]

বিশ্বাসের স্বাধীনতার ওপর গুরুত্ব দিয়ে উদারতাবাদ- জেফারসনের ভাষায়- চার্চ ও রাষ্ট্রের মাঝে একটি দেয়াল নির্মাণ করতে চায়। মিল আরো বলেন :

একটি রাষ্ট্র যেখানে সরকার কোন এক ধর্মের পক্ষে এবং অন্য ধর্মের বিপক্ষে কোন চাপ অনুভব করবে না; একটি রাষ্ট্র যেখানে কোন এক ধর্মের পক্ষে এবং অন্য ধর্মের বিপক্ষে কোন সামাজিক বা শিক্ষাগত চাপ থাকবে না; রাষ্ট্রটি হবে সম্পূর্ণরূপে ধর্মীয় শিক্ষামুক্ত।[১৮]

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ এই ধারণা পোষণ করে যে এর মূলনীতিসমূহ বিচারবুদ্ধির প্রয়োগে প্রতিষ্ঠা ও টেকসই করা সম্ভব; যেহেতু যুক্তি (reason) ও বোধ (intelligence)-এর মূলনীতিসমূহ মানবতার জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। এটি মনে করে 'নৈতিকতার ভিত্তি হল যুক্তি এবং ভুল হয় জ্ঞানে, উদ্দেশ্যে নয়'। হোলিয়ক মনে করতেন এমন বস্তুগত অবস্থা তৈরি করা সম্ভব যা দারিদ্র ও বঞ্চনা দূর করতে সক্ষম হবে। উপযোগবাদীদের ন্যায় তিনিও মনে করতেন নৈতিকতার (অবশ্যই প্রকৃতিগত নৈতিকতা বা natural morality; ধর্মীয় নৈতিকতা নয়) মাধ্যমেই ব্যাপক মানব কল্যাণ সাধন সম্ভব। এই লক্ষ্য অর্জনে আমাদেরকে যুক্তি দ্বারা পরিচালিত হতে হবে এবং সেই যুক্তি হবে অবশ্যই শৃঙ্খলমুক্ত। নৈতিক ও ধর্মীয় গবেষণা বিজ্ঞান গবেষণার ন্যায় মুক্ত হতে হবে। যে কোন অনুসন্ধান, সমালোচনা বা প্রচারের জন্য কোন প্রকার আইনগত বা ধর্মীয় শাস্তি থাকবে না। জীবন যাপনের এ যুক্তিনির্ভর থিওরি দিতে গিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ এমন এক ব্যবস্থা নির্দেশ করে যা মনে করে ধর্ম যথাযথভাবে কাজ করছে না। কিসে মানুষের কল্যাণ তা নির্ধারিত হবে যুক্তির (reason) মাধ্যমে; ঐশ্বরিক বা ধর্মীয় নির্দেশনার মাধ্যমে নয়। আর যুক্তি পরীক্ষিত হবে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। তারপর সেই

---

১৭. John Stuart Mill, On Liberty cited in Abdel Rashid Moten, ibid, p. 2

১৮. Ibid

www.bjilibrary.com

অভিজ্ঞতালব্ধ যুক্তি-নির্ধারিত কল্যাণ কর্মসূচি 'মানবতার লেখক' (Author of Humanity) কর্তৃক অনুমোদিত হয়ে সমাজে প্রচলিত হবে।[১৯]

রাজনৈতিভাবে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র নির্বাচন পদ্ধতি, গণমাধ্যম, নির্বাহী, আইন ও বিচার বিভাগের সমন্বয়ে পরিচালিত হয়। রাষ্ট্রপরিচালনায় জনগনের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে নির্বাচন পদ্ধতি। গণমাধ্যমের কাজ হল স্বাধীনভাবে মানুষের মুক্তবুদ্ধির চর্চা ও বজায় রাখার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করা। বাকী তিনটি অঙ্গের সমন্বয়ে সরকার পরিচালিত হয়। অর্থনৈতিকভাবে এ ধরণের সমাজ আত্ন-নিয়ন্ত্রিত বাজার পদ্ধতির ওপর নির্ভর করে। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের মনোযোগ থাকে সর্বাধিক দক্ষতার দিকে, এর অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হল আত্মনির্ভরশীল প্রবৃদ্ধির সক্ষমতা এবং ধর্ম, নৈতিকতা ও নন্দনতত্ত্বের (aesthetics) প্রতি মোটেও ভ্রুক্ষেপ না করে এটি পরিচালিত হয়।[২০]

উপর্যুক্ত মূলনীতিসমূহ পশ্চিমা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের বেলায় প্রযোজ্য। এ মতবাদের কিছু স্থানিক রূপ রয়েছে। সে সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে আমরা ধর্ম সম্পর্কে এ মতবাদের দু'প্রতিষ্ঠতার (হোলিয়ক ও ব্রাডলাফ) মতামত সম্পর্কে আলোকপাত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি।

ধর্ম সম্পর্কে হোলিয়ক ও ব্রাডলাফ

ইতিহাসের পরিক্রমায় আমরা দেখতে পাই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ তার চলার পথের নানা ধাপে নাস্তিকতায় অঙ্গীভূত হয়েছে। স্রষ্টার অস্তিত্ব সম্পর্কে হোলিয়ক অবশ্য নিজেকে অজ্ঞেয়বাদী (agnostic) বলে দাবী করতেন। হোলিয়কের মতে,

'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ খৃস্টবাদ-বিরোধী নয়। তবে এটি খৃস্টবাদ হতে মুক্ত। এ মতবাদ খৃস্টবাদের মর্যাদাকে চ্যালেঞ্জ করে না। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ এই দাবী করে না যে, অন্য কোথাও 'আলো' বা দিক-নির্দেশনা নেই; তবে এটি জোর দিয়ে বলে, ধর্মনিরপেক্ষ বিশ্বাসে 'আলো' ও 'পথের দিশা' রয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষ জ্ঞান হল সেই জ্ঞান যার ভিত্তি রয়েছে ইহকালে, যা এই জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট, এই জগতের কল্যাণ সাধন করে এবং যা এই জগতের অভিজ্ঞতায় পরীক্ষা করা সম্ভব।'[২১]

হোলিয়ক আস্তিকতা ও নাস্তিকতা দু'টোকেই 'অতি বিশ্বাস' বলে মনে করতেন; কারণ এ'দু'টির কোনটিই পার্থিব অভিজ্ঞতায় পরীক্ষিত নয়।

হোলিয়কের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের কো-ফাউন্ডার ব্রাডলাফ ধর্ম সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করতেন। স্রষ্টার অস্তিত্ব সম্পর্কে ব্রাডলাফ নাস্তিক (atheist) ছিলেন। ১৮৭০ সালে ব্রাডলাফ, হোলিয়কের সাথে এক তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হন। ব্রাডলাফ বলেন, নাস্তিকতা ছাড়া নৈতিকতার কোন স্কীম হাতে নেয়া সম্ভব নয়।

---

১৯. Encyclopedia of Religion and Ethics
২০. Abdul Rashid Moten, ibid, p.2
২১. Wikipedia online Encyclopedia

www.bjilibrary.com

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও আস্তিকতা পাশাপাশি চলতে পারে না। আর তাই আস্তিক্যবাদী বিশ্বাসের বিরুদ্ধে লড়াই করা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের জন্য অপরিহার্য। তিনি আরো মনে করতেন, অদৃশ্যে বিশ্বাস আর মানব-প্রগতি পাশাপাশি চলতে পারে না।[২২]

হোলিয়ক ও ব্রাডলাফ দু'জনেই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মূল প্রবক্তা ছিলেন। ধর্ম নিয়ে তাদের এহেন বিতর্কের কারণে অনেকে এ মতবাদকে দু'ভাগে বিভক্ত করার প্রয়াস পেয়েছেন। Institute for the Study of Secularism in Society and Culture-এর পরিচালক ব্যারি কসমিন ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন: গোঁড়া ও উদার ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ। গোঁড়া ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ধর্মীয় বিশ্বাসকে জ্ঞানতাত্ত্বিকভাবে অবাস্তব মনে করে। আর উদার ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ-এর দৃষ্টিতে 'নিরংকুশ সত্যে উপনীত হওয়া অসম্ভব। আর তাই সংশয়বাদ ও সহিষ্ণুতা মূলনীতি হওয়া উচিত এবং বিজ্ঞান ও ধর্মের আলোচনায় গোঁড়ামি বর্জন করা উচিত।'[২৩]

ধর্মকে অস্বীকার করার মাত্রানুসারে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদেরকে কয়েক ভাগে বিভক্ত হতে দেখা যায়; এক দল নিজেদেরকে নাস্তিক (atheist) বলে দাবী করে (এরা ব্রাডলাফের অনুসারী)। আরেক দল নিজেদেরকে অজ্ঞেয়বাদী (agnostic) বলে দাবী করে (এরা হোলিয়কের অনুসারী)। তৃতীয় এক দল নিজেদেরকে deist বলে দাবী করে। এঁরা একজন সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, যিনি সৃষ্টির সূচনা করেছেন; কিন্তু মানবজাতির পার্থিব জীবন পরিচালনায় তার কোন ভূমিকা বা নির্দেশনা নেই।

ধর্মের ব্যাপারে মতামত যা-ই হোক না কেন এ মতবাদের সমর্থকদেরকে আমরা ধর্মবিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ন হতে দেখি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দি অ্যামেরিকান সেক্যুলার ইউনিয়ন এন্ড ফ্রিথট ফেডারেশন, কয়েকটি স্থানীয় সহযোগী সংগঠনসহ এর লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিল চার্চ ও রাষ্ট্রের পৃথকীকরণ এবং এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের তারা নয়টি দাবী উত্থাপন করেছিল, যেগুলির প্রত্যেকটি ধর্মবিরোধী :

১. চার্চের সম্পত্তি করমুক্ত রাখা যাবে না;

২. কংগ্রেস, রাজ্য আইনসভা, আর্মি, নেভী, কারাগার, আশ্রয়কেন্দ্র এবং সরকারী অর্থে পরিচালিত অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে চ্যাপলিন নিয়োগ দেয়া যাবে না;

৩. কোন ধর্ম সম্প্রদায় পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারী অনুদান দেয়া যাবে না;

৪. উচ্চতর নৈতিক শিক্ষা ও কঠোর সততার বিষয়ে শিক্ষাদানের বেলায় ধর্মীয় শিক্ষা বর্জন করতে হবে এবং সরকারী অর্থে পরিচালিত স্কুলসমূহে ধর্মীয় উদ্দেশ্যে বাইবেল পাঠ বন্ধ করতে হবে;

---

২২. The Autobiography of Mr. Bradlaugh, p. 334, 336 cited in- http:// www.newadvent.org/cathen/13676. html

২৩. Wikipedia

www.bjilibrary.com

৫. ধর্মীয় অনুষ্ঠানসমূহে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ও অঙ্গরাজ্যসমূহের গভর্নরদের উপস্থিতি বন্ধ করতে হবে;

৬. আদালত ও বিভিন্ন সরকারী অফিসে ধর্মীয় রীতিতে শপথ গ্রহণের প্রথা বন্ধ করতে হবে, এক্ষেত্রে শপথ করে মিথ্যা বলার আইনি শাস্তি স্মরণ করিয়ে দেয়াই যথেষ্ঠ;

৭. যেসব আইন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ধর্মীয় বিশ্বাসকে সমর্থন করে সেগুলি বাতিল করতে হবে;

৮. খৃস্টিয় নৈতিকতা সমর্থিত সকল আইন রহিত করতে হবে এবং প্রকৃতিগত নৈতিকতা, সমানাধিকার ও পক্ষপাতহীন ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আইন প্রণয়ন করতে হবে এবং

৯. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও এর অঙ্গরাজ্যসমূহের সংবিধানের সাথে সঙ্গতি রেখে খৃস্টবাদ বা অন্য কোন ধর্মকে বিশেষ সুবিধা দেয়া যাবে না; আমাদের সামগ্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা নিরংকুশভাবে ধর্মনিরপেক্ষ ভিত্তির ওপর গড়ে তুলতে হবে এবং যেখানে পরিবর্তন দরকার তা ধারাবাহিকভাবে ও নিশঙ্কচিত্তে সম্পাদন করতে হবে।[২৪]

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ : নানা দেশে নানা রূপে

পশ্চিমা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের পাশাপাশি আমরা আরো কয়েক ধরনের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ দেখতে পাই।

মার্ক্সীয় ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ: পশ্চিমে বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত ও বস্তুগত যে উন্নতি হয়েছে তার সমস্ত কৃতিত্ব ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে দেয়া হয়। পশ্চিমের অর্জনের পরিণতি কার্ল মার্ক্সের (১৮১৮-১৮৮৩) চাইতে বেশী কেউ পর্যবেক্ষণ করেননি।

পশ্চিমা সভ্যতা সম্পর্কে মার্ক্স বলেছেন:

নগ্ন স্বার্থপরতা আর বিচেতন নগদ পরিশোধ (callous cash payment) ছাড়া মানুষের মাঝে আর কোন বন্ধন অবশিষ্ট নেই। ধর্মানুভূতির পবিত্র আবেশ ও বীরত্বব্যঞ্জক উৎসাহকে এই সভ্যতা অহংবাদী বরফ সাগরে ডুবিয়ে ডুবিয়ে মেরেছে; ব্যক্তিগত সততাকে মূল্য মিনিময়ে দ্রবীভূত করেছে। পারিবারিক বন্ধন হতে আবেগ-অনুভূতি ও স্নেহ-মমতার পর্দা ছিন্ন করে তাকে নিখাদ আর্থিক লেনদেনের পর্যায়ে নামিয়ে দিয়েছে।[২৫]

---

২৪. http:// www.newadvent.org/cathen/13676. html

২৫. Karl Marx and Frederick Engels, Menifesto of the Communist Party (New York: International Publisher 1948), p.11

www.bjilibrary.com

পচনধরা পশ্চিমা সভ্যতার বিকল্প হিসেবে কার্ল মার্ক্স একটি নতুন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক তত্ত্ব দেন যা অবশ্যম্ভাবী সামাজিক উত্তরণের ধাপ পেরিয়ে শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করবে বলে তিনি আশা করেছিলেন। তিনি তার মতবাদকে ধর্মীয় বিশ্বাসের শক্তি এবং বৈজ্ঞানিক প্রমাণের নিশ্চয়তার পোশাক পরাতে সক্ষম হন। এই মতবাদের চূড়ান্ত প্রোডাক্ট হল মার্ক্সবাদ। যা ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীতে ধর্মনিরপেক্ষায়নে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ দর্শন।

এটি খুব জোর দিয়ে বলা যায় যে, মার্ক্সীয় ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ছিল পশ্চিমা ইতিহাস, সমাজ-কাঠামো ও পশ্চিমা সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গীর অনিবার্য পরিণতি। এর প্রতিষ্ঠাতা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ পশ্চিমা সমাজ হতে উদ্ভূত; শুধু তাই নয়, এর পুরো দর্শন পশ্চিমের বুর্জোয়া টাইপের উৎপাদনের অবকাঠামোর ওপর প্রতিষ্ঠিত। মার্ক্সবাদের সারকথা হল পশ্চিমের বিরুদ্ধে পশ্চিমা প্রতিক্রিয়া। ফলে মার্ক্সবাদের মূলনীতিগুলোও একই: বস্তুবাদ, যুক্তিবাদ, আধুনিক বিজ্ঞান ও মানবতাবাদ।

বুর্জোয়া কালচার ও উৎপাদন ব্যবস্থার সমালোচনার ওপর মার্ক্সীয় মানবতাবাদের ভিত্তি। মার্ক্সের মতে, বুর্জোয়া উৎপাদন ব্যবস্থা মানুষের উচ্চ মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত করে। খৃস্টবাদের ওপর তীব্র আক্রমণ করেছেন তিনি; কারণ এটি কাপুরুষতা, স্বার্থপরতা, নীচতা, বশ্যতা এবং বিমর্ষতা প্রচার করে।

পশ্চিমা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ধর্মের সমালোচনায় কিছুটা কোমল; কিন্তু মার্ক্সবাদই প্রথম মতাদর্শ যা ধর্মের ব্যাপারে যুদ্ধংদেহী মনোভাব পোষণ করে। নিজের ডক্টরাল থিসিসের ভূমিকায় মার্কস বলেন, 'এক কথায়, আমি সকল খোদাকে ঘৃণা করি।' মার্ক্সের মতে, 'ধর্ম অবাস্তব; প্রাকৃতিক কার্যকারণ সম্পর্কে মানুষের অজ্ঞতা ও মনস্তাত্ত্বিক দুর্বলতার ফসল। এটি মানুষের বন্দীত্ব ও বিচ্ছিন্নতার ধাপগুলি তৈরি করে, পাশাপাশি মানুষের উন্নত প্রণোদনাসমূহকে বাধা দান করে।'

মার্ক্সের নাস্তিকতাবাদ, সম্ভবত, ইহুদি হিসেবে শৈশবে তীব্রভাবে অনুভূত বঞ্চনাজাত; যাজকশ্রেণীর বিরুদ্ধে সচেতন আক্রমণ যারা তার ভালোবাসা নষ্ট করেছিল এবং লুথারান ধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া যে ধর্ম গ্রহণে তাঁর পিতা বাধ্য হয়েছিলেন।

সোভিয়েত ইউনিয়নের মত কৃষি নির্ভর দেশে আমরা মার্ক্সবাদের বাস্তবায়ন দেখেছি, যদিও মার্ক্স ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন ইংল্যান্ডের মত শিল্পোন্নত দেশে এই মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হবে। মার্ক্সীয় আদর্শে প্রতিষ্ঠিত সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে ধর্মকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য নিয়তান্ত্রিক সরকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এর অর্থ হলো এই সব রাষ্ট্র মার্ক্সীয় আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য সকল ধর্মীয় বিশ্বাসকে ধূলিস্যাৎ করা অপরিহার্য মনে করত। এমনকি কোন কোন মুসলিম দেশে হিব্রু গণক মার্কস-এর বাণী পবিত্র হিসেবে গণ্য করা হয়। তার মতবাদকে ওহীর মর্যাদা দেয়া হয় এবং তাকে এমন খোদার আসনে বসানো হয় যিনি অন্য দেবতাদেরকে ঘৃণা করেন।[২৬]

---

২৬. Abdul Rashid Moten, ibid, p.4

www.bjilibrary.com

তৃতীয় বিশ্বে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ

পশ্চিমা সমাজবাস্তবতা ও তৃতীয় বিশ্বের সমাজবাস্তবতা এক নয়। ধর্ম সম্পর্কে প্রাচ্যের মানুষের অভিজ্ঞতা আর গীর্জার কঠোর দুঃশাসনে পিষ্ঠ পশ্চিমের অভিজ্ঞতা এক নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সদ্য স্বাধীন উপনিবেশগুলির নেতারা উপলব্ধি করেন যে, মার্ক্সীয় ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মত কট্টর ধর্মবিরোধী মতবাদ তো নয়-ই বরং পশ্চিমা ধাঁচের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদও তাদের দেশের ধর্মপরায়ন জনগনের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। তাই মার্ক্সীয় নাস্তিকতা কিংবা পশ্চিমা ধাঁচের অজ্ঞেয়বাদী ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ-এর পরিবর্তে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে তত্ত্বগতভাবে পরিমার্জিত ও অবমূল্যায়িত স্বতন্ত্র ব্রান্ডের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ চালু করা হয়। ফলে তৃতীয় বিশ্বে এসে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে তার পশ্চিমা চরিত্র ও ফ্লেবার ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। তারা এই মতবাদের ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য নিয়ে যুক্তি দিতে শুরু করেন। এটি আরো ভালোভাবে চিত্রিত হয়েছে ভারতীয় প্রেক্ষাপটে, যেমন Gajendragadkar-এর লেখায়:

তদুপরি, ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ মানব জীবনে ধর্মের প্রাসঙ্গিকতা ও কার্যকারিতা স্বীকার করে..সংবিধানের দৃষ্টিকোণে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের অর্থ হল, ভারতে যেসব ধর্ম চর্চা করা হয় সবগুলি সম-স্বাধীনতা পাবে, সম-নিরাপত্তা লাভ করবে।[২৭]

এভাবে বোঝানোর চেষ্টা করা হয় যে, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ মানে জনগনের মাঝে ধর্মের অনুপস্থিতি নয়। এর অর্থ হল ধর্মের ব্যাপারে রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা। তার মানে হল, সকল ধর্ম রাষ্ট্রের সমান পৃষ্ঠপোষকতা পাবে। বিশেষ কোন ধর্মকে প্রাধান্য দেবে না রাষ্ট্র।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের এই সংশোধিত ও পরিমার্জিত রূপটি প্রায়োগিক ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে। বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ ভারতের দিকে তাকালে এর নজির পাওয়া যাবে। সাংবিধানিকভাবে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র[২৮] হওয়ার পরও ভারতে ব্যাপকহারে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন করা হয়। এবং ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রটি সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তাদানে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাসে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপাসনালয় ধ্বংসের সবচাইতে ন্যাক্কারজনক ঘটনাটি ঘটে ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর; ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) মদদপুষ্ট উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠন রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘ (আর.এস.এস)-এর কর্মীরা এইদিন ৪৫০ বছরের পুরোনো ও ঐতিহ্যমন্ডিত ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার বাবরি মসজিদকে (১৫২৮-১৯৯২) ধুলোয়

---

২৭. P.B. Gajendragadkar, 'The Concept of Secularism', Secular Democracy (New Delhi, Weekly) Annual Number, 1970, p.1, cited in Abdul Rashid Moten, ibid, p.5

২৮. We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN, SOCIALIST, SECULAR, DEMOCRATIC REUBLIC.. (The Constitution of India, Introduction)

www.bjilibrary.com

মিশিয়ে দেয়।[২৯] সেই সময় ধর্মনিরপেক্ষতার দাবীদার 'কংগ্রেস' ক্ষমতাসীন থাকলেও মসজিদটি রক্ষায় কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। পরবর্তীতে বিজেপি ক্ষমতায় থাকাকালে গুজরাটে সাম্প্রদায়িক গণহত্যায় হাজার হাজার মুসলিম নাগরিককে হত্যা করা হয়।[৩০] শুধু তাই নয়, বর্তমান কংগ্রেস শাসনামলেও ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হত্যা ও তাদের উপাসনালয় ধ্বংসের ঘটনা অব্যাহত রয়েছে। ২০০৭ সালে বড়দিনের প্রাক্কালে শুধু ঝাড়খণ্ড প্রদেশে ২৫টি গীর্জা ধ্বংস করে উগ্রবাদী হিন্দুরা।

মুসলিম বিশ্বে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তি হতে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত অধিকাংশ মুসলিম দেশে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ আমদানি করা হয়। তবে আশ্চর্য হলেও সত্য যে, সর্বপ্রথম যে মুসলিম দেশে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ আমদানি করা হয় সেটির কোন ঔপনিবেশিক অভিজ্ঞতা ছিল না। ১৯২৪ সালে খেলাফত লুপ্ত করে মোস্তফা কামাল পাশা তুরস্ককে ধর্মনিরপেক্ষ প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করেন। কামাল পাশা তুরস্কে যা চালু করেন তা ভারতের মত সমঝোতা প্রয়াসী ও অবমূল্যায়িত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ছিল না। তিনি পাশ্চাত্য ধাঁচের নাস্তিক্যবাদী ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ চালু করেন। ইসলামী পোশাক ও আরবী হরফ নিষিদ্ধ করে পশ্চিমা ড্রেস ও রোমান বর্ণমালা গ্রহণ করা হয়। ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয়। এসব পলিসির বিরোধীতাকারীদেরকে কঠোর হস্তে (ক্ষেত্রবিশেষে মৃত্যুদন্ডের মাধ্যমে) দমন করা হয়।

তিউনিসিয়ার হাবিব বারগুইবা কিছুটা নম্র পদক্ষেপ গ্রহণ করেন; রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে তিনি ইসলামকে ঠিক রেখে মহিলাদেরকে পর্দা পরিধান করতে নিষেধ করেন। এবং

---

২৯. প্রথম মুঘল সম্রাট বাবরের (১৫২৬-৩০) নির্দেশে জনৈক মীর বাকি ১৫২৮ সালে বাবরি মসজিদ নির্মাণ করেন। ভারতীয় জনতা দল (বিজেপি) সমর্থনপুষ্ঠ উগ্রবাদী সংগঠন আর এস এস-এর সশস্ত্র কর্মীরা ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর এক প্রকার বিনা বাঁধায় ৫ ঘন্টার তান্ডবে মসজিদ ধুলোয় মিশিয়ে দেয়। বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন, কুমুদকুমার ভট্টাচার্য (সম্পাদনা), হিন্দু-পাদ-পাদশাহী (কলকাতা: বর্ণ পরিচয় ১৯৯৩); S.A.H. Haqqi, Secularism Under Siege (Aligarh: U. P. Rabita Committee 1993)

৩০. ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০২ একদল হিন্দু করসেবক 'সবরমতি' ট্রেন যোগে অযোধ্যা হতে গুজরাট ফিরছিল। পথিমধ্যে করসেবকদের বহনকারী বগিতে আগুন ধরে যায় এবং ৫৯ করসেবক আগুনে পুড়ে মারা যায়। এ-ঘটনার জন্য মুসলমানদেরকে দায়ী করা হয়; গুজরাটে বিভিন্ন শহরে ব্যাপকহারে মুসলিম হত্যা করা হয়। মুসলিম মালিকানাধীন হাজার হাজার ঘরবাড়ি ও দোকানপাট জ্বালিয়ে দেয়া হয়। অসংখ্য নারীকে ধর্ষনের পর পৈশাচিকভাবে হত্যা করা হয়। ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের নিরাপত্তা বাহিনী এ-সময় নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে এবং ক্ষেত্র বিশেষে প্রতিরোধকারী মুসলমানদের ওপর গুলি চালায়।
(http://discardedlies.com/entry/2401)

www.bjilibrary.com

পশ্চাদপদতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সুবিধার্থে ১৯৬১ সালে তিনি তিউনিসিয়ানদেরকে রমযানে রোযা না রাখতে আহবান জানান।[৩১]

এই উপমহাদেশে ইংরেজ আমলে ধর্মনিরপেক্ষ মূলনীতিসমূহ আমদানি করা হয়। ১৮৩৫ সালে মুসলিম আইনের বদলে বৃটিশ আইন চালু করা হয়। পরবর্তীতে লর্ড ম্যাকলের সুপারিশ অনুযায়ী ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর ভারতে ধর্মরিপেক্ষতাবাদেকে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। পাকিস্তানকে ইসলামিক রিপাবলিক[৩২] ঘোষণা করা হলেও বিচার ব্যবস্থা ও শিক্ষানীতিতে বৃটিশ মডেলেকে অনুসরণ করা হয়। যেসব মুসলিম দেশে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলির মাঝে গাম্বিয়া, গিনি, নাইজার, নাইজেরিয়া ও সেনেগাল অন্যতম।

বাংলাদেশের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের অনধিকার প্রবেশ

১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের সংবিধানে অন্যতম রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ অর্ন্তভুক্ত করা হয়। এটি ছিল অনাকাঙ্ক্ষিত ও অপ্রয়োজনীয়; কারণ এ মতবাদের স্বপক্ষে জনগণের চাপ ছিল না এবং ক্ষমতাসীন দলের নির্বাচনী ওয়াদায় ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের কথা ছিল না। জন্মলগ্ন থেকে থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা পর্যন্ত কখনো আওয়ামী লীগ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের কথা বলেনি।

১৯৫৩ সালের ৫ ডিসেম্বর আওয়ামী লীগ (তৎকালে আওয়ামী মুসলিম লীগ), কৃষক শ্রমিক পার্টিসহ আরো কয়েকটি দল মিলে 'যুক্তফ্রন্ট' গঠন করে। এই ফ্রন্টের ২১ দফার প্রথম দফার ওপরে মোটা হরফে নিম্নোক্ত বাণীটুকু লিপিবদ্ধ ছিল:

"কোরান-সুন্নার মৌলিক খেলাফ কোন আইন প্রণয়ন করা হইবে না এবং ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে নাগরিকগণের জীবন ধারণের ব্যবস্থা করা হইবে।"[৩৩]

১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে গণপরিষদে পাকিস্তানের সংবিধান পাশ হয়; পাকিস্তানকে ইসলামিক রিপাবলিক ঘোষণা করা হয়। সে-সময় আওয়ামী লীগ এই ঘোষণার বিরোধিতা করেনি।[৩৪] ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫) ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন এবং এই কর্মসূচির ভিত্তিতে ১৯৭০ এর নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন। ৬ দফার কোথাও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের কথা ছিল না। শুধু তাই নয়, নির্বাচন উপলক্ষে প্রকাশিত প্রচারপত্র কিংবা দলীয় প্রধানের রেডিও-টিভির ভাষণ- কোথাও

---

৩১. Abdul Rashid Moten, ibid, p.3

৩২. Pakistan shall be a Federal Republic to be known as the Islamic Republic of Pakistan. (The Constitution of Pakistan, 1 (1))

৩৩. মাহমুদউল্লাহ (সম্পা.), বাংলনাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস ও দলিলপত্র (ঢাকা: গতিধারা ১৯৯৯), খ.১, পৃ. ২১৬-২২২

৩৪. আবু আল-সাঈদ, আওয়ামী লীগের ইতিহাস (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী ১৯৯৬), পৃ. ৬৪,৬৫

www.bjilibrary.com

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবী ছিল না।[৩৫] তবুও ১৯৭২ সালের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ অন্তর্ভূক্ত করা হয়। আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্রের ব্যাখ্যানুসারে তারা ভারতীয় মডেলের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গড়তে চায়। এ মতবাদের কথা বলে সংখ্যালঘু ভোট ব্যাংক নিজেদের দখলে রাখলেও সংখ্যালঘুদের ধন-সম্পদ লুণ্ঠনে আওয়ামী লীগ অগ্রগামী ছিল। সে যাই হোক। বাংলাদেশের সংবিধানের ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ জাতীয় মূলনীতি থেকে বাদ দেয়া হয় এবং তদস্থলে আল্লাহর ওপর বিশ্বাস ও আস্থা সংযোজিত হয়।

মুসলিম দেশসমূহে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ অনুপ্রবেশের ঐতিহাসিক বাস্তবতা নিয়ে আমরা আলোচনা করতে চাই। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের জন্ম ইউরোপে; গীর্জার দুঃশাসনে নিষ্পেষিত ইউরোপীয় মানস ক্রমেই ধর্মবিরোধী হয়ে ওঠেছিল। মুসলিম দেশসমূহ শাসনকালে ইউরোপীয়রা ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেছিল। মুসলিমদের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাদীক্ষা সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা বঞ্চিত হয়। কতিপয় নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষানুরাগীর প্রচেষ্টায় ইসলামী শিক্ষার আংশিক রূপ কোনমতে প্রচলিত থাকে। ইসলামকে আধুনিক সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার উপযোগী বিধান হিসেবে প্রমাণের কোন কর্মসূচি সেই শিক্ষা ব্যবস্থায় ছিল না। ইউরোপীয়রা যখন মুসলিম কলোনিগুলি ছেড়ে দিল তখন এসব দেশ শাসনের উপযুক্ত রইল কেবল তারাই যারা ঔপনিবেশিক শক্তি প্রবর্তিত ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিত। ইসলামের সামগ্রিক রূপ সম্পর্কে তারা মোটেই ওয়াকিফহাল ছিলেন না। অনিবার্যভাবে নব্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত মুসলিম প্রাচ্যে পাশ্চাত্য মডেলে ধর্মনিরপেক্ষ শাসন চালু হয়।

অথচ ধর্ম সম্পর্কে খৃস্টিয় পশ্চিম ও ইসলামী প্রাচ্যের অভিজ্ঞতা এক নয়। মুসলিম প্রাচ্যে মসজিদকেন্দ্রিক কোন মোল্লাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল না। মোল্লাতন্ত্র ও রাজতন্ত্রের যৌথ নিষ্পেষণের অভিজ্ঞতাও নেই মুসলিম প্রাচ্যের। প্রতিনিধিত্বশীল আলিম ও ফকীহগণকে আমরা শাসককূল কর্তৃক নির্যাতিত-নিগৃহীত হতে দেখি।[৩৬] ইসলাম ও

---

৩৫. ১৯৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রচার পত্র, ১ ডিসেম্বর ১৯৭০; শেখ মুজিবের রেডিয়ো-টিভি ভাষণ ২৮ আক্টোবর ১৯৭০, App রিপোর্ট। দেখুন মাহমুদউল্লাহ, প্রাগুক্ত পৃ. ৩৪৫-৩৪৭, ৩৩০-৩৩৩

৩৬. ইমাম আবু হানিফাকে (৬৯৯-৭৬৭) ফিকহ শাস্ত্রের জনক বলে গণ্য করা হয়। ৭৬৩ সালে আব্বাসীয় খলিফা আল-মানসূর তাঁকে কাজীউল কুজাত (প্রধান বিচারপতি) হওয়ার প্রস্তাব দেন। ইমাম আবু হানিফা এ প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়ে বলেন, তিনি এ পদের উপযুক্ত নন। আল-মানসূর বুঝতে পারেন যে রাষ্ট্রীয় পদ গ্রহণ না করার জন্য আবু হানিফা এ অজুহাত পেশ করেছেন। আল মানসূর তাঁকে বলেন, 'আপনি মিথ্যা বলছেন।' জবাবে ইমাম আবু হানিফা বলেন, 'আপনি এক মিথ্যাবাদীকে আপনি কীভাবে কাজীউল কুজাত পদে নিয়োগ দেবেন?' ক্রুদ্ধ আল মানসূর ইমামকে বন্দী করেন এবং কারাগারে তাঁর মৃত্যু হয়।
(http://en.wikipedia.org/wiki/Abu-Hanifa)

www.bjilibrary.com

খৃস্টবাদের মাঝে আরেকটি পার্থক্য হল : খৃস্টিয় পশ্চিম যখন খৃস্টবাদের নিগড়ে বন্দী তখন তাদের উন্নতি-অগ্রগতি ছিল রুদ্ধ। বর্তমানে পাশ্চাত্য সমাজ উন্নতির চরম শিখরে অবস্থান করছে অথচ খৃস্টবাদ রাষ্ট্র ও সমাজ হতে বহিস্কৃত। ধর্ম নিয়ে মুসলিম অভিজ্ঞতা একেবারেই ভিন্ন; সবাই একবাক্যে স্বীকার করবেন যে ইসলামী শাসনের রোল মডেল খোলাফা রাশেদূনের শাসনকাল। ন্যায়বান খলিফাদের শাসনকাল ছিল সুশাসন, ন্যায়বিচার ও সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।[৩৭] উমাইয়া খলিফাদের মধ্যে সবচাইতে ধর্মপ্রাণ ছিলেন উমর ইবন আবদুল আজিজ; তাঁর শাসনামলে সুশাসন ও অর্থনৈতিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার এমন অবস্থা ছিল যে যাকাত নেওয়ার লোক বিরল হয়ে পড়েছিল। স্বাধীনতা-উত্তর মুসলিম দেশগুলির শিক্ষিত সমাজ ইসলামের সোনালী যুগের এই উজ্জ্বল ইতিহাসের ব্যাপারে অনবহিত ছিলেন, তারা ছিলেন পশ্চিমের শ্রেষ্ঠত্বে বিমোহিত। ফলে অনিবার্যভাবে প্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোতে পশ্চিমা ধাঁচের শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়।

ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ	ইসলাম
মানব রচিত	আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত
সম্পূর্ণরূপে পার্থিব	ইহকাল ও পরকাল, দু'কালকেই গুরুত্ব দেয়
যুক্তি, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নীরিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেয়	ওহী, যুক্তি, পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার ওপর গুরুত্ব দেয়
ধর্মকে রাজনীতি হতে পৃথক করে	রাজনীতি ও ধর্মকে ইনটিগ্রেট করে
ধর্মকে কেবল ব্যক্তিগত জীবনে সীমাবদ্ধ রাখতে চায়	মুমিনের সমগ্র জীবনের নির্দেশনা দেয় ইসলাম
মানবতাবাদে বিশ্বাসী	শরী'আহ কাঠামোর আওতায় মানবতাবাদে বিশ্বাসী

এ পর্যায়ে আমরা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও ইসলামের মাঝে তুলনামূলক আলোচনা উপস্থাপন করব। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ; কারণ আমাদের দেশের বহু মুসলিম এখনো মনে করে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও ইসলাম পাশাপাশি চলতে পারে। সেই পুরোনো যুক্তি : এই দু'টির প্রয়োগক্ষেত্র ভিন্ন; ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ইহকাল সম্পর্কে আলোচনা করে আর ধর্ম (ইসলাম) পরকাল নিয়ে কথা বলে। বিষয়টি আমরা খতিয়ে দেখব। ইসলামের সামগ্রিক পরিচয় জ্ঞাপন আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আল কুরআনে ইসলামকে দীন (دين) বলা হয়েছে। আমরা দীন শব্দের পরিধি ও ব্যাপ্তি সম্পর্কে আরবী অভিধান ও কুরআন-সুন্নাহর আলোকে আলোচনা উপস্থাপন করব।

---

৩৭. খুলাফা রাশেদূনের আমলের ন্যায়বিচার ও সামাজিক সুবিচার সম্পর্কে জানতে হলে দেখুন সাইয়েদ কুতব শহীদ, ইসলামের স্বর্ণযুগে সামাজিক ন্যায়নীতি

www.bjilibrary.com

আল কুরআনে ইসলামকে 'দীন' হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। বাংলায় ধর্ম বলতে যা বুঝায় কিংবা ইংরেজীতে religion বলতে যা বুঝায় আরবী শব্দ দীন-এর ব্যাপ্তি তার চাইতে ব্যাপক।

আরবী দীন শব্দটি এসেছে د+ي+ن মূল হতে। যার প্রাথমিক দ্যোতনাসমূহ বাহ্যিকভাবে ক্ষেত্রবিশেষে পরস্পর বিপরীত মনে হলেও এগুলি সমবেতভাবে একটি সামগ্রিকতার প্রতি ইঙ্গিত করে। সামগ্রিকতা বলতে ইসলামকে বুঝানো হচ্ছে যা নিজের মাঝে দীন শব্দের আওতাভুক্ত সকল সম্ভাব্য অর্থ ধারণ করে। দীন শব্দস্থিত বৈপরিত্যসমূহ অস্পষ্টতাজাত নয়; বরং এটি মানব প্রকৃতির মাঝে লুক্কায়িত বৈপরিত্যজাত যা তারা বিশ্বস্ততার সাথে প্রতিফলিত করে।[৩৮]

দীন শব্দের প্রাথমিক অর্থ চারটি:[৩৯] ক) ঋণবোধ বা কৃতজ্ঞতাবোধ; খ) আত্মসমর্পন; গ) বিচারিক ক্ষমতা ও ঘ) স্বভাবজাত প্রবণতা।

আমি শুধু প্রথমটির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দানে সচেষ্ট হব, এটিকে প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে উপস্থাপন করব, তারপর এমন একটি সমন্বিত রূপ আমরা দেখতে পাবো যা প্রতিটি মুসলিম ব্যক্তিগতভাবে বা সমাজের সদস্য হিসেবে বিশ্বাস ও চর্চায় প্রতিফলিত করে এবং যা একটি সামগ্রিকতার প্রতি নির্দেশ করে যাকে আমরা ইসলাম বলে থাকি।

دين মূল হতে উৎসারিত ক্রিয়াপদ দানা (دان) -এর প্রাথমিক অর্থ হলো ঋণগ্রস্ত হওয়া বা কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হওয়া। ক্রিয়াপদটির আরো কিছু অর্থ আছে যেগুলি ঋণ-এর সাথে সংশ্লিষ্ট, কিছু কিছু অর্থ আবার পরস্পর বিপরীত। ঋণগ্রস্ত মানুষকে দাইন (دائن) বলে, এই ঋণ বস্তুগত কিংবা অবস্তুগতও হতে পারে। ঋণবোধ বা কৃতজ্ঞতাবোধ মানুষের মনে ঋণসংক্রান্ত বিধি-বিধান ও ঋণদাতার (ঋণদাতাকেও আরবীতে دائن বলে) প্রতি আনুগত্যের মনোভাব সৃষ্টি করে। যে ব্যক্তি ঋণগ্রস্ততার মধ্যে থাকে সে এক ধরনের বাধ্যবাধকতা বা দায়ন (دين) এ থাকে। 'বাধ্যবাধকতার অধীনে ঋণগ্রস্ততা'-এর সাথে স্বাভাবিকভাবেই সম্পৃক্ত হয় বিচার: দাইনুনাহ (دينونة) এবং অভিযুক্তকরণ : ইদানাহ (إدانة)। উপর্যুক্ত অর্থসমূহ নগরে বা শহরে বসবাসরত সংগঠিত জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে প্রয়োগ করা সম্ভব। শহর বা নগরকে আরবীতে বলা হয় মদীনা:مدينة (বহুবচনে মুদুন : مدن -এ শব্দের মূলও دين হতে পারে)। শহর বা নগর বা মদীনায় একজন বিচারক বা শাসক বা গভর্নর থাকে মানে একজন দাইয়ান:ديان থাকে। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি দানা ক্রিয়াপদ ও এর বুৎপন্ন শব্দসমূহের (derivatives) বিভিন্ন ধরণের প্রয়োগ আমাদের মনে একটি সুসভ্য সমাজের চিত্র অঙ্কন করছে। এটি আরেকটি ক্রিয়াপদের সাথে সংযুক্ত -মাদ্দানা - مدّن যার অর্থ : নির্মাণ করা, শহর প্রতিষ্ঠা করা, সুসভ্য হওয়া, পরিশুদ্ধ করা, মনুষ্যোচিত হওয়া। মাদ্দানা ক্রিয়াপদ হতে আরেকটি পরিভাষা এসেছে : তামাদ্দুন - تمدن অর্থাৎ

---

৩৮. الدين: الطاعة، الدين: المعصية দীন অর্থ আনুগত্য, আবার দীন অর্থ অবাধ্যতা। দেখুন ইবন মানযূর, লিসান আল-আরব (বৈরুত: দার সাদির ১৯৯৭), খ. ১৩, পৃ. ১৭০

৩৯. দীন শব্দের অর্থ বিস্তারিতভাবে জানতে দেখুন ইবন মানযূর, প্রাগুক্ত খ. ১৩, পৃ.১৬৬-১৭১

www.bjilibrary.com

সভ্যতা। এভাবে আমরা দীন-এর প্রাথমিক দ্যোতনা 'ঋণী হওয়া' হতে আরো কিছু প্রাসঙ্গিক অর্থ পাই, যেমন : নিজেকে হীন করা, কোন ওপরওয়ালার সেবা করা, দাসত্ব বা আনুগত্য বরণ করা; আবার অন্য অর্থ যেমন বিচারক, শাসক ও গভর্নর হতে উৎসারিত হয় নতুন কিছু দিক, যেমন: শক্তিশালী হওয়া, ক্ষমতাসম্পন্ন হওয়া; একজন মালিক বা প্রভু যিনি উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন এবং মহীয়ান-গরীয়ান।

তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, دان ও সংশ্লিষ্ট বুৎপন্ন শব্দরাজি আমাদের সামনে একটি চিত্র উপস্থাপন করছে। 'একটি নগরে বা মদীনায় বসবাসরত সুসভ্য জনগোষ্ঠীর আর্থিক কর্মকান্ডের (ঋণ আদান প্রদান) চিত্র তুলে ধরছে, যেখানে একজন শাসক বা গভর্ণর বা বিচারক বা দাইয়ান থাকেন, যিনি নাগরিকদের আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত মামলার বিচার (دينونة) করেন এবং প্রজাদেরও সে বিচার মেনে নেয়ার এবং শাসকের অনুগত থাকার স্বাভাবিক প্রবণতা (دين এর একটি অর্থ হল স্বভাবজাত প্রবণতা) রয়েছে। অতএব, ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী তথা আল কুরআন ও আল হাদীসের দৃষ্টিভঙ্গী বাদ দিয়েও দেখতে পাচ্ছি দীন শব্দটির প্রয়োগক্ষেত্র ইহকাল সংশ্লিষ্ট। ইসলামকে দীন হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে; সুতরাং আদ-দীন আল-ইসলামকে কেবল পরকাল সংশ্লিষ্ট কিছু নির্দেশনা বলার সুযোগ নেই এবং religion বা ধর্মের চাইতে দীন-এর ব্যাপ্তি অনেক ব্যাপক। ড. জামাল বাদাবী বলেন, দীন-এর অনুবাদ হিসেবে religion শব্দটি যথার্থ নয়; religion বুঝাতে আরবীতে আরেকটি শব্দ আছে এবং তা হল ملة।

এবারে ইসলামের দৃষ্টিতে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মূলনীতিসমূহ পরীক্ষা করে দেখব। সেগুলি ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক, না ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ পাশাপাশি চলতে পারে? একজন মুসলিম, ধর্মনিরপেক্ষও হতে পারে কী?

* ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের অন্যতম মূলনীতি হল: 'বস্তুগত উপায়ে মানব সমাজের উন্নতির চেষ্টা করা'।

ইসলাম পার্থিব উন্নতিতে বস্তুগত উপায়-উপকরণ ব্যবহার বিরোধী নয়। তবে বস্তুগত উপায়-উপকরণের যথেচ্ছ ব্যবহার ইসলাম সমর্থন করে না। হালাল-হারামের মাঝে প্রভেদের সীমারেখা টেনে দিয়ে ইসলাম বস্তুগত উপায়-উপকরণ ব্যবহারের নীতিমালা বাতলে দিয়েছে। উন্নয়নে কোন্ ধরণের উপায় অবলম্বন করা যাবে এবং তা কীভাবে ব্যবহার করতে হবে-এ ব্যাপারে ইসলামের সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। কারণ সকল উপকরণ মানব কল্যাণ সাধন নাও করতে পারে এবং বস্তুগত উপকরণের যথেচ্ছ ব্যবহার মানব কল্যাণের পরিবর্তে মানুষের অকল্যাণ সাধন করতে পারে।

* 'ধর্ম অজানা জগত তথা পরকাল নিয়ে কথা বলে; অতএব পার্থিব স্কীমে বা ইহকালীন বিষয়ে ধর্মের স্থান নেই যেমন পরজগতের বিষয়ে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের কোন বক্তব্য নেই।'

আমরা আগেই বলেছি দীন শব্দের অনুবাদ হিসেবে ধর্ম শব্দটি যুৎসই নয়। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, অন্যান্য ধর্মের সাথে সরলীকরণের মাধ্যমে ইসলামকে একটি ধর্ম

www.bjilibrary.com

বলে গণ্য করে। এ বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত না হয়ে আমরা দেখব 'পার্থিব স্কীমে ধর্মের কোন হাত নেই' এ দাবী ইসলামের ব্যাপারে প্রযোজ্য হয় কী না?

ইসলাম দু'টি কালের (ইহকাল বা الدنيا এবং পরকাল বা الآخرة) অস্তিত্ব স্বীকার করে; তবে ইহকাল ও পরকালকে বিচ্ছিন্ন ও সম্পর্কহীন মনে করে না। ইসলামের দৃষ্টিতে ইহকাল ক্ষণস্থায়ী, পরকাল চিরস্থায়ী:

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى

'বরং তোমরা দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দাও, অথচ আখিরাত (দুনিয়ার চাইতে) উত্তম ও স্থায়ী।' (সূরা আল আ'লা : ১৬)

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُوْرِ

পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতিত কিছুই নয়। (সূরা আলে ইমরান : ১৮৫)

ইহকালের সাফল্য প্রকৃত সাফল্য নয়; পরকালের সফলতাই আসল:

تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللهُ يُرِيْدُ الْآخِرَةَ

'তোমরা পার্থিব সম্পদ কামনা কর আর আল্লাহ চান পরকাল। (সূরা আল আনফাল : ৬৭)

আখিরাতের সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে ইবাদাত বন্দেগীতে মশগুল হওয়ার জন্য দুনিয়া বর্জন করা ইসলাম অনুমোদন করে না:

وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلاَّ ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللهِ

'আর বৈরাগ্যবাদ-যা আল্লাহর সন্তুষ্ঠি লাভের জন্য তারা নিজেরা প্রবর্তন করেছিল- আমি তাদের ওপর এই বিধান দিইনি। (সূরা আল হাদীদ : ২৭)

ইহকাল ও পরকাল, দু'কালের সাফল্যই কাম্য:

فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُوْلُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُم مَنْ يَقُوْلُ رَبَّنَا آتِنَا فِيْ الدُّنيَا حَسَنَةً وَّفِي الْأُخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوْا وَاللهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ

'মানুষের মাঝে যারা বলে "হে আমাদের রব! আমাদেরকে ইহকালে দাও," বস্তুত পরকালে তাদের কোন অংশ নেই। আর তাদের মধ্যে যারা বলে, "হে আমাদের রব! আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দাও এবং আখিরাতে কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে আগুনের শাস্তি হতে রক্ষা কর।" তারা যা অর্জন করেছে তার প্রাপ্য অংশ তাদেরই। বস্তুত আল্লাহ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর।' (সূরা আল বাকারা : ২০০-২০২)

পরকালের সাফল্যের ক্ষেত্র ইহকালে প্রস্তুত করতে হবে:

الدُّنْيَا مَزْرَعَةُ الْآخِرَةِ

'দুনিয়া আখেরাতের শস্যক্ষেত্র।'

www.bjilibrary.com

শুধু নামায, যাকাত, রোযা ও হজ্জ-এর মত আল্লাহর হক সংক্রান্ত ইবাদত আদায় পরকালীন মুক্তির জন্য যথেষ্ঠ নয় :

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله صلي الله عليه وسلم إن فلانة تذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها قال: هي في النار. قال: يا رسول الله صلي الله عليه وسلم! فإن فلانة تذكر من قلة صيامها وصدقاتها وصلاتها وأنها تصدق بالأثوار من الأقط ولا تؤذي بلسانها جيرانها. قال هي في الجنة.

আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলল : অমুক মহিলার ব্যাপারে জনশ্রুতি আছে যে সে বেশি বেশি নামায আদায় করে, রোযা পালন করে ও দান-সাদাকা করে। কিন্তু সে নিজের জবানে প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সে জাহান্নামে যাবে। লোকটি আবার বলল, আরেক মহিলা তার ব্যাপারে নামায-রোযা কম আদায়ের জনশ্রুতি আছে এবং সে সামান্য পরিমাণ পনির দান করে, কিন্তু সে প্রতিবেশীকে মুখের কথায় কষ্ট দেয় না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সে জান্নাতে যাবে।[৪০]

এ হাদীস হতে বুঝা যাচ্ছে, সমাজের সদস্য হিসেবে মানুষে মানুষে সম্পর্ক, লেনদেনসহ ইত্যাকার নানাবিধ ইহজাগতিক বিষয়ে ইসলামের যে নির্দেশনা রয়েছে তার প্রতিপালন ব্যতিত কেবল ইবাদত আদায়ে পরকালীন মুক্তি সম্ভব নয়।

বস্তুত পার্থিব জীবনের এমন কোন দিক বা বিভাগ নেই যা আল কুরআনে উপেক্ষিত হয়েছেঃ

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ

'এই কিতাবে আমি কোন কিছুই বাদ দিইনি।' (সূরা আল আন্‌আম : ৩৮)

আল কুরআনে রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থব্যবস্থা, আইন ও শাসননীতিসহ ইহকাল সম্পর্কিত নানা বিষয়ে অনেক নির্দেশনা রয়েছে। পার্থিব জীবন পরিচালনা সংক্রান্ত আল কুরআনে যেসব নির্দেশনা এসেছে উদাহরণস্বরূপ সেগুলির কয়েকটি উল্লেখ করছি।

সার্বভৌমত্ব আল্লাহরঃ

لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُوْرُ

'আসমান ও যমিনের বাদশাহী তাঁরই; সমূদয় তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়।' (সূরা আল হাদীদ : ৫)

---

৪০. আহমদ ও বায়হাকী শুয়াবুল ঈমানে; মেশকাত শরীফ (আফলাতুন কায়সার অনূদিত), (ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী ১৯৯২), খ. ৯, পৃ.১৩৯

www.bjilibrary.com

মৌলিক অধিকার:

وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ

'যে জীবনকে আল্লাহ সম্মানার্হ করেছেন হক ব্যতিত তাকে হত্যা করো না।' (সূরা বনী ইসরাইল : ৩৩)

وَلاَ تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

'নিজেদের ধন-সম্পদ পরস্পরে অবৈধ পন্থায় ভক্ষণ করো না। (সূরা আল বাকারা : ১৮৮)

বৈদেশিক সম্পর্কের মূলনীতি:

وَأَوْفُوْا بِعَهْدِ اللهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلاَ تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ وَلاَ تَكُوْنُوْا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُوْنَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُوْنَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ

'যখন তোমরা অঙ্গীকার কর তখন তোমরা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করো, এবং আল্লাহকে যামিন রেখে পাকাপোক্ত শপথ করার পর তা ভঙ্গ করো না। তোমরা যা কর নিশ্চয়ই আল্লাহ তা জানেন। তোমরা সে নারীর মত হয়ো না যে তার সুতা মজবুত করে পাকানোর পর উহার পাক খুলে নষ্ট করে দেয়। এক জাতি অন্য জাতির চেয়ে বেশী ফায়দা হাসিল করার জন্য নিজেদের কসমকে নিজেদের মাঝে প্রতারণার মাধ্যম করো না। আল্লাহ এদ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলেন। তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করতে কিয়ামতের দিন তিনি অবশ্যই তা বর্ণনা করবেন।' (সূরা আন্ নাহল : ৯১-৯২)

সকল মানুষের প্রতি সুবিচার:

وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ

'এবং তোমাদের মাঝে সুবিচার কায়েম করার জন্য আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।' (সূরা আশ্ শুরা : ১৫)

শূরা বা পরামর্শ:

وَأَمْرُهُمْ شُوْرٰي بَيْنَهُمْ

'আর তাদের (মুসলিমদের) কাজকর্ম সম্পন্ন হয় পারস্পরিক পরামর্শক্রমে।' (সূরা আশ্ শুরা : ৩৮)

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

'(হে নবী!) কাজ-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করো। (আলে ইমরান : ১৫৯)

www.bjilibrary.com

মাতাপিতার অধিকার:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا

'আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহারের। (সূরা আল আহকাফ : ১৫)

আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীর অধিকার:

وَاعْبُدُوا اللهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسَكِيْنِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوْرًا

'তোমরা আল্লাহর 'ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না; এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতিম, অভাবগ্রস্ত, নিকট-প্রতিবেশী, দূর-প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, মুসাফির ও তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পছন্দ করেন না দাম্ভিক, অহঙ্কারীকে। (সূরা আন্ নিসা : ৩৬)

পার্থিব জীবন পরিচালনার নির্দেশনা সম্বলিত আল কুরআনের অসংখ্য আয়াত হতে আমরা মাত্র কয়েকটি উল্লেখ করেছি। অনুরূপভাবে হাদীস গ্রন্থসমূহেও ইহকালীন জীবন পরিচালনার নির্দেশনা পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ সহীহ আল বুখারীর কয়েকটি অধ্যায় শিরোনাম উল্লেখ করা হচ্ছে :

১. كتاب البيوع (ব্যবসা-বাণিজ্য অধ্যায়) ২. كتاب السلم (অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়) ৩. كتاب الشفعة (অগ্রক্রয়ের অধিকার সংক্রান্ত অধ্যায়) ৪. كتاب الإجارة (ইজারা অধ্যায়) ৫. كتاب الحوالات (বিনিময় পত্র অধ্যায়) ৬. كتاب الكفالة (জামানত অধ্যায়) ৭. كتاب الوكالة (প্রতিনিধি নিয়োগ অধ্যায়) ৮. كتاب المزارعة (বর্গাচাষ অধ্যায়) ৯. كتاب المساقاة (বর্গাচাষ অধ্যায়) ১০. كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس (ঋণ, ঋণ আদায় ও দেউলিয়াকরণ অধ্যায়) ১১. كتاب الخصومات (মকদ্দমা অধ্যায়) ১২. كتاب اللقطة (হারানো বস্তু অধ্যায়) ১৩. كتاب الشركة (কোম্পানি অধ্যায়) ১৪. كتاب الرهن (বন্ধক অধ্যায়) ১৫. كتاب العتق (দাসত্বমুক্তি অধ্যায়) ১৬. كتاب الصلح (সন্ধি অধ্যায়) ১৭. كتاب الصيد والذبائح (শিকার ও জবেহ অধ্যায়) ১৮. كتاب المرضي (রোগীর শুশ্রুষা অধ্যায়) ১৯. كتاب اللباس (পোষাক পরিচ্ছদ অধ্যায়) ২০. كتاب الأدب (শিষ্টাচার অধ্যায়) ইত্যাদি।

ইমাম বুখারী তাঁর সময়ের সমাজ বাস্তবতার নিরিখে হাদীসগুলির অধ্যায় বিন্যাস করেছেন। বর্তমান সময়ের সমাজ বাস্তবতায় এই হাদীসসমূহকে নতুন নতুন শিরোনামের আওতায় বিন্যস্ত করা সম্ভব। অনুরূপভাবে অন্যান্য হাদীসগ্রন্থের অধ্যায় শিরোনাম পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাব এগুলির বেশির ভাগ ইহকালে জীবন পরিচালনার নির্দেশনা সংক্রান্ত।

www.bjilibrary.com

ইহজাগতিক জীবন পরিচালনা সংক্রান্ত আল কুরআন ও আল হাদীসের নির্দেশনা মেনে চলা মুসলিমের জন্য ঐচ্ছিক নয়; বরং বাধ্যতামূলক। কারণ

وَمَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا

'রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা তোমরা গ্রহণ কর আর যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করেন তা হতে বিরত থাকো। (সূরা আল হাশর : ৭) এবং

اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰى اَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ

'তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশে বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান কর? সুতরাং তোমাদের যারা এরূপ করে তাদের একমাত্র প্রতিফল পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা এবং কিয়ামতের দিন তারা কঠিনতম শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হবে। তারা যা করে আল্লাহ তা সম্পর্কে অনবহিত নন।' (সূরা আল বাকারা : ৮৫)

তদুপরি

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً

'হে মুমিনগণ! তোমরা সর্বাত্মকভাবে ইসলামে প্রবেশ কর।' (সূরা আল বাকারা : ২০৮)

ইসলামের দৃষ্টিতে পরকাল কোন অজানা জগত নয়। পরকালের চিত্র, পরকালীন জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও দুঃখ-দুর্ভোগের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ আল কুরআন ও আল হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। অতএব ধর্মতত্ত্ব অজানা জগত নিয়ে আলোচনা করে বলে যে দাবী করা হয় ইসলামের দৃষ্টিতে তা অসার।

উপর্যুক্ত আলোচনা হতে বুঝা গেল ইসলাম ব্যক্তিগত জীবনে পালনযোগ্য কিছু বন্দেগী-উপাসনার নাম নয়। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান যাতে পার্থিব জীবন পরিচালনার সামগ্রিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এ নির্দশনার প্রতিপালন একজন মুসলিমের জন্য বাধ্যতামূলক। ইসলামের নির্দেশনা মোতাবেক পার্থিব জীবন পরিচালনা করলেই কেবল একজন মুসলিম পরকালীন সাফল্য অর্জন করতে পারবে। আর তাই মুসলিমের পক্ষে ইহকাল ও পরকালের সাফল্য ও মুক্তির জন্য বিভিন্ন উৎসের দ্বারস্থ হওয়ার সুযোগ নেই; পরকালের জন্য ইসলামের নির্দেশনা অনুসরণ করা এবং ইহকালীন জীবন পরিচালনার জন্য ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বা অন্য কোন মতবাদের শরণ নেয়া একজন মুসলিমের জন্য সম্ভব নয়। ■

লেখক-পরিচিতি : যুবাইর মুহাম্মাদ এহসানুল হক– বিশিষ্ট লেখক, অনুবাদক এবং সহকারী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

লেখা-পরিচিতি : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত ৩০ অকটোবর, ২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সেমিনারে প্রবন্ধটি উপস্থাপিত হয়।

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

সেমিনার-প্রতিবেদন

মোশাররফ হোসেন খান

■

ইন্ডিয়া ডকট্রিন : একটি পর্যালোচনা

বিশিষ্ট লেখক, বুদ্ধিজীবী এবং দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক জনাব আবুল আসাদ বলেছেন, ইন্ডিয়া ডকট্রিন আমাদের জন্য একটি মৌলিক সমস্যা। সমস্যাটি অত্যন্ত মারাত্মক এবং ভয়াবহ। ভারতের মতো সাম্প্রদায়িক জাতি পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি নেই। তারা অন্য কোনো জাতিকেই সহ্য করতে পারে না, এমনকি তাদের মানুষ হিসাবেও গণ্য করে না। বাংলাদেশ মুসলিমপ্রধান দেশ বলেই এদেশ সম্পর্কে তাদের এত এলার্জি এবং ষড়যন্ত্র। তবে তাদের সকল ষড়যন্ত্র আর চক্রান্তের জাল ছিন্ন করে যদি আমরা আমাদের কর্মকৌশল সম্প্রসারিত করতে পারি, তাহলে নিশ্চয়ই আমরা এর সুফল পাবো। এখন প্রয়োজন আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবে এই সমস্যার মুকাবিলা করা। বিশ্বের মুসলিম উম্মাহকেও ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।

গত ১০ই জানুয়ারী, ২০০৮ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত এক সেমিনারে সভাপতির ভাষণে জনাব আবুল আসাদ উপরোক্ত বক্তব্য রাখেন।

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত 'ইন্ডিয়া ডকট্রিন : একটি পর্যালোচনা' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন দৈনিক সংগ্রামের সহকারী সম্পাদক জনাব মুহাম্মদ নূরুল আমিন। পঠিত প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন,

www.bjilibrary.com

সর্বজনাব ড. এম. উমার আলী, ড. মুহাম্মাদ লোকমান, ড. মুহাম্মদ আবদুস সামাদ, ড. আ. ছ. ম. তরিকুল ইসলাম, শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির, ড. হাসান মুহাম্মাদ মুঈনুদ্দীন, ড. মুহাম্মাদ কোরবান আলী, আহসান হাবীব ইমরোজ, জাবেদ মুহাম্মাদ প্রমুখ।

উক্ত সেমিনারে প্রাসঙ্গিক বক্তব্যসহ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক এবং মাসিক পৃথিবী ও মাসিক আল ইসলামের সম্পাদক অধ্যাপক এ. কে. এম. নাজির আহমদ।

অধ্যাপক এ. কে. এম. নাজির আহমদ বলেন, ইন্ডিয়া ডকট্রিন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ আমরা কোন্ অবস্থানে, কেমন আছি– সেটা আমাদের বোঝা প্রয়োজন। বাংলাদেশের জন্য ভারত একটি ভয়াবহ শক্তি। তাদের চতুর্মুখি ষড়যন্ত্রের কারণে আমরা অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত। বাংলাদেশকে ভারত সকল সময়ই মানসিক পীড়ার ভেতর রাখতে চায়। এদেশকে তারা সর্বদা ব্যস্ত এবং তটস্থ রাখার কৌশল অবলম্বন করে। তবে আশার কথা হলো, এদেশের মানুষ স্বাধীনতাপ্রিয়। এদেশকে বহি:র্শক্তি কখনই তাদের তাবেদারে পরিণত করতে পারেনি। পারেনি দাবিয়ে রাখতে। অতীত ইতিহাস তো সেই সাক্ষ্যই বহন করে। আমরা যদি আমাদের তরুণ সমাজের মধ্যে স্বাধীনতার চেতনা, স্বপ্ন, সুফল এবং স্পৃহা জাগিয়ে তুলতে পারি, তাহলে ভারত কেন– পৃথিবীর কোনো আধিপত্যবাদী শক্তিই এদেশকে গ্রাস করতে সক্ষম হবে না। সকল স্তরে ব্যাপকভাবে এজন্য দীনি দাওয়াত এবং নৈতিক শক্তিতে বলীয়ান করার কাজটি আমাদের আরও বেগবান করতে হবে।

প্রফেসর ড. এম. উমার আলী বলেন, আমরা ভারতসহ প্রতিটি আধিপত্যবাদের বিরোধী। কিন্তু দু:খের বিষয় বাংলাদেশে মীর জাফরদের চাষ বেশ ভাল হয়। এদেশের কিছু অপরিণামদর্শী বুদ্ধিজীবীকে ভারত কিনে নিয়েছে। এরাই এদেশে বসে ভারতের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। মূলত আমাদের ঈমান, আকীদা, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি প্রভৃতি মূল্যবোধকে ধ্বংস করাই তাদের মূল লক্ষ্য। ভারত এদেশের ভাড়াটে বুদ্ধিজীবীদের দিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে কাজ করাচ্ছে। ভারত চায় বাংলাদেশের মানুষ আমাদের নিজস্ব তাহজীব তমুদ্দুনকে ভুলে তাদেরকে গোলামী করুক। বাংলাদেশের জনগণকে তারা তাদের গোলাম হিসাবেই দেখতে চায়। ভারতের এই আধিপত্য ও চক্রান্ত থেকে মুক্তি পেতে হলে আমাদের অবশ্যই ঈমানী দৃঢ়তা অর্জন করতে হবে। সেই সাথে মুসলিম বিশ্বের ঐক্য ও সংহতির প্রতিও দৃষ্টি রাখতে হবে।

www.bjilibrary.com

ড. মুহাম্মাদ আবদুস সামাদ বলেন, ভারত একটি বিশাল দেশ। তারা চায় বাংলাদেশকে গ্রাস করে একটি অখণ্ড ভারত। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে তারা এগিয়ে চলেছে। চিন্তার বিষয় বটে, ১৬ই ডিসেম্বর, আমাদের মহান বিজয় দিবসকে তারা পালন করে– 'পূর্বাঞ্চলীয় বিজয় দিবস' হিসাবে। ভারত জানে, কারা তাদের প্রতিপক্ষ এবং স্বার্থের বিরোধী। এজন্য তারা বাংলাদেশের মধ্যে বিভেদের বিষবাষ্প ছড়িয়ে দিয়েছে। সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ, নারী স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ-বিপক্ষ, ধর্মান্ধতা– ইত্যাকার জঘন্য বুলি এদেশে এমনভাবে ছড়িয়ে দিয়েছে, যাতে করে আমাদের নতুন প্রজন্ম বিভ্রান্ত এবং বিপথগামী হয়ে যায়। ভারতের এই আগ্রাসন থেকে মুক্তির জন্য মুসলিম জাতিকে অবশ্যই ঐক্যবদ্ধ এবং ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান হতে হবে।

ড. মুহাম্মাদ কোরবান আলী বলেন, ভারত তার প্রভাব এবং বলয় বিস্তারের জন্য বহু পূর্ব থেকেই পরিকল্পিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তাদের কাজ হলো ইসলামী সংস্কৃতি ও মূল্যবোধকে ধ্বংস করা। সম্প্রতি এদেশে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধের যে হাস্যকর দাবির কথা শোনা যাচ্ছে, তার পেছনেও ভারতের চক্রান্ত রয়েছে। ভারতের কেনা এদেশীয় কিছু বুদ্ধিজীবীকে তারা নানা অপপ্রচারের জন্য ব্যবহার করছে। সুতরাং তাদের সম্পর্কে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।

ড. হাসান মুহাম্মাদ মুঈনুদ্দীন বলেন, ভারতের উদ্দেশ্য পরিষ্কার। তারা মুসলমান এবং ইসলামকে শেষ করে দিতে চায়। তারা চায় বাংলাদেশ তাদের মতো করে চলুক। এদেশকে গ্রাস করার জন্য তারা সকলপ্রকার প্রচেষ্টা ও ষড়যন্ত্র বহু পূর্ব থেকেই চালিয়ে আসছে। কিন্তু আমরা যদি আমাদের ঈমানের ওপর সুদৃঢ় থাকতে পারি, যদি রাসূলের (সা) আদর্শকে সামনে রেখে এগুতে পারি, যদি লোভ-লালসা ও ভয়ের ঊর্ধ্বে উঠে কাজ করে যেতে পারি, তাহলে ভারত কখনই তাদের মিশনে সফল হবে না। আমাদের দুর্বলতাগুলোকে চিহ্নিত করতে হবে এবং তা থেকে মুক্ত হবে।

ড. মুহাম্মাদ লোকমান বলেন, 'ইন্ডিয়া ডকট্রিনের' মাধ্যমে ভারতের নতুন দিক উন্মোচিত হলো। বিস্ময়কর হলেও সত্য যে, বিশ্বের কোনো দেশের সাথেই ভারতের সদ্ভাব নেই। কেন নেই? কারণ হলো– ভারত এমনি একটি জাতি যারা অন্য কোন দেশ বা জাতিকেই সহ্য করতে পারে না। এমন হিংস্র এবং অসামাজিক জাতি গোটা বিশ্বে আর দ্বিতীয়টি নেই। ভারতের এই হিংস্রতা থেকে মুক্তি পেতে হলে মুসলিম উম্মাহকে একত্রিত এবং শক্তিশালী হতে হবে।

www.bjilibrary.com

জনাব শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির বলেন, ভাঙনের মধ্যে কোনো বড় ধরনের কল্যাণ বা অর্জন নেই। তবুও ভাঙনের ধারা অব্যাহত আছে। এ থেকে আমরা মুক্ত হতে পারছি না। ভারত এদেশকে যেমন খুশি তেমনভাবে ব্যবহার করছে। আমরা কেমন মুসলমান? আমাদের কি স্বতন্ত্র পরিচিতি এবং আদর্শ-ঐতিহ্য নেই? মুসলমানরা তাদের স্বকীয়তা যখনই হারিয়েছে, তখনই পদানত হয়েছে। আমাদের এখন প্রয়োজন নিজস্ব স্বকীয়তায় জেগে ওঠা এবং গোটা দেশকে জাগিয়ে তোলা। আমরা কেন ভারতের গোলামী করতে যাবো? আমাদের অনেক অপূর্ণতা রয়েছে, রয়েছে অভাব। কিন্তু আমরা যদি ঈমানের ওপর সুদৃঢ় থাকতে পারি, যদি সাহস অর্জন করতে পারি, তাহলে অবশ্যই ভারতকে মুকাবিলা করতে পারবো। কারণ এই জাতি কখনো কোনো আধিপত্যকেই মেনে নেয়নি। সুতরাং স্বকীয়তার ক্ষেত্রে আমাদের হতে হবে আপোষহীন। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ অত্যন্ত সরল সহজ। এজন্য তাদেরকে যে কেউ সহজেই বিভ্রান্ত করতে পারে। যেমন পারছে ভারত। আমাদের উচিত এদেশের জনগণের ঈমান, আত্মবিশ্বাস এবং স্বকীয়তাকে জাগ্রত করে তোলা।

ড. আ. ছ. ম. তরিকুল ইসলাম বলেন, গোটা বিশ্বে হিন্দুরাষ্ট্র মাত্র একটিই– ভারত। তারা বাংলাদেশকে সকল সময় চাপের মুখে রাখতে চায়। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে, বাংলাদেশ একটি মুসলিমপ্রধান দেশ। আমরা যদি আমাদের জাতিকে সুসংগঠিত এবং ঐক্যবদ্ধ করে, তাদেরকে আদর্শ-ঐতিহ্যের ধারায় উজ্জীবিত করে তুলতে পারি, তাহলে ভারতের মিশন এই দেশে ব্যর্থ হতে বাধ্য।

জনাব আহসান হাবীব ইমরোজ বলেন, বাংলাদেশের জন্য ইন্ডিয়া ডকট্রিন একটি মৌলিক সমস্যা। ভারত বস্তুগত দিক দিয়ে অগ্রসর। আর বাংলাদেশ অগ্রসর তাওহিদ, নৈতিকতা ও আদর্শের ক্ষেত্রে। সুতরাং আমাদের এই মৌলিক শক্তি দিয়েই আমরা ভারতকে মুকাবিলা করতে সক্ষম। এখন প্রয়োজন দীনি হকের দাওয়াতকে সাধারণ মানুষের মধ্যে সম্প্রসারণ করা।

জনাব জাবেদ মুহাম্মাদ বলেন, ভারতের চতুর্মুখী আগ্রাসনে বাংলাদেশ এখন প্রকম্পিত। মুসলিম উম্মাহর প্রকৃত শিক্ষা ও আদর্শের ঘাটতির কারণেই আমাদের আজ এই দুরবস্থা। আমরা একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক। সুতরাং আমাদের উচিত আমাদের স্বকীয়তা, ঐতিহ্য এবং মূল্যবোধের আলোকে নিজেদের পরিচালিত করা।

সেমিনার-প্রবন্ধে মুহাম্মদ নূরুল আমিন বলেন, "ইন্ডিয়া ডকট্রিন বলতে ভারতের সম্প্রসারণ ও আধিপত্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, প্রতিবেশীদের রাজনৈতিক ও

www.bjilibrary.com

অর্থনৈতিক স্বার্থের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ এবং প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকে যেমন বুঝানো হয়েছে তেমনি তার নিজের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে অতিরিক্ত প্রত্যয় বা নিঃসংশয়তার প্রেক্ষাপটে হীনমন্যতা লুকানোর উদ্দেশ্যে অপরের প্রতি তাচ্ছিল্যসূচক আচরণকেও (Superiority Complex) বুঝানো হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ায় অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠার স্বপ্নও এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

নিজের জাতীয় স্বার্থের সাথে সংগিত রেখে ভারত তার আঞ্চলিক রাজনীতি ও কূটনীতির পলিসি নির্ধারণ করবে তা স্বাভাবিক। কিন্তু তাদের এই নীতি পলিসির কারণে ভারতের সাথে তার ক্ষুদ্র প্রতিবেশী দেশসমূহের মধ্যে অব্যাহতভাবে অবিশ্বাস সংশয় ও উত্তেজনা সৃষ্টির ফলে এই অঞ্চলের নিরাপত্তা এবং ফলপ্রসূ সহযোগিতার ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। ফলে ইন্ডিয়া ডকট্রিন প্রতিবেশী দেশসমূহের জন্য আধিপত্যবাদের প্রতিভূ হয়ে দেখা দিয়েছে।"

উক্ত সেমিনারে বহু লেখক, শিক্ষাবিদ এবং বুদ্ধিজীবী উপস্থিত ছিলেন।

সেমিনারটি পরিচালনা করেন মাসিক নতুন কলমের সম্পাদক কবি মোশাররফ হোসেন খান।

সুদের অভিশাপ : পরিত্রাণের উপায়

বিশিষ্ট লেখক, বুদ্ধিজীবী এবং দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক জনাব আবুল আসাদ বলেছেন, সুদ একটি ভয়াবহ অভিশাপ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সুদকে কঠোরভাবে হারাম ঘোষণা করেছেন। সুতরাং সমাজ থেকে সুদ নির্মূল করার জন্য একদিকে যেমন গণসচেতনতার প্রয়োজন অপরদিকে সুদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলাও জরুরি। সুদের কুপ্রভাব থেকে জাতিকে মুক্ত করার জন্য আমাদের অবশ্যই কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ২০০৮ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত এক সেমিনারে সভাপতির ভাষণে জনাব আবুল আসাদ উপরোক্ত বক্তব্য রাখেন।

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত 'সুদের অভিশাপ : পরিত্রাণের উপায়' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অধ্যাপক শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান। পঠিত প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন সর্বজনাব ড. মুহাম্মদ লোকমান, ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির, ড. হাসান মুহাম্মাদ মুঈনুদ্দীন, ড. আ. ছ. ম. তরিকুল ইসলাম, মুহাম্মাদ নূরুল আমিন, ড. মাহফুজ পারভেজ, ড. মুহাম্মদ মতিউল ইসলাম, মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, জাবেদ মুহাম্মাদ, মুহাম্মদ রেজাউল করিম প্রমুখ।

www.bjilibrary.com

উক্ত সেমিনারে প্রাসঙ্গিক বক্তব্যসহ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মাসিক পৃথিবী ও মাসিক আল ইসলামের সম্পাদক এবং বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক এ. কে. এম. নাজির আহমদ।

অধ্যাপক এ. কে. এম. নাজির আহমদ তাঁর বক্তব্যে বলেন, সুদ সম্পর্কে মানুষের মধ্যে ব্যাপক বিভ্রান্তি ছিল, এখনো আছে। তবে আশার কথা হচ্ছে, দিন দিন মানুষের কনসেপ্ট কিছুটা হলেও পরিষ্কার হচ্ছে। যদি ইসলামের সঠিক বক্তব্য মানুষের সামনে তুলে ধরা যায় তাহলে আশা করা যায় সুদের অভিশাপ থেকে মানুষ ক্রমশ মুক্তি পাবে। তবে এর জন্য ব্যাপক প্রচেষ্টার প্রয়োজন। তিনি বলেন, সুদকে চিরতরে মুছে ফেলে তার স্থানে ইসলামের প্রকৃত মডেল উপস্থাপন করা প্রয়োজন। মানুষ যদি একবার ইসলামের সুবিধাগুলো বুঝতে পারে, তাহলে তারা সুদের ভয়াবহ গ্রাস থেকে দূরে থাকবে। যাকাত, সাদাকাহ প্রভৃতির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের জীবনের পরিবর্তন আনতে পারলে সুদের কুপ্রভাব থেকে সাধারণ মানুষকে মুক্তি দেয়া সম্ভব। আমাদের দেশে বহু সমস্যা আছে। সকল সমস্যা এক সাথে সমাধান করা সম্ভব নয়। কিন্তু ধীরে ধীরে যেন আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়, সেজন্য আমাদের সুপরিকল্পিতভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

ড. মুহাম্মদ লোকমান বলেন, মানুষের মৌলিক অধিকার যদি নিশ্চিত করা যায়, তাহলে সুদের অভিশাপ থেকে এই জাতিকে মুক্তি দেয়া সম্ভব। তিনি সুদের কুপ্রভাব সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তোলার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানান।

ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ বলেন, দু:খের বিষয় যে, মুসলমানদের মধ্যেও সুদ সম্পর্কে ব্যাপক ভুল বুঝাবুঝি রয়ে গেছে। এগুলো অপনোদন করতে হবে। সুদ নির্মূলের জন্য ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার কোনো বিকল্প নেই।

ড. হাসান মুহাম্মাদ মুঈনুদ্দীন বলেন, শুধু ইসলামে নয়– পৃথিবীর অন্যান্য সকল ধর্মেই সুদকে ঘৃণার বিষয় হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আর মহান রাব্বুল আলামীন এবং রাসূল (সা) তো সুদের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। সুতরাং সকল পর্যায় থেকে সুদ নির্মূল করাই আমাদের একান্ত প্রচেষ্টা হওয়া উচিত।

জনাব মুহাম্মদ নূরুল আমিন বলেন, সমাজ থেকে সুদ নির্মূলের জন্য আমাদের বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে হবে। মানুষকে সচেতন করে তুলতে হবে। পাশাপাশি ইসলামী অর্থনীতির সুবিধাগুলো জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। এক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ তৈরির কাজটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এদেশের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে

www.bjilibrary.com

ইসলামী অর্থনীতি সম্পর্কিত পৃথক বিভাগ চালু করার জন্যও তিনি সরকারের প্রতি জোর দাবি জানান।

জনাব শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির বলেন, সুদ মৌলিক একটি সমস্যার দিক। এটাকে কোনোক্রমেই ছোট করে দেখার অবকাশ নেই। বেদনার বিষয় যে, আজকে সমাজে সুদকে অনেকেই অন্যান্য আর দশটি ব্যবসার মতই নিছক ব্যবসা বলে গণ্য করে। কিন্তু বুঝতে হবে যে, সুদ হারাম করেছেন স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। সুদের শাস্তির কথাও তিনি আল কুরআনে স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। সুতরাং সুদ সম্পর্কিত কোনো সন্দেহ বা দ্বিধা মুসলমানদের মধ্যে থাকা উচিত নয়। আমাদের যাকাতভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন। সুদকে সামাজিকভাবে বর্জন করতে হবে। সুদের অভিশাপ থেকে পরিত্রাণের জন্য আমাদের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা-সাধনা চালাতে হবে।

জনাব মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম বলেন, সুদের কুফল সর্বত্রই। এর ভেতর কিছু নৈতিক এবং কিছু অর্থনৈতিক– সব মিলিয়ে সুদ এই জাতির জন্য একটি ভয়াবহ অভিশাপ। এই অভিশাপ থেকে মুক্তির রাস্তা একটিই– আর তা হলো সমাজে ইসলামী অর্থনীতি চালু করা।

ড. আ. ছ. ম. তরিকুল ইসলাম বলেন, দু:খের বিষয় যে, সুদ অভিশপ্ত জেনেও মানুষ সেটা ঘৃণার সাথে বর্জন করে না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে উৎসাহিতও করা হয়। সুদের এই অভিশাপে সমাজ নিমজ্জিত। আজ সময় এসেছে সচেতন হওয়ার। সুদের অভিশাপ থেকে এই জাতিকে মুক্ত করতে হলে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ড. মাহফুজ পারভেজ বলেন, সুদ অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। গোটা জাতি আজ সুদের মধ্যে আবর্তিত। সুদ থেকে পরিত্রাণের জন্য আমাদেরকে সামাজিক আন্দোলন এবং দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে হবে। সমাজে ইসলামী অর্থনীতির ব্যাপক প্রচলন ঘটাতে হবে। আমাদের সামগ্রিক সচেতনতা আজ অনেক বেশী প্রয়োজন।

জনাব মুহাম্মদ রেজাউল করিম বলেন, সুদের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে হলে আমাদের সমাজে ইসলামী অর্থনীতি চালু করতে হবে।

ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুদমুক্ত একটি ভারসাম্যপূর্ণ ইসলামী জীবন ব্যবস্থা এই দেশে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সাধারণ মানুষকে সুদের কুফল, শাস্তি এবং এর পরিণাম সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। এর পাশাপাশি ইসলামী

www.bjilibrary.com

অর্থনীতির গুরুত্বও তাদের সামনে যৌক্তিকতাভাবে উপস্থাপন করতে হবে।

ড. মুহাম্মাদ মতিউল ইসলাম বলেন, ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়– সুদখোররাই সবচেয়ে ভয়ঙ্কর আক্রমণকারী হয়ে থাকে। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার কাছে এদেশ নতজানু। ফলে সর্বত্রই সুদ ছড়িয়ে পড়েছে। সুদের এই অভিশাপ থেকে মুক্তির জন্য ইসলামী সমাজ ব্যবস্থাই একমাত্র ভরসাস্থল।

জনাব জাবেদ মুহাম্মাদ বলেন, সুদ থেকে মুক্তির জন্য যাকাত, সাদাকাহ এবং কর্জে হাসানা সমাজে ব্যাপকভাবে চালু করা প্রয়োজন। সুদের সাথে মানুষ যেন জড়িত না হতে পারে সেজন্য সুদের পথগুলো বন্ধ করে দেয়া একান্ত জরুরি।

সেমিনার-প্রবন্ধে অধ্যাপক শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান বলেন, "সমাজ শোষণের যতগুলো উপায় এ পর্যন্ত উদ্ভাসিত হয়েছে, ধনীকে আরও ধনী এবং গরীবকে আরও গরীব করার যত কৌশল প্রয়োগ হয়েছে সুদ তার মধ্যে সেরা। কৌশল, পদ্ধতি, ফলাফল, অর্থনীতির চূড়ান্ত অনিষ্ট সাধন– সকল বিচারেই সুদের কাছাকাছি কোন সমাজবিধ্বংসী হাতিয়ার নেই। সেই প্লেটো-এরিস্টটলের যুগ হতেই সুদ অপ্রতিহত গতিতে সমাজে বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী, সুদকে কঠোর ভাষায় নিন্দা করা হয়েছে, সুদখোরদের সামাজিক শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, সুদ বর্জনেরও আহ্বান জানানো হয়েছে যুগে যুগে। কোন অবতীর্ণ গ্রন্থেই সুদের লেনদেনকে সমর্থন করা হয়নি, বৈধতা দেওয়া হয়নি।"

সুদ থেকে পরিত্রাণের উপায় সম্পর্কে তিনি আরও বলেন : "সুদের এই সর্বগ্রাসী সয়লাব, এর ভয়াবহ বিধ্বংসী কুফলসমূহ হতে উদ্ধার লাভের উপায় কি? ...ইসলামী খিলাফতের দীর্ঘ নয়শত বছরে মুসলিম বিশ্বে কোথাও সুদ বিদ্যমান ছিল না। কিন্তু মুসলিমদের পতন দশা শুরু হলে যখন পাশ্চাত্যের ধনবাদী আগ্রাসী শক্তিসমূহ একে একে মুসলিম দেশসমূহ গ্রাস করতে শুরু করে তখন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও সৃষ্টি হয় চরম নাজুক অবস্থা। ব্যবসা-বাণিজ্য ভূ-সম্পত্তি সবই চলে যায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের দখলে। এই সময়েই প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সুদের বিস্তার শুরু হয়। দীর্ঘদিন পরে যখন এসব দেশ পুনরায় রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করে ততদিনে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুদ গভীরভাবে শিকড় গেড়ে বসেছে। সুদ উচ্ছেদের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে কোন প্রচেষ্টাও চলেনি। অর্থবহ কোন জোরদার কর্মসূচীও গৃহীত হয়নি। সুদ উচ্ছেদের জন্য মাত্র বিগত শতাব্দীর শেষভাগে ইসলামী পদ্ধতির ফাইন্যান্সিয়াল প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। কিন্তু এরপরেও

www.bjilibrary.com

বাংলাদেশের মতো বহু মুসলিম দেশে সুদ অর্থনৈতিক-সামাজিক-প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ডে বিরাজমান।"

উক্ত সেমিনারে বহু লেখক, শিক্ষাবিদ এবং বুদ্ধিজীবী উপস্থিত ছিলেন।

সেমিনারটি পরিচালনা করেন মাসিক নতুন কলমের সম্পাদক কবি মোশাররফ হোসেন খান।

ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক

বিশিষ্ট লেখক, বুদ্ধিজীবী এবং দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক জনাব আবুল আসাদ বলেন, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক বর্তমান যেমন আছে, এরচেয়ে উন্নয়ন ঘটানো জরুরি। বাংলাদেশ সকল সময় ভারতের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে চায়। সম্পর্কের উন্নতি ঘটাতে চায়। কিন্তু ভারতের দিক থেকে তেমন আন্তরিকতাপূর্ণ সাড়া পাওয়া যায় না। যার প্রমাণ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের দু:খজনক হত্যাকাণ্ড। প্রায়ই তারা বাংলাদেশী নাগরিককে অন্যায়ভাবে হত্যা করে, এদেশের সম্পদ ভোগদখলের চেষ্টা করে। এ থেকে বুঝা যায়, এক তরফাভাবে কখনো সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটানো যায় না। দুই দেশেরই সমান আন্তরিকতার প্রয়োজন হয়।

গত ২৭ শে মার্চ, ২০০৮ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত এক সভাপতির ভাষণে জনাব আবুল আসাদ উক্ত বক্তব্য পেশ করেন।

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে 'ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও কলামিস্ট জনাব আজিজুল হক বান্না। পঠিত প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন সর্বজনাব ড. এম. উমার আলী, শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির, মুহাম্মদ নূরুল আমিন, ড. মাহফুজ পারভেজ, নূরুল ইসলাম বুলবুল, মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, যুবাইর মুহাম্মাদ এহসানুল হক, ড. মুহাম্মদ নজীবুর রহমান, অধ্যক্ষ আশরাফ আল দীন, ড. নজরুল ইসলাম খান আলমারুফ, শহীদুল ইসলাম ভূঁইয়া, মুহাম্মাদ তৌহিদ হুসাইন, জাবেদ মুহাম্মাদ, তাজ উদ্দিন, ড. আখতারুল ইসলাম চৌধুরী, মুহাম্মদ এনামুল হক চৌধুরী, মুহাম্মদ রেজাউল করিম, আবুল কালাম আযাদ প্রমুখ।

সেমিনারে প্রাসঙ্গিক বক্তব্যসহ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মাসিক পৃথিবী ও মাসিক আল ইসলামের সম্পাদক এবং বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক এ. কে. এম. নাজির আহমদ।

অধ্যাপক এ. কে. এম. নাজির আহমদ বলেন, বাংলাদেশের সাথে ভারতের আচরণ ঠিক কাশ্মীরের সাথে তাদের আচরণের মত। কাশ্মীরকে যেমন তারা

www.bjilibrary.com

কখনো স্বাধীনতা দেবে না, ঠিক তেমনি তারা বাংলাদেশকেও মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে দেবে না। ভারত মুখে যতই মানবাধিকার এবং গণতন্ত্রের কথা বলুক না কেন, তাদের চরিত্র কিন্তু ভিন্ন। কৌশলও ভিন্ন। তাদের আগ্রাসী মনোভাব সকল সময় ছিল, আজও আছে। আমাদের উচিত, ভারতের কাছে নতজানু না হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার শক্তি অর্জন করা। আমি মনে করি ব্যাপক গণসচেতনতার মাধ্যমে এটা সম্ভব।

ড. এম. উমার আলী বলেন, আমাদের সামনে এখন অস্তিত্বের প্রশ্নটি অনেক বড়। ভারত চারদিক থেকে যেভাবে আগ্রাসন চালাচ্ছে তাতে করে নিজেদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বও কখনো হুমকির সম্মুখীন হয়ে দাঁড়ায়। তাদের এই আগ্রাসী মুকাবিলায় নতজানু না হয়ে কিভাবে বাংলাদেশের অস্তিত্ব অটুট রাখা যায় সেই কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

জনাব নূরুল ইসলাম বলেন, ভারত এমন একটি দেশ– যেখানে এখনো পর্যন্ত বর্ণবাদী প্রথা চালু রয়েছে। তাদের মত হীনমন্য এমন একটি দেশ কিভাবে বাংলাদেশকে আপন ভাবতে পারে? বাংলাদেশের সাথে ভারতের বহু ক্ষেত্রেই বৈষম্য বিরাজমান। তাদের সাথে সম্পর্কের উন্নতি ঘটাতে চাইলেও বাংলাদেশ পারছে না। কারণ ভারতের সে ধরনের কোনো মানসিকতাই নেই।

জনাব নূরুল ইসলাম বুলবুল বলেন, বাংলাদেশ যেন ভারতের পেটেই অবস্থান করে– এমনি তাদের মানসিকতা। ভারতের আচার-আচরণ বাংলাদেশের জন্য বন্ধুত্বপূর্ণ না হয়ে সকল সময় বৈরীপূর্ণই হয়ে থাকে। ফলে তাদের ব্যাপারে আমাদের সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন আছে।

ড. মাহফুজ পারভেজ বলেন, ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্কের বিষয়টি অত্যন্ত স্পর্শকাতর। ভারত বাংলাদেশের জন্য যে কি ধরনের এবং কতটুকু বন্ধু– যে সম্পর্কেও আজ পর্যন্ত তলিয়ে দেখা হয়নি। বিষয়টি ব্যাপক পর্যালোচনার দাবি রাখে।

জনাব মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম বলেন, এশিয়ার কোনো দেশের সাথেই ভারতের সুসম্পর্ক নেই। সুতরাং বাংলাদেশের সাথে তাদের সুসম্পর্কের কথা তো চিন্তাই করা যায় না। ভারত একটি আগ্রাসী দেশ। এটা মাথায় রেখেই তাদের সাথে বাংলাদেশের সতর্ক সম্পর্ক রাখা উচিত।

অধ্যক্ষ আশরাফ আল দীন বলেন, ভারতের সাথে বাংলাদেশ কি ধরনের সম্পর্ক আশা করে– সেটা ভাবতে হবে। কারণ ভারত তো বাংলাদেশের মানচিত্রকেই বদলে দিতে চায়। এ ধরনের একটি দেশের সাথে সুসম্পর্ক রাখতে চাইলেও– সেটা কতটুকু সম্ভব– সেটাও বিবেচনা করতে হবে।

www.bjilibrary.com

জনাব শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির বলেন, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভারত পরিকল্পিতভাবে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে। বাংলাদেশ যেহেতু একটি মুসলিম দেশ, এই কারণেই ভারতের এতটা গাত্রদাহ। সুতরাং এমনি প্রেক্ষাপটে ভারতের সাথে কিভাবে সুসম্পর্ক স্থাপন করা যায়? বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

জনাব মুহাম্মদ রেজাউল করিম বলেন, আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি বটে, কিন্তু এর প্রকৃত স্বাদ ও সম্পদ ভোগ করছে ভারত। আমাদের নতজানু মানসিকতাই এর জন্য দায়ী।

"সেমিনার-প্রবন্ধে জনাব আজিবুল হক বান্না বলেন, প্রাকৃতিক অনিবার্যতা ও ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতার কারণে বাংলাদেশ ভারতের অপরিহার্য প্রতিবেশী। বলা যায়, এটা নিয়তি নির্ধারিত ব্যবস্থাপনা। এ কারণে কাঙ্ক্ষিত বা অনাকাঙ্ক্ষিত যাই-ই হোক, প্রতিবেশীকে নিয়েই বসবাস করা রাজনৈতিক বাস্তবতা। আর এখানেই আসে প্রতিবেশীর মন-মানসিকতা ও আচরণগত প্রসঙ্গ। বিশ্ব রাজনীতির চূড়ান্ত বিচারে শান্তিই হচ্ছে মানব জাতির অভিপ্সা। শান্তির জন্য চাই সমঝোতা, সম্প্রীতি ও মানবিক সৌহার্দ্যের আকুতি। তার চেয়েও বড়ো কথা, শান্তির জন্য চাই বহুমাত্রিক নি:শর্ত সদিচ্ছা। পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে চাই সার্বভৌম সমতার প্রতি নিঃশর্ত স্বীকৃতি। কিন্তু ভারত বাংলাদেশের অভ্যুদয় কাল থেকে শান্তিপূর্ণ সমঝোতার প্রতি আগ্রহ ও সার্বভৌম সমতার নীতির প্রতি কোন শ্রদ্ধা বা আগ্রহ দেখায়নি। এ সত্য আমরা অকপটে উচ্চারণ করতে চাই। অহমিকা, দাদাগিরির রক্ত চক্ষু এবং জাতিগত শঠতার বিচিত্র ধারায় ভারত বাংলাদেশকে কার্যতঃ একটি 'আশ্রিত রাষ্ট্র' বানিয়ে রাখতে চায়। আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য হচ্ছে এই যে, ভারত বাংলাদেশে স্বকীয়তা, বৃহত্তর জনগণের জীবন-বিশ্বাস, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, জাতীয় সমৃদ্ধি এবং রাষ্ট্রীয় শক্তি-সামর্থ্যের প্রতি কখনও শ্রদ্ধা দেখায়নি। ভারত যেমন বাংলাদেশকে সার্বভৌম সমতার ভিত্তিতে সুপ্রতিবেশী হিসেবে মেনে নিতে পারেন, বাংলাদেশের জনগণও তেমনি ভারতকে সৎ প্রতিবেশী, উন্নয়নের সুহৃদ অংশীদার হিসেবে মেনে নিতে পারেনি। ভারতের মতো শত কোটি মানুষের একটি বড়ো দেশ বাংলাদেশের মতো একটি ছোট প্রতিবেশী দেশকে আস্থা ও সৎ প্রতিবেশীসুলভ আচরণে জয় করতে পারেনি। এটা ভারতেরই সীমাবদ্ধতা। শক্তির দম্ভ এবং শঠতার কলা-কৌশল দিয়েই ভারত বাংলাদেশকে পদানত করে রাখতে চায়।"

তিনি আরও উল্লেখ করেন, "বাংলাদেশ যদি জাতীয় স্বার্থ, রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সতর্ক ও কঠোর না হতে পারে, তাহলে স্বাধীনতার স্থপতি শেখ মুজিব, স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ জিয়ার স্বপ্নই শুধু ব্যর্থ হবে না, বাঙ্গালী

www.bjilibrary.com

মুসলমানদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত প্রিয় বাংলাদেশকেও রক্ষা করা যাবে না। ভারতের সাথে আমাদের রাষ্ট্রাচারের মডেল কী হবে, নতুন করে তা গবেষণার প্রয়োজন নেই। মরহুম শের-এ বাংলা ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মজলুম জননেতা মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান, শহীদ জিয়ার আদর্শেই আধিপত্যবাদী-হিন্দু আর্য-ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারতের প্রতি আমাদের জাতিগত আচরণের দিক দর্শন নিহিত রয়েছে। ১৯৭১-এ যারা ভারতীয় আধিপত্যবাদের শৃঙ্খল এড়াতে স্বাধীনতার প্রতিপক্ষ বা বিরোধী হিসেবে নাম লিখিয়েছেন এবং এখনও যারা সেই পুরনো রাজনৈতিক অবস্থানের অপবাদে নানাভাবে খেসারত দিচ্ছেন, ইতিহাস তাদের সামনে আধিপত্যবাদী চক্র ও মীর জাফরী পঞ্চম বাহিনীর কবল থেকে প্রিয় মাতৃভূমির আজাদী রক্ষার সম্মুখ সমরে রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেবার আর একটি সুযোগ এনে দিয়েছে। এবারে ভুল করলে স্পেনের মতো জাতীয়তাবাদী ইসলামী শক্তির চূড়ান্ত পরাভব ঘটতে পারে এই বাংলাদেশে। তবে দেশ রক্ষার মহাসংকটে এ দেশের ইসলামী শক্তিকে সংঘবদ্ধ হয়ে দুইনেত্রীকে সাথে নিয়েই দেশপ্রেমিক শক্তি নিয়ে একাত্তরের মতোই মহাসংগ্রামের নয়া ইতিহাস নির্মাণের ঝুঁকিপূর্ণ উদ্যোগ নিতে হবে। এটাই সময়ের দাবী।

উক্ত সেমিনারে বহু লেখক, বুদ্ধিজীবী এবং শিক্ষাবিদ উপস্থিতি ছিলেন।

সেমিনারটি পরিচালনা করেন মাসিক নতুন কলমের সম্পাদক কবি মোশাররফ হোসেন খান।

বাংলাদেশের প্রতি ভারতের আচরণ

বিশিষ্ট লেখক, বুদ্ধিজীবী এবং দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক জনাব আবুল আসাদ বলেছেন, বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী-স্বপ্ন একটি স্বপ্নবিলাস ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ তারা বাংলাদেশের সাথে কোনোপ্রকার সুসম্পর্ক বজায় রাখতে রাজি নয়। স্বার্থ হাসিলের জন্য যতটুকু প্রয়োজন, ভারত ততোটুকুই কেবল বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক রাখতে চায়। কিন্তু প্রতিবেশী দেশ হিসাবে তারা কখনই বাংলাদেশের কল্যাণকামী নয়। এই সত্যকে আমাদের উপলব্ধি করতে হবে।

গত ২৪শে এপ্রিল, ২০০৮ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক, আয়োজিত 'বাংলাদেশের প্রতি ভারতের আচরণ' শীর্ষক এক সেমিনারে সভাপতির ভাষণে জনাব আবুল আসাদ উক্ত মন্তব্য করেন।

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে

www.bjilibrary.com

'বাংলাদেশের প্রতি ভারতের আচরণ' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. মাহফুজ পারভেজ। প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন সর্বজনাব ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির, ড. মুহাম্মদ আবদুস সামাদ, ড. হাসান মুহাম্মাদ মুঈনুদ্দীন, ড. আ. ছ. ম. তরিকুল ইসলাম, মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, ড. মাহমুদুল হাসান, ড. নজরুল ইসলাম খান আলমারুফ, অধ্যক্ষ আশরাফ আল দীন, মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম, জাবেদ মুহাম্মাদ প্রমুখ।

সেমিনারে প্রাসঙ্গিক বক্তব্যসহ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মাসিক পৃথিবী ও মাসিক আল ইসলামের সম্পাদক এবং বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক এ. কে. এম. নাজির আহমদ।

অধ্যাপক এ. কে. এম. নাজির আহমদ বলেন, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কটি এমনি যে এই বিষয়টি বারবার আমাদের সামনে ঘুরে ফিরে আসে। চারদিক থেকেই আমরা ভারত দ্বারা বেষ্টিত। ভারত আমাদের প্রতিবেশীও বটে। কিন্তু তারা বাংলাদেশের সাথে কখনই বন্ধুত্বসুলভ আচরণ করে না। বরং তাদের বৈরী মনোভাবেরই মনে প্রকাশ ঘটে। ভারতকে আমরা যতই বন্ধু করি না কেন, ভারত কখনই আমাদের বন্ধু নয়। বাংলাদেশকে তারা নানা কৌশলে দুর্বল করে দাবিয়ে রাখতে চায়। আমাদের মনে রাখা উচিত যে, ভারতও কিন্তু নানা সমস্যায় জর্জরিত। সে দেশের অভ্যন্তরে চলছে কেবলই ভাঙনের খেলা। সেদিন দূরে নয়, যেদিন ভারত ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। সুতরাং ভারত-ভয়ে আমাদের আতঙ্কিত না হয়ে বরং তাদের আগ্রাসন থেকে কিভাবে মুক্ত হওয়া যায় সেই কৌশলই আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। এজন্য প্রয়োজন আমাদের নতজানু মানসিকতা পরিত্যাগ করা। মনে রাখা জরুরি যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষার গ্যারান্টি একমাত্র ইসলাম।

ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ বলেন, বাংলাদেশের প্রতি ভারতের আচরণ বড় নির্মম-নিষ্ঠুর। যেটা জুলুমের পর্যায়ে পড়ে। তাদের মধ্যে হঠাৎ করেই এই বৈরী আচরণের স্বভাব তৈরি হয়নি। বরং তাদের এটি মজ্জাগত ব্যাধি। ভারতকে মুকাবিলা করার জন্য আমাদের সার্বক্ষণিক তৈরি থাকা প্রয়োজন।

জনাব শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির বলেন, কয়লার ময়লা যেমন ধুইলে যায় না, ভারতের চরিত্রও ঠিক তেমনি। তাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্যই হলো অন্য কোনো দেশের প্রতি ন্যূনতম শ্রদ্ধাশীলও না দেখানো। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও তাই ঘটছে। এটা নতুন কিছু নয়। বরং তাদের এই আগ্রাসী স্বভাবের দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখেই আমাদের দেশকে কিভাবে আরও শক্তিশালী করা যায়, সেটাই ভাবা একান্ত জরুরি। আমরা যদি আত্মনির্ভরশীল হতে পারি তাহলে ভারত-ভয়ে কম্পিত হবার কিছু নেই।

www.bjilibrary.com

ড. হাসান মুহাম্মাদ মুঈনুদ্দীন বলেন, ভারত সম্পর্কে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ খুব বেশী কিছু জানে না। প্রকৃত অর্থে ভারত শুধু বাংলাদেশের জন্য নয়, বিশ্বের সকল দেশের জন্যই ভয়ঙ্কর। তারা বিশ্বের যেখানেই আছে সেখানেই অনাসৃষ্টি চালিয়ে যাচ্ছে। এমন কুটিল চক্রান্তকারী, আগ্রাসীও হিংসুটে দেশ পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি নেই। সুতরাং এমন একটি দেশ বাংলাদেশের জন্য কিভাবে বন্ধুসুলভ আচরণ করতে পারে?

ড.মুহাম্মাদ আবদুস সামাদ বলেন, বাংলাদেশ যেহেতু একটি মুসিলম দেশ, সেই কারণে আমাদের সাথে তাদের এতটা বৈরী মনোভাব। তাদের মুখোশ উন্মোচন করা প্রয়োজন। তাদের মুকাবিলায় আমাদের কি ধরনের কর্মকৌশল অবলম্বন করা উচিত, সেটা ভাবতে হবে।

ড. মাহমুদুল হাসান বলেন, বাংলাদেশের তুলনায় ভারত একটি বড় শক্তি, সেই কারণে তারা এদেশের সাথে যেমন খুশি আচরণ করে পার পেয়ে যাচ্ছে। মূলত ভারত হিংস্রস্বভাবের একটি দেশ। সেখানে সংখ্যালঘুদের ওপর তারা যে বর্বরোচিত আচরণ করে, সেটা দেখেও কি ভারতকে চেনা যায় না? সুতরাং তারা বাংলাদেশকে কিভাবে আপন করে নিতে পারে? বিষয়টি আমাদের গভীরভাবে ভাবতে হবে।

অধ্যক্ষ আশরাফ আল দীন বলেন, ভারত বাংলাদেশে আসে তাদের মিশন বাস্তবায়নের জন্য। তারা সুপরিকল্পিতভাবে এদেশকে দুর্বল থেকে আরও দুর্বল করে দেবার জন্য দীর্ঘমেয়াদী কর্মকৌশল প্রয়োগ করছে। তাদের মুকাবিলার কথা কি এদেশ কখনো ভেবেছে? কখনো কি আমরা আত্মনির্ভরশীল জাতি হিসাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছি? বরং ভারতকে খুশি করার জন্য সকল সময় নতজানু ভূমিকা পালন করে এসেছি। এখন আমাদের উপলব্ধির সময় এসেছে।

জনাব মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম বলেন, ভারত বাংলাদেশের বহু ভূখণ্ড জবর দখল করে নিয়েছে। তারপরও বাংলাদেশ ভারতকে ট্রানজিট দিয়ে যেন নিজেদেরকেই ধন্য মনে করছে। তারা বর্গীদের মতো এদেশকে শোষণ করে চলেছে। সেখানে চলছে মুসলিম হত্যাকাণ্ড। ভারতে মুসলমানরা অনিশ্চয়তার মধ্যে আতঙ্কিত অবস্থায় কোনো রকমে বেঁচে আছে। বর্ণবৈষম্য সেখানে প্রকট। এমনি একটি ক্ষুদ্রমনা হিংস্র স্বভাবের দেশ কি করে বাংলাদেশের বন্ধু হতে পারে?

ড. আ. ছ. ম. তরিকুল ইসলাম বলেন, ভারত যে বাংলাদেশের সাথে বৈরী আচরণ করবে, সেটাই স্বাভাবিক। কারণ ভালো এবং সুশিক্ষা তাদের চরিত্রেই নেই। তারা একচক্ষু হরিণের মতো। বাংলাদেশের সাথেও তারা সেই ধরনের

www.bjilibrary.com

আচরণ করছে। আগামীতেও করবে। এখন ভাবা জরুরি যে, ভারতের এই আগ্রাসন এবং শত্রুতার মুকাবিলা আমরা কিভাবে করতে পারি।

ড. নজরুল ইসলাম খান আলমারূফ বলেন, বাংলাদেশের সাথে ভারত কিভাবে বৈরী আচরণ করে চলেছে– বিষয়গুলো এদেশের সাধারণ জনগণের কাছে তাদের বোধগম্য উপায়ে তুলে ধরা প্রয়োজন। এদেশের সর্বস্তরের মানুষকে বুঝানো প্রয়োজন যে, বাংলাদেশের জন্য ভারত কখনই বন্ধু ছিল না, আজও নেই, আগামীতেও থাকবে না।

জনাব মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম বলেন, বাংলাদেশের জন্য ভারত সকল সময়ই হুমকিস্বরূপ। এদেশে তারা অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন চালিয়ে যাচ্ছে বিনা বাধায়। তাদের মুকাবিলা করার শক্তি অর্জন করা তো দূরে থাক, এই বিষয়টি যেন এদেশের একেবারেই ভাবনার বাইরে। বরং তাদের তুষ্টির জন্য এদেশের কিছু ভারতপ্রেমী সর্বক্ষণ তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং ভারতকে মুকাবিলা করতে হলে এদেশীয় ভারতীয় দালালদেরকেই প্রথমে চিহ্নিত করতে হবে।

জনাব জাবেদ মুহাম্মাদ বলেন, ভারতের বিষয়টি অত্যন্ত জটিল। ভারত যে এদেশের বন্ধু নয় বরং শত্রু– এই বিষয়টি সাধারণ জনগণের কাছে স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে হবে। সেই সাথে আমাদেরকে দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হতে হবে।

সেমিনার-প্রবন্ধে ড. মাহফুজ পারভেজ বলেন, "বৈরী আচরণ, যাকে তাত্ত্বিক ভাষায় আধিপত্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদ বলা হয়, সেটা ঐতিহাসিকভাবেই ভারত কর্তৃক বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য প্রতিবেশী দেশের ওপর প্রবল ও ভয়ঙ্করভাবে লক্ষ্যণীয়। আন্তর্জাতিক/আঞ্চলিক সম্পর্ক/রাজনীতির প্রধান আলোচ্য বিষয়ের মধ্যেও ভারতের বৈরী আচরণ সংক্রান্ত পাঠ বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে অধীত। দক্ষিণ এশিয়া, ভারত, পাকিস্তান বা বাংলাদেশ বিষয়ক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং শীর্ষ গবেষকগণ দীর্ঘকাল ধরে রাষ্ট্রগত সম্পর্কের নিরিখে বৈরী আচরণ তথা আধিপত্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদ প্রসঙ্গে নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা চালিয়ে ভয়াবহ তথ্য উপস্থাপন করেছেন। ২০০৮ সালে স্বাধীনতার ৩৬ বছর : বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক বিষয়ক পর্যালোচনায় কিছু মৌলিক প্রশ্ন বা ইস্যু আমাদের সামনে চলে আসে, যার মাধ্যমে ভারতের বৈরী আচরণের ধারাবাহিকতা ফুটে ওঠে।"

তিনি আরো বলেন, "বাংলাদেশ ও এর মতো অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র শান্তিপ্রিয় প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহকে নিরাপত্তা, উন্নয়ন, সার্বভৌমত্ব ও অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে অধিকতর তৎপর হতে হবে এবং এ সচেতন তৎপরতা কেবলমাত্র

www.bjilibrary.com

রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে হলেই হবে না; জনগণের মধ্যেও বিস্তৃত হতে হবে। কেননা, জনগণের মধ্যে আত্মপরিচয়, আদর্শবাদী মূল্যবোধ, স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট্যের শক্তিশালী উপস্থিতিই পারে ভারতসহ যে কোন আধিপত্য ও আগ্রাসনকে প্রতিহত করতে।

প্রসঙ্গত একটি বিষয় মনে রাখা দরকার যে, ভারতীয় আগ্রাসন বা আধিপত্যবাদ বলতে হিন্দু শ্রেষ্ঠত্ববাদী রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক এলিট শ্রেণীর অপতৎপরতাকেই সামনে দেখা যায়– যারা সরাসরি হিন্দুত্ব বা কৌশলে ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশের আড়ালে দেশের ভেতরের সিংহভাগ নিম্নবর্ণ এবং ভিন্ন ধর্ম ও জাতিত্বের মানুষকে এবং দেশের বাইরের অন্যান্য দেশের শান্তি প্রিয় নিরীহ প্রতিবেশীদের প্রতিনিয়ত নিষ্পেষিত করছে। অতএব, ভারতীয় আগ্রাসন বা আধিপত্যবাদকে নিরীক্ষণ করতে হবে এই বর্ণহিন্দুত্ববাদী এলিট শ্রেণী এবং এদের উন্নাসিক ও আগ্রাসী চারিত্রিক মানসিকতার আদলে গড়ে ওঠা সমগ্র ভারতব্যাপী তৎপর নানা সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক-ধর্মীয় শ্রেণী গোষ্ঠীর নিরিখে। কোনভাবেই ভারতীয় আগ্রাসন বা আধিপত্যবাদের সঙ্গে সে দেশে বসবাসকারী আপামর সাধারণ মানুষকে এক করে দেখা উচিত হবে না। একজন সাধারণ কাশ্মীরি বা শিখ বা মণিপুরী বা তামিল বা হরিজন ভারতীয় হলেও কোনভাবেই দেশে বা দেশের বাইরে আগ্রাসন বা আধিপত্যের লড়াইয়ে লিপ্ত নন; তিনি এবং তার মতো অসংখ্য জাতপাতে বিভক্ত ভারতীয়রা বরং নিজ দেশেই দলিত হচ্ছেন হিন্দুত্বের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠায় লিপ্ত বর্ণবাদী ভারতীয় শ্রেণীর হাতে। অতএব, বর্ণ হিন্দুত্বের ছদ্মাবরণে কার্যকর ভারতীয় বৈরী আচরণ, আগ্রাসনবাদ, আধিপত্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদকে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত ও অনুধাবন করাই আমাদের দেশ ও জনগণের অস্তিত্ব বিকাশের স্বার্থে প্রয়োজন।"

উক্ত সেমিনার বহু লেখক, বুদ্ধিজীবী এবং সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন।

সেমিনারটি পরিচালনা করেন মাসিক নতুন কলমের সম্পাদক কবি মোশাররফ হোসেন খান।

ইসলামী ব্যাংকিং

খ্যাতিমান লেখক, বুদ্ধিজীবী এবং দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক জনাব আবুল আসাদ বলেন, ইসলামী ব্যাংকি একটি কল্যাণকর, আধুনিক এবং যুগান্তকারী ব্যাংকিং ব্যবস্থা। সমগ্র পৃথিবী এখন এই ব্যাংকিং প্রক্রিয়ার দিকে ক্রমশ ঝুঁকে পড়ছে। এর কারণ, সুদবিহীন যে ব্যাংকিং কার্যক্রম চলতে পারে এবং সেটা একদিকে যেমন সাধারণ মানুষের জন্য কল্যাণকর হতে পারে, অন্যদিকে হতে পারে ব্যবসাসফল ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা সেই মডেল সার্থকভাবে তুলে

www.bjilibrary.com

ধরতে সক্ষম হয়েছে। সুতরাং ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে আরও সফলতা ও দক্ষতার সাথে বেগবান করে তোলা জরুরি।

গত ১২ই জুন, ২০০৮ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত 'ইসলামী ব্যাংকিং' শীর্ষক এক সেমিনারে জনাব আবুল আসাদ সভাপতির ভাষণে উপরোক্ত বক্তব্য রাখেন।

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে 'ইসলামী ব্যাংকিং' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান। প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন সর্বজনাব প্রফেসর ড. এম. উমার আলী, ড. মুহাম্মাদ কোরবান আলী, ড. মুহাম্মাদ লোকমান, ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, অধ্যাপক এ. টি. এম. ফজলুল হক, শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির, ড. হাসান মুহাম্মদ মুঈনুদ্দীন, ড. মুহাম্মাদ মতিউল ইসলাম, ড. আ. ক. ম. আবদুল কাদের, মুহাম্মদ নূরুল আমিন, মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম বুলবুল, মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, ড. নজরুল ইসলাম খান আলমারুফ, মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম, অধ্যাপক খোন্দকার রোকনুজ্জামান, জাবেদ মুহাম্মাদ প্রমুখ।

সেমিনারে প্রাসঙ্গিক বক্তব্যসহ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মাসিক পৃথিবী ও মাসিক আল ইসলামের সম্পাদক এবং বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক এ. কে. এম. নাজির আহমদ।

অধ্যাপক এ. কে. এম. নাজির আহমদ বলেন, মহান রাব্বুল আলামীন সুদকে হারাম করেছেন। সুদের ব্যবসাও হারাম। সুদের লেন-দেন, কায়-কারবারও হারাম। সুদ একটি ভয়াবহ অভিশাপ। সুদের এই অভিশাপ থেকে মুক্ত করার জন্যই প্রয়োজনের তাকিদে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু হয়েছে। সুদমুক্ত ব্যাংকিং অবকাঠামোর সুফল এখন সাধারণ মানুষও ভোগ করতে পারছে। ইসলাম এসেছে সুদকে চিরতরে নির্মূল করার জন্য। যদি সেটা করতে হয় তাহলে ইসলামী ব্যাংকিং-এর মডেল সামনে রেখে আমাদের আরও বিভিন্ন ধরনের সুদমুক্ত অর্থনৈতিক কার্যক্রম চালু করতে হবে। দেশের সকল মানুষের মধ্যে সুদের কুফল ও এর ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে ব্যাপক গণসচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। ইসলামী ব্যাংকি-এর সুফলগুলো সহজলভ্য করে তাদের কাছে পৌঁছুতে হবে। তাহলেই এই সমাজ সুদের অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে পারবে ইনশাআল্লাহ।

প্রফেসর ড. এম. উমার আলী বলেন, আজকের বিশ্বের সকল ব্যাংক একযোগে কেবল ধনীদের জন্য কাজ করছে। এতে করে ধনীরা আও ধনী হচ্ছে, আর গরীবরা আরও গরীব হয়ে পড়ছে। এর ব্যতিক্রম কেবল ইসলামী

www.bjilibrary.com

ব্যাংকিং ব্যবস্থা। এটা এখন গোটা বিশ্বে পাইওনিয়রের ভূমিকা পালন করছে। তবে এতটুকুতেই তৃপ্ত হলে চলবে না, এই ধারাকে আরও বেগবান, কার্যকর এবং যুগোপযোগী করে সাধারণ মানুষের জন্য কল্যাণকর হিসাবে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। সুদের কুপ্রভাব থেকে সমাজ ও জাতিকে মুক্ত করার জন্য ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে আরও যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করতে হবে।

ড. মুহাম্মাদ লোকমান বলেন, উপস্থাপিত প্রবন্ধটি কয়েকটি অধ্যায়ে সংযোজিত : যেমন– সংজ্ঞাসহ ইসলামী ব্যাংক ও সুদী ব্যাংকের মধ্যে পার্থক্য; ইসলামী ব্যাংকের অনন্য বৈশিষ্ট্যসমূহ; ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ কৌশলে এবং পরিশেষে উপসংহার। প্রবন্ধটি তাত্ত্বিকভাবে খুবই তথ্য সমৃদ্ধ এবং আলোচনা ও ব্যাখ্যামূলক যা সাধারণ পাঠকসহ সকল সুধীদের জন্য অত্যন্ত সহজবোধ্য হয়েছে; এজন্য আমি প্রবন্ধকারকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। সম্মানিত লেখক একজন অর্থনীতিবিদ এবং একজন লেখক ও গবেষকও বটে। তাই আলোচিত প্রবন্ধটি 'ইসলামী ব্যাংক'-এর কোন একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ও বিভাগে গবেষণামূলক মূল্যায়ন হলে এটি ইসলামী ব্যাংকিং সেন্টারে মূল্যবান অবদান হিসাবে স্বীকৃতি পেত বলে আমার বিশ্বাস। এছাড়া উপস্থাপিত প্রবন্ধের আলোচিত/উল্লিখিত অধ্যায়গুলোর সঙ্গে "ইসলামী অর্থনীতিতে ইসলামী ব্যাংকিং"-এর অবস্থান ও গুরুত্ব, অর্থ ও সম্পদ বিকেন্দ্রীকরণ ও হস্তান্তরে ইসলামী ব্যাংকিং-এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং আধুনিক বিশ্বে ইসলামী ব্যাংকিং এর জন্য চ্যালেঞ্জ ও সমস্যাসমূলের ওপর একটি নাতিদীর্ঘ আলোচনা থাকলে এটি আরো বেশী তথ্যবহুল ও পূর্ণাঙ্গ হত বলে আমার বিশ্বাস; এ বিষয়ে আমি প্রবন্ধকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

বিশেষ করে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকি এর জন্য প্রধান প্রধান অন্তরায় যেমন ইসলামী ব্যাংকি এর জন্য পার্লামেন্ট বা সংসদ কর্তৃক আইন রচিত না হওয়া; সরকার কর্তৃক বহুল পরিমাণে সুদভিত্তিক বণ্ড ও সিকিউরিটিজ চালু, বিনিয়োগকারীদের তরফ থেকে Default Cultive প্রতিষ্ঠা, কেন্দ্রীয় ব্যাংক বা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক রিজার্ভ রিকোয়ারমেন্টে সুদের প্রবর্তন, ইসলামী ব্যাংকিং-এর উপযোগী যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ম্যান পাওয়ারের অপ্রতুলতা, শরীয়া কাউন্সিলসমূহের বিনিয়োগের ওপর শরীয়া রুলিং-এর পার্থক্য, পাশ্চাত্য জগতে অগণিত সুদভিত্তিক কাউন্সিয়েল ইনস্টিটিউশানের আবির্ভাব এবং গোটা সুদভিত্তিক অর্থনীতির আলোকে কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে ইসলামী ব্যাংকিং-এর কার্যক্রম পরিচালনা, ইত্যাদি। এছাড়া বিনিয়োগ কৌশলসমূহের মধ্যে বর্তমানে সবচেয়ে বেশী প্রচলিত কৌশলসমূহের উল্লেখসহ ইসলাম সমর্থিত বিনিয়োগ কৌশল বাস্তবায়নে অসুবিধাসমূহ এবং সুদ ও মুনাফার

www.bjilibrary.com

মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্যসমূহ উপস্থাপন করলে প্রবন্ধের সার্বিক দিক পূর্ণাঙ্গ হত বলে আমার ধারণা।

ড. মুহাম্মাদ কোরবান আলী বলেন, ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা কিভাবে এলো– সেটাও পর্যালোচনা হওয়া প্রয়োজন। বলাবাহুল্য, ইসলামী আন্দোলনের ফসলই হলো ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা। এই ব্যাংকিং প্রক্রিয়া গোটা বিশ্বে কিভাবে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে, এখন সেটাই চিন্তা-ভাবনা করে পদক্ষেপ নেবার সময়।

ড. হাসান মুহাম্মাদ মুঈনুদ্দীন বলেন, আমাদের সকল প্রকার আয়-ব্যয়ের প্রক্রিয়া আল্লাহ নির্দেশিত এবং রাসূলের (সা) অনুসৃত পথে হতে হবে। সুতরাং এই প্রেক্ষাপটে এখন ইসলামী ব্যাংকিং-এর কোনো বিকল্প নেই।

ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ বলেন, এখন গোটা বিশ্বের মানুষ অর্থের পেছনে লাগামহীন ঘোড়ার মতো ছুটছে। হালাল-হারামের কোনো তোয়াক্কাই তাদের নেই। জাগতিক সমৃদ্ধিই একমাত্র তাদের কাম্য। এটা খুবই দু:খজনক। আল্লাহর নির্দেশ ও রাসূলের (সা) অনুসরণীয় পথ থেকে বর্তমান সমাজের অধিকাংশ মানুষ বহুদূরে। সমাজের ধ্বংস এখন মুখ বরাবর। এই সমূহ পতন থেকে রক্ষার জন্য ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা ঢাল হিসাবে কাজ করতে পারে। এই ধারাকে আরও বেগবান করতে হবে।

জনাব মুহাম্মদ নূরুল আমিন বলেন, ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা সময়োপযোগী একটি কল্যাণকর ব্যাংকিং ব্যবস্থা। তবে একে গতিশীল করার জন্য আরও বহু কার্যক্রম এতে সংযোজন করা প্রয়োজন।

জনাব শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির বলেন, ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থাকে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার একটি সহজাত ও সহায়ক উপাদান বা element বলা যায়। এককভাবে ইসলামী ব্যাংকের পক্ষে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হচ্ছে দু'টি। আমর-বিল-মারূফ এবং নাহী-আনিল-মুনকার। যাকাত প্রবর্তন এবং সর্বোতভাবে সুদ বর্জন করতে হবে। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা মূলত সুদ-বিবর্জিত ব্যবসায়ী লেনদেন ও কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। যাকাতভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা বা ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কাজে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা সহায়ক ভূমিকা পালন করে। প্রচলিত সুদভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থায় সুদই একমাত্র ভিত্তি। এখানে যাকাতের ভূমিকা মূখ্য নয়। সুদ, দাতা ও গ্রহীতা উভয়কেই অর্থের দাসে পরিণত করে। আর যাকাত, দাতা ও গ্রহীতা উভয়কেই আল্লাহর আবদে পরিণত করে। সুদ, ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান বৃদ্ধি করে জ্যামিতিক হারে আর যাকাত, ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান ঘুচায় অভাবনীয় হারে। যাকাত মানবাধিকারে

www.bjilibrary.com

রক্ষাকবচ আর সুদ মানবাধিকারের সংহারক। সুদ মানুষকে ঋণের জালে আবদ্ধ করে আর যাকাত মানুষকে ঋণমুক্ত করে। প্রচলিত সুদভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থার মধ্যে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থাকে চালিয়ে নেয়া সম্ভব হলেও অনেক বাধার সাথেই প্রতিনিয়ত মুকাবিলা করতে হয়। তাই যাকাতভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা ব্যতীত ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার চলার পথ সুগম হয় না। এ প্রেক্ষিতে দু'টো প্রস্তাব আমরা বিবেচনা করতে পারি। যেমন– ১. ইসলামী কোন এনজিও বা সংস্থারই ক্ষুদ্র ঋণের নামে মানুষকে ঋণগ্রস্ত করার কর্মসূচী বর্জন করা উচিত যা সুদভিত্তিক অর্থনীতির পরিপূরক ও সহায়ক। ঋণের ভিত্তিতে কাজ করতে হলে তা হবে একমাত্র কুরআন ঘোষিত 'কর্দান হাসানান'-এর মৌলনীতির ভিত্তিতে। ব্যাপকভাবে যাকাত প্রদানে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে ঋণগ্রস্ত মানুষকে ঋণমুক্ত করা এবং জীবন সংগ্রামে মানুষকে স্বনির্ভর হতে সহায়তা করাই ইসলামী আর্থিক সংস্থাগুলোর মৌল কর্মসূচী হওয়া উচিত। কাজটি পর্যায়ক্রমে গ্রুপ বা গ্রামভিত্তিক পরিকল্পিতভাবে হতে পারে। ২. যাকাতভিত্তিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এখন থেকে এ দাবি গণদাবি করে তোলা দরকার যে, যদি কোন ব্যক্তি বা সংস্থা সরকারীভাবে সমস্ত সম্পদ ও দায়-এর স্বচ্ছতা প্রদর্শন করে যাকাত প্রদান করে, তবে সে ব্যক্তি ও সংস্থাকে আয়করের আওতামুক্ত রাখা হবে। এতে করে একদিকে যাকাত দাতা বাড়বে অন্যদিকে দুর্নীতি প্রতিরোধ হবে, যাকাত দাতারা অহেতুক করের বোঝার জুলুম থেকে বাঁচাবে এবং দেশ দারিদ্র্য মুক্ত হবে।

জনাব মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম বুলবুল বলেন, ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা আমাদেরকে সুদের ভয়ালো অভিশাপ থেকে মুক্তি দিয়েছে। কিন্তু এর কার্যক্রম এখনও সীমিত পর্যায়ে থাকায় দেশের সকল মানুষ সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সুতরাং ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে গণমুখী করে তুলতে হবে এবং সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় এর সুফলটুকু পৌছে দিতে হবে। তাহলেই গোটা জাতি সুদের অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবে ইনশাআল্লাহ।

ড. মুহাম্মাদ মতিউল ইসলাম বলেন, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। সুতরাং ইসলামী অর্থনীতি সমাজে চালু থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। দু:খের বিষয়, বহুকাল যাবৎ এদেশের মানুষ এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল। ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা এদেশে চালু হবার পর তাই মানুষের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়। ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে যদি আরও গতিশীল করা যায় তাহলে এর প্রভাবে গোটা জাতিই আলোকিত হয়ে উঠবে বলে আশা করি।

জনাব মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম বলেন, ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা শুধু বাংলাদেশেই নয়, বর্তমান গোটা বিশ্বের কাছেই এখন একটি মডেল হিসাবে

www.bjilibrary.com

গণ্য। অন্যান্য ধর্মের মানুষও এখন এই ব্যাংকিং ব্যবস্থার দিকে ক্রমশ ঝুঁকছে, এটা আশার কথা। আমরা যদি দক্ষ জনশক্তি দ্বারা এই ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে আরও যুগোপযোগী করে তুলতে পারি– তাহলে এর প্রভাব পড়বে গোটা বিশ্বেই। সুতরাং আমাদের দায়িত্বের পরিসীমাকে আরও বৃদ্ধি করতে হবে।

অধ্যাপক এ.টি.এ. ফজলুল হক বলেন, ইসলামী ব্যাংকিং গুরুত্ব যে অপরিসীম– এটা এখন এদেশের জনগণ বুঝতে সক্ষম হয়েছে। এটা ইসলামী ব্যাংকিং-এর ক্ষেত্রে একটি বিরাট সাফল্য। এই ধারাকে আরও বেগবান করে তোলা প্রয়োজন।

ডা. আ. ক. ম. আবদুল কাদের বলেন, ইসলামী ব্যাংকিং-এর ব্যবস্থা আমাদের ঈমানের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত। মানুষের জীবনধারা সুদমুক্ত হবে, কলুষমুক্ত হবে– এটাই ঈমানের দাবি। ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা আমাদের জন্য একটি নিয়ামতস্বরূপ। তবে খেয়াল রাখতে হবে, এর মধ্যে যেন কোনো চোরা-বাঁকা পথ না থাকে। স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার প্রশ্নে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা যেন দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে।

অধ্যাপক খোন্দকার রোকনুজ্জামান বলেন, ইসলামী ব্যাংকিং-এর মধ্যে মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এখন সময়ের দাবি– গ্রাম পর্যন্ত এর কার্যক্রম বিস্তৃত করা। যাতে করে সাধারণ মানুষ এর সুফল ভোগ করতে পারে।

ড. নজরুল ইসলাম খান আলমারূফ বলেন, ব্যবসা এবং সুদের মধ্যে যে কি পার্থক্য– এটা ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা নির্ণয় করতে সক্ষম হয়েছে। এটাও অনেক বড় সফলতা। সুদী কায়-কারবার ছাড়াও যে ব্যাংক চলতে পারে, ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা সেটাও সফলভাবে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে।

জনাব জাবেদ মুহাম্মাদ বলেন, ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা নি:সন্দেহে একটি কল্যাণমুখী ব্যবস্থা। এর কার্যক্রম এবং সেবার মান আরও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

সেমিনার-প্রবন্ধে অধ্যাপক শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান বলেন, "মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আল কুরআনে সুস্পষ্ট ভাষায় সর্বকালের জন্য, সকল বনি আদমের জন্য একদিকে যেমন ব্যবসাকে বৈধ ঘোষণা করেছেন অন্যদিকে সুদ ও সুদভিত্তিক সকল কার্যক্রমকে চিরতরে নিষিদ্ধ করেছেন। অথচ আজকের দুনিয়ায় সুদের সর্বগ্রাসী সয়লাব চলছে। সব ধরনের অর্থনৈতিক লেনদেন, ব্যবসায়িক কায়-কারবার সর্বত্রই সুদের অপ্রতিহত ও অবারিত গতি। সুদ সমাজ ও শোষণের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার, যুলমের

www.bjilibrary.com

সবচেয়ে মারাত্মক অস্ত্র। সুদের মাধ্যমে সমাজকে সবচেয়ে সুকৌশলে ও বেশি শোষণ করছে আজকের সনাতনী ব্যাংক ব্যবস্থা। কি পুঁজিবাদী দেশ, কি সমাজতন্ত্রী দেশ, কি মুসলিম প্রধান দেশ সর্বত্রই সনাতনী ব্যাংকগুলো সুদী কারবারে লিপ্ত। যারা ব্যাংক হতে নানা প্রয়োজনে ঋণ নেয় তারা তো সুদ দিতে বাধ্য হয়ই, এমনকি যারা শুধু নিরাপত্তা ও সঞ্চয়ের জন্যেই ব্যাংকে টাকা আমানত রাখে তাদেরকেও মুনাফার লেবাস পরিয়ে ব্যাংক সুদ নিতে প্ররোচিত করে। সমাজ বিধ্বংসী, যুলমকারী এবং শোষণের সফল মাধ্যম এই সুদের হাত থেকে মুসলিম মিল্লাতকে রক্ষা করার জন্যেই বর্তমানকালে সৃষ্টি হয়েছে ইসলামী ব্যাংকের।"

তিনি আরও বলেন, "বিশ্বের ইসলামী ব্যাংকসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন ও ব্যালন্সশীটসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়... তারা শুধু বিপুল মুনাফাই অর্জন করেনি, সুদভিত্তিক ব্যাংকগুলোর তুলনায় আমানতকারীদের বেশি হারে মুনাফা প্রদান করছে। স্মরণ রাখা দরকার, সুদভিত্তিক ব্যাংকগুলোর বয়স যেখানে দুইশ' বছরের বেশি ইসলামী ব্যাংকের বয়স সেখানে তিন দশকের কিছু বেশি। এখনও তার শৈশবকাল কাটিয়ে ওঠেনি। আশার কথা, ইসলামী ব্যাংক ও ফাইন্যান্সিয়াল ইন্সটিটিউশনগুলো বিনিয়োগের জন্য শারীয়াহর দৃষ্টিতে বৈধ নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং সম্মিলিতভাবে একে অন্যের অভিজ্ঞতা হতে শেখার চেষ্টা করছে। ইসলামী ব্যাংকের সাফল্য একদিকে যেমন তার কর্মীবাহিনীর ঐকান্তিকতা, পেশাগত কর্মকুশলতা এবং দক্ষতার ওপর নির্ভরশীল, তেমনি নির্ভরশীল তার অংশীদারী বিনিয়োগকারীদের সততা, যোগ্যতা এবং ব্যবসায়িক দূরদর্শিতার ওপর। বিশেষত আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে প্রয়োজনীয় দক্ষতা, অভিজ্ঞতা এবং সততাসম্পন্ন ব্যবসায়ী পাওয়া খুবই দুরূহ। এই সমস্যা সমাধানের জন্য ইসলামী ব্যাংকসমূহকে নিজ উদ্যোগে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

বর্তমান অনৈসলামী পরিবেশ, বিশেষত প্রচলিত বাণিজ্যিক, রাজস্ব ও দেওয়ানী আইনের অনেকগুলোই ইসলামী ব্যাংকের সুষ্ঠু কার্য পরিচালনার পথে বিষম বাধা। এসব আইনের পরিবর্তন বা সংশোধন প্রয়োজন। যেহেতু সংশ্লিষ্ট সরকারের অনুমতিক্রমে এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনেই ইসলামী ব্যাংকগুলো পরিচালিত হচ্ছে, সেহেতু এসব আইন সংশোধন বা পরিবর্তনের দায়-দায়িত্ব তাদের ওপরও বর্তায়। ইসলামী ব্যাংক এসব প্রতিকূলতার মধ্যেই কাজ করে যাচ্ছে এবং ক্রমাগত সাফল্যের সোপানে উত্তরণ লাভ করছে। বস্তুত সুদী ব্যাংক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ইসলামী ব্যাংক এক

www.bjilibrary.com

সাহসী ও ভিন্নধর্মী চ্যালেঞ্জ। এই ব্যাংক শারীয়াহসম্মত উপায়ে মুসলিমদের রুটি-রুজীর ব্যবস্থার পাশাপাশি সমাজের বৃহত্তর কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্যও পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ইসলামী ব্যাংক তাই মুসলিমদের জন্য প্রয়োজনীয় এক প্রতিষ্ঠানই নয়, মুসলিম উম্মাহর জন্যও অপরিহার্য এক ইন্সটিটিউশন।"

উক্ত সেমিনারে বহু লেখক, বুদ্ধিজীবী এবং সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন।

সেমিনারটি পরিচালনা করেন মাসিক নতুন কলমের সম্পাদক কবি মোশাররফ হোসেন খান।

অর্থনৈতিক ভারসাম্য সৃষ্টিতে যাকাতের ভূমিকা

বিশিষ্ট লেখক, বুদ্ধিজীবী এবং দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক জনাব আবুল আসাদ বলেন, আল কুরআনে মহান রাব্বুল আলামীন যাকাতের ওপর অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন। নামায, রোযা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি যাকাতও গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়। যাকাত হলো ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য একটি ইমার্জেন্সী ফান্ড। অপর দিকে সমাজের অর্থনৈতিক ভারসাম্য সৃষ্টিতেও যাকাতের অসীম গুরুত্ব বিদ্যমান। এই দিকগুলো বিবেচনা করে যাকাতের ওপর আমাদের বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। ইবাদাত ও অর্থনীতির এই দিকটি কোনোক্রমেই অবহেলা করা উচিৎ নয়। কারণ অর্থনৈতিক ভারসাম্য সৃষ্টিতে যাকাতের ভূমিকা সীমাহীন।

গত ১০ই জুলাই, ২০০৮ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত– 'অর্থনৈতিক ভারসাম্য সৃষ্টিতে যাকাতের ভূমিকা' শীর্ষক এক সেমিনারে সভাপতির বক্তব্যে জনাব আবুল আসাদ উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত 'অর্থনৈতিক ভারসাম্য সৃষ্টিতে যাকাতের ভূমিকা' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. আ. ক. ম. আবদুল কাদের। পঠিত প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন সর্বজনাব ড. এম. উমার আলী, ড. মুহাম্মাদ কুরবান আলী, ড. মুহাম্মাদ লোকমান, ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, অধ্যাপক এ.টি.এম. ফজলুল হক, শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির, ড. মুহাম্মাদ আবদুস সামাদ, মুহাম্মদ নূরুল আমিন, মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, ড. মাহফুজ পারভেজ, যুবাইর মুহাম্মদ এহসানুল হক, ড. নজরুল খান আল মারুফ, মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, অধ্যাপক খোন্দকার রোকনুজ্জামান, জাবেদ মুহাম্মাদ প্রমুখ।

সেমিনারে প্রাসঙ্গিক বক্তব্যসহ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মাসিক পৃথিবী ও মাসিক আল ইসলামের সম্পাদক এবং বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক এ. কে. এম. নাজির আহমদ।

www.bjilibrary.com

অধ্যাপক এ. কে. এম. নাজির আহমদ বলেন, যাকাত ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য একটি পিলারস্বরূপ। এটা আমাদের ইবাদাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। সমাজের অর্থনৈতিক ভারসাম্য সৃষ্টিতে যাকাতের কোনো বিকল্প নেই। বিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা মহান রাব্বুল আলামীন। তিনি তাঁর বান্দার কল্যাণের জন্যই যাকাতের বিধান দিয়েছেন। সুতরাং এটাকে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করতে হবে এবং সমাজের সর্বস্তরে যাকাত প্রদান ও তার সুষ্ঠু বিলি-বন্টনের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। যাকাত কোনো দান নয়, এটা গরীবের হক। সেই হক যেন আমরা আদায় করতে পারি সেই দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

ড. এম. উমার আলী বলেন, অর্থনৈতিক ভারসাম্য সৃষ্টিতে যাকাতের ভূমিকা অপরিসীম। যাকাত আল্লাহর এবং বান্দাহর হক। সুতরাং সেই হক আমাদের আদায় করতে হবে। যদি সেটা হয় তাহলে আজকের এই ভারসাম্যহীন সমাজ আবারও ভারসাম্যপূর্ণ হয়ে উঠবে।

ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ বলেন, ইসলমাই একমাত্র অর্থনৈতিক ভারসাম্যের যুগান্তকারী পথ দেখিয়েছে। সেটা হলো যাকাত। কুরআনের আলোকে সঠিকভাবে যাকাত প্রদান করলে যাকাতদাতার সম্পদও বৃদ্ধি পায়। এই বিষয়টি সাধারণ মানুষকে বুঝানো প্রয়োজন। যাকাত সম্পর্কে অনেকের মধ্যে স্বচ্ছ ধারণা না থাকার কারণে এর সুফল থেকেও সমাজ বঞ্চিত হচ্ছে। এই অবস্থা থেকে সমাজকে মুক্ত করার দায়িত্ব আমাদের।

ড. মুহাম্মাদ লোকমান বলেন, অর্থনৈতিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা শুধুমাত্র যাকাত ব্যবস্থার নয় গোটা ইসলামী সমাজ ব্যবস্থারই মূল লক্ষ্য। অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতাই আজকের সমাজে ও বিশ্বে সকল অশান্তি, বৈষম্য, অনৈক্য, বিপর্যয় ও শ্রেণী সংগ্রামের সৃষ্টি করেছে। মূলত অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতা বলতে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, নারী ও পুরুষে, অঞ্চলে অঞ্চলে, সেক্টরে সেক্টরে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে সুষম অর্থ ও সম্পদ বণ্টন ব্যবস্থার অভাবে তথাকথিত সমবণ্টন ও অসম বণ্টন ব্যবস্থার কারণে অর্থনৈতিক তথা অর্থ সম্পদের পার্থক্য সৃষ্টি করেছে, যাকাত ব্যবস্থা যা ইসলামের সুষম বণ্টন ব্যবস্থার কাঠামোগত অপরিহার্য অঙ্গন বিধান তা প্রবর্তন করতে পারলেই কেবলমাত্র অর্থনৈতিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব। তথা অর্থনৈতিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠায় যাকাতের ভূমিকা অপরিহার্য বলে সর্বমহলে স্বীকৃত হবে এবং একটি সুখী ও সমৃদ্ধশালী সমাজ প্রতিষ্ঠা লাভ করবে বলে আমার বিশ্বাস। এহেন কাঙ্ক্ষিত যাকাতভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

ড. মুহাম্মাদ কোরবান আলী বলেন, বাস্তব এবং সঙ্গত কারণেই অর্থনৈতিক

www.bjilibrary.com

ভারসাম্য সৃষ্টিতে যাকাতের ভূমিকা অনস্বীকার্য। যাকাত সমাজে যদি যাকাত পূর্ণাঙ্গভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যায় তাহলে নিঃসন্দেহেই এই সমাজ একটি ভারসাম্যপূর্ণ সমাজে পরিণত হবে।

জনাব মুহাম্মদ নূরুল আমিন বলেন, যাকাতের সুফল সমাজে প্রতিফলিত করতে চাইলে আমাদের আরও বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। কারণ অর্থনৈতিক ভারসাম্যের জন্য যাকাতের কোনো বিকল্প নেই।

জনাব অধ্যাপক এ. টি. এম. ফজলুল হক বলেন, যাকাতের যে অপরিসীম গুরুত্ব– সেটা সেভাবে সমাজে তুলে ধরা হচ্ছে না। ফলে যাকাত আদায় এবং প্রদানের ক্ষেত্রে বহু মানুষ অসচেতন রয়ে গেছে। এজন্য ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা এবং ক্যাম্পিং করা প্রয়োজন। সাধারণ মানুষের মধ্যে যাকাতের গুরুত্ব, এর সুফল এবং এটা যে অবশ্যই পালনীয় একটি ইবাদাত– সেটা ব্যাপকভাবে বুঝাতে হবে। এই দায়িত্ব সরকার এবং আমাদের পালন করতে হবে।

ড. মুহাম্মাদ মতিউল ইসলাম বলেন, শুধু ব্যক্তি পর্যায়ে নয়, রাষ্ট্রীয়ভাবেও যাকাত আদায়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

ড. মাহফুজ পারভেজ বলেন, ইসলাম স্বয়ংসম্পূর্ণ। ইসলামেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে যাকাত। সুতরাং এটিকে কোনোভাবেই ছোট করে দেখার সুযোগ নেই। যাকাতের মধ্য দিয়ে সমাজের অর্থনৈতিক ভারসাম্যই শুধু সৃষ্টি হয় না, মানুষের মধ্যে উঁচু-নিচু প্রভেদও বিলুপ্ত হয়। এর সুফল সর্বব্যাপী। যাকাত যথাযথভাবে আদায় ও প্রদানের ব্যবস্থা নিলে সমাজ সুদের অভিশাপ থেকেও মুক্ত হতে পারে।

জনাব শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির বলেন, দয়াময় আল্লাহ, তিনিই শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন, তিনিই সৃষ্টি করেছেন মানুষ। তিনিই তাকে ভাব প্রকাশ করতে শিখিয়েছেন। আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তিনি শুধুমাত্র তাঁর ইবাদাতের জন্য। আর ইবাদাতের বা আমলে সালেহ-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে নিয়াত। আর এজন্যই আল্লাহ পাক বলেছেন, 'সুতরাং দুর্ভোগ সেই সালাত আদায়কারীদের জন্য যারা তাদের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন, যারা লোক দেখানোর জন্য সালাত আদায় করে।" (সূরা আল মাউন : ৪-৬) এসব সালাত আদায়কারীদের দৈহিক ব্যায়াম হয় ঠিকই। ইবাদাত হয় না। ইসলামে কোন ইবাদাতকেই শুধু দৈহিক বা শুধু আর্থিকভাবে এভাবে নবী পাক (সা) কর্তৃক চিহ্নিত করা বরং সব ধরনের ইবাদাতেই নিয়তের বা মনের ইচ্ছার বা মনোযোগের গুরুত্ব অপরিসীম বলে নবী (সা) এর হাদীস হতে আমরা জানি।

www.bjilibrary.com

তাই সালাত শুধু দৈহিক ইবাদাত এবং যাকাত শুধু আর্থিক ইবাদাত, এভাবে প্রান্তিক মন্তব্যের পৃথক করার কোন অবকাশ সম্ভবত নেই।

পুঁজিবাদ বা সমাজবাদ উভয়ই বিভিন্ন প্রান্তিকতায় পূর্ণ। শুধুমাত্র ইসলামই ভারসামপূর্ণ ও মানবিক জীবন বিধান হিসাবে প্রমাণিত। পুঁজিবাদী সভ্যতায় অর্থই সবকিছু। তাই সবকিছুই এই সভ্যতায় পণ্যতুল্য। নারী, পুরুষ এমনকি শিশুও। সব কর্মকাণ্ড অর্থের মানদণ্ডে বিচার্য। আর্থিক প্রাপ্যতা বা সফলতাই এর সকল কিছুর মানদণ্ড। মানবিক আবেদনে সাড়া দেয়ার কোন দৃষ্টান্ত নেই এ সভ্যতায়। আছে করুণা। তাচ্ছিল্য। অহঙ্কার। অর্থের বিনিময়ে ক্ষুধার তাড়নায় কলিজার টুকরা শিশু বেচাকেনা এবং নারীর আব্রু ফেরি করা এ সভ্যতার বৈশিষ্ট্য। দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত মানুষের শ্রম নাম মাত্র মূল্যে ক্রয় করা এবং পৃথিবীর বুকে মানুষকে দাস হিসাবে বেচাকেনার প্রচলন এই সভ্যতারই।

পুঁজিবাদী সভ্যতায়, সুদ হচ্ছে অর্থনৈতিক গতিশীলতার একমাত্র ভিত্তি। যা ধনীকে আরও ধনী, দরিদ্রকে হত দরিদ্রে পরিণত করে। ধনী, উপর্যুপরি ধনের লোভে অর্থের দাসে পরিণত হয়। আর হতদরিদ্র মানুষ, ন্যূনতম অর্থের প্রয়োজনে অর্থের দাসে পরিণত হয়। অর্থাৎ পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ধনী ও দরিদ্র উভয়কেই অর্থের দাসে পরিণত করে।

অন্যদিকে, ইসলামে যাকাত হচ্ছে অর্থনৈতিক গতিশীলতার একমাত্র ভিত্তি নয়, বরং অন্যতম একটি ভিত্তি। যা ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান ঘুচিয়ে অনেক সময়ই দরিদ্রকে ধনীতে পরিণত করে। করুণা হিসাবে নয়, দরিদ্র মানুষের অধিকার হিসাবে ধনীরা যাকাত আদায় করে। দরিদ্র মানুষের অধিকার স্বেচ্ছায় আদায় করে– শুধু আল্লাহর আদেশ পালনার্থে। আল্লাহর প্রতি সমর্পিত ধনী ব্যক্তিই এই স্বেচ্ছা দানে এগিয়ে আসে। যাকাত আদায়ের মাধ্যমে ধনী ব্যক্তি আল্লাহর মুখলিস আব্‌দে পরিণত হয়। অন্যদিকে দরিদ্র মানুষ, যাকাত প্রাপ্তির পর তার মৌলিক প্রয়োজন মেটাতে পারে এবং আল্লাহর অনুগত এবং কৃতজ্ঞ ইবাদাতকারীতে পরিণত হয়। অর্থাৎ যাকাতের বিধান বাস্তবায়িত বা অনুসৃত হলে ধনী-দরিদ্র উভয়ই মহান আল্লাহর মুখলিস ইবাদাতকারীতে পরিণত হয়।

সুতরাং শুধু যাকাত, দারিদ্র্য দূর করবে এমন ভাবনার অবকাশ ইসলামে নেই। আর তাই শ্রমবিমুখ মানুষকে যাকাত যতই দেয়া হোক না কেন তার দারিদ্র্য দূর হওয়ার কোন আশা নেই।

জনাব মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম বলেন, অর্থ সম্পদ দান করলে সেটা সমাজের

www.bjilibrary.com

সকল ক্ষেত্রেই ছড়িয়ে পড়ে। ফলে তার সুফল মানুষ ভোগ করতে পারে। বর্তমান সমাজে যদি যাকাতকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হতো এবং সেই আলোকে পদক্ষেপ নেয়া যেত, তাহলে ইনশাআল্লাহ এই সমাজ, এই দেশ দারিদ্র্যমুক্ত হতে পারতো।

অধ্যাপক খোন্দকার রোকনুজ্জামান বলেন, যাকাত ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুফল কত দ্রুত লাভ করা সম্ভব তার নজির ইসলামের সোনালী যুগেই রয়েছে। মা'আজ ইবন জাবাল (রা)-কে মহানবী (সা) স্বয়ং ইয়েমেনের গভর্ণর হিসাবে নিয়োগ দিয়েছিলেন। আবু বকরও (রা) তাঁকে সেই পদে বহাল রাখে। উমর (রা) খিলাফত লাভের পরে মা'আজ (রা) সংগৃহীত যাকাতের এক তৃতীয়াংশ মদীনায় পাঠিয়ে দেন। পরের বছর পাঠন অর্ধেক। তার পরের বছর যাকাতের সমস্ত অর্থই তিনি মদীনায় পাঠিয়ে দেন। খলিফা প্রত্যেকবার বিরক্ত হন এবং কৈফিয়ত তলব করেন। মা'আজ (রা) প্রথম দুইবার জানান, ইয়েমেনে বিতরণের পর উদ্বৃত্ত অংশ মদীনায় পাঠানো হয়েছে। শেষের বার তিনি জানান, "এখানে এমন কেউ নেই যে আমার থেকে যাকাত সংগ্রহ করবে।" উমার বিন আবদুল আজীজের (রহ) শাসনামলেও যাকাত নেবার লোক খুঁজে পাওয়া যেত না। যাকাতভিত্তিক অর্থনীতির সাফল্য এমনি।

ড. আ. ক. ম. আবদুল কাদের তাঁর সেমিনার-প্রবন্ধে উল্লেখ করেন, "ইসলাম মানব জাতির জন্য মহান রাব্বুল আলামীন কর্তৃক প্রদত্ত দীন, ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। আল কুরআনে এই দীনের অনুসারীগণকে 'উম্মাতে ওয়াসাত'– মধ্যপন্থা অনুসরণকারী উম্মাত নামে অভিহিত করা হয়।

মুসলিম উম্মাহ আল্লাহ নির্দেশিত পন্থায় ইবাদাত-বন্দেগীর মাধ্যমে মহান সত্তার সাথে নিবিড় আধ্যাত্মিক সম্পর্ক কায়েম করে। এইসব ইবাদাতের মধ্যে কিছু আছে দৈহিক আর কিছু আর্থিক। আর্থিক ইবাদাতের মধ্যে যাকাতের স্থান প্রথম আর মৌলিক ইবাদাতগুলোর মধ্যে এর স্থান তৃতীয়। মহান আল্লাহই মুসলিম উম্মাহর কল্যাণার্থে যাকাতের বিধান প্রবর্তন করেন আর মহানবী (সা) এই বিধানের পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্দেশনা প্রদান করে এক প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দান করেন। যাকাত ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বাইতুল মালের প্রধান উৎস যা অর্থনৈতিক গতি প্রবাহ ও ভারসাম্য সৃষ্টিতে অনবদ্য অবদান রাখে।"

তিনি আরও বলেন, "ইসলামে যাকাত ব্যবস্থা একটি গতিশীল অর্থ ব্যবস্থার নাম। এর খাতসমূহ ও হার আল কুরআন ও হাদীস কর্তৃক নির্ধারিত। ফলে সম্পদশালীদের ওপর করের ন্যায় যাকাতের দুর্বহ বোঝা চাপানোর সুযোগ ইসলামে নেই। অপরদিকে এটি মওকুফ কিংবা হ্রাস-বৃদ্ধি করার অধিকারও

www.bjilibrary.com

কারো নেই। তাই যাকাত অর্থনীতির চাকাকে সচল ও ভারসাম্যপূর্ণ রাখতে সহায়তা করে। যাকাত সম্পদের মালিকের সমুদয় সম্পদ তথা মূলধন পরিচ্ছন্ন রাখে এবং তা বিনিয়োগ ও ভোগ-ব্যবহারের সুযোগ করে দেয়। অনেক সময় দেখা যায়, কালো টাকার মালিকগণ অধিক কর আরোপের আশঙ্কায় তাদের সম্পদ প্রদর্শন করেন না। আর রাষ্ট্রীয় শাস্তির আশঙ্কায় তা বিনিয়োগ করতেও ভয় পান। কিন্তু যাকাত প্রদানকারীর হৃদয়ে সদা জবাবদিহিতার ভয় জাগরুক থাকার কারণে তাঁরা ব্যবসায়-বাণিজ্য ও অর্থ লগ্নি প্রভৃতিতে স্বচ্ছতা বজায় রাখেন। আর প্রতি বছর বাধ্যতামূলক যাকাত প্রদান করতে হবে বিধায় মূলধনে প্রবৃদ্ধি সাধনের লক্ষ্যে তাঁরা সমুদয় সম্পদ বিনিয়োগ করতে সচেষ্ট থাকেন। অপরদিকে যাকাত ব্যবস্থায় যেহেতু তাদের ওপর অধিক করের বোঝা চাপানোর সুযোগ নেই, তাই তাঁরা অবৈধ পন্থায় অধিক মুনাফা অর্জনের মানসিকতা পোষণ করেন না। ফলে সামগ্রিক অর্থ ব্যবস্থায় ভারসাম্য বজায় থাকে। সুতরাং বলা যায়, অর্থনৈতিক ভারসাম্য সৃষ্টিতে যাকাতের ভূমিকা অপরিসীম।"

উক্ত সেমিনারে বহু লেখক, বুদ্ধিজীবী এবং শিক্ষাবিদ উপস্থিত ছিলেন।

সেমিনারটি পরিচালনা করেন মাসিক নতুন কলমের সম্পাদক কবি মোশাররফ হোসেন খান।

একটি মুসলিম দেশের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন কৌশল

বিশিষ্ট লেখক, বুদ্ধিজীবী এবং দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক জনাব আবুল আসাদ বলেছেন, একটি মুসলিম দেশের উন্নয়ন কৌশল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে বিষয়টি ব্যাপক আলোচনা-পর্যালোচনার দাবি রাখে। উন্নয়ন কৌশল বলতে আমরা বুঝি ওয়ার্কিং পলিসি বা প্ল্যান। একটি মুসলিম দেশের উন্নয়নের জন্য এই পলিসি বা প্ল্যান কার্যকর করা একান্ত জরুরি। দেশের উন্নয়নের প্রথম শর্ত হচ্ছে, সেই দেশের মানুষের চারিত্রিক, নৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামগ্রিক জীবনমানের উন্নয়ন ঘটানো। যদি সেটা করা সম্ভব হয়– তাহলে সেই দেশের উন্নয়নও সম্ভব হবে। তিনি বলেন, দেশ পরিচালনার জন্য ইসলামের একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা আছে। সেই নীতিমালা এবং কর্মকৌশল অনুসরণ করলে আজকের বিশ্বে মুসলিম দেশগুলোরও কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব।

গত ২রা আগস্ট, ২০০৮ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত– 'একটি মুসলিম দেশের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন কৌশল' শীর্ষক এক সেমিনারে সভাপতির বক্তব্যে জনাব আবুল আসাদ উক্ত মন্তব্য করেন।

www.bjilibrary.com

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে 'একটি মুসলিম দেশের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন কৌশল' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জনাব মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম। পঠিত প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন সর্বজনাব ড. এম. উমার আলী, ড. মুহাম্মাদ কোরবান আলী, ড. মোহাম্মদ আবদুল মাবুদ, ড. মুহাম্মাদ লোকমান, ড. মুহাম্মাদ আবদুস সামাদ, অধ্যাপক এ. টি, এম, ফজলুল হক, শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির, মুহাম্মদ নূরুল আমিন, ড. মাহফুজ পারভেজ, ড. আহমদ আলী, অধ্যক্ষ আশরাফ আল দীন, যুবাইর মুহাম্মাদ এহসানুল হক, মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম, জাবেদ মুহাম্মাদ প্রমুখ।

সেমিনারে প্রাসঙ্গিক বক্তব্যসহ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মাসিক পৃথিবী ও মাসিক আল ইসলামের সম্পাদক এবং বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক এ. কে. এম. নাজির আহমদ।

অধ্যাপক এ. কে. এম. নাজির আহমদ বলেন, একটি মুসলিম দেশের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রথমে প্রয়োজন উন্নয়ন কৌশল নির্ণয় করা। এর জন্য প্ল্যানিং কমিশনেরও প্রয়োজন। সেই কৌশলগত দিকসমূহের নির্দেশাবলী আল কুরআন ও আস্‌সুন্নাহতে সন্নিবেশিত আছে। সেইগুলো যদি সঠিকভাবে অনুসরণ ও প্রয়োগ করা যায় তাহলে যে কোনো মুসলিম দেশই উন্নয়নের শিখরে পৌছুতে পারে। অতীতেও এর বাস্তবতা আমরা সোনালী ইতিহাসের মাধ্যমে জানতে পারি। বর্তমানেও সেই কৌশলই কার্যকরী ভূমিকা রাখতে সক্ষম। এখন প্রয়োজন সেগুলোর অনুসরণ করা এবং বিজ্ঞানসম্মতভাবে বাস্তবে রূপদান করা। আমি মনে করি, যদি কোনো ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়, তা হলে তাদের জন্য এইসমূহ উন্নয়ন ঘটানো আরও সহজতর হবে।

ড. এম. উমার আলী বলেন, ঈমান ও তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করলে নিয়ামতের দরোজা খুলে যায়। এটা মহান রবেরই শিক্ষা এবং ওয়াদা। সুতরাং কোনো মুসলিম দেশ যদি এই দুটো অপরিহার্য নীতিমালা অনুসরণ করতে পারে, তাহলে সেই দেশের উন্নয়নও সম্ভব। আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান পূর্ণভাবে অনুসরণ করা ছাড়া এমন কোনো কৌশলই নেই, যা দিয়ে দেশ বা জাতির কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ঘটতে পারে। সুতরাং আমাদেরকেও সেই নীতি এবং কৌশল যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই।

ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ বলেন, উন্নয়নের জন্য পাশ্চাত্যকে অনুসরণ করতে গিয়ে আমরা আমাদের নৈতিক মূল্যবোধকেও হারিয়ে ফেলছি। চারিত্রিক অধঃপতনের কারণে আমরা আজ সকল দিক দিয়েই লাঞ্ছিত। উন্নয়ন তো

www.bjilibrary.com

দূরে থাক, আমরা এখন সমস্যার সমুদ্রে নিমজ্জিত। অথচ, আমাদের সামনে উন্নয়নের জন্য আল কুরআন ও আস্ সুন্নাহর মডেল আছে। আজও যদি এই মডেল যথাযথভাবে অনুসরণ করা যায়, তাহলে যে কোনো মুসলিম দেশই কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ঘটাতে পারে।

ড. মুহাম্মাদ কুরবান আলী বলেন, পাশ্চাত্যের উন্নয়ন কৌশলই বর্তমান মুসলিম দেশগুলো প্রাকটিস করছে। এটা দুর্ভাগ্যজনক। এতে করে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন তো সাধন হচ্ছেই না, বরং দিন দিনই মুসলিম দেশগুলো আরও অবনতির অতলে ডুবে যাচ্ছে। এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে অবশ্যই আল কুরআন এবং আস্ সুন্নাহর দিকেই ফিরে যেতে হবে। তাহলেই আমরা কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের ব্যাপারে আশাবাদী হতে পারি।

ড. মুহাম্মাদ আবদুস সামাদ বলেন, মুসলিম দেশ মানেই কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র নয়। ইসলামের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ কোনো মুসলিম দেশই করছে না। ফলে কোনোপ্রকার উন্নয়নও ঘটছে না। প্রতিটি মুসলিম দেশই যদি পাশ্চাত্যের অন্ধ গোলামী থেকে বেরিয়ে এসে ইসলামের সঠিক অনুসরণে তৎপর হয়, ইসলামকে যদি তারা মডেল হিসাবে গ্রহণ করে, তাহলেই কেবল কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের আশা করা যায়।

ড. মুহাম্মাদ লোকমান বলেন, ইসলামী নিয়ম-নীতির যথাযথ অনুসরণ ছাড়া কোনো মুসলিম দেশেই কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন আশা করা যায় না।

জনাব শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির বলেন, একটি মুসলিম দেশ বলতে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশকেই বুঝাবে। যেমন ছিল নবী (সা) ও সাহাবা (রা)-দের কর্তৃক পরিচালিত মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ। একটি মুসলিম রাষ্ট্র এমন হবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে যে তাতে কোন মুসলিমই থাকবে না। একটি মুসলিম দেশ বা রাষ্ট্র মানে Multi-cultural, multi-religion, multi-dientional country-কেই বুঝায়। সুতরাং মুসলিম দেশ বা রাষ্ট্রের উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণে এই বাস্তবতা বা রিয়েলিটিকে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন যে সেখানে শুধু মুসলিমরাই থাকবে না, অমুসলিমরাও থাকবে। তাহলেই উন্নয়ন কৌশল effective হবার আশা করা যায়। অন্যথায় গৃহীত উন্নয়ন কৌশল, কৌশলগত কারণে অকার্যকর হয়ে যেতে পারে। পাশ্চাত্যের উন্নয়ন কৌশল মূলত বস্তুগত বা নিরেট অর্থনৈতিক উন্নয়ন কেন্দ্রিক। সম্পূর্ণরূপে জাগতিক বা ইহলৌকিক। এর পেছনে মূলত পাশ্চাত্যের রাষ্ট্র ও ধর্মের বিরোধের ঐতিহাসিক কারণ জড়িত রয়েছে। ফলে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকল দেশেই পাশ্চাত্য কর্তৃক প্রস্তাবিত উন্নয়ন কৌশল মূলত ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে জীবন ধারণের মান উন্নয়নকেই বুঝায়।

www.bjilibrary.com

ইসলামে বিষয়টি তেমন নয়। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হওয়ার কারণে ইসলাম নিজেই একটি জীবন ব্যবস্থা। যার কার্যকারিতা প্রকাশ হয় রাষ্ট্র ব্যবস্থার মাধ্যমে। মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনের সুখময় জীবনমান উন্নয়নের মাধ্যমে। নারীর অধিকার, সমানাধিকার, মানবাধিকার ইত্যাদি মানব জাতিকে শিখিয়েছে ইসলাম। ইসলামের আগমন না হলে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মতো মানবতার মহান শিক্ষকের জন্ম না হলে মানব জাতি এ শিক্ষা কখনই পেত না। আজকের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যে উন্নয়ন, তার সূচনা করেছিল মুসলিমরা। যার ধারাবাহিকতায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি আজকের এই পর্যায়ে।

জনাব মুহাম্মাদ নূরুল আমিন বলেন, একটি মুসলিম দেশের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ঘটাতে হলে আমাদের ইসলামের অতীত ইতিহাসের দিকে তাকাতে হবে। আল কুরআন এবং রাসূলের (সা) দিক নির্দেশনাই একটি মুসলিম দেশের রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য একমাত্র মডেল হওয়া উচিৎ। এটা যত দিন পর্যন্ত করা হয়েছিল, তত দিন উন্নয়নের সোনালী সুফল আমরা লক্ষ্য করেছি। আর যখনই মুসলিম দেশের শাসকবৃন্দের চরিত্রের পদস্খলন ঘটেছে, তখন থেকেই দুর্ভোগ নেমে এসেছে। এই দুর্ভোগ এখন সীমা অতিক্রম করেছে। সুতরাং কাল বিলম্ব না করে প্রতিটি মুসলিম দেশের শাসকবৃন্দের উচিৎ আল কুরআনের কাছেই ফিরে যাওয়া এবং রাসূলের (সা) পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ করা।

ড. মাহফুজ পারভেজ বলেন, এখন সময় এসেছে জাযিরাতুল আরবের দিকে দৃষ্টি ফেরানোর। দেশ ও জাতির উন্নয়নের জন্য পাশ্চাত্যের অনুসরণ নয়, বরং পাশ্চাত্যের চক্র থেকে বেরিয়ে ইসলামের সঠিক অনুসরণ করতে পারলেই কেবল কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সাধিত হতে পারে। আমরা ইতিহাস পড়ি, কিন্তু ইতিহাস থেকে ভালো কোনো শিক্ষাই গ্রহণ করি না। একটি দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য ইসলামের মডেল ছাড়া এমন আর কোন্ মডেল আছে? নেই।– এই বিশ্বাসের ওপর যদি আমরা সুদৃঢ় থাকতে পারি তাহলেই কেবল কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের স্বপ্ন সফল হতে পারে।

ড. আহমদ আলী বলেন, বর্তমানে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর দুরাবস্থা ও পাশ্চাদপদতার মূল কারণ হলো ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শ থেকে দূরে সরে গিয়ে বস্তুবাদী ও ধর্মনিরপেক্ষ জীবন ব্যবস্থাকে গ্রহণ করে নেওয়া। যদি মুসলিম রাষ্ট্রগুলো প্রকৃত অর্থেই উন্নয়ন অর্জন করতে চায়, তাহলে ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শের প্রকৃত অনুসরণ ও বাস্তবায়নই হবে তাদের উন্নতি ও অগ্রগতির একমাত্র সনদ। যত দ্রুত আমরা এই অমোঘ সত্য উপলব্ধি করতে পারবো, ততই ত্বরান্বিত হবে মুসলিম দেশসমূহের উন্নতি ও অগ্রগতি।

www.bjilibrary.com

অধ্যাপক এ. টি. এম. ফজলুল হক বলেন, মুসলিম দেশের উন্নয়নের জন্য কোনোপ্রকার জাগতিক কর্মকৌশলই উপযুক্ত নয়। সেটা বাঞ্ছনীও নয়। উন্নয়নের কৌশল গ্রহণ করা জরুরি আল কুরআন এবং রাসূলের (সা) আদর্শ থেকে। যদি সেটা সম্ভব হয়, তাহলেই কেবল দেশ ও জাতির উন্নয়ন হতে পারে।

অধ্যক্ষ আশরাফ আল দীন বলেন, মুসলিম দেশের উন্নয়নের জন্য আজ বড় বেশি প্রয়োজন ঐক্যবদ্ধভাবে ইসলামের যুগান্তকারী মডেলকেই অনুসরণ করা। বর্তমান মুসলিম দেশগুলোর উন্নয়নের পথে প্রধান সমস্যাগুলো কি কি, সেগুলো সনাক্ত করতে হবে এবং তার সমাধানে ঐক্যবদ্ধভাবে মুসলিম বিশ্বকে একযোগে কাজ করতে হবে। পাশ্চাত্যের অনুসরণ এবং গোলামীর মধ্যে কেবল ধ্বংস আছে, কোনো কল্যাণই নেই– এটা আজ উপলব্ধি করতে হবে।

জনাব যুবাইর মুহাম্মাদ এহসানুল হক বলেন, দু:খের বিষয় যে, বর্তমান উন্নতি বলতে কেবল জাগতিক উন্নতিই গুরুত্ব পায়। একটি মুসলিম দেশ ও জাতির জন্য নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সকল দিকেই উন্নয়ন ঘটানো প্রয়োজন। ইসলামের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ ছাড়া কোনো উন্নয়নই সম্ভব হতে পারে না। সুতরাং ইসলামকেই উন্নয়নের মডেল হিসাবে গ্রহণ করতে হবে।

জনাব মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম বলেন, ইসলামী রাষ্ট্রই কেবল পারে সার্বিক উন্নয়ন ঘটাতে। সেই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের সকলপ্রকার তৎপরতার চালানো প্রয়োজন। ইসলামই আমাদের একমাত্র মডেল হওয়া উচিত।

জনাব জাবেদ মুহাম্মাদ বলেন, মুসলিম বিশ্বের মানুষ আজ শঙ্কিত এবং উদ্বিগ্ন। তাদের সামনে আশার আলো জ্বালানো প্রয়োজন। একমাত্র আল কুরআন এবং আস্‌সুন্নাহই সেই আশার আলো জ্বালাতে সক্ষম। সুতরাং মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি দেশেরই উচিৎ আল কুরআন এবং রাসূলের (সা) পথ অনুসরণ করা। তাহলেই সার্বিক মুক্তি এবং কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের প্রত্যাশা করা যায়।

সেমিনার-প্রবন্ধে জনাব মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম উল্লেখ করেন, "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে পাশ্চাত্যের অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধি এবং রাজনৈতিক কর্তৃত্বের ফলশ্রুতিতে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার পূর্বতন ঔপনিবেশিক দরিদ্রপীড়িত ও নব্য স্বাধীন দেশগুলো যার মধ্যে মুসলিম বিশ্বের দেশগুলোও রয়েছে, পাশ্চাত্য মডেলের উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করে এগিয়ে যাবার কোশেশ করেছে। জার্মান পণ্ডিত উলফগাং সাকস অত্যন্ত

www.bjilibrary.com

সুন্দরভাবে বলেছেন, "বিগত চল্লিশ বছরকে উন্নয়নের যুগ বলা যায়। যেমন লাইট হাউজের উজ্জ্বলতা, নাবিককে তীরের দিকে পথ প্রদর্শনের মতো 'উন্নয়ন' এমন একটি ধারণা, যা নব প্রজন্মকে যুদ্ধোত্তর ইতিহাসের ভ্রমণ পথে নিয়ে যায়। গণতান্ত্রিক বা স্বৈরতান্ত্রিক দেশই হোক না কেন, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো ঔপনিবেশিক শোষণ থেকে মুক্ত হয়ে তাদের প্রাথমিক গর্বের বহি:প্রকাশ হিসাবে পাশ্চাত্য নির্দেশিত উন্নয়ন মডেলকে জাহির করেছে।... সমস্ত প্রচেষ্টাকে পাশ্চাত্য মডেলের উন্নয়ন লক্ষ্যে পৌছানোর জন্যই যুক্তিযুক্ত মনে করা হয়েছে। কিন্তু তা অন্ধকারেই রয়ে গেছে... বিগত প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে এ দেশগুলো পাশ্চাত্য উন্নয়ন মডেলকে বন্ধুভাবাপন্ন হিসেবে গ্রহণ করেছে।

কিন্তু দৃশ্যপট পরিবর্তন হতে শুরু করেছে। উলফগাং সাকস আরো বলেছেন, 'আলোক স্তম্ভে ফাটল ধরেছে এবং তা চূর্ণ-বিচূর্ণ হতে শুরু করেছে। উন্নয়ন ধারণা এখন যেন বুদ্ধিবৃত্তিক ধ্বংসাবশেষের ছবি। সত্যিকার অর্থে এ যুগ শেষ হয়ে যাবে। এখন এর সমাধি রচনার সময়।

জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচীর (ইউএনডিপি) মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ১৯৯২-এ অনুতাপের সাথে স্বীকার করা হয় যে, 'উন্নয়ন প্রচেষ্টার ফসল সব জায়গায় সমভাবে পড়েনি এবং প্রায়ই তা হতাশাজনক' এবং প্রতিবেদনটি সতর্ক করে দিয়ে উল্লেখ করেছে, 'বিশ্ব দারিদ্র্যের নিগূঢ় সমস্যাগুলো আরো বৃদ্ধি পেতে পারে ও তা বিশ্ব বৃহদাকার ছন্দপতন ঘটাতে পারে। যার ফলাফল থেকে শিল্পোন্নত ও ধনী দেশগুলোও রেহাই পাবে না। প্রতিবেদনটি পরামর্শ দিয়ে লিখেছি, 'বিশ্ব উন্নয়নের সমস্যাগুলো দূর করার জন্য ধনী দেশগুলোর নিজের স্বার্থেই একটা নতুন, শক্তিশালী এবং মৌলিকভাবে ভিন্ন কিছু কৌশল ও পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত।

মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ১৯৯২ এই স্পষ্ট বাস্তবতাকে তুলে ধরেছে যে, গত তিন শতাব্দীর তথাকথিত সর্বজনীন উন্নয়ন প্রচেষ্টায় ধনীরা আরো ধনী হয়েছে এবং দরিদ্ররা আরো দরিদ্র হয়েছে। ঊনিশশত ষাট দশকে, পাঁচ বিলিয়ন জনসংখ্যার তুলনায় ত্রিশগুণ বেশি ভাল অবস্থানে ছিল। জাতিগত অভ্যন্তরীণ অসঙ্গতি বিবেচনায় রেখে সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী বলা যায়, জনসংখ্যার প্রথম এক-পঞ্চমাংশ সম্ভবত অন্যদের তুলনায় একশত পঞ্চাশগুণ বেশি ভাল অবস্থানে আছে।"

তিনি আরও বলেন, "একটি মুসলিম দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার এক নম্বর উদ্দেশ্য হবে মানব সম্পদ উন্নয়ন। একটি মুসলিম জনমানুষের মনোভঙ্গী ও পুনঃ পুনঃ সংশোধন, ব্যক্তিত্ব ও চারিত্রিক উন্নয়ন, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, বিভিন্ন

www.bjilibrary.com

কাজের জন্য দক্ষতা অর্জন, জ্ঞান-গবেষণার উন্নতি, মূল উন্নয়ন কার্যক্রম ও সকল প্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সাধারণ জনগণের দায়িত্বশীল এবং সক্রিয় ও সৃষ্টিধর্মী অংশগ্রহণের জন্য পদ্ধতি উদ্ভাবন এবং সর্বোপরি উন্নয়নের ফলভোগ অংশীদারিত্বের বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে। এটি শিক্ষার সম্প্রসারণ ও ইসলামীকরণ জনগণের সার্বিক নৈতিক প্রশিক্ষণ ও সহযোগিতা, অংশীদারিত্ব ও সহমর্মিতার ভিত্তিতে উদ্ভাবিত সম্পর্কে নতুন কাঠামোর গুরুত্বারোপের দাবি করে। মানব সম্পদ সমাবেশকরণ ও পুনঃ পুনঃ আত্মত্যাগের উৎসাহ অর্জনের জন্য অবশ্য সুউচ্চ দক্ষতা সম্পন্ন কলা কৌশল অপরিহার্য।"

উক্ত সেমিনারে বহু লেখক, বুদ্ধিজীবী এবং সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন।

সেমিনারটি পরিচালনা করেন মাসিক নতুন কলমের সম্পাদক কবি মোশাররফ হোসেন খান।

নারীর উত্তরাধিকার ও অর্থনৈতিক মুক্তি :

একটি পর্যালোচনা

বিশিষ্ট লেখক, বুদ্ধিজীবী এবং দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক জনাব আবুল আসাদ বলেছেন, নারীর উত্তরাধিকার ও অর্থনৈতিক মুক্তি পাশ্চাত্য কখনো দিতে পারে না। দিতে পারে একমাত্র ইসলাম। পাশ্চাত্যকে অনুসরণ ও অনুকরণ করতে গিয়ে আমাদের সমাজ ও পারিবারিক কাঠামোও আজ ধ্বংসের সম্মুখীন। তাদের পথ ও আদর্শ অনুসরণ করে যতই আন্দোলন-সংগ্রাম করা হোক না কেন, তাতে দুর্ভোগ বেড়ে যাওয়া ছাড়া কোনো সুফলই বয়ে আনতে পারে না। মহান রাব্বুল আলামীনই নারীর উত্তরাধিকার এবং অর্থনৈতিক মুক্তির ব্যাপারে সুস্পষ্ট পথ-নির্দেশনা দান করেছেন। সেই পথেই কেবল নারীর কল্যাণ, মুক্তি এবং সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হতে পারে।

গত ২১শে আগস্ট, ২০০৮ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত 'নারীর উত্তরাধিকার ও অর্থনৈতিক মুক্তি : একটি পর্যালোচনা' শীর্ষক এক সেমিনারে সভাপতির বক্তব্যে জনাব আবুল আসাদ উক্ত মন্তব্য করেন।

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত 'নারীর উত্তরাধিকার ও অর্থনৈতিক মুক্তি : একটি পর্যালোচনা' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অধ্যাপক খোন্দকার রোকনুজ্জামান। পঠিত প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন সর্বজনাব ড. এম. উমার আলী, ড. মুহাম্মাদ লোকমান, ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, মোহাম্মাদ শোয়েব নাজির, ড. মুহাম্মাদ আবদুস সামাদ, ড. হাসান মুহাম্মাদ মুঈনুদ্দীন, ড. আ. ক. ম. আবদুল কাদের, ড. মাহফুজ পারভেজ,

www.bjilibrary.com

ড. মুহাম্মাদ মতিউল ইসলাম, মুহাম্মদ নূরুল আমিন, মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, ড. আহমদ আলী, ড. নজরুল ইসলাম খান আলমারুফ, যুবাইর মুহাম্মাদ এহসানুল হক, জাবেদ মুহাম্মাদ প্রমুখ।

সেমিনারে প্রাসঙ্গিক বক্তব্যসহ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মাসিক পৃথিবী ও মাসিক আল ইসলামের সম্পাদক এবং বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক এ. কে. এম. নাজির আহমদ।

অধ্যাপক এ. কে. এম. নাজির আহমদ বলেন, নারীর উত্তরাধিকার ও অর্থনৈতিক মুক্তির বিষয়টি আজ অত্যন্ত জটিল করে তোলা হচ্ছে। অথচ ইসলামই নারীর প্রকৃত মর্যাদাসহ সকলপ্রকার অধিকার নিশ্চিত করেছে। আল কুরআন এবং আস্‌সুন্নাহর সঠিক জ্ঞান অনেকের মধ্যে না থাকায় ইসলামের সেই বিধান অনুসরণ করা হচ্ছে না। যার কারণে সমাজ ও পরিবার চরম ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। আমাদের মনে রাখা জরুরি যে, ইসলামের বিধানই বিজ্ঞানসম্মত, অত্যাধুনিক এবং চূড়ান্ত। আমরা যদি ইসলামের বিধানগুলো সঠিকভাবে অনুসরণ করি তাহলে আর কোনো সমস্যাই থাকার কথা নয়।

ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ বলেন, ইসলামের সকল বিধান একটির সাথে অন্যটি জড়িত। ইসলামের কোনো একটি বিধানকেই পাশ কাটিয়ে যাবার মতো নয়। সেটা করতে গেলেই সমস্যার সৃষ্টি হয়। এরই বাস্তবতা আমরা দেখছি নারীর বর্তমান অবস্থানের মাধ্যমে। তারা নানা ইস্যু সৃষ্টি করে আন্দোলন-সংগ্রামে লিপ্ত। এটা হাস্যকরই বটে। কেননা, ইসলামই তো তাদের সার্বিক নিরাপত্তা ও মর্যাদা দান করেছে। সুতরাং বাঁকা পথে মুক্তির বিফল চেষ্টা না করে বরং ইসলামের দিকেই আমাদের ফিরে আসতে হবে।

ড. এম. উমার আলী বলেন, আমরা অনেক ক্ষেত্রেই ইসলামী বিধানসমূহের ব্যাপারে আত্মরক্ষামূলক অবস্থায় থেকে কথা বলি। এ অবস্থা এসেছে সমাজে ইসলাম বিজয়ী অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত না থাকার কারণে। বর্তমান তো শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো ভাল চাকুরী, উচ্চহারে বেতন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন। আমাদের প্রতিযোগিতামূলক সমাজে নারীদের বর্তমান অবস্থান হচ্ছে, গ্রামের নারীরা গৃহস্থালীর কাজে ব্যস্ততা, কৃষি ক্ষেত্রে ব্যস্ততা, গ্রাম্য উন্নয়ন প্রকল্পে গ্রামের রাস্তাঘাটের উন্নয়ন কাজে, নির্মাণ কাজে, নারীদের অবদান সামাজিক ক্ষেত্রে নেতৃত্ব, শিক্ষা, গবেষণা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, প্রশাসন, রাজনীতি প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর বর্তমান অবস্থান আমাদের বিচার করতে হবে। নারী-উন্নয়নের নীতির প্রেক্ষিতে এসবের অর্থনৈতিক back ground আছে। সন্দেহ নেই আমাদের অনৈসলামিক সমাজে নারীরা বহু ক্ষেত্রেই উপেক্ষিত হতে হচ্ছে। এটা হয়ত এজন্য যে আমরা সমাজের বর্তমান প্রেক্ষাপটে নারীর অর্থনৈতিক, সামাজিক,

www.bjilibrary.com

সাংস্কৃতিক, একাডেমিক অধিকার কার্যকর করতে এখনও পুরোপুরি অভ্যস্ত হতে পারিনি। সমাজে ইসলামে প্রতিষ্ঠিত না থাকায় যত সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। নারীর প্রকৃত কাঙ্ক্ষিত মুক্তির জন্য ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার কোনো বিকল্প নেই। এটা আমরা যত দ্রুত উপলব্ধি করতে পারবো, ততোই এর সুফল সমাজ ও পরিবারে প্রতিফলিত হবে।

ড. মুহাম্মাদ লোকমান বলেন, ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সমাজে সর্বশ্রেণীর মানুষ তথা নারী পুরুষের মধ্যে অর্থনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে ইসলামের নারীর উত্তরাধিকার বিষয়টি সম্পর্কিত ও সামঞ্জস্যশীল তথা নারী পুরুষের মধ্যে অর্থনৈতিক ভারসাম্য ও সমতা বিধান সাধনের জন্যই ইসলামী অর্থনীতির সবচেয়ে বড় "বিধান" মিরাসী আইনের আলোকেই নারীদের জন্য উল্লিখিত উত্তরাধিকার ব্যবস্থার ঘোষণা রয়েছে আল কুরআনে। মূলত সমাজে নারী-পুরুষের মধ্যে অর্থনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এর চেয়ে কোন বিকল্প ব্যবস্থা হতে পারে না।

আমরা যদি নারীদের প্রতি সুবিচার করতে চাই এবং তাদের প্রতি অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চাই তবে দুনিয়ার মানব রচিত সকল 'ইজমা'-এর পরিবর্তে একমাত্র ইসলামে উল্লিখিত নারীর উত্তরাধিকার আইনই প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ইসলাম মূলত সমাজে নারী ও পুরুষের মধ্যে ঘোষিত উত্তরাধিকারের মাধ্যমেই সর্বপ্রকার অর্থনৈতিক ও সমতা প্রতিষ্ঠাকে নিশ্চিত করেছে।

জনাব মোহাম্মদ শোয়েব নাজির বলেন, একজন মাদকাসক্ত নারী বা পুরুষের কাছে মাদকের ভয়াবহ পরিণতি কখনই কোন গুরুত্ব বহন করে না। মাদকের আসক্তিই তাকে মাদকের পক্ষে এনে দাঁড় করায় বা মাদকের পক্ষে কথা বলতে উৎসাহিত করে।

একজন নারী বা পুরুষ যখন ইসলামে নারীর উত্তরাধিকার ও অর্থনৈতিক মুক্তির বিষয়ে প্রশ্ন তোলে– তখন ইসলামে নারীর উত্তরাধিকার, মর্যাদা ও অর্থনৈতিক মুক্তির বিষয়ে তার নিজের সামগ্রিক বিচার করার সক্ষমতার বিষয়েই মূলত প্রশ্ন তোলেন। জীবন বিধান হিসাবে ইসলামের সামগ্রিক রূপ সম্পর্কে অজ্ঞতাই তাদেরকে এ প্রশ্ন তুলে ইসলামের মানবিক জীবন বিধানের বিপক্ষে এনে দাঁড় করায়। নারীর সর্বোচ্চ মর্যাদা নিশ্চিতকারী জীবন বিধান ইসলামের বিপক্ষে এনে দাঁড় করায়।

মানবিক জীবন বিধান হিসাবে ইসলামের সৌন্দর্য একজন অনিন্দ্য সুন্দরী নারীর চেয়েও অনেক সুন্দর। চোখ ফেরানো যায় না। আর যায় না বলেই বিশ্বাস শত শত অমুসলিম প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ইসলামের সৌন্দর্যের প্রশংসাসূচক

www.bjilibrary.com

উক্তি না করে পারেননি। বিশ্বের অন্য কোন জীবন বিধানের ব্যাপারে এমন প্রশংসাসূচক উক্তির নজির নেই।

ইসলাম উপেক্ষা করে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যত আইনই তৈরি হোক না কেন, এতে নারীর প্রকৃত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে না। নারীর অধিকার, মর্যাদা নিরাপত্তা এবং সর্বপ্রকার কল্যাণ নিশ্চিত করেছে একমাত্র ইসলাম। এখন প্রয়োজন কেবলমাত্র ইসলামের আইনগুলোর সঠিক প্রয়োগ।

ড. মুহাম্মাদ আবদুস সামাদ বলেন, যেখানে ইসলাম কার্যকর নেই, সেখানে নারী অধিকার লঙ্ঘিত হওয়াই স্বাভাবিক। এদেশেও তাই হচ্ছে। আল্লাহর দেয়া বিধান যদি সমাজে চালু থাকতো তাহলে নারী অধিকার নিয়ে এখন যে ধরনের হৈচৈ বা আন্দোলন হচ্ছে, এর কোনো কিছুরই প্রয়োজন হতো না। সুতরাং নারীর সার্বিক মুক্তি এবং কল্যাণের জন্য একমাত্র ইসলামকেই অনুসরণ করতে হবে।

জনাব মুহাম্মদ নূরুল আমিন বলেন, বর্তমান বিশ্বে পাশ্চাত্য যে কয়টি বিষয়ে আঘাত করতে চায়, এর মধ্যে নারী সংক্রান্ত বিষয় অন্যতম। সুতরাং এই বিষয়ে আমাদের সচেতন থাকা প্রয়োজন। নারী অধিকার নিয়ে ইসলামের অপব্যাখ্যা দিচ্ছে একশ্রেণীর গোষ্ঠী। অথচ তারা জানে না যে, ইসলামই কেবল নারীর উত্তরাধিকার, অর্থনৈতিক ও মর্যাদা নিশ্চিত করেছে। সুতরাং সমাজ থেকে প্রচলিত ভুল ধারণা দূর করার জন্য আমাদের সচেষ্ট হতে হবে।

ড. মাহফুজ পারভেজ বলেন, ইসলাম নারীর উত্তরাধিকারের বিধানের মাধ্যমে নারীর অর্থনৈতিক মুক্তিই শুধু নয়, সামগ্রিক মুক্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে। বস্তুতপক্ষে ইসলামে নারীর উত্তরাধিকারের সুস্পষ্ট বিধান নারী মুক্তির একটি বাস্তব সনদ। নারী প্রগতির নামে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের যে সকল দল, মত, এনজিও বা এজেন্টরা কাজ করছে, তারা কোন মানদণ্ডেই ইসলামের বিধানের চেয়ে অধিক আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা নারীকে দিতে পারছে না বলেই নানা ফন্দি-ফিকিরের মাধ্যমে বাংলাদেশসহ ইসলামী বিশ্বের নারীদের নানা বাহানায় বিভ্রান্ত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তথ্য, তত্ত্ব ও ইতিহাসের আলোকে আমরা এ সত্যেরই প্রতিধ্বনিই করতে পারি যে, ইসলামকে পাশ কাটিয়ে কোন নারী নীতি বা নারী অধিকারের উদ্যোগ নারীদের জন্য যৌক্তিক কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। নারীকে আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান এবং সর্বপ্রকার পাশবিকতা থেকে রক্ষার জন্য আমাদের কর্তব্য হলো ইসলামকে গভীরভাবে অধ্যয়ন ও অনুশীলন করা এবং কুরআন ও আস্‌সুন্নাহর নির্দেশিত পথ অনুসরণ করা। এ কাজে নারী ও পুরুষকে সহমর্মিতার সাথে এক সঙ্গে কাজ করা প্রয়োজন।

www.bjilibrary.com

ড. আ. ক. ম. আবদুল কাদের বলেন, উত্তরাধিকার সূত্রে নারীর অর্থনৈতিক অধিকার আল কুরআন কর্তৃক স্থিরিকৃত। মৃত ব্যক্তির পুত্র-কন্যা তার সম্পদের অংশীদার হয়।

মানুষের কর্মের অধিকার আছে। সম্পদ অর্জনের অধিকার আছে। হালাল রুজি-রোজগারের অধিকার আছে। প্রতিটি কাজ যা মানুষ করে তাই হল পেশা, ইসলাম নারীদের সেই মর্যাদাসম্পন্ন পেশায় নিয়োজিত করার অনুমোদন দেয়, যা তাকে সম্মান ও মর্যাদার জন্য যথার্থ। নারীদের প্রধান দায়িত্ব মাতৃত্ব এবং স্ত্রীর দায়িত্ব পালন করা। পুরুষ তাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পালন করবে। নারীদের স্বতন্ত্র সম্পদের মালিক হওয়া, ক্রয়-বিক্রয়, ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা বৈধ।

ড. আহমদ আলী বলেন, সম্পত্তিতে পুরুষের চেয়ে নারীদের অধিকার বেশি; এটা নয়, বরং সম্পত্তি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নারীদের মধ্যে বিভাজন বেশি।

ইসলামে যেমন সংসারের প্রয়োজনে নারীদেরকে স্বাধীনভাবে আর্থিক কারবার পরিচালনা করার অধিকার দিয়েছে, তেমনি কোন মহিলার যোগ্যতা ও সামর্থ্য থাকলে পারিবারিক ভারসাম্য রক্ষা করে পর্দার সাথে নারীদের উপযোগী পেশা অবলম্বন করতে পারে।

ইসলাম নারীকে কত উঁচু পর্যায়ের মর্যাদা দান করেছে, সেটা যদি সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার করা যায়, তাহলে এর সুফল সমাজে প্রতিফলিত হবে।

ড. হাসান মুহাম্মাদ মুঈনুদ্দীন বলেন, এদেশের সরকারও নারীর অধঃপতনের জন্য দায়ী। কারণ তারা নারীদের কোনো সমস্যারই সমাধান দিতে পারেনি। বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী নারী আন্দোলনের মূলে উদ্দেশ্যটা কি? উদ্দেশ্য হলো ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতিপক্ষে একটি ইস্যু দাঁড় করানো। ইসলামের প্রতি বিদ্বেষের কারণেই এটা করা হচ্ছে। অথচ তারা আল কুরআনের বিধানগুলো দেখে না। ইসলামের নিয়ম-নীতি সম্পর্কেও অজ্ঞ। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের পথ হলো ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যা যথাযথভাবে জনসমক্ষে তুলে ধরা।

জনাব মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম বলেন, নারীর অর্থনৈতিকসহ সকলপ্রকার অধিকার যথাযথভাবে দিয়েছে একমাত্র ইসলাম। দু:খের বিষয়, সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত না থাকায় এর কোনো সুফলই নারীরা ভোগ করতে পারছে না।

ড. মুহাম্মাদ মতিউল ইসলাম বলেন, ইউরোপিয়ান সমাজে নারীদেরকে খুব কুৎসিতভাবে উপস্থাপন করা হয়। পাশ্চাত্য সমাজে নারীর কোনো অধিকার

www.bjilibrary.com

এবং মর্যাদাই নেই। অথচ তারা উঁচু গলায় নারী অধিকার নিয়ে কথা বলে। ইসলামের বিধানগুলোর সাথে বিশ্বকে পরিচিত করাতে পারলে সকল দিক দিয়েই কল্যাণকর হতো।

সেমিনার-প্রবন্ধে অধ্যাপক খোন্দকার রোকনুজ্জামান উল্লেখ করেন, "মি. র‍্যামসে ইসলামী উত্তরাধিকার সম্পর্কে যথার্থই বলেছেন : 'সভ্য জগৎ উত্তরাধিকার আইন সম্পর্কে এ যাবৎ যা কিছু জানতে পেরেছে, তার মধ্যে ইসলামী উত্তরাধিকার আইনই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি যুক্তিসম্মত এবং পূর্ণাঙ্গ।

আশা করা যায়, দূরদর্শী লোকেরা এটুকুতেই বুঝবেন। তবে আরো এক ধাপ আগে বাড়বার মত নারীবাদী আমাদের সমাজে বিরল নয়। তারা হয়ত বলে বসবেন, যে শর্তে পুরুষ নারীর দ্বিগুণ সম্পত্তি পাচ্ছে (অর্থাৎ আর্থিক দায়িত্ব পালন), সে শর্ত নারীও মেনে নেবে। পুরুষের মত নারীও পারিবারিক ব্যয় নির্বাহে অংশ নেবে। এতে অন্তত পরিবারে মর্যাদা তো বাড়বে। তাকে অবহেলার পাত্রী হয়ে থাকতে হবে না। স্বামী এবং তার স্বজনদের দুর্ব্যবহার তাকে সইতে হবে না। বিভিন্ন পারিবারিক ব্যাপারে মতামত দেবার অধিকার সে লাভ করবে। এভাবে নারীকে পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বীর ভূমিকায় অবতীর্ণ করে তার মুক্তি অর্জন করা যাবে না। নারী-পুরুষ একে অপরের সহযোগী, প্রতিযোগী নয়। একে অপরের সহকর্মী, পরিপূরক। দু'জনের দু'টি কর্মধারার মিলনস্থল হল জীবন নামের মোহনা।

ইসলাম হল স্বভাব-ধর্ম (ফিৎরাত)। তাই ইসলামের বিধানগুলো মানব প্রকৃতির সাথে সাংঘর্ষিক নয়। মানুষের দেহমনের গঠন প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য রেখে ইসলাম তার দায়িত্ব ও কর্তব্য বাতলে দিয়েছে। পুরুষের ওপর অর্পণ করেছে বাইরের শ্রমসাধ্য কর্মজগৎ। তার মনোদৈহিক গঠন এর জন্য সম্পূর্ণ উপযোগী। পক্ষান্তরে, নারীকে অর্পণ করেছে সন্তান পালন ও গৃহকর্মের দায়িত্ব। এটি তার মাতৃত্বের দাবি, তার নারীত্বের দাবি। আল কুরআন নারীদের উদ্দেশ্যে বলেছে : 'তোমরা আপনাপন গৃহে শান্তির সাথে অবস্থান কর'। মহাজ্ঞানী আল্লাহ মানুষের স্রষ্টা। মানুষের যোগ্যতা, প্রবণতা তথা সকল বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একমাত্র তিনিই প্রকৃত ওয়াকিফহাল। তাই, মানুষের পূর্ণাঙ্গ চিত্র সামনে রেখে তিনি যে নিয়ম-নীতি প্রণয়ন করেছেন তা হতে পেরেছে অভ্রান্ত, চিরন্তন। যোগ্যতাপ্রবণতার ভিত্তিতে কর্ম বিভাজনের এই একমাত্র যুক্তিসিদ্ধ নীতিকে গ্রহণ করার মধ্যেই কেবল নারীর মুক্তি এবং কল্যাণ নিহিত রয়েছে।"

উক্ত সেমিনারে বহু লেখক, বুদ্ধিজীবী এবং সাংবাদিক উপস্থিতি ছিলেন।

সেমিনারটি পরিচালনা করেন মাসিক নতুন কলমের সম্পাদক কবি মোশাররফ হোসেন খান।

www.bjilibrary.com

ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিক

বিশিষ্ট লেখক, বুদ্ধিজীবী এবং দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক জনাব আবুল আসাদ বলেছেন, ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকের অধিকার বের বিষয়টি আজকের দুনিয়ায় ব্যাপকভাবে আলোচিত হচ্ছে। এটাই যেন সকল ইস্যুর কেন্দ্রবিন্দু। পশ্চিমা সভ্যতার বিপরীতে ইসলামী সভ্যতার গুরুত্ব কতখানি সেটা আজ যতো বেশি বিশ্বের সামনে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা যাবে, ততোই এর সুফল বয়ে আনবে। কারণ, পশ্চিমা বিশ্ব এখন ইসলামের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছে। ইসলামই তাদের একমাত্র শত্রু। সুতরাং তারা প্রমাণ করতে ব্যর্থ চেষ্টা করে যাচ্ছে যে, এই যুগে ইসলাম অচল। তাদের এই ষড়যন্ত্রের কালো ছায়া বাংলাদেশেও লক্ষ্য করা যায়। এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। তাদের মুকাবিলায় আমাদের ঈমানের বলে বলীয়ান হয়ে দৃঢ়তার সাথে ইসলামকে সর্বত্র উপস্থাপন করতে হবে। প্রমাণ করতে হবে যে, ইসলাম ছাড়া আর কোনো সভ্যতা নেই, আর কোনো মুক্তির পথ নেই। তিনি বলেন, ইসলামী রাষ্ট্রেই কেবল অমুসলিম নাগরিক সকলপ্রকার স্বাধীনতা ও সুবিধা ভোগ করতে পারে। কিন্তু কোনো অমুসলিম রাষ্ট্রে ইসলাম ও মুসলমান নিরাপদ নয়। এর নজির আমরা অতীতেও দেখেছি, বর্তমানও দেখতে হচ্ছে।

গত ১৬ই অক্টোবর, ২০০৮ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত, 'ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিক' শীর্ষক এক সেমিনার সভাপতির ভাষণে জনাব আবুল আসাদ উক্ত বক্তব্য পেশ করেন।

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে 'ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিক' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জনাব শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির। পঠিত প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন সর্বজনাব প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ লোকমান, ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, ড. মুহাম্মাদ আবদুস সামাদ, ড. হাসান মুহাম্মাদ মুঈনুদ্দীন, ড. আ. ছ. ম. তরিকুল ইসলাম, মুহাম্মদ নূরুল আমিন, ড. মাহফুজ পারভেজ, ড. আহমদ আলী, অধ্যক্ষ আশরাফ আল দীন, যুবাইর মুহাম্মাদ এহসানুল হক, ড. নজরুল ইসলাম খান আলমারুফ, ড. মুহাম্মাদ আবদুল হক, মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম, অধ্যক্ষ মুহাম্মদ তাওহীদ হুসাইন, শফিউল আলম ভূঁইয়া, জাবেদ মুহাম্মাদ প্রমুখ।

সেমিনারে প্রাসঙ্গিক বক্তব্যসহ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মাসিক পৃথিবী ও মাসিক আল ইসলামের সম্পাদক এবং বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক এ. কে. এম. নাজির আহমদ।

www.bjilibrary.com

অধ্যাপক এ. কে. এম. নাজির আহমদ বলেন, ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিক বিষয়টি বর্তমান বিশ্বপ্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং বিশ্বের কাছে ইসলামী রাষ্ট্রের ধারণা এবং এর কাঠামো সম্পর্কে স্পষ্ট করে তোলা প্রয়োজন। ইসলামী রাষ্ট্র সম্পর্কিত আলোচনা-পর্যালোচনা এবং লেখালেখি ব্যাপকভাবে হওয়া উচিৎ। এর পাশাপাশি তুলে ধরা প্রয়োজন অমুসলিম রাষ্ট্রে মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা এবং কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রে অকম্যুনিস্টদের অবস্থা সম্পর্কিত চালচিত্র। বলাবাহুল্য যে, একমাত্র ইসলামী রাষ্ট্রেই অমুসলিম নাগরিক সকল দিক দিয়ে নিরাপদ। ইসলামই তাদেরকে এই নিরাপত্তা দান করেছে। তাদের সঠিক মূল্যায়ন ও মর্যাদাও দান করেছে একমাত্র ইসলামী রাষ্ট্র। সুতরাং ইসলামী রাষ্ট্রই হচ্ছে একমাত্র কল্যাণকর রাষ্ট্র। এই কল্যাণকর ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে আমাদের সকলপ্রকার প্রচেষ্টা চালানো জরুরি।

প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ লোকমান বলেন, ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের অধিকার প্রসঙ্গে কুরআন-হাদীসেই স্পষ্ট বক্তব্য পেশ করা হয়েছে। অমুসলিমদের সাথে আচরণের ভিত্তি বা নীতিমালা এবং ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকদের সাধারণ অধিকারসমূহের বিষয়গুলো সুস্পষ্ট। এর মধ্যে সন্দেহের কোনো অবকাশই রাখা হয়নি। রাসূল (সা) প্রতিষ্ঠিত ও খোলাফায়ে রাশেদার প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে অমুসলিমদের নাগরিক অবস্থান ও অধিকার কিভাবে রক্ষিত হয়েছিল সেদিকে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। বাংলাদেশে অমুসলিম-অমুসলিম সম্প্রীতির অবস্থা বর্তমানে বিশ্বে একটি বিরল দৃষ্টান্ত। শুধুমাত্র মুসলিম দেশ হওয়ার কারণেই তা সম্ভব হচ্ছে। যদি এই দেশটি ইসলামী রাষ্ট্র হতো তাহলে এখানে অমুসলিম নাগরিক আরও বেশি সুবিধা ভোগ করতে পারতো।

ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ বলেন, ইসলামী রাষ্ট্রের মডেলটি আজ বিশ্বের সামনে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা একান্ত প্রয়োজন। ইসলামী রাষ্ট্রের মডেল কি? সেটা হলো– কুরআন, সুন্নাহর আলোকে ও খোলাফায়ে রাশেদা এবং উমার ইবনে আবদিল আযীযের সময়ে কাযক্রমের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনার মডেল। এই রাষ্ট্রে সকল অমুসলিম নাগরিক তাদের সকলপ্রকার অধিকার ভোগ করতে পারে। ইসলামী রাষ্ট্রই তাদের সেই অধিকার নিশ্চিত করেছে।

ড. হাসান মুহাম্মাদ মুঈনুদ্দীন বলেন, একটি ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিমের অধিকার সম্পর্কে আল কুরআনে স্পষ্টভাবে নীতিমালা পেশ করা হয়েছে। একটি ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিক যতটুকু স্বাধীনতা ভোগ করার সুযোগ পায়– অমুসলিম দেশে তারা ততটুকু পায় না। মুসলিম দেশে অমুসলিম নাগরিকরা কি কি সুযোগ পাচ্ছেন তার বিস্তর উদাহরণ রয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্র যখন চালু ছিল তখন নারী, বৃদ্ধ, অসুস্থ, প্রতিবন্ধীদের ওপর কর

www.bjilibrary.com

ধার্য ছিল না। এটা একটি বিরল দৃষ্টান্ত। বর্তমান বিশ্বে মুসলিম দেশগুলো অমুসলিমদের সাথে কি ধরনের আচরণ এবং অমুসলিম দেশগুলোতে মুসলিম সংখ্যালঘুদের সাথে কি ধরনের আচরণ করা হচ্ছে সেটা ব্যাপক পর্যালোচনা হওয়া প্রয়োজন। এর পরও লেখালেখি এবং সেমিনার-সিম্পোজিয়ামও করা প্রয়োজন।

ড. মুহাম্মাদ আবদুস সামাদ বলেন, এখন ইসলামের সর্বজনীনতা তুলে ধরা এবং ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের মূল্যায়নসম্বলিত কথা এবং এর সপক্ষে কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য তুলে ধরা প্রয়োজন। একটি ইসলামী রাষ্ট্রে সাধারণ নাগরিক অধিকার। যেমন– মানবিক মর্যাদার ক্ষেত্রে; ধর্ম ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা; ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালন, আচার-আচরণ, আইন-কানুন, ন্যায় বিচার পাওয়া, জান মাল ও সম্ভ্রমের রক্ষার অধিকার, উত্তম মুয়ামালাহ, সামাজিক সহযোগিতা পাওয়া ও দেয়ার ক্ষেত্রে কুরআন সুন্নাহ, খোলাফা ও মুসলিম শাসকদের বাস্তব চিত্র তুলে ধরা প্রয়োজন।

জনাব মুহাম্মদ নূরুল আমিন বলেন, একজন মুসলমান কখনই অসহিষ্ণু নয়। হতে পারে না। অতীতেও ছিল না, এখনো নেই। বরং অমুসলিমরাই যে অসহিষ্ণু এর প্রমাণ তো এখন গোটা বিশ্বেই পাওয়া যায়। অথচ ইসলাম এবং মুসলমানই বর্তমান প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের একমাত্র শত্রু। তারাই ইসলাম এবং মুসলমানকে অসহিষ্ণু, জঙ্গিবাদ, মৌলবাদ হিসাবে ব্যাপকভাবে প্রচারে লিপ্ত। সকলপ্রকার মিডিয়াকেও তারা ব্যবহার করছে তাদের কথাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। সুতরাং এর মুকাবিলা আমাদের করণীয় কি হতে পারে– সেই বিষয়ে গভীর ভাবে ভাবতে হবে।

ড. মাহফুজ পারভেজ বলেন, প্রথমেই আমি একটি প্রশ্ন তুলতে চাই। সেটা হলো : ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রে মুসলিম অধিকার ও অমুসলিমদের অধিকার বলে বিভাজনযুক্ত আলাদা কিছু রয়েছে কি? মুসলিমদের কি কোন বিশেষ অধিকার আছে? অমুসলিমদের কি কোন অধিকারহীনতা আছে? নাকি সকল ক্ষেত্রেই সমানাধিকার রয়েছে? কোনও কোনও ক্ষেত্রে অমুসলিমদের অধিকতর অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা রয়েছে কি? এ সকল প্রশ্নের সুস্পষ্ট উত্তর বর্তমান সময়ে আরও জোরালোভাবে আসা দরকার ছিল। বিশেষ করে কল্যাণধর্মী রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টারত ইসলামী আন্দোলন যে মুসলিম ও অমুসলিম নির্বিশেষে জাতিসত্তার সকল সদস্যের অধিকার, নিরাপত্তা, মর্যাদা, সম্মান ও সমৃদ্ধির জন্যই কাজ করছে, সেটা তুলে ধরা দরকার। একটি ব্যাপকভিত্তিক গণচারিত্র্যের জনআন্দোলনরূপে আপামর মানুষের সমর্থন ও সম্মতির ভিত্তিতে ইসলামী আন্দোলনকে মুসলিম ও অমুসলিম সকলেরই

www.bjilibrary.com

সম্মিলিত কল্যাণের প্রতীকস্বরূপ সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনে বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত করতে হলে প্রতিপক্ষের অপপ্রচার এবং জ্ঞানগত অজ্ঞতাজাত ভুল ধারণাসমূহের অপনোদন করে নাগরিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে মানব স্বার্থ রক্ষায় ইসলামের প্রশ্নাতীত শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ পুন:প্রমাণিত করা আজকে আমাদের সকলের বুদ্ধিবৃত্তিক, নাগরিক ও ঈমানী কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমাদের মনে রাখতে হবে, কোনও বিষয়ে চিন্তার শৈথিল্য ও বিভ্রান্তি আসে ইতিহাসহীনতা, অজ্ঞানতা ও কূপমণ্ডুকতা থেকে। অথচ ইসলামে, যে কোনও বিষয়ের মতই অমুসলিম ও সংখ্যালঘুদের সঙ্গে আচরণ ও নীতিমালার ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র অজ্ঞানতা ও কূপমণ্ডুকতার কোনই স্থান নেই।

ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হলো নাগরিকদের যোগ্যতা ও ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করা, তাদের মেধা, স্বকীয়তা ও দক্ষতা উন্নততর করার মাধ্যমে শান্তি ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবনের নিশ্চয়তা দেওয়া এবং এভাবেই ইহলৌকিক কল্যাণ ও পারলৌকিক সাফল্যের পথে অগ্রসর হওয়া। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ সমগ্র মানব জাতির সামনে এই দিক নির্দেশনাই দিয়েছে। আজকেও এই শাশ্বত আহ্বানের মাধ্যমে মুসলিম ও অমুসলিমদের নির্বিশেষে সকল নাগরিককে একটি উচ্চতর নৈতিকভিত্তিক শান্তি, নিরাপত্তা ও কল্যাণকামী জীবনের দিকে পথ না দেখালে সাম্রাজ্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদের আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক দানবীয় শক্তি ও বাংলাদেশের মত ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের সমাজ সংস্কৃতি মানুষদের মানবিক সম্মান ও মৌলিক মানবাধিকারকে গ্রাস করে ফেলবে। ফলে মানব মুক্তির সর্বজনীন মন্ত্র হিসাবে ইসলামের আলোকিত মহাসড়কে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে জাতি-ধর্ম-ভাষা-বর্ণ-লিঙ্গ-অঞ্চল নির্বিশেষে সমগ্র মানবজাতিকে আহ্বান জানানো ছাড়া শান্তি, কল্যাণ, মনুষ্যত্ব, মানবতা, সভ্যতা ও সর্বজনীন মানবাধিকারকে বাঁচানোর আর কোন পথ খোলা নেই।

ড. আ. ছ. ম. তরিকুল ইসলাম বলেন, ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে যে অসহিষ্ণু এবং অন্য ধর্ম বিদ্বেষী বলে প্রচারণা চালানো হচ্ছে এর উপযুক্ত জবাব দেয়া প্রয়োজন। কারণ একমাত্র ইসলামী রাষ্ট্র ছাড়া অন্য কোনো ধরনের রাষ্ট্রই মানুষের অধিকার সুনিশ্চিত করতে পারে না। ইতিহাসই তার সাক্ষী। সুতরাং আল কুরআন, আস সুন্নাহ, রাসূলের (সা) রাষ্ট্র পরিচালনা এবং খোলাফায়ে রাশেদার যুগের ইতিহাস বিশ্বের সামনে ব্যাপকভাবে তুলে ধরা প্রয়োজন।

অধ্যক্ষ আশরাফ আল দীন বলেন, একটি ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের অধিকারগুলোকে উল্লেখ এবং এর সমর্থনে ইসলামী রাষ্ট্র শুধু নয় মুসলিম

www.bjilibrary.com

প্রধান রাষ্ট্রগুলোর দায়িত্ব কর্তব্য এবং বর্তমান বাস্তবতা সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার প্রচারণা চালানো প্রয়োজন। বর্তমান যুগের গণতান্ত্রিক মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে অমুসলিম নাগরিকগণ যে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছেন তারও ব্যাপক প্রচারণা প্রয়োজন।

ড. আহমদ আলী বলেন, ইসলামী রাষ্ট্রই হলো একটি কল্যাণকর রাষ্ট্র। যদিও অমুসলিমকে ইসলাম রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে হলে তাকে ইসলামী আইনের সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়েই নির্দিষ্ট হারে ফী বছর জিযয়া দিতে হয়। ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের সকলপ্রকার অধিকার ও মর্যাদা সুনিশ্চিত করা হয়েছে। যেটা অন্য কোনো রাষ্ট্র ব্যবস্থা করতে পারে না।

ড. মুহাম্মদ আবদুল হক বলেন, ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের মূলনীতি সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে মুসলিমদের হাতে ইসলামী রাষ্ট্র হবে। যা বর্তমান পৃথিবীতে স্বীকৃত গণতান্ত্রিক পদ্ধতি। আর এটি হচ্ছে– ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের অন্যতম মূলনীতি। এ প্রসঙ্গে মদীনা সনদের পেক্ষাপটও যৌক্তিকতা আসতে পারে।

মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম বলেন, ইসলামী রাষ্ট্র সম্পর্কে আজকের বিশ্ব তেমন অবহিত নয়। এজন্য তারা অপপ্রচার চালাচ্ছে। সুতরাং ইসলামী রাষ্ট্রের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র বিশ্বের সামনে তুলে ধরা একান্ত জরুরি।

মুহাম্মাদ শফিউল আলম ভূঁইয়া বলেন, ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকরা কি ধরনের সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারে তার একটি চিত্র আজকের সমাজে বিজ্ঞানসম্মতভাবে তুলে ধরা একান্ত জরুরি।

অধ্যক্ষ মুহাম্মদ তাওহীদ হুসাইন বলেন, ইসলাম রাষ্ট্রে অমুসলিমদেরও কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। যেমন অমুসলিমগণ রাষ্ট্রের যাবতীয় আনুগত্য করবে এবং আইন মেনে চলবে, অমুসলিম রাষ্ট্রের বন্ধু ও হিতাকাঙ্ক্ষী হবে, প্রভৃতি। প্রকৃত অর্থে ইসলামী রাষ্ট্র এমন একটি কল্যাণ রাষ্ট্র– যে রাষ্ট্রে মুসলিম-অমুসলিম সকলেরই স্ব স্ব অধিকার ও সুবিধা প্রদান করে থাকে। ইসলামী রাষ্ট্রের অতীত ইতিহাস আজ অনেক বেশী করে পর্যালোচনা হওয়া প্রয়োজন।

ড. নজরুল ইসলাম খান আলমারূফ বলেন, অমুসলিম রাষ্ট্রে আজ মুসলিম নাগরিকের অধিকার কিভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে তার পরিসংখ্যান আমাদের জানা নেই। তবে সেই ভয়াবহ চিত্র দেখে আমরা মর্মাহত হই। এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তির একমাত্র পথ– ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। যেখানে মুসলিম-অমুসলিম– সকলেই স্ব স্ব অধিকার ভোগ করতে পারবে।

www.bjilibrary.com

জনাব জাবেদ মুহাম্মাদ বলেন, মুসলিম মাত্রই একটি আদর্শবাদী জাতির নাম। যাদের কাছে আজও অবিকৃত রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে সেই স্রষ্টার বাণী যিনি মূলত সবারই স্রষ্টা এবং সবারই পরিচালনার জন্য গাইড লাইন স্বরূপ দিয়েছেন সর্বশেষ মহাগ্রন্থ আল কুরআন।

অবশ্য এ গ্রন্থ যে শুধু মুসলিমদের জন্যই দেয়া হয়েছে তা নয়। তাই আমরা অমুসলিমদের মাঝেও দেখি যারা এ গ্রন্থ অধ্যয়ন করে তারা এর রঙে নিজেদেরকে রঙিন করতে চায়। ফলে অনেকেই মুসলিম হয়ে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। এটা অবশ্য আল কুরআনুল কারীমেরই মু'জিযা; আল কুরআনুল কারীমের শ্রেষ্ঠত্বের গুণ। আজকে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ হিসাবে বাংলাদেশে আমরা দেখছি অমুসলিমদের সকল ধর্মীয় উৎসবে বাংলাদেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীরা তাদের অনুষ্ঠানস্থলে যাচ্ছে, তাদের অনুষ্ঠানে দর্শকের ভূমিকা পালন করে তাদের উৎসাহ উদ্দীপনা যোগাচ্ছে তাদের উৎস স্থলে মুসলিম সরকার প্রধান যাচ্ছেন এবং সামগ্রিক নিরাপত্তা দানের লক্ষ্যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণও নিশ্চিত করছেন। অথচ এই সময়েই আমরা দেখছি অমুসলিমদের দেশে মুসলিম ভাইদের ওপর আক্রমণ করে হত্যা ও নির্যাতন চালানো হচ্ছে।

সেমিনার-প্রবন্ধে জনাব শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির বলেন, "আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন "Complete Code of life হিসাবে ইসলামী রাষ্ট্র কাঠামোয় অমুসলিম নাগরিকদের যে অধিকার দেয়া হয়েছে এবং ঐতিহাসিকভাবেই এর যে প্রমাণ রয়েছে তা এই মানবিক জীবন বিধানকে এতটা সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছে যে, যে কোন ধর্মের মানুষ ইসলামের এই মানবিকতায় মুগ্ধ না হয়ে পারেনি। যার কারণে মুহাম্মাদ (সা) এবং ইসলামী জীবন বিধানের ব্যাপারে বিভিন্ন ভাষাভাষী ও ধর্মের মানুষের অসংখ্য প্রশংসা বাণী রয়েছে যা অন্য কোন জীবন বিধান বা ধর্মের ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না।

এত বহুল প্রশংসিত একটি জীবন বিধান এবং তার অনুসারীরা আজ কেন এত নিগৃহীত এবং সারা বিশ্বে অমুসলিমগণ কর্তৃক সন্ত্রাসী হিসাবে চিহ্নিত হচ্ছে? এর পেছনে শুধুই কি তথ্য সন্ত্রাস? না ভিন্ন কোনো কারণও রয়েছে?

নিঃসন্দেহে তথ্য সন্ত্রাস একটি অন্যতম প্রধান কারণ। তবে সেই সাথে বর্তমান মুসলিমদের ঈমানে দৃঢ়তা, ঐক্য এবং উদারতার দৃষ্টান্তের অভাবও প্রধান কারণ।...

বর্তমান পাশ্চাত্য মিডিয়া এবং এ দেশীয় পাশ্চাত্য অর্থপুষ্ট মিডিয়া গোষ্ঠি কিছুতেই ইসলামের সৌন্দর্য দেখতে পায় না। পরিকল্পিতভাবে ইসলামের

www.bjilibrary.com

বিরুদ্ধে বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে এরা তথ্য সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে একদিকে সাধারণ অমুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ইসলামের ব্যাপারে একটি অহেতুক ভুল ধারণা তৈরী হচ্ছে। অন্যদিকে মুসলিম সাধারণ্যে ব্যাপক বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়ছে। আর এভাবে পরিকল্পিতভাবে তৈরি ঘোলাটে পরিস্থিতিতে আধিপত্যবাদী, গণতন্ত্রের মুখোশধারী, মানবতা ধ্বংসকারী শক্তি তাদের লক্ষ্য হাসিল করে নিচ্ছে। মুসলিমদেরকে দিয়ে মুসলিমদের রক্ত ঝরাচ্ছে। কখনও কখনও সরাসরি নিজেরাই আগ্রাসন চালাচ্ছে মুসলিম জনপদে।

মুসলিম উম্মাহর এ অবস্থা নবী (সা)-এর তায়েফে নির্যাতিন হয়ে রক্তাক্ত হবার ঘটনার সাথে তুলনীয়। যেখানে রাসূল (সা)-এর বিরুদ্ধে কাফির ও মুশরিক শক্তি কিছু নিরপরাধ মানুষকে উস্কানি দিয়ে লেলিয়ে দিয়েছিল। যারা উপুর্যপরি পাথর ছুড়ে রাসূল (সা)-কে আপদমস্তক রক্তাক্ত করেছিল। তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলেন। আজ তেমনি গোটা মুসলিম উম্মাহ যেন সারা বিশ্বে রক্তাক্ত হয়ে পড়েছে। এতটা নির্যাতনের পরও রাসূল (সা) যেমন কাউকে অভিশাপ দেননি কিংবা ধৈর্যহারা হননি বরং আগামী বংশধরদের মধ্যে ইসলামের অনুসারীর স্বপ্ন দেখেছিলেন, দোয়া করেছিলেন, তেমনি বর্তমানে মুসলিম উম্মাহকেও একই নীতিতে ধৈর্যধারণ করতে হবে এবং আগামী প্রজন্মের মধ্যে ইসলামের অনুসারী তথা ইসলামের বিজয়ের স্বপ্ন দেখতে হবে। যেভাবে রাসূল (সা) দেখেছিলেন।"

উক্ত সেমিনারে বহু লেখক, বুদ্ধিজীবী এবং সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন।

সেমিনারটি পরিচালনা করেন মাসিক নতুন কলমের সম্পাদক কবি মোশাররফ হোসেন খান।

ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ

বিশিষ্ট লেখক বুদ্ধিজীবী এবং দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক জনাব আবুল আসাদ বলেন, ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ একটি বিশাল বিষয়। দু'টির দুই প্রান্তসীমায় অবস্থান। ইসলামের মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের দূরতম কোনো সম্পর্ক থাকাও সম্ভব নয়। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ এমন এক উদারনীতির পরিচায়ক– যার মধ্যে ফ্রয়ডের যৌনদর্শন, কার্লমার্কাসের সমাজতন্ত্র, সেক্যুলারিজম, পুঁজিবাদ– সবই একাকার হয়ে যায়। কিন্তু ইসলামের দর্শন অত্যন্ত পরিষ্কার। তার অবস্থানও সংশয়হীন ও সুদৃঢ়। এজন্যই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা ইসলামকেই প্রধানতম শত্রু মনে করে। তারা ইসলাম থেকে জীবন, রাজনীতি, সমাজনীতি, পারিবারিক প্রথা, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড

www.bjilibrary.com

সকল কিছুই পৃথক করতে চায়। এটা তাদের এক কৌশলী হাতিয়ার। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের প্রবক্তারা অত্যন্ত সচেতন এবং সতর্ক। সুকৌশলে তারা মুসলিম উম্মাহকে বিভ্রান্ত এবং বিভক্ত করার চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং আমাদের আরও বেশী সতর্ক হতে হবে। ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

গত ৩০শে অক্টোবর, ২০০৮ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত "ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ" শীর্ষক এক সেমিনারে সভাপতির ভাষণে জনাব আবুল আসাদ উক্ত বক্তব্য রাখেন।

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে "ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ" শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জনাব যুবাইর মুহাম্মদ এহসানুল হক। পঠিত প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন সর্বজনাব প্রফেসর ড. মুহাম্মদ লোকমান, ড. হাসান মুহাম্মাদ মুঈনুদ্দীন, ড. মুহাম্মদ আবদুস সামাদ, ড. মাহফুজ পারভেজ, মুহাম্মদ নূরুল আমিন, ড. আ.ছ. ম. তরিকুল ইসলাম, মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, ড. মুহাম্মাদ মতিউল ইসলাম, ড. মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম মাসুদ, ড. নজরুল ইসলাম খান আলমারূফ, শফিউল আলম ভূঁইয়া, অধ্যক্ষ তাওহীদ হুসাইন, ড. মুহাম্মদ আবদুল হক, জাবেদ মুহাম্মাদ প্রমুখ।

সেমিনারে প্রাসঙ্গিক বক্তব্যসহ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক এবং মাসিক পৃথিবী ও মাসিক আল ইসলামের সম্পাদক অধ্যাপক এ.কে.এম. নাজির আহমদ।

অধ্যাপক এ.কে.এম. নাজির আহমদ বলেন, ধর্মনিরপেক্ষতার ধোঁয়ায় আজ গোটা জাতি আচ্ছন্ন। এর প্রবক্তারা খুবই সোচ্চার। তারা ইসলামের মূল আদর্শ, চেতনা এবং স্পীরিট থেকে মানুষকে দূরে রাখতে চায়। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ শ্লোগান তাদের একটি মারণাস্ত্র, যা দিয়ে তারা ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহকে ঘায়েল করতে চায়। মূলত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের কোনো আদর্শ নেই। নেই কোনো ভিত্তি। এটা সমাজতন্ত্র, পুঁজিবাদসহ নানা অপকৌশলের চেয়েও ভয়ঙ্কর এবং মারাত্মক। সুতরাং এ সম্পর্কে আমাদের সচেতন থাকতে হবে এবং ইসলামের আদর্শে মানুষকে উজ্জীবিত করে তোলার কাজ আরও বেগবান করতে হবে। সর্বোপরি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের কুফল সম্পর্কে সমাজ ও জাতিকে সতর্ক ও সচেতন করে তুলতে হবে।

প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ লোকমান বলেন, ইসলামকে ধ্বংস করার জন্যই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সকলপ্রকার অপচেষ্টা। এর ধারক এবং বাহকরা

www.bjilibrary.com

সুবিধাভোগী। তাদের সুখ-সম্ভোগের জন্যই এই ভ্রান্তি ছড়িয়ে দিচ্ছে জনমনে এবং সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। কায়েমী এই স্বার্থবাদী গোষ্ঠীর মুকাবিলা করা প্রয়োজন এবং সেটা ইসলামের মাধ্যমেই। এজন্য আমাদের অনেক বেশী দীনি দায়িত্ব পালন করতে হবে। সমাজ থেকে ধর্মনিরপেক্ষতার শিকড় উপড়ে ইসলামের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এটাই সময়ের দাবি।

ড. হাসান মুহাম্মদ মুঈনুদ্দীন বলেন, মধ্য ইউরোপ থেকে তুরস্কে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রবেশের কারণ কি সেটা আমাদের আজ ভেবে দেখতে হবে। ধর্মনিরপেক্ষতার বিপ্লব সেখানে কি দিয়েছে? কেবল ইসলামী জাগরণকেই তারা বাধাগ্রস্ত করেছে। বাংলাদেশেও চলছে ধর্মনিরপেক্ষতার জোয়ার। এর একমাত্র কারণ- তারা ইসলামী আন্দোলনকে প্রতিহত করতে চায়। ইসলামের জাগরণকে বাধাগ্রস্ত চায়। তাদের সবচেয়ে বড় অস্ত্র ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ। সেই অস্ত্র দিয়ে তারা মুসলিম উম্মাহকে ধ্বংস করতে চায়। ধর্মনিরপেক্ষতার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তোলা আজ একান্ত প্রয়োজন। ইসলাম পরকালে বিশ্বাসী, অপর দিকে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ভোগবাদে বিশ্বাসী। সুতরাং এই দুইএর মধ্যে আকিদাগত পার্থক্য ব্যাপক-বিশাল। কোনো মুসলমানই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদে বিশ্বাসী হতে পারেন না। কারণ এটা ঈমানেরই পরিপন্থী।

ড. মুহাম্মদ আবদুস সামাদ বলেন, ধর্মনিরপেক্ষতার উৎপত্তি কোথায় এবং তা কিভাবে মুসলিম বিশ্বে প্রবেশ করে, সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের প্রবক্তারা আল্লাহকে অস্বীকার করে না, তবে দীনকে দুনিয়া থেকে পৃথক মনে করে। ইসলামের জন্য এটাই বেশী মারাত্মক। কেননা এর মাধ্যমে মুসলিম সাধারণকে প্রতারিত করা হয়। ইসলাম ভঙ্গের কারণসমূহের মধ্যে একটি হলো রাসূলের (সা) উপস্থাপিত জীবন বিধানের ওপর অন্য মতবাদকে প্রাধান্য দেয়া। এটা জনসাধারণকে বুঝাতে হবে। ধর্মনিরপেক্ষতার কুফল ব্যাপক। যেমন : ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ; আল্লাহর বিধানকে প্রত্যাখ্যান করে; ইসলামের ইতিহাসের বিকৃতি সাধন করে; ধর্মীয় শিক্ষার বিলোপ ঘটায়; চারিত্রিক অধঃপতন ঘটে এবং সমাজে অশ্লীলতার সয়লাব বয়ে যায়। সুতুরাং এই মরণব্যাধি থেকে আমাদের সমাজকে মুক্ত করতে হবে।

জনাব মুহাম্মদ নূরুল আমিন বলেন, ইসলামের অনুসারীরা ধর্মনিরপেক্ষতার কথা কখনো বলতে পারে না। কেননা ইসলামই একমাত্র জীবন-বিধান যা রাষ্ট্রকে সমাজ পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছে। ইসলাম রাষ্ট্রের ওপর দায়িত্ব অর্পণ করেছে। যেমন : ১. অন্যায় এবং অশ্লীলতা মুক্ত সমাজ কায়েমের লক্ষ্যে নামাজ কায়েমের মাধ্যমে মানুষের চরিত্র গঠন করা, ২. অর্থনীতিকে

www.bjilibrary.com

শোষণ মুক্ত করার লক্ষ্যে সুদের মূলোচ্ছেদ করে সম্পদের সুষম ও ন্যায্য বণ্টন এবং যাকাত ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে মানুষের অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণ, অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা নিশ্চিত করার মাধ্যমে মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, ৩. সৎ কাজের আদেশ প্রদানের মাধ্যমে মানুষকে সৎ জীবন যাপনের উদ্বুদ্ধ ও সুপথে পরিচালিত করা এবং ৪. যাবতীয় অসৎ ও নীতিগর্হিত কাজ এবং পাপাচার থেকে মানুষকে বিরত রেখে সমাজকে পূত পবিত্র রাখা। সুতরাং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের কুফল সম্পর্কে আমাদের সম্যক ধারণা থাকতে হবে এবং এটাকে শান্তভাবে প্রতিহত করতে হবে।

ড. মাহফুজ পারভেজ বলেন, সেক্যুলারিজম শব্দটির প্রকৃত অর্থ হল : 'ইহজগৎ সম্বন্ধীয়' বা 'ধর্ম-সম্বন্ধীয় প্রশ্ন-বর্হিভূত'। অর্থাৎ ইহজাগতিকতা। অভিধানের ভাষায় সেক্যুলার বা ইহজাগতিকতা মানে :

* যা ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিকভাবে পবিত্র বলে বিবেচিত নয়।

* যা ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়।

* যা কোনও ধর্মবিশ্বাসের অন্তর্গত নয়।

* রাজনৈতিক বা সামাজিক দর্শন, যা ধর্মবিশ্বাসকে নাকচ করে দেয়।

ফলে যারা কোনও ধর্মের অন্তর্গত নন, কোনও ধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত নন, কোনও ধর্মে বিশ্বাসী নন এবং আধ্যাত্মিকতা ও পবিত্রতার বিরোধী, যারা সেক্যুলারিজম বা ইহজাগতিকতাকে বিশ্বাস ও পালন করেন, তারা সেক্যুলার বা ইহজাগতিক। সেক্যুলার শব্দটির সঠিক অনুবাদ ইহজাগতিকতাই হওয়া উচিত। কারণ মধ্যযুগের ইউরোপে খ্রিস্ট্রিয় চার্চ ও পোপের হাতে মানুষের জীবন ও জগৎ যেভাবে বন্দি ও নিষ্পেষিত হয়েছিল, তা থেকে মুক্তির জন্য সেখানে ধর্ম ও রাজনীতিকে পৃথক করা প্রয়োজন ছিল। প্রয়োজন ছিল গ্রিক ক্লাসিকসহ চিন্তা-দর্শন-রাজনীতি-সাহিত্যসহ সকল ক্ষেত্রে দেব-দেবী ও পোপের অনাকাঙ্ক্ষিত প্রাধান্যকে মুক্ত করে মানব সত্তার স্বাধীনতা নিশ্চিত করা। সেই বিবেচনায় ইউরোপে সেক্যুলারিজম প্রাসঙ্গিক। এবং সে অর্থে ইহজাগতিকতা না বলে ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটি সেক্যুলারিজম বলতে প্রয়োগ করা হয়।

ইউরোপের তিক্ত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে উত্থিত সেক্যুলার বা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলতে এমন একটি রাষ্ট্র বা সমাজ ব্যবস্থাকে বোঝানো হয়, যে রাষ্ট্র বা সমাজ কোনও বিশেষ ধর্মের ভিত্তিতে পরিচালিত নয়। এ মতবাদীয়রা ইউরোপিয় খ্রিস্ট্রিয় মধ্যযুগের অন্ধকারের অভিজ্ঞতার আলোকে বিশ্বাস করেন যে, মানবজীবনের পক্ষে যা কিছু মঙ্গলজনক তা ঈশ্বর ও ধর্ম থেকে বিযুক্ত, নিরপেক্ষ। মধ্যযুগ-পরবর্তীকালে রেনেসাঁ-রিফরমেশন-এনলাইটেনমেন্ট ইত্যাদিও ধারাবাহিকতায় ১৮৪৬ সালে ইংল্যান্ডের হোলিওক (১৮১৭-

www.bjilibrary.com

১৯০৬) সর্বপ্রথম মতবাদ হিসাবে সেক্যুলারিজম প্রচার করেন। তবে এ মতবাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবক্তা ছিলেন চার্লস ব্র্যাডলাফ (১৮৩৩-১৮৯১)। এ মতবাদ প্রচারের জন্য ইংল্যান্ডে 'ন্যাশনাল সেক্যুলার সোসাইটি' নামে একটি সমিতিও প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইউরোপের অভিজ্ঞতায় মধ্যযুগের খ্রিস্ট্রিয় স্বেচ্ছাচারের প্রতিবাদে সেক্যুলারিজম বাস্তবসম্মত হলেও এশিয়ায় সে যথাযর্থ নয়; মুসলিম বিশ্বে তো নয়ই। কারণ, ইউরোপে যখন মধ্যযুগ, সে সময়কালে ইসলাম শাসনে ও জীবন-ধারণে বিশ্বব্যাপী আলোর যুগ সূচিত করেছে। ইসলামে পোপতন্ত্রের মত মোল্লাতন্ত্র কখনও প্রতিষ্ঠা পায়নি এবং মসজিদ কখনও অজ্ঞানতা ও জীবনবিমুখতার দিকে ঠেলে দেয়নি। ইসলাম দুনিয়া ও আখেরাতের যৌথ-কল্যাণে ভারসাম্যপূর্ণভাবে প্রচেষ্টা চালিয়েছে। দুনিয়াকে আখেরাতের শষ্যক্ষেত্ররূপে চিহ্নিত করে কর্মমুখর করেছে। অতএব ইউরোপের বা খ্রিস্ট জগতের জন্য প্রযোজ্য সেক্যুলারিজম এশিয়া ও ইসলামে আকার্যকর ও অচল।

ড. আ.ছ.ম তরিকুল ইসলাম বলেন, 'Secularism' শব্দের আসল অর্থই হচ্ছে 'ধর্মহীনতা' belief that morality or education should not be besed on religion. (Oxford Dictionary) Secularism এর অনুবাদ 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটিও যে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে গ্রহণ করা হয়েছে তা স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের উদ্দেশ্যই হলো জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র থেকে ধর্মকে বাদ দেয়া। ধর্ম মানুষকে পশ্চাৎপদ করে এটাই বড় অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কামাল আতাতুর্কের আন্দোলন প্রাথমিক দিকে মুসলিম নেতাদেরকে কাজে লাগিয়েই শুরু হয় যেমন লিবিয়ার আহমাদ সুনুসী পাকভারত উপমহাদেশের শওকত আলী মোহাম্মদ আলীকেও তারা ব্যবহার করে। আরব বিশ্বে ফারহ আনতুয়ান (১৮৭৪-১৯২২) ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের প্রথম প্রবক্তা ছিলেন। এরপর তো এই শ্লোগানের সয়লাব চলছে। এতে করে মুসলিম উম্মাহ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সুতরাং এ থেকে মুক্তির উপায় ও কৌশল আমাদের বের করতে হবে।

ড. মুহাম্মাদ শফিকুল ইসলাম মাসুদ বলেন, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ ও অন্যান্য মতবাদের সাথে তুলনামূলক আলোচনায় ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের নেতিবাচক দিকসমূহ আরও বিস্তারিতভাবে জনসমক্ষে তুলে ধরা প্রয়োজন।

ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ প্রসংগে ব্যাপক আলোচনা-পর্যালোচনা হওয়া জরুরি। সমসাময়িক কালে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের অবস্থান বা পরিণতি কি সেটাও আমাদের স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ মূলত ভুলের ওপর নির্ভুলভাবে দণ্ডায়মান। এখানে রয়েছে কেবল অপব্যাখ্যার

www.bjilibrary.com

প্রাধান্য। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে নাম মাত্র আনুষ্ঠানিকতার রূপান্তর করেছে এবং জীবনকে বস্তুবাদী দর্শনমুখী করে গড়ে তুলেছে। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ অনুসারে পরিচালিত রাষ্ট্রের করুণ পরিণতি সম্পর্কেও জনসমাজকে অবহিত করা প্রয়োজন।

জনাব শফিউল আলম ভূঁইয়া বলেন, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ একটি কুফরী মতবাদ। সুতরাং এই মতবাদের কুফলগুলো আরো বলিষ্ঠভাবে জনসমক্ষে তুলে ধরা প্রয়োজন।

ড. নজরুল ইসলাম খান আলমারুফ বলেন, ইসলাম আল্লাহ মনোনীত একমাত্র বিশ্বজনীন জীবন ব্যবস্থা। তাই একজন মুসলমান কখনো ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারে না। যখন বিশ্বব্যাপী ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের আমদানী-রপ্তানীর রমরমা বাণিজ্যের উৎসব চলছে, তখন ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের মুখোশ উন্মোচিত করা একান্ত প্রয়োজন। কারণ ধর্মের অন্তরালে অধর্মের চর্চাকে দারুণভাবে নিরুৎসাহিত করে। ফলে এ ব্যাপারে আমাদের সতর্ক পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি।

ড. মুহাম্মদ আবদুল হক বলেন, অন্যান্য ধর্মের সাথে ধর্মনিরপেক্ষতার সম্পর্ক আর ইসলামের সাথে ধর্মনিরপেক্ষতার বিরোধ এক নয়। এ বিষয়টি আরও ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন। যেহেতু ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা, অন্যদিকে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবাস্থার দাবিও কোন ধর্ম বা মতবাদ করে না– এই প্রেক্ষাপটে ব্যাপক আলোচনা হতে পারে।

ঈমানের দৃষ্টিভঙ্গিতে ধর্মনিরপেক্ষতার আলোচনা হতে হবে। রাজনৈতিক মতবাদ হিসাবে ধর্মনিরপেক্ষতার বিরোধিতার সাথে সাথে ধর্মনিরপেক্ষতা শিরক ও কুফর হিসাবে দলীল সহ পেশ করাও প্রয়োজন।

জনাব মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম বলেন, রাষ্ট্র বা রাজনীতির সাথে ধর্ম থাকেবে না, ধর্ম থাকবে একান্ত ব্যক্তিগত জীবনে, রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণে ও পরিচালনায় কোনভাবেই ধর্ম আসবে না, অর্থাৎ মুসলিম বিশ্বে ধর্মনিরপেক্ষতা অর্থ ইসলাম মুক্ত শাসন। ধর্মনিরপেক্ষতার পরিণতি হলো– চিন্তাধারায় সংশয়বাদ ও মূল্যবোধে বিভ্রান্তি। নৈতিকতাও ধর্ম থেকে রাজনীতি আলাদা করে ফলে লোভ লালসা, যিনা-ব্যভিচার, নির্লজ্জতা, পাশবিকতা তাদের কাছে অন্যায় মনে হয় না। ধর্মনিরপেক্ষতার কুফল ব্যাপক। কোনো মুসলিম রাষ্ট্রে তাই ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে কোনো কিছু থাকতে পারে না।

জনাব মুহাম্মাদ জাবেদ মুহাম্মাদ বলেন, ইসলামের মূলনীতি বা মূলভিত্তি কী সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা আমাদের মাঝে থাকা প্রয়োজন।ধর্মনিরপেক্ষবাদের প্রবর্তকরা কিভাবে সর্বত্র ধর্মকে দূরে ঠেলে দিয়ে তাদের মতবাদ প্রতিষ্ঠার কাজে আত্মনিয়োগ করেছে এ সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তোলা জরুরি।

www.bjilibrary.com

জনাব যুবাইর মুহাম্মদ এহসানুল হক তাঁর সেমিনার প্রবন্ধে বলেন, "আমরা যখন ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ নিয়ে আলোচনা করছি তখন ইউরোপে একটি মতবাদ হিসাবে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ পরিত্যক্ত হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মূলনীতিসমূহ তারা পরিত্যাগ করেছে; বরং পরবর্তীতে ইউরোপীয় চিন্তায় এমন সব তত্ত্বের আগমন ঘটেছে যা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মূলনীতিসমূহকে ধারণ করে এই মতবাদকে ছাপিয়ে গেছে। অবশ্য বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ নিয়ে আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে; এদেশের কতিপয় রাজনৈতিক দল ও বুদ্ধিজীবী এখনো ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের ডঙ্কা বাজাচ্ছেন। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের রাজনৈতিক সমর্থন আদায়ের জন্য তারা ধর্মনিরপেক্ষতার আশ্রয় নেন। শুধু তাই নয়, ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ায় ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের বেশ কিছু মূলনীতিকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হয়। আমাদের দেশের এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী ইসলামের ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের যুগপৎ অনুশীলন সম্ভব বলেও দাবি করেন।

তিনি আরো বলেন,

"ইসলামের দৃষ্টিতে পরকাল কোন অজানা জগত নয়। পরকালের চিত্র, পরকালীন জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও দুঃখ-দুর্ভোগের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ আল-কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। অতএব ধর্মতত্ত্ব অজানা জগত নিয়ে আলোচনা করে বলে যে দাবি করা হয় ইসলামের দৃষ্টিতে তা অসার।

উপর্যুক্ত আলোচনা হতে বুঝা গেল ইসলাম ব্যক্তিগত জীবনে পালনযোগ্য কিছু বন্দেগী-উপাসনার নাম নয়। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান, যাতে পার্থিব জীবন পরিচালনার সামগ্রিক দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এদিক নির্দেশনার প্রতিপালন করা একজন মুসলিমের জন্য বাধ্যতামূলক। ইসলামের নির্দেশনা মুতাবিক পার্থিব জীবন পরিচালনা করলেই কেবল একজন মুসলিম পরকালীন সাফল্য অর্জন করতে পারে। আর তাই মুসলিমের পক্ষে ইহকাল ও পরকালের সাফল্য ও মুক্তির জন্য বিভিন্ন উৎসের দ্বারস্থ হওয়ার সুযোগ নেই; পরকালের জন্য ইসলামের নির্দেশনা অনুসরণ করা এবং ইহকালীন জীবন পরিচালনার জন্য ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বা অন্য কোন মতবাদের আশ্রয় নেয়াও একজন মুসলিমের জন্য সম্ভব নয়।"

উক্ত সেমিনারে বহু লেখক, বুদ্ধিজীবী এবং সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন।

সেমিনারটি পরিচালনা করেন মাসিক নতুন কলমের সম্পাদক কবি মোশাররফ হোসেন খান। ■

লেখক-পরিচিতি : মোশাররফ হোসেন খান– কবি, সম্পাদক– মাসিক নতুন কলম।

www.bjilibrary.com

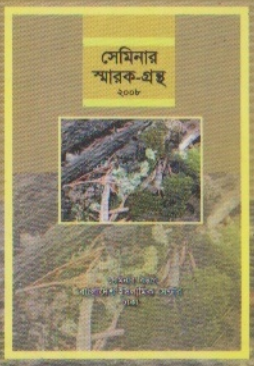

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা